এ ডাইনেস্টি অ্যাট ওয়ার
এম্পায়ার অব দ্য
মোগল
ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাডোস
আলেক্স রাদারফোর্ড
BanglaBook.org
অনুবাদ: কাজী আখতারউদ্দিন

'ভয়ঙ্কর এবং নৃশংসতায় ভরপুর একটি যুগে শুরু হওয়া সত্যিকার ঐতিহাসিক চরিত্র– ব্যাপক সংঘর্ষ নিয়ে রচিত এমন একটি কাহিনী, যা পুরোপুরি পাঠকমনকে নিমগ্ন করে রাখে। বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনার মতো এ সাহিত্যকর্মটিও আমাকে আগ্রহের সাথে এক পাতা থেকে আরেক পাতায় যেতে বাধ্য করেছে।'

–উইলবার স্মিথ।

'কন ইগুলডন এবং সাইমন স্ক্যারোর রচনার সাথে এটি এক সারিতে বিবেচিত। ...উপন্যাসটি শ্বাসরুদ্ধকর উপাদানে ঠাসা'।

–মান্ডা স্কট, বোদিকাখ্যাত লেখক।

'উপন্যাসটির মাধ্যমে অ্যালেক্স রাদারফোর্ড তাঁদের নিজের মানকে অত্যন্ত উঁচুতে তুলেছেন।'

–ডেইলি মেইল।

'গদ্যটি যথেষ্ট উদ্দীপ্তপূর্ণ, এর গতিধারায় কোথাও ছেদ পড়ে নি। ...রাদারফোর্ডরা একজন ঝানু সংবাদদাতার মতো লিখেন, যিনি সরাসরি রণাঙ্গন থেকে সংবাদ প্রেরণ করেন।'

–টাইম আউট, মুম্বাই।

'মোগল জাতি ও তাদের দরবার জীবনের আকর্ষণীয় বিশদ বর্ণনার সাথে তাদের নৃশংস সংস্কৃতির মিশেল ঘটান হয়েছে। ...স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন বর্ণনা। রাদারফোর্ডরা একটি গর্বিত জাতি ও তাদের ভয়ঙ্কর শাসকদের এক বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন।'

– ক্যানবেরা টাইমস।

'এটি নৃশংস কর্মকাণ্ড আর গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত অন্যতম বিশাল একটি ঐতিহাসিক প্রেমকাহিনী। ...শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনীটি আমাকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল।'

–সম্পাদক, জিমপি টাইমস।

ISBN 978-984-9170105

আত্মপ্রত্যয়ী একজন নতুন সম্রাট আওরঙ্গজেব, ভারতের ঝলমলে ময়ূর সিংহাসনে আরোহণ করলেন। বৃদ্ধ পিতা জীবিত থাকাকালেই তিনি তাঁর হাত থেকে এই সিংহাসন ছিনিয়ে নিলেন। এর জন্য বহু রক্ত দিয়ে তাঁকে মূল্যশোধ করতে হয়েছেঃ গৃহযুদ্ধের সময় ভাইদের খুঁজে বের করে তাদের হত্যা করেছেন। এখন মোগল সাম্রাজ্যকে সত্যিকার পথে ফিরিয়ে এনে নতুন গৌরব অর্জন করতে হবে। তবে বিশাল ক্ষমতার প্রয়োগ মানুষকে নিঃসঙ্গ করে দেয়, চারদিকে শত্রু, কাকে বিশ্বাস করবেন তিনি? নিশ্চয়ই তাঁর ছেলেদের নয়। তাঁকে অবশ্যই নিজের উপর আর সেই জ্ঞানের উপর আস্থা রাখতে হবে, যার দ্বারা যুদ্ধের ময়দান ছাড়াও আরো অন্য উপায়ে একজন মানুষকে বশ করা যায়।

তবে যতই বছর পার হতে লাগলো, স্মৃতি তাঁর পিছু ছাড়লো না– সেই বাবার দুঃখময়স্মৃতি, যিনি কখনও তাঁকে ভালোবাসেন নি; মায়ের কথা, যিনি চিরশায়িত আছেন তাজমহলে; যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে আর যে ছেলে-মেয়েদেরকে অন্ধকার কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দেন, প্রয়োজনেই সব করা হয়েছে, এমনকি ন্যায়নীতির কারণেও। তবে আল্লাহ্ কীভাবে তাঁর বিচার করবেন...?

অ্যালেক্স রাদারফোর্ড দুইজন লেখকের ছদ্মনাম– এরা হচ্ছেন ডায়ানা প্রেস্টন ও তাঁর স্বামী মাইকেল প্রেস্টন। 'রাদারফোর্ড' ছয়টি পুস্তক নিয়ে রচিত একটি সিরিজ– 'এম্পায়ার অব দ্য মোগল' রচনার জন্য বিখ্যাত।

প্রেস্টন দম্পতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। এরা উভয়েই ভ্রমণপিপাসু এবং এ যাবৎ ১৪০টিরও বেশি দেশে ভ্রমণ করেছেন।

ভারত তাদের প্রথম পছন্দ। তাজমহল নির্মাণের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এরা এর নির্মাতা মোগল রাজবংশের প্রথমদিকার ইতিহাসের ভেতরে ঢুকে পড়েন। ঐতিহাসিক উপন্যাস, 'এম্পায়ার অব দ্য মোগল' রচনা করতে গিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার ইতিহাস বুঝার জন্য তাঁরা মোগল আমলের কালানুক্রমিক সমস্ত ঘটনাপঞ্জি পড়েন। কয়েকবছর ধরে তারা মোগলদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে প্রথম মোগল সম্রাট বালক-রাজা বাবরের জন্মভূমি ফারগানা উপত্যকা থেকে শুরু করে– ইরান, উজবেকিস্তানের সমরকন্দের নীল গম্বুজ আর মিনার, তারপর লাল মরুভূমি হয়ে ওক্সাস নদীর পার হয়ে, হিন্দুকুশ পর্বতের উপর দিয়ে কাবুল আর আফগানিস্তান থেকে খাইবার হয়ে উত্তর ভারতের সমতল ভূমিতে পৌঁছেন।

ছয়টি পুস্তক নিয়ে রচিত এম্পায়ার অব দ্য মোগল সিরিজটিতে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী, মোগল সাম্রাজ্যের দুইশো বছরের উত্থান-পতনের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

এম্পায়ার অব দ্য মোগল
ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাডোস

অ্যালেক্স রাদারফোর্ড

ভাষান্তর : কাজী আখতারউদ্দিন

এম্পায়ার অব দ্য মোগল
ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাডোস
মূল : অ্যালেক্স রাদারফোর্ড
অনুবাদ : কাজী আখতারউদ্দিন

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৬

রোদেলা ৩৯৫
প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০।
সেল: ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
রাজিবুর রহমান রোমেল

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা মাত্র

Empire of the Moghul Traitors In the Shadows by Alex Rutherford
Translated by Kazi Aktheruddin
First Published *Ekushe Boimela 2016*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web www.rodela prokashani.com

Price : Tk. 400.00 Only US $ 10.00
ISBN : 978 984 91701-0-5 Code : 395

আওরঙ্গজেবের
সাম্রাজ্য জগৎ
সমরকন্দ
ফারগানা
হিমালয়
বাল্ক
হিন্দু কুশ
হিরাত
আফগানিস্তান
কাবুল
কাবুল নদী
কাশ্মীর
শ্রীনগর
গজনি
কান্দাহার
লাহোর
পারস্য
বালুচিস্তান
পাঞ্জাব
দিল্লি
ফতেহপুর
শিক্রি
সামুগড়
সিন্ধু
আজমীর
আগ্রা
যোধপুর
(জয়পুর)
রাজাস্তান
গোয়ালিওর
ভারানাসী
গঙ্গা নদী
গোয়ার
উদয়পুর
পাটনা
এলাহাবাদ
বিহার
গুজরাট
মান্দু
নর্মদা নদী
হুগলি
চম্বাই
বাংলা
আশিরগড়
বোরহানপুর
সুরাট
তপতি নদী
দাক্ষিণাত্য
আহমেদনগর
বিজাপুর
গোলকোণ্ডা
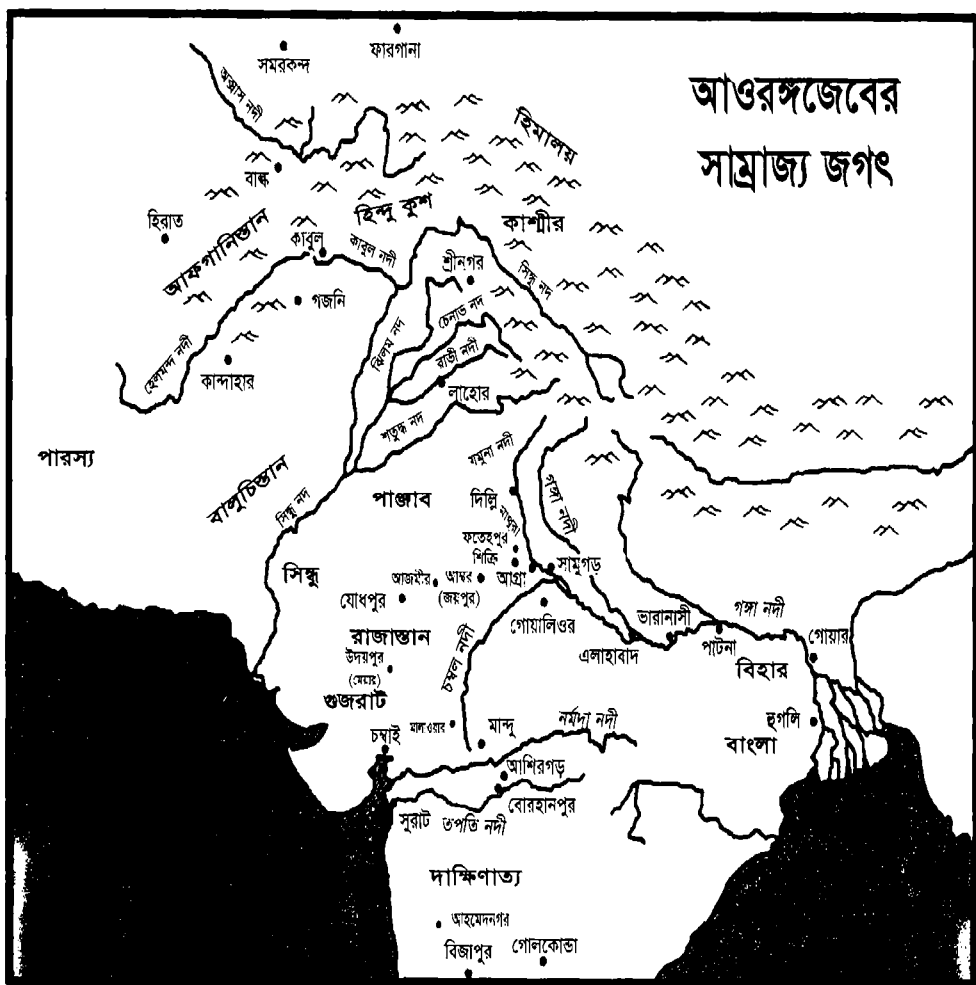
শাসন করার কাজটি এতই সূক্ষ্ম যে, একজন রাজাকে
তাঁর নিজ ছায়ার প্রতিও ঈর্ষান্বিত হতে হয়।

–সম্রাট আওরঙ্গজেব

অধ্যায় এক

বাঘ-নখ

একটি সমর সভায় যোগ দিতে দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ি পথ দিয়ে পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে দাড়িওয়ালা মারাঠা সেনানায়ক তার সঙ্গীর সাথে কথা বলছিল—বিখ্যাত বিজাপুরী সেনাপতি আফজাল খান শিবাজীকে সাময়িক অস্ত্রবিরতির আহ্বান জানিয়েছিলেন, যাতে ওরা পরস্পর সাক্ষাৎ করে যুদ্ধ থামাবার শর্ত নিয়ে বিজাপুরীদের সাথে একমত হতে পারেন। শিবাজী সাময়িক অস্ত্রবিরতি এবং দেখা করার বিষয়ে রাজি হলেন। তবে আফজাল খানকে তার বিশ্বাস নেই, তাই সতর্কতার সঙ্গে প্রস্তুতি নিলেন। তিনি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত তার দুর্গের নিচে ঘন জঙ্গলের মাঝে গাছ কেটে পরিষ্কার করে একটি খোলা জায়গায় সাক্ষাতের স্থান নির্ধারণ করলেন। আফজাল খানের অহমিকার কথা ভেবে তিনি এই স্থানটির ঠিক মাঝখানে রেশমি পর্দা ঝুলানো একটি জমকালো তাঁবু খাড়া করলেন। তারপর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ফাঁকা স্থানটি পর্যন্ত দুটি পথ তৈরি করলেন। *একটি তার* নিজের দুর্গের দিক থেকে, অপরটি আফজাল খানের শিবিরের দিক থেকে। তিনি তার শত্রুকে চিঠি লিখে জানালেন—এরকম একটি জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ এমন দুইজন বিখ্যাত নেতার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতের জন্যই অপেক্ষা করছে। তিনি আফজাল খানকে প্রথমে এসে এই চমৎকার পরিবেশ উপভোগ করতে আহ্বান জানালেন। তার এসব করার উদ্দেশ্য, যাতে তিনি জানতে পারেন আফজাল খান কোন পথ দিয়ে আসেন এবং নিজে আসার আগে পাহাড়ের উপরের দুর্গ থেকে পরিষ্কারভাবে শত্রুর আগমন লক্ষ করতে পারেন।

এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি পঞ্চাশজন পদাতিক সৈন্য পাঠিয়ে খোলা জায়গাটির চারদিকে ঘন জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে বললেন। আমি আমার লোকজনসহ তাদের মধ্যে ছিলাম। অস্ত্রসহ ভালোভাবে লুকোবার জন্য তিনি আমাদেরকে পাতাসহ গাছের ডালপালা শরীরে বাঁধার নির্দেশ দিলেন। সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট

সময় ঘনিয়ে আসতেই, শিবাজি তার দুর্গের উঁচু প্রাকার বেষ্টিত ছাদ থেকে দেখতে পেলেন—আফজাল খান প্রায় একশো লোক নিয়ে আসছেন। সাথে সাথে তিনি গোপিনাথ ব্রাহ্মণ নামক দূতকে পাঠালেন। আফজাল খানকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল যে, তারা উভয়েই শুধু একজন সশস্ত্র দেহরক্ষী সাথে নিয়ে আসার বিষয়ে সম্মত হয়েছিলেন। তাই তাকে প্রস্তাব দেওয়া হল বাকি সেনাদেরকে এক মাইল দূরে একটি টিলার কাছে থামাতে। এই স্থানটি আগেই দৈবাৎ লাল ক্রস চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলেন।

যথাসময়ে বিজাপুরী সেনাপতি টিলার কাছে তার লোকজনদের ছেড়ে বাকি পথটুকু কেবল একজন দেহরক্ষীসহ পালকিতে চড়ে তাঁবুতে পৌঁছলেন। আমি আমার লোকজনসহ পথের কাছেই লম্বা ঘাসের জঙ্গলের মাঝে লুকিয়ে ছিলাম। সবাই স্থির থাকতে চেষ্টা করছিলাম, তবে একটা কথা কি জান, ব্যাপারটা এতো সহজও ছিল না। একে তো গরম তার উপর চারদিকে মশা-মাছি ভন ভন করছিল। আমাদের উপর নির্দেশ ছিল, আফজাল খান কোনো চালাকি করার চেষ্টা করলে আমরা বের হয়ে আসবো। সোনার কাজকরা চার বেহারার পালকিতে চড়ে তিনি আমাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, তার দেহে কোনো বর্ম নেই। কেবল একটি দুধসাদা ঢোলা আলখাল্লা পরে রয়েছেন, কোমরে রত্নখচিত কোমরবন্ধ বাঁধা। তাকে অনুসরণ করা মাথা কামানো বলিষ্ঠ দেহরক্ষীকে আমি চিনতে পারলাম। চেনার ভাল কারণ, সে ছিল সাঈদ বান্দা। তোমার ওখান থেকে আমার নাকের উপর যে কাটা দাগটা দেখতে পাচ্ছো, সেটা এই মাথা কামানো দানবটির তরোয়ালের আঘাতের ফলে হয়েছে। আমি যেখানে লুকিয়ে ছিলাম সেখান থেকে প্রায় একশো গজ দূরে ছোট দলটি তাঁবুর কাছে পৌঁছাবার পর বেহারারা পালকি নিচে নামিয়ে একটু পিছিয়ে মাটিতে আসন পেতে বসলো। আফজাল খান তার দেহরক্ষী সাঈদ বান্দাকে তাঁবুতে ঢুকতে ইশারা করলেন। সে ভেতরে ঢুকে এক মুহূর্ত পরেই বেরিয়ে এল। আপাতত সবকিছু ঠিকঠাক আছে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে আফজাল খানকে ইশারা করলো। আফজাল খান পালকি থেকে বেরিয়ে তাঁবুতে ঢুকলেন।

এরপরই আমি পাহাড়ের উপরে দুর্গ থেকে তুর্যধ্বনির শব্দ শুনতে পেলাম। কয়েক মিনিট পর শিবাজি পায়ে হেঁটে এগিয়ে এলেন। তিনিও নীল সুতির সাধারণ একটি পোশাক পরে ছিলেন। আফজাল খানের মতো তিনিও একজন মাত্র দেহরক্ষী সাথে নিয়ে এসেছেন। শিবাজি তাঁবু থেকে কয়েক পা থাকতেই আফজাল খান দরজার কাছে হাজির হলেন। ওরা একটি বেমানান জুটি ছিল—আফজাল খান চওড়া, গাট্টাগোট্টা ধরনের আর ভালুকের মতো লোমশ দেহ।

আর আমাদের নেতা ছিলেন ছোটখাট হালকা-পাতলা গড়নের, তারের মতো পাকানো দেহ। সেনাপতির কাছে এসে শিবাজি একটু ঝুঁকলেন। আর সেনাপতি মুখে চওড়া হাসি নিয়ে দুই হাত দুই দিকে মেলে এগিয়ে গেলেন, যেন তাকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন। ঠিক তখনই একটি ধাতুর ঝিলিক চোখে পড়লো। আফজাল খান তার চওড়া আস্তিনের মধ্যে একটি ছোরা লুকিয়ে রেখেছিলেন, এখন সেটা বাগিয়ে শিবাজির বুক বরাবর আঘাত হানলেন। কিন্তু তুমি তো জান শিবাজি কিরকম দ্রুত আর ক্ষিপ্রতাসম্পন্ন। তিনি ঝট করে পেছনে শরীর দোলালেন। ধারালো ছুরিতে কেবল তার নীল আলখাল্লাটি সামান্য কেটে গেল। আমি আমার লোকজনসহ এক লাফে দাঁড়িয়ে অস্ত্র নিয়ে সামনে ছুটলাম। এদিকে শিবাজি আফজাল খানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আফজাল খান আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, সাদা আলখাল্লা লাল টকটকে রক্তে ভিজে গেল।

'তাহলে এটা সত্যি—শিবাজি বাঘ-নখ ব্যবহার করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, ওটা তিনি তার ডান হাতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আর তার ধারালো ইস্পাত দিয়ে কাজটি সমাধা করেন। যখন শিবাজি আফজাল খানের দেহরক্ষী সাঈদ বান্দার দিকে ফিরলেন, তখন পালকির সেই সাহসী বেহারাগুলো ছুটে এসে সেনাপতিকে ধরাধরি করে পালকিতে তুলে নিল। তারপর পেছনে রক্তের ধারা ফেলে রেখে পালকি নিয়ে পথে নামলো। আমি চিৎকার করে আমার লোকদেরকে বেহারাদের পাকড়াও করতে বললাম, এদিকে আফজাল খানকে পালকি থেকে টেনে নামালাম। তখন তার মুমূর্ষু অবস্থা, কাজেই খুব সহজেই তার বিশাল ভুঁড়িতে তরোয়াল ঢুকিয়ে তাকে শেষ করে দিলাম। তারপর শিবাজির দিকে ছুটে গেলাম, ভেবেছিলাম সাঈদ বান্দাকে হত্যা করে অপমানের প্রতিশোধ নেবো, এতে শিবাজিকেও সাহায্য করা হবে। কিন্তু তরোয়ালধারী লোকটি ততক্ষণে মর মর অবস্থায় হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছিল। বাঘ-নখের আঘাতে তার গলা চিরে দু'ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, সে দু-হাতে গলা ধরে রেখেছিল। তার কণ্ঠনালী চিরে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরে দাক্ষিণাত্যের লাল মাটি ভিজে যাচ্ছিল। প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সেনানায়ক কথা থামালো, সে যেন আবার সেই লড়াইয়ে ফিরে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত পর তার সঙ্গী বললো, 'এই গল্প বার বার শুনেও আমার ক্লান্তি নেই। কিন্তু আপনার কি মনে হয়, শিবাজি আমাদেরকে আজ কেন এখানে ডেকেছেন? নতুন কোনো অভিযানের পরিকল্পনা হচ্ছে নাকি?'

'সেটা শীঘ্রই জানতে পারবো।'

লোক দুটি শিবাজির প্রধান তাঁবুর কাছে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামতেই গোধূলি হয়ে এলো। তাঁবুর ভেতরে ঢুকে ওরা দেখলো মারাঠি নেতা ইতোমধ্যেই জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে চলেছেন। মারাঠিদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি যার কোনো শ্রদ্ধা নেই, সেই মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে মারাঠিদের দেশে একজন ভিনদেশি হানাদার হিসেবে ধিক্কার জানাতে গিয়ে প্রচণ্ড আবেগে তার দু-চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছিল। "তিনি আমাদেরকে বলেন, 'পাহাড়ি ইঁদুর', অথচ তিনি নিজেই একজন পরজীবী কীট। ক্ষমতার লোভে নিজের ভাইদেরকে শেষ করে দিয়েছেন। অন্যায়ভাবে সিংহাসন দখলের জন্য এতোগুলো বছর তাঁর পিতাকে বন্দী করে রেখেছেন, যা তাঁর নিজ ধর্ম বিশ্বাসে একটি গর্হিত অপরাধ। ইঁদুর হই বা না হই, আমরা তাঁর হাত কামড়ে দিয়েছি আর বার বার কামড়াতেই থাকবো যতক্ষণ না আমরা তাঁর কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হই।"

জ্বালাময়ী ভাষণ এবং নাটকীয় অঙ্গভঙ্গি দিয়ে শিবাজি তার লোকদের মনে উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তার পরিকল্পনা খুলে বললেন। 'আমরা উত্তর-পশ্চিমে যাবো, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে রাতে চলবো, যাতে লোকজনের চোখে না পড়ি। তারপর সবাই একত্রিত হয়ে মোগলদের সম্পদশালী সুরাট বন্দর আক্রমণ করে লুণ্ঠন চালাবো। আমার গুপ্তচরেরা জানিয়েছে গর্বিত আওরঙ্গজেব বোকার মতো এই বন্দরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল রেখেছেন। তাঁর বিশ্বাস কেউ এখানে আক্রমণ করতে সাহস করবে না। শীঘ্রই জানতে পারবেন, তাঁর নিজের আর আমাদের লোকদের সামনে তাঁকে নতজানু হতে হবে। এখন সবাই যাও, যুদ্ধের জন্য আর সেই সাথে অর্জিত পুরস্কার ও চিরস্থায়ী বিজয় গৌরবের জন্য প্রস্তুত হও।' তার কথায় সায় দিয়ে তার সেনানায়কেরা গর্জে উঠলো।

দেরিতে আসা দুই সেনানি বের হওয়ার সময়, একজন অপরজনকে বলছিল, 'এবার আওরঙ্গজেবের গলাকে বাঘ-নখ থেকে সতর্ক হতে হবে।'

ঘোড়ায় চড়ে শিবাজি বললেন, 'এখনই সময়। মোগলদেরকে তাদের অপরাধ আর বিজয় অভিযানের জন্য রক্ত দিয়ে মূল্য দিতে হবে। তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে হবে হিন্দুস্তান আমাদের, তাদের নয়।' তারপর তিনি পায়ের গোড়ালি দিয়ে কালো ঘোড়াটির পাঁজরে গুঁতো দিলেন। একটি ঝোঁপের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বের হয়ে ঘোড়াটি সৈকতের নরম বালুর উপর দিয়ে ছুটে চললো। পাঁচশো লোক নিয়ে শিবাজি সুরাটের চারপাশ ঘিরে থাকা নিচু মাটির

দেয়ালের দিকে ছুটে চললেন। পশ্চিম দিকে তার মাসব্যাপী যাত্রা বেশ দ্রুত হয়েছিল এবং অধিকাংশ সময় তারা কারও চোখে পড়েনি। তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে চলছিল। যেসব মোগল সেনানায়ক এসব ছোট ছোট দলের কথা শুনেছিল তারা এদেরকে ঘুরে বেড়ানো ডাকাত মনে করে খুব একটা পাত্তা না দিয়ে নিজেদের আরাম আয়েশে মত্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য শীঘ্রই তারা এবং তাদের মতো অন্যরাও নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে।

ঘামে ভেজা দেহ নিয়ে ঘোড়াটি প্রতিরক্ষার প্রথম বাধা—তিনফুট উঁচু দেয়ালটি টপকাতে এক লাফ দিতেই শিবাজি তার তরোয়াল সামনে বাগিয়ে ঘোড়াটির ঘাড়ের দিকে একটু ঝুঁকলেন। দেয়ালের পেছন থেকে আত্মরক্ষার জন্য দাড়িওয়ালা একজন মোগল সৈন্য এক হাত উঠাতেই শিবাজি তার তরোয়ালের এক কোপে সৈন্যটির হাত কব্জি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। সৈন্যটিকে পেছনে ফেলে শিবাজি আবার তরোয়াল চালালেন। দ্বিতীয় আঘাতটি পড়লো একজন মোগল সেনা কর্মকর্তার মুখে। লোকটির দাঁত ভেঙ্গে রক্তাক্ত চোয়াল বুকের উপর ঝুলে পড়লো। সামান্য যে ক'জন মোগল সেনা বাইরের দেয়াল প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিল, তারা শহরের ভেতরের দেয়ালের দিকে ছুটে চললো। কয়েকজন তাদের অস্ত্র ফেলে ছুটে পালালো। তারপর শিবাজি একের পর এক গাদা বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার ফট ফট আওয়াজ শুনতে পেলেন। তার পাশের বেগুনি রঙের পাগড়িপরা মারাঠি সৈন্যটি বুকে হাত চেপে ধীরে ধীরে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। পেছন থেকে ছুটে আসা ঘোড়াগুলো খুর দিয়ে তাকে মাড়িয়ে গেল। কাছাকাছি আরেকটি ঘোড়া পা ভাঁজ করে বালুর উপর লুটিয়ে পড়লো, সাথে সাথে এর আরোহীও ছিটকে মাটিতে পড়লো। তারপর আরো দুই-তিনজন মারাঠি মাটিতে পড়ে গেল। তবে বাদবাকিরা দৃঢ়তার সাথে ঘোড়া ছুটিয়ে চললো।

সুরাটের উপরের দিকে তাকিয়ে শিবাজি শহরের দক্ষিণ দিকের বন্ধ ফটকের ঠিক পেছনে একটি দুই-তিনতলা ভবনের সমতল ছাদে গাদা বন্দুকধারী একদল মোগল সেনার ছায়ামূর্তি দেখতে পেলেন। লোহার দণ্ড দিয়ে ঠেলে ঠেলে বন্দুকের নলে বারুদ ভরে তারা আবার গুলি ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বামহাতে ঘোড়ার মুখ সেদিকে ঘুরিয়ে শিবাজি চিৎকার করে উঠলেন, 'ওরা বন্দুকে বারুদ ভরার আগেই ফটকের দিকে ছোটো।' সেই সাথে ডান হাতের তরবারি দিয়ে ছুটে পালানো একজন মোগল সেনার পিঠে আঘাত করলেন। শীঘ্রই তার কয়েকজন লোকসহ তিনি ফটকের কাছে পৌঁছলেন। তিনি আশা করছিলেন, ভেতরে যারা আছে তারা হয়তো ফটকের দরজা একটু ফাঁক করবে

যাতে তাদের ছুটে আসা সঙ্গীরা ভেতরে ঢুকতে পারে। কিন্তু না, কঠিন মনের আত্মরক্ষাকারীরা যথেষ্ট বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, তারা বরং তাদের সাথিদেরকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেবে, কিন্তু তাকে ভেতরে ঢুকার সুযোগ দেবে না।
শিবাজি দ্রুত ভাবতে লাগলেন, তাহলে কিভাবে তিনি লোকজনসহ শহরের ভেতরে ঢুকবেন?
একবার ভাবলেন ঘোড়ার পিঠ থেকে দেয়ালে চড়লে কেমন হয়? না, প্রায় বার ফুট উচ্চতা খুব বেশি হয়ে যায়। একজনের উপর একজন দাঁড়িয়ে মানব-সিঁড়ি তৈরি করলে কেমন হয়? না, এটাও খুব ঝুঁকিপূর্ণ আর অনেক সময় লাগবে। তারপর হঠাৎ তার চোখে পড়লো একটি জংধরা ছোট কামানের নল মাটির দেয়ালের ছায়ায় পড়ে রয়েছে। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'ঐ কামানের নলটা নাও, ওটাকে দুরমুশ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।' ঘোড়ার পিঠ থেকে এক লাফে নেমে তিনি মাটিতে পড়ে থাকা কামানের নলটির দিকে ছুটলেন। তার কয়েকজন দেহরক্ষীও তাকে অনুসরণ করলো। এদের মধ্যে একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আবার উঠে দাঁড়াল। একটু পরই বর্মের নিচে ঘামতে ঘামতে আটজন লোকসহ শিবাজি কামানের নলটি তুলে ফটকের সামনে বয়ে নিয়ে এলেন।
একজন মারাঠি বললো, 'রাতেরবেলা ওরা বামদিকের যে ছোট দরজাটা ব্যবহার করে সেটার উপর আঘাত করলে হতো না?'
শিবাজি উত্তর দিলেন, 'ভালো কথা বলেছো।' তিনি বলার সাথে সাথে এর কব্জা লক্ষ্য করে আঘাত কর।' হাঁপাতে হাঁপাতে ওরা কামানের ভারি নলটি একবার পেছনের দিকে নিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে ছোট দরজাটির কব্জা লক্ষ্য করে আঘাত করলো। কোনো ফল নেই। 'আবার!' এবার দরজার কিছু কাঠের টুকরা ভাঙ্গলেও, দরজাটি জায়গা মতোই রইল। 'আরো জোরে!' তৃতীয় আঘাতে দরজাটি কব্জা থেকে খুলে এল। শক্তিশালী গড়নের একজন তরুণ দেহরক্ষী প্রথমে ঢুকলো, তারপর শিবাজি আর তার প্রায় বিশজন সেনা তাকে অনুসরণ করলো। একটু নিচু হয়ে ওরা দালানটির দিকে ছুটে চললো, যেখান থেকে মোগলরা গুলি ছুঁড়ছিল। হঠাৎ একজন মোগল সেনা গুলি ছুঁড়তেই তরুণ দেহরক্ষীটির পায়ে গুলি লাগতেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। একজন মারাঠি সেনার হাতে বারুদভরা গাদা বন্দুক ছিল, সে ধীরে সুস্থে লক্ষ্য স্থির করে গুলি ছুঁড়লো। সবুজ জ্যাকেটপরা একজন মোগল সেনার শরীর মুচড়ে উঠলো, হাত-পা ছুঁড়ে ছাদের উপর থেকে সে মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে পড়ে তার মাথা

ফেটে ঘিলু বেরিয়ে গেল। বাদবাকিরা ছাদ থেকে লাফিয়ে নেমে পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো। তবে মারাঠিরা তাদের উপর চড়াও হয়ে তলোয়ার চালাতে লাগলো, কেউ ছাড়া পেল না।

শিবাজি আর তার লোকজনেরা একটু দম নেবার জন্য থামতেই একজন মারাঠি দৌড়ে উপরে এসে বললো, 'মহারাজ, মোগলরা শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। অস্ত্রসহ বড় একটি দল ঘোড়ায় চড়ে উত্তর দিকের ফটক দিয়ে পালাচ্ছে। মনে হল ওদের মধ্যে কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাও আছে। অন্যরা নৌকা বেয়ে বন্দরে অপেক্ষমাণ মোগল জাহাজের দিকে যাচ্ছে। জাহাজগুলো ইতোমধ্যে পাল তুলতে শুরু করেছে।'

'কাপুরুষের দল! ওদের টাকা-কড়ি কোথায় আছে খোঁজো—নির্দয়ভাবে আওরঙ্গজেব যে করের বোঝা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে...তবে শহরের সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষতি করো না। আমাদের মতো ওরাও মোগলদের হাতে অত্যাচারিত হয়েছে। তবে নিয়মানুযায়ী অনুসন্ধান করবে। মোগলরা ওদের রত্নভাণ্ডার ভালোমতোই লুকিয়ে রাখে।'

শিবাজি নিজে কয়েকজন লোক নিয়ে বন্দরের সামনের দিকে মুখ করা গুদামগুলোর একটির দিকে চললেন। তবে ওরা সাবধানে দালানের দেয়াল ঘেঁসে চললো, কেননা মোগলদের পালিয়ে যাওয়াটা একটি ফাঁদও হতে পারে। কিংবা ছাদে আরো মোগল সেনা ওঁৎ পেতে থাকতে পারে। তবে সৈকতে পৌঁছে ওরা দেখলো সব একেবারে নীরব। সকালের রোদে সাগরের পানি চিকচিক করছে। ওরা জনশূন্য জাহাজঘাট ঘুরে দেখলো, অন্যসময় জায়গাটি জনসমাগমে সরগরম থাকতো। বড় বড় কতগুলো উজ্জ্বল হলুদ রঙের কাপড়ের গাঁট জাহাজঘাটে পড়ে রয়েছে। কুলিরা যেখানে ফেলে রেখে পালিয়েছে, সেখানেই পড়ে রয়েছে। ফেলে রাখা দুটো পিপা থেকে মরিচ ধুলায় পড়ে রয়েছে। সৈকতে আছড়ে পড়া ছোট ছোট ঢেউয়ের শব্দ আর মাঝে মাঝে দু-একটা গাংচিলের চিৎকার ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

শিবাজি তার লোকজনসহ নিঃশব্দে বেলেপাথরের কয়েকটি বড় বড় দালানের চারপাশ ঘিরে থাকা একটি উঁচু ইটের দেয়ালের দিকে এগোলেন। হঠাৎ একটি বন্দুকের গুলি শিবাজির কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। আরো কয়েকটি গুলি তার পায়ের চারপাশে ধুলি উড়িয়ে গেল। একজন মারাঠি তার রক্তাক্ত পায়ের ডিম ধরে মাটিতে পড়ে গেল। শিবাজি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সবাই যে যেখানে পারো লুকাও।' গুলি আসছিল ইটের দেয়ালঘেরা আঙিনাটি থেকে। গুপ্তচরের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যানুসারে

শিবাজি অনুমান করলেন এই দালানগুলোতে নিশ্চয়ই ইউরোপীয় বণিকরা থাকে। তার ধারণা সত্য প্রমাণিত হল যখন একটি দালানের উপরের তলা থেকে সাদা চামড়ার একজন মানুষ জানালা দিয়ে মুখ বের করে সাবধানে উঁকি দিল। গাদা বন্দুক হাতে আরেকটি লোক জানালার সামনে এসে দ্রুত একবার গুলি করেই বসে পড়লো। আরেকজন মারাঠি সেনা পড়ে গেল, রক্তে তার সাদা জামা লাল হয়ে গেল। তার একজন সঙ্গী সামনে ছুটে এল, তারপর তার কাঁধের নিচে হাত দিয়ে ধরে তাকে কাপড়ের গাঁটরির আড়ালে টেনে নিয়ে গেলো।

শিবাজি একমুহূর্ত ভাবলেন। দালান-কোঠাগুলোর চারপাশ ঘিরে থাকা উঁচু দেয়ালের চারদিকে অন্তত পঞ্চাশ ফুট খোলা জায়গা রয়েছে। তার লোকেরা এই জায়গাটুকু পার হতে ভীত নয়, তবে নিসন্দেহে কয়েকজন মারা পড়বে। শুধু শুধু তাদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে কী লাভ? তাই তিনি বললেন, 'পিছু হটে পুরো দেয়ালটি ঘিরে ফেল আর নজর রাখো কেউ যেন এখান থেকে বের হতে কিংবা ঢুকতে না পারে। আমরা এখন মোগলদের কোষাগারের অনুসন্ধান করবো, তারপর বিদেশিদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।'

ঘণ্টা দুয়েক পার হল, তবে পুরোনো নগর দুর্গটিতে কয়েকটি রূপার মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। শিবাজি বুঝতে পারলেন ওরা আসল ধনভাণ্ডারের সন্ধান এখনও পায়নি, যা অবশ্যই আছে। দুটো বড় পাম গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে হতবুদ্ধি হয়ে তিনি ভাবছিলেন মূল ধনরত্নগুলো ওরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। এমন সময় পাকাচুলের একজন মারাঠি সেনা-কর্মকর্তা তার কাছে এসে বললো, 'মহারাজ, আমার একজন লোক বলছে, যখন সে ঐ কুয়াটির কিনারায় চারপাশে পাথরের আস্তরণ দেওয়া অংশটির উপর পা ঠুকছিল তখন এক জায়গায় ফাঁপা আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। তার ধারণা এর নিচে হয়তো কোনো গোপন কুঠরি থাকতে পারে। কুয়াটির পানিতে আমি একটি পাথর ফেলে দেখেছি, যেরকম ধারণা করেছিলাম ততটুকু গভীর মনে হল না। লোকটির কথাই হয়তো সঠিক।'

'ঠিক আছে, তাহলে ঐ পাথরের আস্তরণগুলো তুলে ফেল।'

মারাঠিরা দ্রুত কাজে লেগে পড়লো। হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাথরের আস্তরণগুলো তুলতে শুরু করলো। দশ মিনিটের মধ্যে ওরা একটা খাড়া সিঁড়ি দেখতে পেল, সোজা কুয়াটির নিচের দিকে নেমে গেছে। তালা দেওয়া একটি ধাতব বেষ্টনী দিয়ে ঢোকার পথটি বন্ধ করা ছিল। গাদা বন্দুকধারী একজন মারাঠি তালাটির মধ্যে একটু বারুদের গুঁড়া ঢেলে, আগুন

লাগিয়ে দিয়ে পেছনে সরে দাঁড়াল। দপ করে আগুন জ্বলে উঠতেই একটা দুম শব্দ হল, তারপর তারের জালটি খুলে গেল। ধোঁয়া আর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে শিবাজি ভেতরে কয়েকটি লোহার সিন্দুক দেখতে পেলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'সিন্দুকগুলো খোল।' তার হুকুম তামিল করতে তার লোকেরা ছুটে এল। একটু পরই ভারি ডালাগুলো খুলতেই ভেতরে থরে থরে সাজানো সোনা-রূপার মুদ্রা পাওয়া গেল।

ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে শিবাজি সবচেয়ে বড় সিন্দুকটির মুদ্রাগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। সোনা-রূপার মুদ্রাগুলো তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পড়ছিল। এমন সময় মোটাসোটা একজন মারাঠি সেনা-কর্মকর্তা তার কাছে ছুটে এল। এই লোকটি ইউরোপীয়দের আবাসের চতর্দিক ঘেরাও করা সেনাদলের নেতৃত্বে ছিল। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে শুরু করলো, 'মহারাজ, ইউরোপীয়রা ' এতটুকু বলেই সে দম নিতে থামলো।

'বল, ইউরোপীয়রা কী?'

'ওরা তাদের জান-মাল রক্ষার বিনিময়ে মুক্তিপণের টাকা দেবার প্রস্তাব দিয়েছে।'

'হ্যাঁ বল, তারপর।'

আরেকবার দম নিয়ে লোকটি আবার বলা শুরু করলো। 'সাদাচুলের, দাড়িওয়ালা একজন ইউরোপীয় বণিক দুই হাত মাথার উপর তুলে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। সে আমাদের ভাষায় চেচিয়ে বললো, এখানে যে দায়িত্বে আছে, তার সাথে সে কথা বলতে চায়। আমি বাইরে এসে বললাম আমিই এখানে দায়িত্বে আছি। তখন সে কেবল বললো, আমরা তাদের কোনো ক্ষতি না করলে বণিকেরা আমাদেরকে কয়েক লাখ মুদ্রা দেবে। আমি তাকে জানালাম আপনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন, তবে আমি এখুনি আপনাকে কথাটি জানাচ্ছি।'

শিবাজি একটু থেমে চিন্তা করলেন। ইউরোপীয়রা উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। শক্তিপ্রয়োগ করে ওদেরকে পরাজিত করতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও অনেক সময় লেগে যাবে। আর এই ফাঁকে মোগলরাও আরো সৈন্য নিয়ে ফিরে আসতে পারে। মুক্তিপণের টাকার পরিমাণটি বিশাল। আর তার সাথে এই সিন্দুকগুলোর টাকা মিলিয়ে তার লোকদের লুটপাটের ক্ষুধা মেটানো ছাড়াও হিন্দুস্তানের অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে তার সমরাভিযানের খরচও দীর্ঘদিন চালানো যাবে। তাছাড়া এই বিদেশিদের শত্রু বানিয়ে কি লাভ, যেখানে শোনা যায় মোগলদের সাথে এদেরও সুসম্পর্ক নেই? এদের সমর্থন—বিশেষত ওরা

যেসব আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যোগান দিতে পারবে, তা আমাদের মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার ভবিষ্যৎ লড়াইয়ে বেশ কাজে লাগবে।
'ওদেরকে বল আমি ওদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছি।'

দিল্লির লাল কেল্লায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই কাকগুলো তাদের বাসার খোঁজে কা কা চিৎকার করতে করতে ফিরে আসতে লাগলো। খাস মহল থেকে বের হয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেব দুই পাশে সারবেঁধে মাথা নুইয়ে থাকা অমাত্য এবং সিপাহসালারদের মধ্য দিয়ে হেঁটে তিনদিক খোলা দিওয়ান-এ-আম-এর দিকে হেঁটে চললেন। ডানে বামে না তাকিয়ে মার্বেল পাথরের মঞ্চে উঠে তিনি তাঁর পিতার রত্নখচিত সোনার ময়ূর সিংহাসনে বসলেন। দুধ সাদা সাধারণ আলখাল্লা পরা দীর্ঘ, হলকা-পাতলা গড়নে তাঁর কঠোর আত্মসংযমী ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হচ্ছে। লম্বা সুন্দর হাতের আঙুলগুলো সিংহাসনের ঝলমলে হাতলে রাখলেন। কাঁচা-পাকা দাড়ি সুন্দরভাবে ছাঁটা। বাজপাখির মতো বাঁকা নাকের উপরে হাসিহীন কালো চোখদুটো হলুদ রেশমি পোশাকপরা সুরাটের সুবেদারের দিকে স্থির হয়ে রয়েছে। দুজন প্রহরী তাকে এগিয়ে নিয়ে আসছিল। মঞ্চের বারো ফুট দূরত্বে এসে সুবদার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে উপুড় হয়ে লম্বা হল।
শান্ত ভাবলেশহীন কণ্ঠে আওরঙ্গজেব বললেন, 'উঠুন। এ ধরনের অসংযত, লোক দেখানো বিনয় দেখাবার প্রয়োজন নেই। আমার যা দরকার, তা হল সুরাটে আপনার কার্যকলাপের সঠিক ব্যাখ্যা। কিভাবে আপনি ভূঁইফোড় শিবাজি আর তার পাহাড়ি দস্যুদের শহর লুট করতে দিলেন?'
'জাঁহাপনা, শহর রক্ষার জন্য আমার পর্যাপ্ত সেনা ছিল না। হাজার হাজার মারাঠি হঠাৎ আক্রমণ করে বসে। ওরা ধর্মোম্মাদ, নিজের জীবনের প্রতি ওদের কোনো দয়ামায়া নেই। তাছাড়া সুরাটের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আপনার সিংহাসনে বসার শুরু থেকেই ঠিক ছিল না।'
'আপনার আসলে মোট কতজন লোক ছিল?'
'ছয়শো পঞ্চাশের বেশি না।'
'আর কামান?'
'দশটি। তবে সবকটিই ছোট আর পুরোনো আমলের।'
'বাইরে থেকে কোনো বিপদ আসার খবর জানাতে নগরের সীমানার বাইরে প্রত্যন্ত এলাকায় ঘোড়সওয়ার টহলের ব্যবস্থা নেননি কেন?'

'টহলদার ছিল...তবে ঘোড়সওয়ার ছিল না। এখন বুঝতে পারছি জাঁহাপনা, তা যথেষ্ট ছিল না।'

আরওরঙ্গজেব নীরবে সুবেদারের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সুবেদার তোতলাতে শুরু করলো, 'জাঁহাপনা, আমি সকল নগরবাসীকে নির্দেশ দিলাম, যার যার মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে জান বাঁচাতে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিতে।'

'আপনিও তাই করলেন, তাই না?'

সুবেদার মাথা নিচু করে বললো, 'হ্যাঁ।'

'সুরাট ছেড়ে চলে গেলেন আর এদিকে চারদিন ধরে নগরে লুটপাট চললো।'

সুবেদার মাথা নেড়ে সায় দিল। হঠাৎ গলা শুকিয়ে যাওয়ায় তার মুখ থেকে কথা বের হচ্ছিল না। সারা মুখে দরদর করে ঘাম ঝরছে, হলুদ রেশমি আলখাল্লার কাঁধ ঘামে ভিজে গেছে।

'ইউরোপীয়রা কি করে তাদের সম্পদ রক্ষা করতে পারলো, অথচ আপনি পারলেন না?'

আতঙ্কে সুবেদারের দুচোখের মণি কাঁপছিল, দুহাত ঘষতে ঘষতে সে বললো, 'জাঁহাপনা, ওদেরতো ছোট একটি জায়গা ছিল, আর আমাকে গোটা শহরের প্রতিরক্ষা দেখতে হয়।' তারপর থেমে একবার ঢোক গিলে আবার বলা শুরু করলো, 'বিদেশিদের হাতে নতুন নতুন অস্ত্র ছিল...আর আমার লোকও ছিল খুব কম...ওরা ভয় পাচ্ছিল মারাঠিরা হয়তো...'

আওরঙ্গজেব মনে মনে ভাবলেন, পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে সুবেদার বুঝতে পারে নি যে, তিনি কতটুকু জানেন আর তার গুপ্তচরের জাল কতদূর ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি বললেন, 'আপনার আগের বর্ণনা অনুযায়ী শহর রক্ষার জন্য, যে তিন হাজার সৈন্য নিযুক্ত করার কথা ছিল তার কি হল?' তারপর আওরঙ্গজেব এক টুকরা কাগজ বের করে বললেন, 'আপনার স্বাক্ষর করা এই রশিদটি আমার খাজাঞ্চি আমাকে দিয়েছেন। রাজকীয় কোষাগার থেকে সেনাবাহিনীর খরচ জোগাতে আপনাকে বার্ষিক যে ভাতা দেওয়া হত এটি তার রশিদ। এই স্বাক্ষর আর সিলমোহর কী আপনার নয়?'

এবার সুবেদার থর থর করে, কাঁপতে কাঁপতে আওরঙ্গজেবের সামনে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়লো। কোনো উত্তর দিতে পারলো না। ভাতা গ্রহণ করে সেই টাকা দিয়ে সেনা নিয়োগ করা, তাদের বেতন দেওয়া আর তাদেরকে যথাযথ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত না করে পুরো টাকাটা সে আত্মসাৎ করেছে। এটা বুঝতে পেরে আওরঙ্গজেব কঠিন চেহারা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি

শুধু আপনার সম্রাটের সাথে বেইমানি করেন নি, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ভঙ্গ করে আল্লাহর সাথেও বেইমানি করেছেন, যেখানে চুরি এবং দুর্নীতি নিষেধ করা আছে। উদ্ধত একজন কাফের এবং কিছু বিদেশি, যারা ইতোমধ্যেই আমাদের শাসনের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছে, তাদের সামনে আমাকে আর আপনার ধর্মের অপমান করেছেন। যদি মারা যেতেন তাহলে আপনি একজন শহিদ হতেন। আর এখন কী হয়েছেন? একজন হীন কাপুরুষের মতো আপনার প্রভুর সামনে কাতর স্বরে কাঁদছেন। তবে আমি দয়ালু তাই আপনাকে পরকালে পাঠাবো না, তবে আপনার আর আপনার পরিবারের সমস্ত সম্পদ রাজকোষে সমর্পণ করবেন। যে পাপ করেছেন তা থেকে শুদ্ধ হতে একজন গরিব এবং নগণ্য তীর্থযাত্রীর মতো মক্কায় হজ করতে যাবেন। পথে যেতে যেতে ভিক্ষা করে যা পাবেন তা দিয়ে জীবন ধারণ করবেন। এখন আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যান!'

সুবেদার মাটিতে বসে পড়েছিল, একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করে আবার ঢলে পড়লো। দুজন প্রহরী তার দুই বাহু জাপটে ধরে তাকে টেনে নিয়ে চললো। সে পেছন পেছন মাটিতে হলুদ তরলের দাগ রেখে যেতে লাগল। কাপুরুষ লোকটি তার প্রস্রাব সামলাতে পারে নি।

আওরঙ্গজেব এবার তার সভাসদ আর সেনাপতিদের দিকে ফিরলেন। 'এই লোকটির পরিণতির কথা মনে রাখবেন। সাম্রাজ্যে কোনো ধরনের দুর্নীতি আমি সহ্য করবো না। আপনাদের মধ্যে কেউ তা লঙ্ঘন করলে আমি কোনো দয়া দেখাবো না। আর ঐ বেইমান শিবাজিকে নির্মূল করতে আমি ইতোমধ্যেই একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী পাঠিয়েছি। মোগল বংশের প্রতি সে যে অপমান করেছে, তার জন্য দুনিয়ার বুক থেকে তাকে মুছে ফেলা হবে। এবার আপনারা যেতে পারেন। নবোদ্যম নিয়ে আর নিঃস্বার্থভাবে দৃঢ়সংকল্প হয়ে যার যার দায়িত্ব পালনে লেগে পড়ুন।'

রাত নেমে এসেছে আর এখন কাকের বদলে আকাশে বাদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আওরঙ্গজেব খাসমহলের দিকে ফিরে চললেন। সেখানে পৌছে একাকী একটি চাবি নিয়ে ছোট একটি হাতির দাঁতের বাক্স খুলে একটা কাগজের টুকরা বের করলেন। সেখানে দাঁড়িয়েই শিবাজির কাছ থেকে যে চিঠিটা পেয়েছিলেন, তা আরেকবার পড়লেন। চিঠিটা কাউকে দেখান নি।

আপনারা, মোগলরা মনে করেন—আপনারা কুশলী যোদ্ধা। কিন্তু আপনাদের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধারাও আমার দেশে বেশিদিন টিকতে পারে নি। মারাঠিদের ভূমি রুক্ষ আর কঠিন হলেও তা আমাদের। আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি

আর শেষ মানুষটি আর দুর্গগুলো থাকতে তা রক্ষা করবো। এখানে অনুপ্রবেশ করলে আপনারা নিজেদের রক্তের সাগরে ডুবে যাবেন।

অন্য কেউ হলে এধরনের দাম্ভিকতাপূর্ণ আর ঔদ্ধত্য মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে ঝোঁকের মাথায় হঠকারী কিছু একটা করে বসতো। নিঃসন্দেহে শিবাজিও আওরঙ্গজেব সম্পর্কে তাই ভেবেছিলেন। তবে অভিজ্ঞতা আওরঙ্গজেবকে আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখার মূল্য আর এখন কি করা দরকার সেদিকে মনোযোগ দিতে শিখিয়েছে। এক্ষেত্রে যারা প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা করার স্পর্ধা দেখিয়েছে, তাদেরকে অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে হবে। এটা তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতে যথাসময়েই করবেন। তবে বিজয় যখন আসবে, তখন তা হবে পরিপূর্ণ ও চিরকালের জন্য, যা হঠাৎ গজিয়ে উঠা উচ্চাভিলাষী যে কোনো বিদ্রোহীর জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে থাকবে।

অধ্যায় : দুই

বেগম পাদিশাহ

রুপা আর ফিরোজা দিয়ে বাঁধানো কুরআনটি নামিয়ে রেখে রওশনআরার দিকে তাকিয়ে আওরঙ্গজেব বললেন, 'কি ব্যাপার বোন?' রওশনআরা তখনও হাঁপাচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন তিনি ছুটতে ছুটতে হেরেম থেকে আওরঙ্গজেবের খাসকামরায় এসেছেন কোনোমতে কেবল এতটুকু বলতে পারলেন, 'দুজন কাসিদ—বার্তাবাহক—আগ্রা থেকে এসেছে। ওরা জাহানারার কাছ থেকে আমার জন্য একটি বার্তা নিয়ে এসেছে।'

'জাহানারা? উনি তো অসুস্থ ছিলেন, তাই না?'

'না...জাহানারা নন, আমাদের বাবা অসুস্থ। তিনি জানিয়েছেন, বাবা এখন মৃত্যুশয্যায়। তিনি অনুরোধ করেছেন, আমি যেন তোমাকে রাজি করিয়ে তাঁর কাছে নিয়ে যাই। বাবা তোমাকে কিছু বলতে চাচ্ছেন।'

আওরঙ্গজেব উঠে দাঁড়ালেন, 'কি বলবেন?'

'জাহানারা কিছু বলেন নি, তবে বেশ জোর দিয়ে এটা জানিয়েছেন তুমি যদি এখুনি না যাও তাহলে খুব দেরি হয়ে যাবে।'

'দেরি হবে, কার জন্য? আমার না বাবার?'

রওশনআরা চোখ পিটপিট করলেন। অনেকসময় আওরঙ্গজেবের মন বোঝা খুব কঠিন হয়। তারপর সাহস করে বললেন, 'হয়তো তোমাদের দুজনের জন্য।'

'তিনি বহুদিন আগে আমার শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। তাছাড়া এখন আমরা একজন আরেকজনের সাথে কি কথা বলবো? তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করবেন। আর আমি তাকে বলবো, আমি যা করেছি তা সাম্রাজ্যের ভালোর জন্য করেছি। এতে আমাদের দুজনের কি লাভ হবে?'

রওশনআরার চোখে পানি এল। তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, আওরঙ্গজেব তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরবেন, কিন্তু তা হবার নয়। মুখ স্থির করে তিনি সোজা

সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তার মুখ দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। রওশনআরা বললেন, 'তোমার মনে আছে যখন আমি একেবারে ছোট ছিলাম তখন বাবা আমাকে একবার কিভাবে নদী থেকে উদ্ধার করেছিলেন? আমার অবশ্য এঘটনার কিছুই মনে নেই। অবশ্য তখন তো আমি খুব ছোট ছিলাম—জাহানারার কিন্তু ঠিক মনে আছে। যখন আমরা বড় হচ্ছিলাম তখন তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন কিভাবে আমাদের ঘোড়ার গাড়িটা উল্টে পানিতে পড়তেই আমি মায়ের হাত থেকে ছিটকে পানিতে পড়ে গিয়ে প্রায় ভেসে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বাবা আমাকে উদ্ধার করেন। শুধু তার কারণেই আজ আমি বেঁচে আছি।'

'এই কাহিনী আমি বহুবার শুনেছি। আর যখন আমাদের মা বেঁচে ছিলেন, তখনকার সময়ের বাবার অনেক স্মৃতি আমার নিজেরও মনে আছে। তবে আমরা দুজনেই জানি মা মারা যাবার পরের বছরগুলোতে সবকিছু কিরকম বদলে গিয়েছিল। আমাদের বেশি আবেগপ্রবণ হওয়া উচিত নয়। বিশেষত একজন সম্রাট হিসেবে আমি চাই না কোনো ধরনের আবেগ আমার বিচারবুদ্ধিকে ঘোলা করে দিক।'

'তবে অনেকসময় আমার কি মনে হয় জানো, আমরা হয়তো সঠিকভাবে তাঁকে বিচার করতে পারিনি। মনে হয় তিনি আমাদের জন্য যা ভালো ভেবেছিলেন, তাই করছিলেন।'

আওরঙ্গজেব তাঁর বোনের দুহাত ধরে বললেন, 'এটা খুবই স্বাভাবিক যে এরকম একটি মুহূর্তে আমরা সেই বন্ধনের কথা ভাবি, যা আমাদেরকে পরিবারকে একসাথে বেঁধে রেখেছিল। তবে আমরা নিজেদের সাথেই প্রতারণা করবো, যদি আমরা ভাবি যে, আমরা যা করেছি তা ভুল ছিল। তাছাড়া কি করতে হবে সে সিদ্ধান্ত তুমি নাওনি। সেটা আমার নিজের ভালোর জন্য কিংবা সুবিধার জন্য ছিল না, সেটা করা হয়েছিল সাম্রাজ্যের স্বার্থে। দুনিয়া এবং আল্লাহর সামনে এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি নিজে নিয়েছি। তোমার মনে রাখা উচিত, তখন আমি যদি সাথে সাথে কিছু না করতাম, তাহলে কি হতে পারতো? দারা শিকোহ শুধু খারেজি ছিলেন না, তিনি তাঁর ভাইদেরকে ঘৃণা করতেন। তিনি খুব দুর্বল চিত্তের মানুষ ছিলেন। যার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষরা লড়াই করেছিলেন, হাতে সময় পেলে তিনি তার অধিকাংশই ধ্বংস করে ফেলতেন। আর এদিকে আমাদের বাবার তাঁর প্রিয়পুত্রের কোনো দোষই চোখে পড়ে না। যেন একজন মানুষ ভরদুপুরের সূর্যের দিকে খোশমেজাজে তাকিয়ে রয়েছেন।'

রওশনআরা মাথা নাড়লেন। তাঁর ভাই হয়তো ঠিকই বলেছেন—সাধারণত তিনি তাই বলেন। সেই যখন থেকে শাহজাহানের হাত থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নিয়ে আওরঙ্গজেব তার বড় বোন জাহানারার জায়গায় তাকে সাম্রাজ্যের প্রধান সম্রাজ্ঞী করেছিলেন, তারপর এতোবছর ওরা এসব বিষয় নিয়ে কখনও কোনো কথা বলেন নি। আর তিনি এতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। মসৃণগতিতে আর বেশ আনন্দে তাঁর জীবন কেটে যাচ্ছিল, পদবি, সম্পদ...এদুনিয়ার জীবনে যা তিনি চেয়েছেন তার অধিকাংশ এখন তাঁর হয়েছে। তিনি হেরেম শাসন করেন। যদিও মাঝে মাঝে এমনভাবে নিজের ইচ্ছাপূরণ করেন, যা তিনি জানেন তাঁর ভাই অনুমোদন করবেন না, তবে এসব বিষয়ে তিনি খুবই সতর্ক থাকেন! তিনি একজন ভালো সম্রাজ্ঞী ছিলেন, ঠিক যেরকম একজন ভালো কন্যাও ছিলেন। তারপর একসময় বুঝতে পারলেন দারা শিকোহ এবং জাহানারার তুলনায় তাঁর বাবার কাছে তিনি কিছুই না। তবে এজন্য তাঁর অবশ্যই অপরাধ বোধ করা উচিত নয়। হাতের পিঠে চোখের পানি মুছে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে এখন তুমি কি করবে আরওরঙ্গজেব? তুমি কি আগ্রা যাবে?'

আওরঙ্গজেব ধীরে ধীরে তাঁর বোনের হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'জানি না।'

তিনি বুঝতে পারলেন তাঁকে এখন সাবধানে ভাবতে হবে। তাঁর বাবার অসুস্থতার খবরটি অপ্রত্যাশিত নয়। আর তা হবেই বা কেন? শাহজাহান বৃদ্ধ হয়েছেন, আর কারাধ্যক্ষ নিয়মিত তাকে যে খবর জানাতো, তাতে বোঝা যাচ্ছিল সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তিনি আরো দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। যদি আওরঙ্গজেব সৎভাবে চিন্তা করেন আর নিজের মনের সত্যিকার অনুভূতি নিজের কাছে না লুকান, তাহলে এটা ঠিক যে, সেই যখন তিনি তাঁর বাবাকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁকে বন্দী করেছিলেন, তখন থেকেই গত ছয় বছরে তিনি বেশ কয়েকবার তাঁর বাবার মৃত্যু কামনা করেছিলেন। অন্তত আন্তরিকভাবে এটাও ভাবতেন যে...

কিন্তু এখন যেহেতু তাঁর বাবার শেষ সময় আসলেই ঘনিয়ে এসেছে, তখন তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না কি করবেন। রওশনআরাকে যাই বলুন না কেন, শাহজাহানকে বন্দী করে তিনি কি একটু অপরাধ বোধ করছেন না? কেন একবারও তাকে দেখতে কারাগারে যাননি? এটা কি এ কারণে যে, তিনি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, যদি তাঁর বাবা তাকে ক্ষমা করে দেন, তার প্রতি ভালোবাসা দেখান আর এতে বাবার প্রতি তাঁর মন নরম হয়ে যায়? কিন্তু দুজনে মিটমাট করে ফেললে তার পরিণতিটা কি হবে? শাহজাহান আবার

সিংহাসনে ফিরে আসবেন—নাকি তার ভাই দারা শিকোর জীবিত পুত্র বসবে? না, সাম্রাজ্যের স্বার্থে এটা কখনও তিনি হতে দেবেন না। কিংবা এটা হয়তো অন্যকিছু তার ভয় হচ্ছে শাহজাহানের চোখে না জানি কি দেখতে পাবেন। শুধু ঘৃণাই দেখতে পাবেন, ভালোবাসা নয়, যা তিনি ছোটবেলায় একজন পিতার কাছ থেকে আশা করতেন। অথচ তাঁর বাবা তাঁর সমস্ত ভালোবাসা তাঁর খারেজি জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন।

এমনকি যখন তিনি দিল্লি থেকে বজরায় যমুনা নদীর উপর দিয়ে তাজমহলে যেতেন প্রার্থনা করতে, যেখানে রত্নখচিত সাদা মার্বেল পাথরের কবরে তাঁর মা শুয়ে আছেন, তখনও তিনি একবারও চোখ তুলে আগ্রা দুর্গের দিকে তাকাননি। দুর্গের লাল বেলেপাথরের দেয়ালের ছায়ার নিচ দিয়ে যাওয়ার সময়, সচেতন হয়ে ভাবতেন যে, শাহজাহান হয়তো দুর্গের প্রাকারবেষ্টিত সমতল ছাদের উপরে তাঁর কারাগারের অষ্টকোণ টাওয়ারের ভেতর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এমন একটি মাস যায়নি যে, শাহজাহান তাঁকে চিঠি লিখে আদেশ করেছেন কিংবা অনেক সময় মিনতিও করেছেন অন্তত একবারও তাকে দেখতে যেতে। কিন্তু তিনি নিজেকে সংযত রেখেছেন, কোনো উত্তর দেননি। দুই-একদিন এই বিষয়টি নিয়ে একবারও ভাবার চেষ্টা করেননি। তিনি নিজেকে বুঝাতেন এই চিঠিগুলো একধরনের ফন্দি, যাতে তিনি নিজেকে অপরাধী ভাবেন। তাঁকে দেখার জন্য বাবার মোটেই কোনো আকুলতা নেই। সুতরাং তিনি কোনোদিন তাঁর বাবাকে দেখতে যাননি। আর একজন সন্তান হিসেবে এখন করুণা দেখাবার জন্যইবা কেন যাবেন? আর বাবার মৃত্যুশয্যায় এখন উপস্থিত হলে কি উদ্দেশ্য সাধন হবে? শুধু আবার জেগে উঠবে সন্দেহের অনুভূতি, কিংবা হয়তো অপরাধ বোধ, যা ইতিমধ্যেই তার মনে জেগে উঠছে আর সেই সাথে সম্ভবত সত্যিকার দুঃখ বোধ। একটু আগেই অতিরিক্ত ভাবাবেগ সম্পর্কে রওশনআরাকে কি সাবধান করেননি? স্বভাব সুলভভাবে চোখ বুঁজে চিন্তা করার পর তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস নিলেন। মনে হয় উপায় একটা খুঁজে পাওয়া গেছে।

'শাহজাদা মুয়াজ্জমকে একটা চিঠি লেখো। সে আগ্রা থেকে কেবল বিশ মাইল দূরে শিবির স্থাপন করেছে। তাকে বলো ঘোড়ায় চড়ে দুর্গে যেতে, সেখানে গিয়ে পিতামহকে দেখার পর ফিরে এসে আমাকে জানাবে তিনি কেমন আছেন। আমার ছেলেকে সেখানে পাঠিয়ে আমি আমার বাবার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দুটোই প্রদর্শন করবো। আর এই ফাঁকে একটু চিন্তা করার সুযোগ পাবো যে, সেখানে আমি নিজে যাবো কি যাবো না।'

আওরঙ্গজেব যে তাঁর উপর আস্থা রেখেছেন এই কথাটি ভেবে রওশনআরা কৃতজ্ঞ বোধ করলেন। তিনি সাথে সাথে বললেন, 'এখনই লিখছি।' এই কথাটি বলে তাঁর খাড়া রেশমি ঘাগড়ার খসখস শব্দ করে ঘুরে চলে গেলেন।
একা হওয়ার পর আওরঙ্গজেব আবার কুরআন শরিফ তুলে নিলেন। পাতা খুলে সূরার দিকে তাকালেও পবিত্র আয়াতের দিকে মনোযোগ দিতে পারলেন না। পিতার সাথে দেখা করার সিদ্ধান্তটি আপাতত স্থগিত করার কারণে মনে হয় তাঁকে আর হয়তো জীবিত দেখতে পারবেন না। আর সেই সাথে একটি মুখোমুখি অবস্থা এড়াতে পেরেছেন, যেখানে তিনি হয়তো তাঁর আবেগ সামলাতে পারতেন না, পরিণতি তো দূরের কথা। একমুহূর্তের জন্য চোখ বুজতেই অন্ধকারের বদলে পরিষ্কার তাঁর সবচেয়ে বড় বোন জাহানারার মুখটা দেখতে পেলেন, যেন তিনি এখানেই ছিলেন। জাহানারা তাঁর বাবার সাথে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছিলেন আর তাই তাঁর বিদ্রোহের সময় থেকেই আওরঙ্গজেব তাঁর বড় বোনকে দেখতে পারেননি। এখন তাঁর মনের অবস্থা কি কে জানে আর তাঁকেই বা কিভাবে তিনি বিচার করবেন?

তিন সপ্তাহ পর শোকের শাদা পোশাক পরে আওরঙ্গজেব ঘোড়ায় চড়ে ধীরে ধীরে বাঁকা ঢাল বেয়ে উপরের দিকে উঠে তীক্ষ্ণ কীলক বসানো আগ্রা দুর্গের বিশাল প্রথম ফটকের ভেতর দিয়ে এগোলেন। শেষ যখন তিনি এখানে এসেছিলেন, তারপর অনেক বছর পার হয়ে গেছে, তারপরও সবকিছু চেনা মনে হচ্ছে। লাল বেলেপাথরের দুর্গ, উঠান আর বাগান সবকিছু সেই আগের মতোই আছে। সিংহাসনে বসার পর যখন তাঁর বাবা নতুন পরিবার নিয়ে এখানে বসবাস করতেন ঠিক তখনকার মতো। ঐ থামগুলোর মাঝে আওরঙ্গজেব তাঁর ভাইদের সাথে তরোয়াল নিয়ে খেলতেন...আর তাঁদের অপরূপ সুন্দর প্রিয় মা গোলাপ সুরভিত কামরায় বসে সারাক্ষণ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতেন...?
মমতাজের মৃদু হাসির কথা মনে পড়তেই আওরঙ্গজেব ভ্রু কুঁচকালেন। তাঁর স্মৃতি ছিল অম্ল-মধুর। তাজমহল থেকে মাত্র আসার পর এখন তা আরো বেশি মনে পড়ছে, যেখানে এখন তাঁর বাবা তাঁর মায়ের পাশে শুয়ে রয়েছেন। সমাধির পাশে বসে তিনি একা কেঁদেছিলেন, সেটা কি মমতাজের জন্য এবং তাঁর মৃত্যুর পর তিনি যে একাকীত্বে ভুগছেন সে জন্য, নাকি শাহজাহানের জন্য অথবা তার নিজের জন্য, তা নিশ্চিত নয়।

আওরঙ্গজেব চিবুক তুললেন। কেউ যেন তাঁর চেহারায় একজন সম্রাটের উপযুক্ত গাম্ভীর্য ছাড়া আর কিছুই না দেখতে পায়, যিনি তাঁর বাবার মৃত্যুতে শোক পালন করছেন। চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন, সবকিছু ঠিকঠাক আছে যেরকম তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন; যখন একজন বার্তাবাহক মুয়াজ্জমের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছিল যে, সে আগ্রা পৌঁছে দেখে শাহজাহান ইতিমধ্যেই মারা গেছেন। দুর্গের উপরে সবুজের জায়গায় সাদা পতাকা উড়ছে। ফোয়ারাগুলো স্তব্ধ। এমনকি গোলাপঝাড় থেকে সমস্ত ফোটাফুল কেটে ফেলা হয়েছে। কেউ যেন বলতে না পারে যে, তিনি তাঁর বাবার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা দেখান নি, যিনি শুধু তাঁর বাবাই নন, তিনি এককালে মোগল সম্রাটও ছিলেন।

বহু স্তম্ভ শোভিত দেওয়ান-ই-আমে পৌঁছার পর তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন। সেখানে সাদা পোশাক পরা সভাসদ ও সেনাপতির একটি দল নীরবে তাঁকে অর্ভ্যথনা করার জন্য অপেক্ষা করছিল। ঘোড়া থেকে নেমে তিনি ডানে-বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে অপেক্ষমাণ দলটির সারির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চললেন। ওরা সবাই বুকে ডানহাত রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা প্রকাশ করছিল। মার্বেল পাথরের মঞ্চের কাছে পৌঁছে আওরঙ্গজেব ধীরে ধীরে সিঁড়ির তিনটি ধাপ বেয়ে মঞ্চে উঠে ঘুরে তাকালেন। আওরঙ্গজেব দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে এই মঞ্চেই ময়ূর সিংহাসনটি ছিল। তিনি দুই হাত তুলে শুধু বললেন, 'আজকের এই বিষাদময় দিনে আমার কাছে, আপনাদের সম্রাটের কাছে আসার জন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ রাতে যখন আপনারা প্রার্থনা করবেন, আমি অনুরোধ করবো তখন এই কথাটি মনে রাখবেন, যেরকম আমিও স্মরণ করবো যে, এই পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আমরা এখন যেরকম আছি তার জন্য সবাই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ এবং আমরা যে অবস্থানেই থাকি না কেন, সকলকে তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।' তারপর আওরঙ্গজেব পেছন ফিরতেই একজন ভৃত্য—কোরচি দরজা মেলে ধরতেই তিনি ভেতরে খাসমহলের দিকে এগিয়ে চললেন।

বার্নিশ করা চকচকে সোনালি শামিয়ানার নিচে সাদা মার্বেল পাথরের কামরাটি ম্লান আলোয় মৃদু দীপ্তি ছড়াচ্ছে। একটি মুহূর্ত তার মনে হল যেন, তাঁর মায়ের সুন্দর মূর্তিটি একটি ধনুকাকৃতি খিলানের নিচে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বামী আর সন্তানদের জন্য অপেক্ষা করছেন, যেন সবাই একসাথে নৈশ আহার করতে পারেন।

তারপর তিনি কামরায় ঢুকে তাঁর জন্য পেতে রাখা একটি নিচু, নরম আসনে বসে একটি রেশমি বালিশে হেলান দিলেন। দেয়ালে আয়না বসানো কুলুঙ্গিতে

মোমবাতির শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে। খানসামারা তাঁর সামনে একটি সাদা কাপড় বিছিয়ে তার উপর খাবারের থালা সাজিয়ে রাখতে শুরু করলো। ভোর থেকে তিনি কিছুই খান নি, তারপরও তাঁর মোটেই খিদে পায় নি। কেবল সামান্য সাদা ভাত, ডাল আর তন্দুরি থেকে মুরগির মাংস নিলেন। তারপর যমুনা থেকে আনা বরফ-শীতল পানি খেলেন। কোরচি তাঁর নিজস্ব পেয়ালায় পানি ঢেলে দিল। এই পেয়ালাটি তিনি যেখানে যান সেখানেই তাঁর কোরচি সাথে বয়ে নিয়ে যায়। আলোকভেদ্য কিন্তু অস্বচ্ছ একটি জেড পাথর কেটে গোলাপের আকৃতি দেওয়া হয়েছিল। পানিতে বিষ থাকলে সাথে সাথে এটি বিবর্ণ হয়ে যাবে।

খাওয়া শেষ করে আওরঙ্গজেব বেলকনিতে গেলেন। যমুনা নদীর বাঁকের উপরে পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে। তাজমহলের মুক্তার মতো গম্বুজ রূপালি আলোয় ভরে গেল। কয়েকমুহূর্ত আওরঙ্গজেব এই দৃশ্যটির দিকে তাকিয়ে রইলেন... ভাষায় বর্ণনা করা যায় না এমন একটি বিষণ্ন অথচ অপরূপ দৃশ্য। তারপর পেছন ফিরলেন। এখন তিনি সাক্ষাৎকারটি করতে চাচ্ছেন তা আর দেরি করা যায় না আবার তাঁর ভীষণ ভয়ও করছিল। একবার হাততালি দিলেন।

মসলিনের পর্দা সরিয়ে কোরচি বেলকনিতে ঢুকে বললো, 'জাঁহাপনাঃ'

'আমার বোন শাহজাদি জাহানারার কাছে যাও। আমার তরফে থেকে সালাম জানিয়ে তাকে এখানে আসতে বল।'

অপেক্ষা করতে করতে আওরঙ্গজেব বেলকনিতে পায়চারি করতে লাগলেন আর সেই সাথে তাঁর লম্বা আঙুল দিয়ে সবুজ জেড পাথরের তসবিহ জপ করতে লাগলেন। এটা সবসময় তাঁর কোমরবন্ধ থেকে ঝুলে থাকে। সেই সাথে তাঁর বুকও ঢিপঢিপ করছিল যেন এখুনি কোনো যুদ্ধে ছুটবেন। একটুপরই পেছনে মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেল আর কোরচি বলে উঠলো, 'জাঁহাপনা, তিনি এসেছেন।'

'ঠিক আছে। তুমি এখন যাও আর দ্যাখো কেউ যেন আমাদের বিরক্ত না করে।'

তিনি ঘুরে দেখলেন সাদা মসলিন পোশাক পরা শীর্ণ একটি মূর্তি, মাথা সাদা শালের ঘোমটায় ঢাকা, ছায়ায় মুখ দেখা যাচ্ছে না। ভাই, বোন, একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর আওরঙ্গজেব নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, 'আপনি কেমন আছেন জাহানারা? একটু কাছে আসুন আপনাকে দেখি।'

তাঁর বোন কয়েক পা সামনে এগিয়ে ধীরে ধীরে মাথার ঘোমটা নামিয়ে দিলেন। শেষ যখন আওরঙ্গজেব তাঁকে দেখেছিলেন, তারপর এই সাত বছরে

তাঁর বয়স বেশ বেড়ে গেছে মনে হল। তাঁর একান্ন বছর বয়স থেকেও তাঁকে আরো বয়স্ক মনে হচ্ছিল। মোটা বেনি করা চুল প্রায় সাদা হয়ে গেছে আর চিবুক চামড়া থেকে ঠেলে উঠেছে। বাম গালে আর গলায় এখনও আগুনে পোড়ার দাগগুলো রয়েছে। অল্পবয়সে সেই আগুনে তিনি প্রায় পুড়ে মরছিলেন। চোখের নিচে কালি। আওরঙ্গজেব কি বলবেন, তা মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর এই জীর্ণশীর্ণ মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখ থেকে কোনো কথা বের হল না। তাঁকে ইতস্তত করতে দেখে জাহানারা আরো কাছে এগিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে একজন সম্রাটের উপযুক্ত সম্মান দেখাতে শুরু করলেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'না!' তিনি বাধা দিলেন না, আর যখন তাঁকে ছাড়লেন তখন আওরঙ্গজেব দেখলেন তাঁর চোখের পানি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। আর এটা দেখে তাঁর নিজের চোখের পাতাও খচখচ করে উঠলো, তিনি বহু কষ্টে তা সামলিয়ে বললেন, 'এখানে এসে আমার পাশে বসুন। অনেকদিন হল আপনি আমার পাশে বসেন না।' তাঁকে আবেগে ভেসে গেলে চলবে না। জাহানারা স্বেচ্ছায় তাঁর বাবার সাথে কারাবরণ বেছে নিয়েছিলেন, অথচ তিনি এখানে সম্রাজ্ঞী হতে পারতেন। আর তাঁর চেয়ে বেশি খারেজি দারাকে ভালোবাসতেন... আর এই কথাটাই তাঁর সবসময় মনে পড়তো, যখনই তিনি জাহানারার কথা ভাবতেন। আর এটাই তাকে শক্তি যোগাতো এই কথাটি ভুলে যেতে যে, যতকিছুই হোক তাঁর বড় বোন তাঁর কাছে মায়ের মতো ছিলেন আর তিনি সব ব্যাপারে তাঁর সম্মতি চাইতে পারতেন।

জাহানারা মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'আমি খুশি যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের বাবা, আমাদের মায়ের পাশেই শান্তিতে শুয়ে রয়েছেন। যা যা করার দরকার সবকিছুই আমি করেছি—মোল্লারা সারাদিনরাত তাঁর আত্মার শান্তির জন্য মঙ্গল কামনা করে দোয়া করেছেন।'

'ধন্যবাদ।'

'শেষ মুহূর্তে তিনি আমাকে বলেছিলেন, যে তোমার বিরুদ্ধে তাঁর কোনো অভিযোগ নেই. তিনি তোমাকে ক্ষমা করেছেন।'

একথাটি শোনার পর আওরঙ্গজেব সমুচিত জবাব দিয়ে বলতে চাচ্ছিলেন :

কি জন্য তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন? তাঁর অযোগ্য হাত থেকে সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য আর আমার ধর্মভ্রষ্ট ভাইয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য, যিনি এটা ধ্বংস করে দিতেন? আমি তাঁকে ক্ষমা করি নি...তিনি কখনও আমার কাজের প্রশংসা করেন নি।

কিন্তু তিনি এই কথাগুলো উচ্চারণ না করে বরং জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কিছু বলেছেন?'

'তিনি আমাকে বলেছেন, আমি যেন তোমাকে অনুরোধ করি, যেকোনো উপায়েই হোক তুমি যেন তোমার ছেলেদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো আর ছেলেদেরকে পরস্পরের সাথে লড়াই করতে অনুমতি দিও না। তিনি তখত-ইয়া তক্তা—সিংহাসন কিংবা শবাধার—একজন যোদ্ধার এই গোপন নীতিমালা বা সংকেত লিপির কথা বলেছেন, যা আমরা তৃণভূমিতে আমাদের পুরোনো দেশ থেকে নিয়ে এসেছি। তিনি বলেছেন যখন আমরা হিন্দুস্তানে প্রবেশ করেছি তখন থেকেই এটা আমাদের বংশের বিপর্যয়ের হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে। একেবারে শেষ নিশ্বাস নেওয়ার সময় তিনি ফিসফিস করে আমাকে বললেন যে, আমাদের রাজবংশের সবচেয়ে বড় হুমকিটা সবসময় ভেতর থেকে এসেছে। যদি আমরা সাবধান না হই, তাহলে আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করবো আর আমাদের শত্রুদের কিছুই করতে হবে না, ওরা কেবল আমাদের একদা বিশাল সাম্রাজ্য থেকে লুটের ভাগ নিয়ে যাবে। তিনি বললেন, তিনি চেষ্টা করেছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা থামাতে, তবে ব্যর্থ হয়েছেন।'

'তিনি কি শুধু এ বিষয় নিয়েই নিজেকে ভর্ৎসনা করেছেন?'

'না। তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, জীবনে তিনি ভুল করেছেন...অবশ্য আমরা সবাই তাই করি।'

আওরঙ্গজেব অনুভব করলেন জাহানারা তাঁর দুহাতের মাঝে তাঁর হাতটা ধরেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কি মনে হয়, আমি যা করেছি তা ভুল ছিল?'

'তুমি জানো আমি তাই মনে করি। একজন পুত্র এবং একজন ভাই হিসেবে তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করনি। তুমি দারাকে তোমার শত্রু বানিয়েছ, মিত্র বানাও নি। তারপর যখন তাঁকে পরাজিত করলে, তখন তাঁকে আর তাঁর ছেলেকে মেরে ফেলার দরকার ছিল না। কিংবা অন্য ভাইদের বিরুদ্ধে না গেলেও পারতে।' কথাগুলো বলার সময় তিনি হয়তো অনুভব করতে পারছিলেন যে, তাঁর দুহাতের মধ্যে আওরঙ্গজেবের হাতটি শক্ত হয়ে গেছে, তাই তিনি আরো জোরে তাঁর হাতটা চেপে ধরে বললেন, 'কিন্তু আওরঙ্গজেব, যা হবার হয়েছে। যে বাবার সাথে তুমি এত অন্যায় করেছো, তিনি যদি তোমাকে ক্ষমা করতে পারেন, আমারও তা করা উচিত। আমরাতো এখনও ভাই আর বোন, তাই না? তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা কখনও কমে যায় নি। যদিও আমি বাবার সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি এটা করেছি,

কেননা আমি মনে করেছিলাম এটাই আমার জন্য ঠিক—একজন কন্যা হিসেবে এটা আমার দায়িত্ব ছিল।'

আওরঙ্গজেব তাঁর মাথা এমনভাবে নিচু করলেন, যাতে জাহানারা তাঁর মুখটা দেখতে না পারেন। যে বোনকে তিনি সবসময় ভালোবাসতেন, তাঁর সাথে আবার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ফিরে পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, 'আপনি এখুনি আমার সাথে দিল্লিতে আমার দরবারে চলুন। আমাদের মায়ের মৃত্যুর পর বাবা যেমন আপনাকে সম্রাজ্ঞী করেছিলেন, এখন আপনি আবার এই সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হবেন। আমি আপনাকে পাদিশাহ বেগম—শাহজাদিদের রানি করবো। ইচ্ছে করলে আপনি আপনার নিজের জন্য আলাদা মহল...দাসিচাকর... আমার ধনভাণ্ডারের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন, সব নিতে পারেন।'

জাহানারা মৃদু হাসলেন, যে হাসির কথা আওরঙ্গজেবের ভালো মনে আছে। তিনি বললেন, 'উপাধি কিংবা বিলাসিতা নয়, সবচেয়ে ভালো হয় যদি তুমি কথা দাও যে, সাম্রাজ্যের মঙ্গল করবে আর পরিবারের বাকি আমরা যারা আছি তাদের দিকে খেয়াল রাখবে। হে আল্লাহ, এটাই হবে আমাদের বংশের নতুন সূচনা।'

অধ্যায় তিন

বন্দী

আগ্রা দুর্গের দেওয়ান-ই-আম-এর মঞ্চের উপর আওরঙ্গজেব একটি সোনালি চেয়ারে খুশিমনে বসলেন। একপাশে দেয়ালের উঁচু জায়গা থেকে জাফরির আড়াল থেকে জাহানারা তাকিয়ে রয়েছেন। বোনের সাথে মিটমাট করে ফেলার পর গত তিনটি মাস কেবল ভাল খবরই পাওয়া যাচ্ছিল আর এখন জাহানারা এবং পুরো সভাসদ আওরঙ্গজেবের সর্বশেষ বিজয় দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন। যে শিবাজি সুরাট বন্দর তছনছ করার সাহস দেখিয়েছিল, ১৫০,০০০ সেনার বিশাল একটি বাহিনী এবং উন্নততর কৌশল দিয়ে তাকে পরাভূত করা হয়েছে। তিনি বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। মারাঠি নেতা তেইশটি দুর্গ ফেরত দেওয়াসহ ৪০০,০০০ রুপি ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, একটু পরই তার বালক পুত্র সম্ভাজিকে নিয়ে দরবারে এসে আওরঙ্গজেবের সামনে নতজানু হবেন।

শিঙ্গা বেজে উঠতেই আওরঙ্গজেব বুঝলেন, শেষ পর্যন্ত সেই মুহূর্তটি এসে গেছে, এবার এই মরুভূমির ইঁদুরজোড়া আসল মোগল জাঁকজমক টের পাবে। তিনি ওদেরকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে রোজকার প্রথামাফিক একের পর এক রাজকীয় ডিক্রি জারি করতে শুরু করলেন এবং আর্জিদারদের বিরাট একটি সারির অভিযোগ ইত্যাদি সমাধান করতে লাগলেন। পার্থিব জগতের প্রতীক জাঁকালো পোশাক-অলঙ্কার ইত্যাদি ব্যবহারকে তিনি সাধারণত অসার দম্ভের প্ররোচনা এবং ধর্মদ্রোহিতাপূর্ণ অহংকার হিসেবে ঘৃণা করেন। তবে অনেক সময় এগুলো কাজে লাগে আর এখন সেই সময়টি এসেছে। অত্যন্ত যত্নসহকারে সোনালি এমব্রয়ডারি করা দুধ-সাদা ব্রোকেডের আলখাল্লা পরেছেন। আলখাল্লাটির গলায় আর হাতে মুক্তার মালা সেলাই করা, খোদাই করা পান্না আর রক্তলাল রুবির মালা গলায় পেঁচিয়েছেন। হীরকখচিত কোমরবন্ধ থেকে আলমগির তরোয়ালটি ঝুলছে। বিখ্যাত এই তরোয়ালটি তাঁর

পূর্বপুরুষ বাবর, ফারগানা থেকে এনেছিলেন আর আঙুলে ঝলমল করছে তৈমুরের সোনার বাঘের মাথাওয়ালা একটি আংটি। তিনি মনে মনে তাঁর নিজের প্রতিচ্ছবিটি এভাবে আঁকলেন ছেচল্লিশ বছর বয়সে জাগতিক সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী পূর্ণতাপ্রাপ্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব। ষষ্ঠতম এবং আল্লাহর মেহেরবাণিতে হয়তো সমগ্র মোগলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। এই ভাবমূর্তিটি তাঁকে পরিতৃপ্ত করলো।

দুপাশে ছয়জন করে মোগল দেহরক্ষীদল শিবাজি আর তার পুত্রকে ঘিরে সভাসদদের সারির মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে এল। দেহরক্ষীদের পরনে সবুজ পোশাক, বুকে চকচকে পালিশ করা বর্ম আর হাতে লম্বা বর্শা। সবাই ঘুরে উৎসুক দৃষ্টিতে দাক্ষিণাত্যের নেতার দিকে তাকাল। আওরঙ্গজেবের চেয়ে মারাঠি নেতা অন্তত ছয় ইঞ্চি বেঁটে আর হালকা-পাতলা গড়নের। শিবাজি মঞ্চের সামনে এসে থামলেন, তার ছেলে কয়েক পা পেছনে দাঁড়াল। একজন পরাভূত শত্রু হিসেবে বিনয়ের সাথে মাটির দিকে চোখ না রেখে তিনি অপলকভাবে সরাসরি সম্রাটের মুখের দিকে তাকালেন। সাথে সাথে আওরঙ্গজেব তাচ্ছিল্যের সাথে মাথা ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকালেন। আরেকবার তূর্যধ্বনি হল, আওরঙ্গজেবের সচিব সামনে এগিয়ে শিবাজির সামনে একটি কাগজ মেলে ধরলো। তিনি এখন যে আনুগত্যের শপথ নেবেন, সেই বাক্যগুলো এতে লেখা ছিল।

শিবাজি আর তাঁর দিকে তাকিয়ে নেই, এটা বুঝতে পেরে আওরঙ্গজেব আবার মঞ্চের উপর থেকে নিচের দিকে তাকালেন। বাক্যগুলো জোরে জোরে না পড়ে তিনি ভ্রু কুঁচকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেগুলো পরীক্ষা করছিলেন। তারপর তিনি ঘুরে সচিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শব্দগুলো ফারসিতে লেখা হয়েছে— ভাষাটি আমি ভালই জানি, আপনি শুনতেই পাচ্ছেন, তবে আমি আমার দেশীয় ভাষায় শপথ নিতে চাই।'

আওরঙ্গজেবের দেহ কঠিন হয়ে গেল। পরাজিত হয়েও কি লোকটার শিক্ষা হয় নি? তিনি বললেন, 'আপনি আমার দরবারের ভাষা—ফারসিতে শপথ নেবেন!'

শিবাজি বললেন, 'ঠিক আছে।' তারপর তিনি গম্ভীর কণ্ঠে সাবলিলভাবে ফারসিতে শপথবাক্য পাঠ করা শুরু করলেন, 'আমি শিবাজি, মারাঠি গোষ্ঠীর নেতা এই মর্মে সম্রাট আরঙ্গজেবের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করছি, যাকে আমি আমার অধিরাজ স্বীকার করছি এবং বিশ্বস্ততা এবং সম্মানের সাথে তাঁর সেবা করবো। একই সাথে আমার পুত্র সম্ভাজিও এই শপথ বাক্য মেনে চলবেন।'

আওরঙ্গজেব শুনেছিলেন যে, শিবাজি নিজেকে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে দাবি করতেন। শপথবাক্য পাঠ করার পর আওরঙ্গজেব একবার মাথা নেড়ে

তাঁর স্বীকৃতি জানালেন, তারপর দরবারে নীরবতা নেমে এল। মারাঠি লোকটিকে বুঝতে হবে যে, মোগল সাম্রাজ্যে সে কতটা গুরুত্বহীন। আর এই পূর্ণ দরবার ছাড়া আর কোথায় সেটা ভালো হয় দেখান, যেখানে হাজির রয়েছে ঐ কমলা রঙ-এর পোশাকপরা রাজপুতদের মতো অন্যান্য সামন্তরাজা, যাদেরকে তিনি আগ্রায় ডেকে এনেছিলেন। অবশ্য মাঝে মাঝে ঐ রাজপুত রাজাদের অহঙ্কারও তার কাছে অসহ্য মনে হত।

তিনি দরবারের সচিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার এই সর্বশেষ সামন্ত রাজাকে ঐ সেনাপতিদের পেছনে নিয়ে যাও, যাতে তিনি লক্ষ করতে পারেন কিভাবে আমরা দরবারের কাজ চালাই আর সেখান থেকে তিনি শিখতে পারেন।' শিবাজি ঘুরে দেখলেন, আওরঙ্গজেব দরবার কক্ষের একেবারে পেছন দিকে দেখাচ্ছিলেন, যেখানে সর্বকনিষ্ঠ কর্মকতারা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা দেখে অপমানে তার মুখ লাল হয়ে গেল। আওরঙ্গজেবের সামনে যারা উপস্থিত ছিল তারা সবাই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। তিনি বুঝতে পারলেন ওরা ভালোভাবেই তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে যে, তিনি এই হঠাৎ গজিয়ে উঠা পরাভূত শত্রুর দর্পচূর্ণ করতে চলেছেন। অন্য কোনো অদূরদর্শী মানুষ হলে তাকে ফাঁসি দিয়ে দিত, অথচ তিনি তার সাথে কত মহানুভবতাই না দেখিয়েছেন। একজন বীর শহিদ হলে ভবিষ্যতে তার জাতিকে বিদ্রোহে অনুপ্রেরণা যোগাতো, অথচ তার বদলে চোখের সামনে নতজানু হয়ে থাকা একজন অধীনস্ত সামন্ত রাজা নিশ্চয়ই অনেক ভাল।

আওরঙ্গজেব অপেক্ষা করছিলেন দেখার জন্য যে শিবাজি তার জন্য নির্ধারিত জায়গায় যান কি-না, কিন্তু তার বদলে মারাঠি নেতা সচিবের বাধা এড়িয়ে সামনে একেবারে মঞ্চের কিনারায় এসে বললেন, 'জাঁহাপনা, আপনার মতো আমিও একজন শাসক। আমার শরীরে রাজরক্ত বইছে, অথচ আপনি আমাকে আমার চেয়ে নিচু স্তরের মানুষের সারিতে স্থান দিচ্ছেন। কেন আমাকে অপমান করছেন?'

শিবাজি এত কাছে এসে পড়েছেন যে, আওরঙ্গজেব তার দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন আর তার চোখে আগুন দেখতে পাচ্ছিলেন। কামরায় নীরবতা আরো গাঢ় হয়ে এসেছিল। ধীরে ধীরে আওরঙ্গজেব উঠে দাঁড়ালেন। ইচ্ছে করেই কণ্ঠস্বর শান্ত রেখে বললেন, 'আপনি এক্ষুনি আমার আনুগত্য ঘোষণা করে শপথ বাক্য পাঠ করেছেন, অথচ তারপরও আমার কথা অমান্য করে প্রকাশ্যে আমার বিরোধিতা করছেন।'

শিবাজি সাথে সাথে উত্তর দিলেন, 'আর আপনি সবার সামনে আমায় অবমাননা করছেন। আমি আর এখানে থেকে অপমান সহ্য করবো না।' এই

কথাটি বলেই সাথে সাথে পেছন দিকে ঘুরে শিবাজি তার ছেলের হাত ধরে টানতে টানতে সভাসদদের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে বাইরের দিকে চললেন।
আওঙ্গজেব আদেশ দিলেন, 'প্রহরী, ঐ লোকটিকে থামাও! তাকে আর তার ছেলেকে গ্রেফতার কর। ফাওলাদ খান, যে পর্যন্ত না আমি এদের ভাগ্য নির্ধারণ না করি, ততদিন আপনি আগ্রার সুবেদার হিসেবে এদেরকে আপনার হেফাজতে রাখবেন।'
শিবাজি ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকালেন, তবে প্রহরীরা তাকে আর তার ছেলেকে দ্রুত বাইরে নিয়ে যেতেই তিনি বাধা দিলেন না।
আওরঙ্গজেব আবার সিংহাসনে বসলেন। কেউ তাঁর দিকে না তাকালেও অনুমান করতে পারছিলেন যে, ভেতরে ভেতরে তিনি রেগে ফেটে পড়ছিলেন।
তিনি বললেন, 'চলুন আমরা দরবারের কাজে ফিরে যাই—বাংলা থেকে খাজনা কিরকম আদায় হল...।'

শিবাজি বেশ সাবধানে তার কাঁধ সমান উঁচু বিশাল আকৃতির বেতের ঝুড়িগুলোর ভেতরের মালামাল পরীক্ষা করলেন—নানরুটি, বাক্সভরা শুকনো খুবানি আর কিসমিশ, চাউল আর ডালের ছোট ছোট থলে। তারপর মৃদু হাসলেন—যেরকম বলেছিলেন সবকিছু সেরকমই এসেছে।
শেষ ডালাটি বন্ধ করার পর তার নায়েব একুজি বললো, 'মহারাজ, আগ্রার গরিব মানুষেরা রোজ আপনার নাম গান গায়। আমি প্রহরীদেরকে জিজ্ঞেস করবো তারা ঝুড়িগুলো পরীক্ষা করবে কি-না। তারপর বেহারাদেরকে ঝুড়িগুলো গাড়িতে তুলতে বলবো।'
'খুব ভাল। প্রহরী আর বেহারাদেরকে রোজকার মতো পাওনা মিটিয়ে দিতে ভুলো না। আমি নিশ্চিত হতে চাই যেন খাবারগুলো যাদের জন্য পাঠানো হচ্ছে তাদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছুক। শুনেছি বাজারে রুটির দাম খুব বেড়ে গেছে আর আমাদের সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ অনাহারে রয়েছে।' শিবাজি এর বেশি বললেন না। আওরঙ্গজেবের চোখ আর কান রয়েছে সবজায়গায় আর সেজন্যই তিনি বেশ সাবধানে কথা বলেন।
গত তিনমাস ধরে ওদেরকে দুর্গের সংকীর্ণ যে ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল সেখান থেকে প্রতিদিন বিকেলে তিনি একুজিকে দুর্গের বাজারে পাঠিয়ে আসছেন। তার নায়েবের সেখানে যাওয়ার অনুমতি ছিল। সেখান থেকে সে আগ্রার গরিব মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেবার জন্য খাবার কিনতে যেত। শুকনো

খাবার ভর্তি তিনটি ঝুড়ি শিবাজি শহরের একটি মন্দিরে পাঠাতেন। প্রথম প্রথম প্রহরীরা এই দানকর্ম করার অনুমতি দিতে রাজি ছিল না, ওরা সুবেদার ফাওলাদ খানের কাছ থেকে অনুমতি আনার কথা বলেছিল। সুবেদারও সন্দেহ করেছিলেন, প্রথম কয়েকদিন খাবার ভর্তি ঝুড়ির ভেতরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখলেন আর ফেরার সময় আবার পরীক্ষা করলেন যে, ভেতরে কেউ শিবাজির জন্য কোনো অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে কি-না। তবে শিবাজি যেরকম আশা করেছিলেন, রোজ রোজ একই রকম পরীক্ষা করতে করতে সুবেদার বিরক্ত হয়ে গেলেন। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে এই কাজের ভার প্রহরীদের উপরেই ছেড়ে দিলেন। আর শিবাজির কাছ থেকে প্রতিদিন রূপার মুদ্রা পেয়ে ওরা খুশি মনেই এই কাজটি করে চললো।

এখন ওরাও ওদের দায়িত্বে শিথিল হতে শুরু করেছে। বেশিরভাগ সময় ওরা পেটমোটা বেতের ঝুড়িগুলোর ভেতরে একবার উঁকি মেরেই ছেড়ে দিত। ছোট একটি উঠানের চতুর্দিকে চারটি কামরা নিয়ে শিবাজির কারাগার। এখান থেকে বের হবার যে ফটক রয়েছে তার বাইরে একটি গাধার গাড়িতে ঝুড়িগুলো তোলা হল। মাল তোলার পর হলুদ পাগড়িপরা গড়োয়ান লাগামটি একবার ঝাঁকি দিতেই গাধার গাড়িটি দুর্গের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চললো। গেট পার হয়ে শহরের রাস্তা ধরে মন্দিরের দিকে চলতে শুরু করলো। খাবারগুলো সেখানে বিতরণ করা হবে। শিবাজি নিজেকে বাহবা দিলেন, প্রহরীগুলো কি বোকা। শুকনো ফলের ভেতরে লুকিয়ে রেখে মন্দিরের পুরোহিতের কাছে তিনি যে লিখিত বার্তাটি পাঠিয়েছেন, তা ওরা দেখতে পায় নি। আর পুরোহিত যে উত্তরটি পাঠিয়েছিলেন তাও ওরা দেখে নি। চিঠির উত্তর লেখা ছোট কাগজটি পেঁচিয়ে বেতের ঝুড়ির বেতের ফাঁকে গুজে রাখা ছিল। শিবাজি যা জানতে চেয়েছিলেন, তার উত্তরে ওরা লিখে জানিয়েছিল, ওরা তার কয়েকজন সেনাপতির সাথে যোগাযোগ করেছিল আর তাদেরকে বলেছিল ওরা যেন দ্রুতগামী দুটি ঘোড়া নিয়ে শহরের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে তৈরি হয়ে থাকে। শিবাজির পালিয়ে বের হওয়া পর্যন্ত ওরা তার জন্য অপেক্ষা করবে।

তবে সেই মুহূর্তটি কখন আসবে? তিনি সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন দেখতে যে, রোজকার খাবার বিতরণের কাজটি গতানুগতিক হতে হতে একসময় প্রহরীরা পুরোপুরি কখন এ থেকে সম্পূর্ণ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তার মনে একটু অহঙ্কার ছিল যে, ধৈর্য ধরা আর সেই সাথে ঠিক কখন আঘাত হানতে হবে সেটি জানাটাও তার একটি শক্তি। একুজি বাজারে জোর গুজব শুনে এসেছে যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আওরঙ্গজেব কান্দাহার অভিযানে সেনাবাহিনী পাঠাবেন আর সেই সাথে তার মারাঠি বন্দীদেরকেও তাদের

সমস্যাসঙ্কুল নিজের দেশ থেকে কাবুলে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেবেন। একথাটি যদি সত্যি হয় তবে মাহেন্দ্রক্ষণটি এগিয়ে আসছে।

ঝুড়িগুলো পাঠিয়ে দেবার পর একুজি একটি পিতলের ঘটিতে তার প্রভুর পানের জন্য পানি ঢেলে একজন ভৃত্যকে পান করতে দিল। খাবারের স্বাদ গ্রহণের জন্য শিবাজি কয়েকজন ভৃত্য রাখার অনুমতি পেয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানটি লক্ষ করে শিবাজি মুখ বাঁকিয়ে হাসলেন। কারাগারে বন্দী হওয়ার পর প্রথম প্রথম তিনি সন্দেহ করতেন যে, আওরঙ্গজেব হয়তো তাকে বিষপ্রয়োগ করতে চেষ্টা করবেন কিংবা তার গলায় ছুরি চালাবার জন্য একজন গুপ্তঘাতক পঠাবেন। কিন্তু কিছুই হয় নি। এ ধরনের কাঁচা কাজ করে একজন শহীদ সৃষ্টি না করে আওরঙ্গজেব বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। শিবাজি এখন বুঝতে পেরেছেন দুর্গে থাকাকালীন হয়তো তিনি যথেষ্ট নিরাপদ থাকবেন। তার জীবন নাশের যেকোনো চেষ্টা সম্ভবত আগ্রা থেকে কান্দাহারের পথে হতে পারে। লোকজনের চোখ-কান এড়িয়ে অনেক দূরে এমনভাবে কাজটি করা হবে যেন, কোনো ডাকাত কিংবা বিদ্রোহীর ঘাড়ে দোষ চাপানা যায়। সম্রাটের দিকে কেউ আঙুল দেখাতে না পারে। এই আরেকটি কারণে আওরঙ্গজেব তাকে কান্দাহার পাঠাবার আগেই তাকে অবশ্যই পালাতে হবে।

এখন মনে হচ্ছে যেন, দেবতারা তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। ঘণ্টাখানেক আগে একুজি যখন বাজারে ছিল তখন তিনি প্রহরীদেরকে কিছু বলাবলি করতে শুনেছিলেন, যা যতশীঘ্র সম্ভব তার নায়েবকে জানাতে হবে। পানির পাত্রটি একুজির হাত থেকে নেবার সময় তিনি তার গলায় ঝুলানো একটা চামড়ার ফিতা থেকে ঝুলে থাকা পিতলের গনেশের মূর্তিটি ছুলেন। গোপন সঙ্কেতটি টের পেয়ে একুজি বুঝতে পারলো যে, তিনি প্রহরীদের কান এড়িয়ে তাকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা বলতে চাচ্ছেন। কালো পাগড়িপরা মাথাটা সামান্য হেলে সে সায় দিল।

পানি খাওয়া শেষ করে শিবাজি ধীরে ধীরে উঠান পেরিয়ে উঁচু একটা দেয়ালের পেছনে লুকানো ছোট প্রস্রাবখানার দিকে এগোলেন। একুজিও দ্রুত সেখানে গেল। দুজনেই কানখাড়া করে একমুহূর্ত অপেক্ষা করলেন, তবে উঠান থেকে কোনো শব্দ শোনা গেল না। শিবাজি সশব্দে প্রস্রাব করতে শুরু করে ফিসফিস করে তার নায়েবকে বললেন, 'তুমি যখন বাইরে ছিলে তখন আমি শুনলাম একজন প্রহরী বলছিল, পানিপথ যুদ্ধে মোগলদের বিজয়ের বার্ষিকী পালনের জন্য আগামীকাল বিরাট ভোজ আর আতশবাজির উৎসব হবে। সেদিন থেকেই তাদের হিন্দুস্তানের অভিশপ্ত বিজয়যাত্রা শুরু হয়েছিল।'

'হ্যাঁ মহারাজ। আমিও বাজারে লোকজনদের এটা বলাবলি করতে শুনেছি। আর ফেরার পথে দেখলাম বড় একটি মাঠে সবুজ মখমলের তাঁবু খাটানো হচ্ছে। মনে হয় সেখানেই ভোজ হবে।'

'চমৎকার। পুরো দুর্গে সবার মনোযোগ ভিন্নমুখী থাকবে। পালাবার চেষ্টা করার জন্য এটাই সুবর্ণ সুযোগ।' শিবাজি শরীর বাঁকা করে চওড়া গলার একটি মাটির ঘড়া থেকে পানি ঢেলে নিয়ে হাত ধুলেন। আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কিভাবে পালাতে হবে সেটা ওরা কয়েকশো বার আলোচনা করেছেন— মাঝে মাঝে এই প্রস্রাবখানায়, আবার অনেকসময় গভীর রাতে ফিসফিস করে পুরো পরিকল্পনার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

রাতে বিছানায় শুয়ে শিবাজি ফিসফিস করে তার পাশে শোয়া ছেলেকে খবরটা জানালেন। এই প্রথম তিনি তার নয় বছর বয়সি ছেলে সম্ভাজিকে এই পরিকল্পনার কথা জানালেন আর অনুভব করলেন কথাটা শুনেই তার ছেলের দেহ শক্ত হয়ে গেল। তিনি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'কোনো চিন্তা করোনা, শুধু আমি আর একুজি তোমাকে যা যা করতে বলবো ঠিক তাই করবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পরদিনটি এত ধীরে কাটছিল যে, শিবাজি প্রায় অস্থির হয়ে উঠলেন। তবে বিকেল গড়াতেই তার চার দেয়াল ঘেরা আবাসের বাইরে থেকে মানুষের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সম্ভবত ভোজের অতিথিরা এসে গেছে। সূর্য দিগন্তে ডুবে যাওয়ার আগেই প্রচণ্ড শব্দে প্রথম আতশবাজি আকাশে উড়লো। ছোট ছোট তারাগুলো ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না। তারপর পরই উল্লসিত চিৎকার। একুজি রোজকার মতো ঠিক সময়েই বাজারে গিয়েছে। তিনি আশা করলেন উৎসব চলাকালীন বাজার হয়তো খোলা থাকবে, যাতে একুজি শুকনো খাবাগুলো কিনতে পারে আর গাধার গাড়িটি দুর্গে ঢুকে বেতের ঝুড়িগুলো নিতে পারবে। নায়েবের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করার সময় তিনি ধীর স্থির থাকার চেষ্টা করলেন, অহেতুক উঠানে পায়চারি কিংবা অস্বাভাবিক কিছু করা থেকে বিরত থাকলেন যাতে দুই প্রহরীর দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়। প্রহরী দুজন একটা নিম গাছের ছায়ায় বসে পান চিবুচ্ছিল। শেষপর্যন্ত একুজি ফটকে এসে হাজির হল আর তার পেছনে দুজন কুলির মাথায় দুটো ঝুড়ি যথারীতি দেখা যাচ্ছে। এবার তার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। এপর্যন্ত ঠিক আছে, তবে কঠিন কাজটি এখনও বাকি রয়ে গেছে।

একুজি জিজ্ঞেস করলো, 'মহারাজ, মালামালগুলো এসে গেছে। আপনি কি রোজকার মতো দেখে নেবেন?'

'অবশ্যই দেখবো। তবে বাইরের আতশবাজির শব্দ আর হৈহুল্লোরে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। ঝুড়িগুলো বরং ভেতরে আমার কামরায় নিয়ে এসো।' নায়েবের পিছু পিছু কুলিরা ঝুড়িগুলো মাথায় করে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। তবে শিবাজি যেখানে ছিলেন, সেখানেই রইলেন, প্রহরীরা কিছু বলে কি-না শোনার জন্য। ঠিক তখনই আরেকটি আতশবাজি ফুটে উঠতেই প্রহরী দুজন শিবাজির দিকে পেছন ফিরে একটা পাথরের বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে আতশবাজির খেলা দেখার জন্য আকাশের দিকে তাকাল।

মোট তিনটি ঝুড়ি ভেতরে কামরায় নেওয়া পর্যন্ত শিবাজি অপেক্ষা করলেন। সেখানে সম্ভাজি তার জন্য অপেক্ষা করছিল। আর একুজি দুই কুলিকে বিদায় করে দিতেই ওরা বাইরে এসে প্রায়ান্ধকার আকাশে আতশবাজির সোনালি রঙের তারা দেখতে লাগলো। নিঃশব্দে তিনি এক থেকে পাঁচশো পর্যন্ত গুণতে শুরু করলেন, এই সময়ের মধ্যে দুটি ঝুড়ি থেকে যথেষ্ট পরিমাণ শুকনো খাবার নামিয়ে একুজি একটা ঝুড়ির ভেতর সম্ভাজিকে ঢুকালো। তারপর শিবাজি উঠলেন এবং নিচু হয়ে স্যান্ডেল থেকে কিছু ধুলা ঝাড়ার ভান করে তারপর ধীরে ধীরে ভেতরের দিকে হেঁটে চললেন।

একুজি ফিসফিস করে বললো, 'জলদি করুন, মহারাজ!' শিবাজি দরজার কাছে রাখা খোলা ঝুড়িটার ভেতরে ঢুকলেন। ঝুড়ির ভেতরে গুড়িসুরি মেরে বসতেই একুজি তার মাথা, ঘাড়ে রুটি, আর খাবারের প্যাকেট ভরতে শুরু করলো। যতদুর সম্ভব খাবার সামগ্রী দিয়ে তাকে পুরোপুরি ঢেকে ঢাকনিটা বন্ধ করার আগে একুজি কুলিদেরকে ডাকলো, 'বেয়ারা, এখানে এস!' তবে বাইরের প্রচণ্ড হট্টগোলের শব্দে কুলিরা তার ডাক শুনতে পেল না। শিবাজি অনুভব করলেন, একুজি তার ঝুড়িটি পাশ কাটিয়ে দরজার কাছে গিয়ে আবার জোরে চিৎকার করে কুলিদের ডাকলো। তারপর আতশবাজির শব্দ হঠাৎ থেমে যেতেই শিবাজি পাথরের মেঝেতে কুলিদের খালি পায়ে হাঁটার শব্দ শুনতে পেলেন। তারপর অনুভব করলেন ঝুড়িটি উপরের দিকে উঠছে, তিনি দুপাশে তার পেশিবহুল দুই হাত ঠেকা দিয়ে বসলেন। কুলিটি ঝুড়িটি মাথায় করে উঠান পার হয়ে নিচে পাথরের মেঝেতে রাখলো। তারপর দুবার ধপ করে শব্দ হতেই বুঝলেন অন্য ঝুড়িগুলোও তার পাশে এসে গেছে।

তিনি শুনলেন একুজি চেঁচিয়ে বলছে, 'আপনারা কি ঝুড়িগুলোর ভেতরে দেখবেন? আমি কিন্তু এখনও এর মুখ বাঁধিনি।' শিবাজি চোখ বুজলেন। এত ধীরে কখনও সময় পার হয় নি। তার পিঠ দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে

লাগলো। সম্ভাজি কিভাবে সামলাচ্ছে কে জানে? সে সাহসি ছেলে, তবে বয়স মাত্র নয় বছর.

কেউ কথা বললো না। ব্যাপার কি? কি হচ্ছে? হয়তো যে কোনো মুহূর্তে ঝুড়ির ঢাকনি খুলে যাবে আর তারপর তিনি অনুভব করবেন একটা আঙুলে খোঁচা মেরে মেরে দেখছে, একসময় তার গায়ে খোঁচা মারবে। তারপর তার চুল ধরে তাকে টেন বের করবে। কিন্তু তারপর আবার আতশবাজি আকাশে উড়লো। প্রায় একই সাথে সাথে এক ঝটকা মেরে ঝুড়িটাও উপরের দিকে উঠলো। শিবাজি আবার চলতে শুরু করেছেন। আতশবাজির নতুন প্রদর্শনীর দিকে অবশ হয়ে তাকিয়ে ওরা হয়তো ঝুড়িগুলো নিয়ে চলে যেতে কুলিদেরকে ইশারা করেছিল। আতশবাজির শাঁ শাঁ আর হিস হিস শব্দ হলেও শিবাজি ওদের হাঁটার ছন্দ বুঝতে পারছিলেন আর গুণতে চেষ্টা করছিলেন কয় পা গেল। আট, নয়, দশ ...একজন কুলি বিড়বিড় করে বললো, 'এই শিবাজি দিন দিন আরো দানশীল হচ্ছেন। আমি শপথ নিয়ে বলবো এই ঝুড়িটা ভীষণ ভারি।' কিন্তু ওরা ওদের চলা থামাল না...এগার, বারো, তেরো...এখন মনে হয় ওরা ভেতরের গেটের চৌকাঠের নিচ দিয়ে যাচ্ছে। এখানেই গাধার গাড়িটা অপেক্ষা করার কথা। হাউই বাজির শাঁ শাঁ হিস হিস শব্দের ভেতর দিয়ে কান খাড়া করে তিনি লাগামের মৃদু টুংটাং শব্দটা ঠিকই ধরতে পারলেন। গাধার গাড়িটা এসে গেছে!

ঠিক তখনই কুলি তার ঝুড়িটা মাটিতে ফেলে দিল। এক মুহূর্ত ঝুড়িটা সামনে পেছনে দুলতে লাগলো—যদি উল্টে পড়ে ঢাকনিটা খুলে যায় তাহলে তিনি ধরা পড়ে যাবেন। শিবাজি নিজের দেহ কুণ্ডলি পাকিয়ে শক্তভাবে একটা বলের মতো করে রাখলেন আর আশা করলেন যেন ঝুড়িটার দুলুনি থেমে যায়। একুজি চিৎকার করে উঠলো, 'এই বুদ্ধু সাবধানে রাখ! যদি আমার প্রভুর কাছ থেকে রূপার মুদ্রা পেতে চাও, তাহলে অসাবধান হয়ো না। নাও ঝুড়িটা তোল আবার।' ঝুড়িটা আবার উঠলো। যখন অনুভব করলেন গাড়িতে রাখার জন্য ঝুড়িটা আরো একটু উঠলো, তখন শিবাজি বহুকষ্টে একটা বিজয় উল্লাসের চিৎকার দমন করলেন। গাড়িটা যেভাবে তার নিচে পর পর দুবার দুলে উঠলো, তাতে বুঝা গেল তার ঝুড়িটাই প্রথমে তোলা হয়েছে। এক মুহূর্ত পর গাড়োয়ান চাবুক হাঁকাতেই গাড়িটা দুর্গ থেকে বের হওয়ার ঢালু পথ বেয়ে নামা শুরু করতেই শিবাজি টের পেলেন তার ঝুড়িটা সামনের দিকে সামান্য টাল খেল।

সবকিছু ভালোভাবে চললে শীঘ্রই ওরা মন্দিরে পৌঁছে যাবেন। সেখানে পুরোহিত তাকে আর তার ছেলেকে ভবঘুরে ভিক্ষুকের ছদ্মবেশ নিতে সাহায্য

করবে। তারপর আগ্রার সরু গলির মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে শহরের দেয়ালের বাইরে আমবাগানের কাছে নিয়ে যাবেন, যেখানে তার লোকজন ঘোড়া নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। তারপর গরম বাতাসে চুল উড়িয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ওরা দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ের দিকে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলবেন।

আগ্রা দুর্গের বুরুজের উপরে দাঁড়িয়ে আওরঙ্গজেব নিচে কুচকাওয়াজ ময়দানের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সেখানে পাকানো চাবুক বার বার প্রহরীদের খোলা পিঠের উপর পড়ছিল। ওরা আর্তনাদ করছিল আর ওদের ক্ষতবিক্ষত দেহের নিচে বালু রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছিল। দুই হাত পা দুই দিকে ছড়িয়ে একটা কাঠের ফ্রেমের উপর ক্রুশের মতো শুইয়ে হাত-পা চামড়ার ফিতা দিয়ে বাঁধা ছিল। ওরা টানাটানি করে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল হাতপায়ের বাঁধন ছিড়তে।

একশো চাবুক মারা হল সঠিক শাস্তি। এই লোকদুটোর দায়িত্বে অবহেলার কারণে মারাঠি নেতা পালাতে পেরেছেন। এর ফলে শিবাজি আবার একজন বীর হবেন আর তিনি নিজে হবেন একজন হাস্যাস্পদ ব্যক্তি। আর শুধু তাই নয়। শিবাজি যে পালিয়েছেন সেটা কেবল আজ সকালে ওরা আবিষ্কার করেছে। অথচ পরিষ্কার গত সন্ধ্যায় তিনি আর তার ছেলে বেশ চতুরতার সাথে প্রতিদিন যে দান সামগ্রী বেতের ঝুড়িতে করে মন্দিরে পাঠাতেন, তার মধ্যে লুকিয়ে পালিয়েছেন। আর তার নায়েব, যে নিশ্চয়ই তার পালাবার সমস্ত ব্যবস্থা করেছিল, সেও গতরাতে চুপিসারে শিবাজির চাকরবাকরসহ পালিয়েছে। আওরঙ্গজেব সাথে সাথে তাদেরকে ধরবার জন্য কয়েকজন ঘোড়সওয়াড় পাঠিয়েছিলেন, তবে পলাতকদের ধরবার তেমন আশা নেই।

আর্তচিৎকার থেমে গেছে। মনে হল প্রহরী দুজন জ্ঞান হারিয়েছে। তারপরও চাবুকমারা চলছে—তিনি হুকুম দিয়েছিলেন যদি ওরা জ্ঞান হারায় তবুও চাবুক মারা চলতেই থাকবে। কাঠের আড়াআড়ি খুঁটি থেকে দেহগুলো এখন কশাইয়ের হুক থেকে ঝুলানো মাংসপিণ্ডের মতো নিস্তেজ হয়ে ঝুলছিল। যদি বেঁচেও থাকে—হয়তো থাকবে—তবে জীবনের বাকি দিনগুলো চাবুকের ঘায়ের ক্ষত বয়ে বেড়াবে। সবসময় মনে থাকবে কিভাবে ওরা দায়িত্ব অবহেলা করেছিল। আর দুর্গের সুবেদার ফাওলাদ খানকে কাবুলে নির্বাসনে পাঠানো হবে।

পেছন ফিরে আওরঙ্গজেব ধীরে ধীরে তাঁর মহলের দিকে হেঁটে চললেন। পরিচারকদেরকে লেসের সুতার তৈরি টাট্টি পর্দাটি নামিয়ে দিতে বলে তিনি

শক্ত মার্বেল পাথরের মেঝেতে হাঁটুগেড়ে বসে প্রায়ান্ধকারে নামাজ পড়া শুরু করলেন। সব সময়ের মতো যখনই আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হন, তখন অনিশ্চিত এই পৃথিবীতে একমাত্র নিশ্চিত এই সত্তাই সান্ত্বনা হয়ে দাঁড়ায়। শেষবারের মতো মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সেজদার পর যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন অনুভব করলেন তার মন অনেক শান্ত এবং পরিষ্কার হয়েছে। শিবাজি তাঁকে বোকা বানিয়েছেন। তবে তার পালিয়ে যাওয়ার পেছনে হয়তো কোনো ঐশী উদ্দেশ্য রয়েছে। হয়তো আল্লাহ তাকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তিনি একটু বেশি গর্বিত হয়ে যাচ্ছেন, নিজের সক্ষমতা সম্পর্কে বেশি আস্থাবান হয়েছেন এবং এক ও অদ্বিতীয় সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে অতিরিক্ত ঢিলেমি দিয়েছেন। অবশ্যই এটাই প্রথম নয় যে তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন তিনি কতটুকু ভালো মুসলিম। অনেক সময় যখন রাতে ঘুম আসতো না, তখন তিনি ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তাঁর একাগ্রতা প্রমাণের জন্য উপায় খুঁজে বেড়াতেন— আরো মসজিদ নির্মাণ করবেন, গরিবদের উদ্দেশ্যে অনুদান আরো বাড়িয়ে দেবেন, মক্কায় আরো বেশি উপঢৌকন পাঠাবেন...।

তবে এসব কাজ তার মনে আনন্দ এনে দিত। তবে এই প্রথমবার তাঁর মনে হল, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কাজে তাঁকে তাঁর প্রিয় কিছু কোরবানি দিতে হবে। তবে সেটা কি? নারীর মধ্যে তিনি যে আনন্দ খুঁজে পেতেন? তাঁর বেগমদের মধ্যে দিলরাস বানু অনেক দিন আগে মারা গিয়েছেন আর নওয়াব বাঈয়ের কাছে আকর্ষণ করার মতো তেমন কিছু নেই। তবে রাতের পর রাত উদিপুরী মহলের বাহুর উষ্ণতায় তিনি দুনিয়ার কষ্ট ভোলার চেষ্টা করে চলেছেন। ইন্দ্রিয়পরায়ণ উদিপুরী তার সুগন্ধিময় দেহ দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে জড়িয়ে ধরে যে সুখ দেন, তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলে কি আল্লাহর প্রতি তাঁর কর্তব্য সমাধা হবে? না, আল্লাহ নারীকে সৃষ্টি করেছেন একটি উদ্দেশ্যে—পুত্র জন্ম দেবার জন্য। ইতিমধ্যে তাঁর চারটি পুত্রসন্তান হয়েছে, তার মধ্যে মোহাম্মদ সুলতান তাঁর বাবা আর ভাইদের সাথে লড়াই চলার সময় তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যার পরিণতিতে সে বাকি জীবন অন্ধকূপে বন্দী হয়ে কাটাবে। আর বাকি তিনজন—মুয়াজ্জম, আজম আর আকবর বর্তমানে তাদের দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ওরা তাঁর গর্ব। তবে কে জানে ভবিষ্যতে কি হবে? যদি ওদের মধ্যেও কেউ বিশ্বাসঘাতক হয়ে দাঁড়ায় কিংবা কোনো একজন যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা অসুখে মারা যায়? সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে হলে তাঁর আরো পুত্রসন্তানের প্রয়োজন; কাজেই এখন যৌনকর্ম থেকে বিরত হওয়ার সময় নয়। তাঁকে অন্য কিছু ত্যাগ করতে হবে। তার মধ্যে সংগীত হল একটি। তবলা আর সেতারের

আওয়াজ সবসময় তাকে ইন্দ্রিয়সুখ দিত, তবে সেটি কি চপলতা এবং স্বার্থপরতা নয়? নিজেকে খুশি করা ছাড়া সংগীতের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। তাকে এটাই ছাড়তে হবে। রাষ্ট্রের কোনো অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছাড়া সুন্দর দামি পোশাক আর রত্নালঙ্কার পরা বাদ দিতে হবে। ঈশ্বরপ্রেমী একজন মানুষের এসব পোশাক পরিচ্ছদের অনাবশ্যক অলঙ্কার কোনো প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যতে সরলতাই হবে তাঁর ব্যক্তিগত স্লোগান। তাহলেই আল্লাহ তার বর্জন এবং আত্মত্যাগ অনুমোদন করবেন এবং অবিশ্বাসী শিবাজির বিরুদ্ধে তাঁকে বিজয় এনে দেবেন।

মারাঠি নেতার কথা মনে পড়তেই তার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। তিনি কল্পনা করলেন, পালিয়ে যাওয়ার পর সে উল্লাস করছে ...আত্মতৃপ্তির হাসি দিয়ে আর গর্ব করে তার অনুসারীদের কাছে বর্ণনা করছে কিভাবে মোগলদেরকে বুদ্ধির খেলায় বোকা বানিয়েছে। ঠিক আছে, সে, তার অনুসারী আর অন্যান্য যারা একই ধর্মবিশ্বাসী তারা সবাই এই স্পর্ধা দেখানোর কারণে অনুতপ্ত হবে।

দুইদিন পর ফজরের নামাজের পর আওরঙ্গজেব দেওয়ান-এ-খাসে এলেন। সেখানে তাঁর অনুরোধে ধর্মীয় উপদেষ্টা, উলামারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কালো আলখাল্লা পরা কালো দাড়িওয়ালা মোল্লারা তাঁকে দেখে মাথা নুইয়ে অভ্যর্থনা জানাতেই তিনি তাদেরকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। তাঁকে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকারে ওরা ভারী লাল-নীল কার্পেটের উপরে বসলেন।

"আপনারা তো জানেন যে, রাজদ্রোহী মারাঠি নেতা শিবাজি পালিয়েছে। তার পলায়ন আমার আর আমার সাম্রাজ্যের জন্য একটি অবমাননার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্যই আমি আপনাদেরকে এখানে আসতে আহ্বান জানিয়েছি। সমস্ত রাজদ্রোহী আর অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা এখন শিবাজিকে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একজন বিজয়ী ব্যক্তি মনে করবে। এছাড়া ওদের মধ্যে যারা বিধর্মী তারা এই বিষয়টি তুলে ধরবে যে, তারা সবাই একই ধর্মবিশ্বাসী আর তার পলায়নে মন্দিরের পুরোহিতরা যে সাহায্য করেছে সেকথাটিও বলবে। আর এসব কথা বলে ওরা অন্য হিন্দুদেরকেও বিদ্রোহে সামিল হতে আহ্বান জানাবে। আমি এটা হতে দেবো না। অনেক চিন্তাভাবনার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এখন সময় এসেছে সেই কাজটি করার, যা আমরা প্রায়ই আলোচনা করেছি। আপনাদের মধ্যে অনেকেই যে কাজটি করার জন্য প্রায়ই আমাকে চাপ দিতেন, তা হল—হিন্দু প্রজাদেরকে আমার ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব

দেখানো। আমি তাদেরকে দেখাতে চাই, তাদের ধর্মের উপর বিধিনিষেধ কম আরোপ করে মোগলরা কতটুকু সহনশীলতা আর মহানুভবতা দেখিয়েছেন। তবে তারা যদি আমার বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহে সমর্থন করে তাহলে আরো কঠিন বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে।'

অনেক মোল্লা মাথা নেড়ে সায় দিলেন। আবার কেউ কেউ তাদের নেতা হিরাত থেকে আগত আলেম, সাদা দাড়িওয়ালা আবু হাকিমের দিকে তাকালেন। তিনি হাত তুলে বললেন, 'আমি কী একটা কথা বলতে পারি, জাঁহাপনা?'

'অবশ্যই বলুন, আবু হাকিম।'

'আপনার কথা আমাদেরকে আনন্দ দিয়েছে আর এ থেকে আপনার বিস্তৃত এবং গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখছি যে, কাফেররা কিভাবে আপনার মহান পূর্বপুরুষ, আল্লাহ তার বেহশত নসীব করুন—সম্রাট আকবরের কাছ থেকে পাওয়া স্বাধীনতা আর সমযোগ্যতা থেকে অন্যায় সুবিধা নিচ্ছে। হিন্দু 'ধর্ম'টির, যদি আমরা এটাকে একটা ধর্ম বলেই থাকি, এর যারা পৌরহিত্য করে থাকেন, তারা হচ্ছে বাচাল ধরনের কিছু পুরোহিত। আমি যতদূর খবর পেয়েছি, তা থেকে জানতে পেরেছি, ওরা মনে করে ধূপ-ধুনার ধোঁয়ায় আধো-অন্ধকার মন্দিরগুলো ওদের জন্য নিরাপদ আর সেখান থেকেই ওরা আপনার আশীর্বাদ ধন্য শাসনের বিরুদ্ধে মানুষজনকে ক্ষেপিয়ে তোলার মতো হঠকারিতা করছে। মোগলদেরকে ওরা ভিনদেশি হানাদার হিসেবে অভিযুক্ত করে আর দাবি করে যে, হিন্দু প্রজাদের উপর আপনার কোনো আইনগত কর্তৃত্ব নেই, যাদেরকে আপনি এবং আপনার পূর্বপুরুষরা তাদের মাটি থেকে অধিকারচ্যুত করেছেন। তাদের উপর করারোপ করা কিংবা তাদেরকে শাস্তি দেবারও কোনো অধিকার আপনার নেই, কাজেই ওরা আপনার হুকুম এবং কোনো তলব মানতে বাধ্য নয়। অবশ্যই আমরা সকলে এই জঘন্য মানুষগুলোকে আপনার ক্ষমতা আর শাসনের বদান্যতা বুঝাতে মহামান্য জাঁহাপনাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। আর এর মধ্য দিয়ে আমাদের ধর্মের বদান্যতাও শিক্ষা দেবো, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছেন আপনি।'

মাথা নিচু করে লোকটির কথাগুলো শুনতে শুনতে আওরঙ্গজেব ভাবছিলেন, আবু হাকিম একজন বাচাল আর অতিবিগলিত মোসাহেব, নিজের কণ্ঠস্বর শুনে সে নিজেই ধন্য হচ্ছে। বেশিরভাগ সময় তার দীর্ঘ এবং গুরুভার নসিহতগুলো বিশ্বাসীদের অনুপ্রাণিত করার বদলে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার উদ্দেশ্যে করা হত। তবে তাকে উলেমাদের প্রধান নিযুক্ত করার সময় আওরঙ্গজেব

পারতে পেরেছিলেন যে, তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। সম্রাটের মনের ইচ্ছা আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন এবং তার বৈধতা দানের জন্য নিজে নিজেই যথাযত ধর্মীয় যুক্তি খুঁজে বের করতে পারেন। এই আবু হাকিমই তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, খারেজি দারাকে ফাঁসি দিয়ে তিনি আল্লাহর কাজই করছেন আর এই কাজের জন্য নরকপ্রাপ্তির বদলে বরং তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে।

ধন্যবাদ আবু হাকিম। খুবই ভালো হয় যদি আপনি আর অন্যান্য উলেমারা আমার সাম্রাজ্যের সকল মসজিদ, মাদ্রাসায় আপনাদের ভাইদেরকে বুঝান, যেন তারা ওয়াজ-নসিহত করার সময় আমার শাসনের আইনানুগ এবং সদাশয় দিকটি এবং আমাদের ধর্মের সঠিক পথে এর আনুগত্যের কথাটিও তুলে ধরেন। আমার সকল প্রজাদের সামনে আমার কর্তৃত্ব স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমি হোলি আর দেওয়ালির মতো হিন্দু উৎসব নিষিদ্ধ করতে রাজকীয় ফরমান জারি করবো। এছাড়া হিন্দুদের পবিত্র স্থাপনাগুলো ধ্বংস করার আদেশ

একজন তরুণ মোল্লা জিজ্ঞেস করলো, 'সবকটি নিশ্চয়ই নয় জাঁহাপনা?' সাথে সাথে আবু হাকিমের ঘন ভ্রুঁর নিচ থেকে কড়া চোখে তার দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকাতেই সে বুঝতে পারলো সম্রাটের কথার মাঝে কথা বলে সে ভুল করেছে। এখন সে চোখ নামিয়ে সোজা কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভালো প্রশ্ন করেছেন, অবশ্যই সবকটি নয়। সবকটি ধ্বংস করার চেষ্টা করাটা অবাস্তব আর অবিজ্ঞ হবে। আমি প্রথমে মথুরার মন্দিরটা দিয়ে শুরু করতে চাই, এটা হিন্দুদের একটা প্রধান তীর্থকেন্দ্র আর এখান থেকেই লোকজনের অসন্তুষ্টির খবর এসেছে আর ওখানে খাজনা আদায় করতে গিয়ে আমার লোকেরা ওদের হাতে নাজেহাল হয়েছে। এতেও যদি প্রজারা আমার কর্তৃত্ব ক্ষমতার প্রতি নত না হয় তাহলে ওদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য আমি আরো মন্দির বেছে নেব। হয়তো নতুন কিংবা মেরামত করা মন্দিরগুলো বেছে নেব। আর পার্থিব অর্থে আমার শাসন এবং আমাদের নিজ ধর্মের প্রাধান্য প্রমাণ করতে যেসব মন্দির ভেঙ্গে ফেলা হবে সেসব জায়গায় নতুন নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হবে।'

আওরঙ্গজেব একটু থেমে তাঁর কথার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করলেন। তার কথায় উলেমারা একটু অবাক হলেও তাদের মুখের ভাব দেখে বুঝা গেল ওরা কতটা তার কথায় সায় দিয়েছে। তিনিই প্রথম মোগল সম্রাট, যিনি তাঁর ধর্মকে শাসন কাজে ব্যবহার করছেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা, যত বড়ই হন না কেন, সবাই আপস করেছিলেন। কেউ কেউ, বিশেষত আকবর—এমনভাবে কাজ

করেছিলেন যেন, তাঁদের প্রকৃত কোনো ধর্ম মোটেই ছিল না। অন্যরা পার্থিব জীবনে ধর্মকে উপেক্ষা করে কেবল মুখে মুখে ধর্মবিশ্বাসের কথা বলেছিলেন। এরা ব্যক্তিগত জীবনে মদ, আফিম আর অন্যান্য আমোদপ্রমোদে ব্যস্ত ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি এ ধরনের আচরণ লক্ষ করেছিলেন, যখন তাঁর পিতামহ জাহাঙ্গীর আর তাঁর বাবা শাহজাহানের মধ্যে লড়াই চলছিল, তখন তাঁর পিতামহ জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ভবিষ্যতে ভালো ব্যবহার করবেন এই আশায় তাঁকে আর দারা শিকোহকে জিম্মি করে রেখেছিলেন। রাতের পর রাত পিতামহের তত্ত্বাবধানে থাকার সময় তাঁরা দেখেছেন, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান মদের গ্লাসে আফিমের বড়ি মিশিয়ে দিচ্ছেন। আর প্রতি চুমুকের সাথে জাহাঙ্গীর তাঁর ধর্মকে অমান্য করেছেন, সুরার প্রভাবে তাঁর মাথা ঘুলিয়ে গিয়েছিল আর তাঁর নামকাওয়াস্তে কুচক্রী স্ত্রীকে সাম্রাজ্য শাসন করার অনুমতি দিয়ে সাম্রাজ্যকে বিপন্ন করে তুলেছিলেন।

তিনি আবার বললেন, 'আমার আরো কিছু বলার আছে। আমি যদি আমার প্রজাদের সামনে আমাদের ধর্মবিশ্বাস আর সেই সাথে আমার কর্তৃত্বের প্রাধান্য তুলে ধরতে চাই, তাহলে আমার নিজেকেও ব্যক্তিগতভাবে ধর্মের প্রতিটি আচার-আচরণ পালনে লোকজনের সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকতে হবে।'

আবু হাকিম বললেন, 'কিন্তু জাঁহাপনা, এই দুনিয়ায় আপনার চেয়ে ধর্মভীরু এবং নিয়ম-কানুন নিষ্ঠার সাথে পালন করে এমন মুসলিম সন্তান আর কেউ নেই।'

'আপনি ভুল বলেছেন। একটি দৃষ্টান্ত রাখার জন্য আমাকে আরো কিছু অবশ্যই করতে হবে। আমি জানি যে, অনেক সময় আমি বেশ অসতর্ক হয়ে পড়ি। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন, সংগীতের প্রতি আমার অনুরাগ আমার মনকে আমার দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। শক্তির অপচয় হয় এবং আমাকে আলসে করে দেয়। কাজেই এখন থেকে আমি রাজদরবারে বাদ্যযন্ত্র বাজানো নিষিদ্ধ করতে চাই। এছাড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কোনো উপলক্ষ ছাড়া দামি পোশাক আর রত্নালংকার ব্যবহার করবো না আর সভাসদদেরও তা করতে বোঝাবো। এই ধরনের অলঙ্করণ অতিমাত্রায় ব্যক্তিগত অহঙ্কার আর অসার দম্ভের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই না, আর এটা আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করে দেয়। আর আমি আমার জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি লিপিবদ্ধ করার গোমর দেখানোর নিয়ম থেকে দরবারের লিপিকারকে বিরত করতে চাই। আমার বিচারক হচ্ছেন আল্লাহ, যাঁর এ ধরনের লেখ্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই, তাই আমারও নেই। আপনাদের আর যদি কিছু বলার না থাকে

তাহলে আপনারা এখন আসতে পারেন। ফরমানগুলো তৈরি হবার পর আবার আপনাদের তলব করবো, যাতে আমরা সবাই আবার আলোচনা করবো কিভাবে আমার পরিকল্পনা কাজে লাগানো যায়।'

সন্ধ্যায় কামরায় একাকী বসে আওরঙ্গজেব একটু পরিতৃপ্তি অনুভব করলেন। শিবাজির পলায়নের ঘটনাটি এখনও তার মনে পীড়া দিচ্ছে, তবে এটা হয়তো একটি আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। কেননা এটা তার দর্পচূর্ণ করে দিয়ে তাঁকে কঠিন সিদ্ধান্ত নেবার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাছাড়া সংগীত সুখ বির্সজন দেবার মতো শক্তি খুঁজে পেয়ে তিনি খুশি হয়েছেন। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আর দরবারের ঘটনাপঞ্জি লিপিবদ্ধ পরিত্যাগ করার তুলনায় এটা করতে তাঁর অনেক চেষ্টা করতে হয়েছে। আর একবার জনসমক্ষে ঘোষণা দেওয়ার পর আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। তবে অন্যরকম বৈধ আনন্দের উৎস এখনও আছে তার কাছে। একটু পর তিনি উদিপুরী মহলের কাছে যাবেন...তবে একজন কোরচি হঠাৎ উদয় হয়ে তাঁর এই সুখ-ভাবনায় ছেদ ঘটাল।

'জাঁহাপনা, শাহজাদি জাহানারা বেগমসাহিবা এসেছেন। তিনি আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছেন।'

'অবশ্যই। তাকে এখানে নিয়ে এস।' জাহানারা কামরায় ঢুকতেই আওরঙ্গজেব তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, 'আসুন বোন।' তিনি তখনও তাঁর বাবার জন্য শোকের সাদা পোশাক পরেছিলেন, যদি নিয়মমাফিক সে সময় পার হয়ে গেছে। তিনি আওরঙ্গজেবের হাত একমুহূর্ত ধরে রেখে তারপর বললেন, 'ধন্যবাদ আওরঙ্গজেব, আমার সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছ, সেজন্য ধন্যবাদ।'

আওরঙ্গজেব তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'আপনার চেহারা আগের চেয়ে ভালো দেখাচ্ছে।' আসলেই এটা সত্যি। গত কয়েকমাসে তার চেহারা অন্যরকম ছিল। তবে একটু কাছে এগিয়ে তিনি দেখলেন আজ রাতে তার অভিব্যক্তিতে বেশ টান টান আর উদ্বিগ্ন ভাব দেখা যাচ্ছে। আওরঙ্গজেব বললেন, 'কি ব্যাপার আপনি এত রাতে এখানে জাহানারা?'

'তোমার সাথে আমার অতি জরুরি কিছু কথা বলার প্রয়োজন ছিল। একটু আগে যা শুনতে পেলাম, তা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি নাকি হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব পালন নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছ আর ওদের কয়েকটা মন্দির ভেঙ্গে ফেলতে চাচ্ছ। আমার একজন পরিচারিকা বললো তার স্বামী নাকি আজ সন্ধ্যার নামাজে মতি মসজিদে মোল্লাকে এই ঘোষণা দিতে শুনেছে। এটা কি আসলে সত্যি?'

'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। বেশ কিছুদিন ধরে আমি এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছিলাম। তবে শিবাজির অবাধ্যতা প্রমাণ করেছে যে, অন্যরা তার দেখাদেখি বিদ্রোহ শুরু করার আগেই আমার কর্তৃত্ব হিন্দুদের সামনে দেখাবার এটিই সঠিক সময়। প্রজাদেরকে দেখাতে হবে যে, আমার সহ্যের একটা সীমা আছে আর তাছাড়া ভেতর-বাইরের যে কোনো ধরনের হুমকি থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।'

'কিন্তু হিন্দুরা তো তোমার প্রজাদের মধ্যে অনেক সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর অনেকেই সাম্রাজ্যের ভাল এবং বিশ্বাসী সেবক। আমাদের পূর্বপুরুষদের আমল থেকেই ওরা আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত। বিদ্রোহের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। ভেবে দ্যাখো আমাদের নিজ ধর্ম থেকেই তো অনেক শত্রু এসেছে সেই বিজাপুর আর গোলকুন্ডার সুলতান থেকে শুরু করে পারস্যের শাহ, আর আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উচ্ছৃঙ্খল আফগান গোত্র পর্যন্ত কতজন আছে বল। এদের তুলনায় আমাদের বিশ্বস্ত হিন্দু প্রজারা এমন কি করেছে যে, তাদের ক্ষেত্রে এটা হবে? ওদের ধর্মের বিরুদ্ধে যাওয়া মানেই ওদেরকে সরাসরি শিবাজির মতো রাজদ্রোহীর শিবিরে ঠেলে দেওয়া। তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না, যে আশংকা তুমি এড়াতে চাইছো এতে বরং তা আরো সৃষ্টি হবে?'

আওরঙ্গজেবের ঠোঁট থেকে হাসি মুছে গিয়ে চেহারা কঠিন হলো। তার বোনের সাথে মাত্র বনিবনা হয়েছে, অথচ তা কত ভঙ্গুর...তাকে আরো সাবধান হতে হবে যাতে এই সম্প্রীতিটা নষ্ট না হয়। অথচ তিনি আওরঙ্গজেবের বিচার-বিবেচনাকে চ্যালেঞ্জ করছেন—যা আর কেউ করার সাহস করবে না। আর তাঁর এই সিদ্ধান্তে তিনি কাউকেই নাক গলাতে দেবেন না, এমনকি জাহানারাকেও নয়।

তিনি শান্তভাবে বললেন, 'আমি আপনার সাথে একমত নই। আমি চাই এমনভাবে আমার ক্ষমতা প্রকাশ করবো যেন কেউ তা উপেক্ষা করতে না পারে। যাতে তারা বুঝতে পারে যে, শিবাজির সাথে বিদ্রোহে সামিল হলে আমার প্রতিশোধ কিরকম প্রবল হতে পারে। আপনি একজন নারী এবং দীর্ঘদিন নির্জনে জীবন-যাপন করেছেন। সাম্রাজ্য শাসনের বাস্তবতা আর শত্রুর মনমেজাজ আপনি কি আমার মতো বুঝতে পারবেন?'

জাহানারা বললেন, 'আমি ঠিকই বুঝি! আমি কি বাবাকে একসময় রাষ্ট্রের কাজে সহায়তা করি নি? তিনি কি আমার মায়ের নামাঙ্কিত সিলমোহর আমার হাতে তুলে দেননি, যা দিয়ে আমি ফরমান জারি করতে পারতাম? তিনি কি মাঝে মাঝে আমার পরামর্শ চেয়ে তা আমলে নেন নি?' এক মুহূর্তের জন্য তাঁর

চোখদুটো জ্বলে উঠলো, তারপর আবার বললেন, 'তোমাকে সাবধান না করলে, আমি আমার বাবা আর পূর্বপুরুষদের প্রতি আমার কর্তব্য পালনের দায়িত্বে ব্যর্থ হব। আর যদি তোমার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করার বিষয়ে তুমি নিজের অবস্থানে অনড় থাকো, তাহলে মোগলরা এতদিন সংগ্রাম করে যা গড়ে তুলেছিল তা অস্থির, হয়তো ধ্বংস করে ফেলবে। এতকাল যেখানে কোনো বিভেদ ছিল না, এখন তা গড়ে উঠবে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলতে থাকবে। তাদের ধর্মের প্রতি বৈষম্য দেখিয়ে তাদেরকে দূরে ঠেলে দেওয়ার পরিবর্তে অভিজাত হিন্দু পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলে আমরা কি হিন্দুস্তানে আমাদের অবস্থান সংহত করে তুলি নি? তাদের রক্ত কি আমাদের ধমনিতে বইছে না—তোমার ছেলের ধমনিতে কি নেই? একজন রাজপুত অভিজাত নারীর গর্ভে কি তোমার একটি পুত্র সন্তান নেই? এজন্য কি মুয়াজ্জমকে তুমি অন্যদের চেয়ে কম ভালোবাস? একজন মানুষের ধর্মের দিকে না তাকিয়ে আমাদের রাজবংশ আর সাম্রাজ্য কি উন্নতি লাভ করে নি?'

'আপনি আপনার উদার সুফি বিশ্বাসে অতিরিক্ত প্রভাবিত হয়েছেন। আপনি এটাকে আপনার জন্য উপযুক্ত দর্শন মনে করতে পারেন, তবে এগুলো আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করা থেকে অনেক দূরে রয়েছে।'

'হ্যাঁ, আমি একজন সুফি। সব সময়ই তা থাকবো আর এটাই আমাকে সহনশীল হতে আর অন্যকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। তবে শুধু এ কারণেই আমি তোমাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করছি না। আমি তোমাকে এসব বলছি কেননা এটা আমাদের শাসন কাজ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে অনেক বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। আওরঙ্গজেব, তোমাকে কে এই পরামর্শ দিয়েছে? উলেমারা দিয়েছে? আমার মনে হয় মোল্লারা তোমার আর তোমার রাজত্বের ভালো করার বদলে নিজেদের ক্ষমতার ব্যাপারটি নিয়ে বেশি ভাবে।'

আওরঙ্গজেবের ঠোঁট থেকে হাসি মুছে গেল, তিনি বললেন, 'এটা আমার একার সিদ্ধান্ত ছিল। এমনকি মোল্লাদের সাথে আলোচনা করলেও সিদ্ধান্ত একা আমিই নেব। আল্লাহর নামে বলছি জাহানারা, আমি জানি যে আমি ঠিকই করছি।'

'তুমি যখন ছোট ছেলেটি ছিলে, তখন তুমি খুব একরোখা ছিলে। যা সঠিক মনে করতে তার জন্য তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় বড় ছেলেদের সাথে লড়াই করতে। আমি তোমার সাহস দেখে তোমাকে আরো ভালোবাসতাম আবার সেই সাথে তোমার জন্য দুশ্চিন্তাও করতাম। যখন কোনো ব্যাপারে

মনস্থির করে ফেলো তখন তুমি খুব সরল মনে দুনিয়াকে বিচার কর—ভালো আর মন্দ তোমার কাছে সাদা আর কালোর মতো। তুমি সব সময় আশা কর পৃথিবী যৌক্তিক পথে নয় বরং তোমার যুক্তিমতো চলুক। যদি হিন্দু প্রজারা তোমার ক্ষমতা প্রদর্শনের সামনে মাথা নত না করে, তাহলে কি হবে? তুমি কেবল তোমার আর তোমার উত্তরাধিকারীদের জন্য তকলিফ আর অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করবে যার কোনো প্রয়োজন নেই।'

মিনতি নিয়ে আওরঙ্গজেবের মুখের দিকে তাকাতেই তাঁর চোখে পানি চলে এল। তবে আওরঙ্গজেবের চেহারায় কোনো ধরনের আবেগ কিংবা প্রতিক্রিয়া নেই দেখে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, এতক্ষণ যে কথাগুলো বলেছেন তা পরোপুরি বিফলে গেছে। পেছনে ফিরে তিনি দ্রুত কামরা থেকে বের হয়ে গেলেন। আওরঙ্গজেব তাকে অনুসরণ করতে উদ্যত হলেন—তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর মনে ব্যথা দিয়েছেন, যা তিনি কখনও চান নি। তবে নিজেকে থামালেন। আর কিই বা তিনি বলতে বা করতে পারেন? জাহানারার জানা উচিত ছিল যে, জাগতিক বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে কোনো লাভ নেই। এটা তাঁকে শিখতে হবে।

অধ্যায় চার

বিদ্রোহ ধূলিসাৎ হল

রওশনআরা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'মনে রেখো জানি হচ্ছে—দারার মেয়ে! যে বিশ্বাসঘাতককে তুমি ঘৃণা কর তার মেয়েকে কেন ছেলের বউ বানাচ্ছ? অনেক সময় আমি তোমাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।'

আওরঙ্গজেব ভাবলেন, তবে আমি তোমাকে ঠিক বুঝি। যেহেতু জাহানারা এই প্রস্তাবটি এনেছে শুধু একারণেই আজম আর জানির মধ্যে এই বিয়েতে তিনি রাজি হচ্ছেন না। বড় বোনকে সাম্রাজ্যের পাদিশাহ বেগমের পদে পুনর্বহাল করায় রওশনআরা তাঁর ক্ষোভ চেপে রাখতে পারে নি। একটা বাচ্চামেয়ের মতো অস্থিরভাবে ঠোঁট ফুলিয়ে তিনি বললেন, 'এটা ঠিক না। সে নয়, আমিই তোমার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম! আগ্রা দুর্গ থেকে পালিয়ে এসে কে তোমার শিবিরে যোগ দিয়েছিল? সেটা জাহানারা নয়—সেটা ছিলাম আমি! কে তোমাকে জানিয়েছিল আগ্রা দুর্গের প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের বাবা কতজন প্রহরী আর কয়টা কামান রেখেছেন? আমি!' প্রথম প্রথম আওরঙ্গজেব মিষ্টি কথায় তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, তারপর চমৎকার গোলকুন্ডা হীরা বসানো সুন্দর একটা সোনার হার দিয়েছিলেন। রওশনআরা সাগ্রহে সেটা গ্রহণ করেছিলেন—আর করবেন না কেন? তিনি রত্ন খুব ভালোবাসেন। তা সত্ত্বেও রাজদরবার দিল্লিতে ফিরে আসার পর তিনি মুখ গোমড়া করে হেরেমে নিজের ঘরেই বসেছিলেন আর একবারও জাহানারাকে দেখতে তার প্রাসাদে যান নি। আর এখন...

আওরঙ্গজেব বললেন, 'বোন, আমাকে বিচার করতে দিন কোনটি আমাদের পরিবারের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে। এমনকি আগ্রা থাকাকালীন আমি লক্ষ করেছি আজম তার চাচাতো বোনের প্রতি একটু বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছিল—আর আপনি নিজেও এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, তাই না?

'হ্যাঁ—সতর্ক হওয়ার জন্য বলেছিলাম! তবে আমি কখনও একথা ভাবি নি যে তুমি তাদের বিয়ে দিতে চাইবে।'

আওরঙ্গজেব বললেন, 'দারার মেয়ের সাথে আমার একজন ছেলের সম্পর্ক করলে আমার অবস্থান আরো শক্তিশালী হবে, কমবে না। আর এতে দুনিয়ার সবাই জানবে যে, অতীতে আমাদের সম্পর্কে যে ফাটল ধরেছিল তা আমি মেটাতে চাই।' কথাগুলো বলার সময় আওরঙ্গজেব সচেতন হলেন যে, প্রায় একই কথা জাহানারা তাকে বলেছিলেন।

'কিন্তু তুমি আমাকে সব সময় বলতে যে, আজমের সাথে কোনো অভিজাত ব্যক্তির মেয়ে কিংবা বিদেশি কোনো শাহজাদির বিয়ে দেবে...?'

'তা এখনও করা যায়...শুধু জানিই আজমের একমাত্র স্ত্রী হবে কেন?'

'যাই হোক তোমার উচিত ছিল অন্তত এই বিয়ের ব্যাপারটা আমাকেই প্রথমে বলা, অথচ আমাকে হেরেমের অন্যের কাছ থেকে খবরটা শুনতে হল। ভেবে দেখেছ এতে আমার মনের অবস্থা কি হয়েছে? অন্য আরেকজন মহিলার দিকে তাকিয়ে আমার কিরকম লেগেছিল বলো তো?'

'আমি দুঃখিত, সত্যি আমার ভুল হয়ে গেছে। তোমাকেই আমার প্রথমে বলা উচিত ছিল।'

'এখন যে সেটা বুঝতে পেরেছ সেজন্য আমি খুশি হয়েছি।'

'সেক্ষেত্রে আমিও আশা করি যে, তুমি বুঝবে কেন আমি বিয়েটা দিতে চাচ্ছি। যাই হোক, তোমাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি, কারণ একটা ব্যাপারে আমার তোমার সাহায্য প্রয়োজন।'

'আমার সাহায্য?'

'চাকরি করার সময় আমাদের যেসব কর্মকর্তা মৃত্যুবরণ করে, তাদের বিধবা স্ত্রী আর পরিবারের সাহায্য করার জন্য আমি একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলাম। খাজাঞ্চী আমাকে জানিয়েছে এখানে প্রচুর দেনা হয়েছে, অথচ আমি প্রতিবছর এতে হাজার হাজার রুপি অনুদান দেই। সম্ভবত এটা ঠিক মতো চালাতে পারছে না কিংবা কেউ তহবিল তছরূপ করছে। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি উপযুক্ত ভাবতে পারছি না, যে বিষয়টা তদন্ত করে আমাকে জানাবে। তুমি কী কাজটা করবে?'

এক মুহূর্ত পর রওশনআরা বললেন, 'হ্যাঁ।' তার মুখে খুশির মৃদু হাসি দেখে আওরঙ্গজেব বুঝলেন যে, তাঁর পরিকল্পনায় কাজ হয়েছে। তিনি সব সময় জানতেন কিভাবে তাঁর বোনকে সামলানো যায়। ছোটবেলা থেকেই তিনি একা থাকতে পছন্দ করতেন না, সব সময় চাইতেন কেউ না কেউ তাকে সঙ্গ দিক, সবাই তাকে দেখুক আর তাকে গুরুত্ব দিক। আর এতে তার মধ্যে এমন একটি ভাব হত যে, তোষামোদে সহজেই ভুলে যেতেন আর কেউ অবজ্ঞা

করলে ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থা হত। জাহানারা রাজদরবারে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তিনি নিজের শক্তিতে আস্থাহীন ছিলেন—এমনকি আওরঙ্গজেবের প্রতিও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। সব সময় তাঁকে খুশি করতে চেষ্টা করতেন। পরবর্তীতে বড় বোনের প্রতি তাঁর বিরক্তি আর ঈর্ষা তাঁর উপর চেপে বসে। এখন থেকে তাঁর সাথে ঘন ঘন দেখা করতে হবে, তাঁর প্রশংসা করতে হবে বিশেষত সবার সামনে আর প্রচুর উপহার দিতে হবে। আওরঙ্গজেব তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'এখন আমাকে ক্ষমা কর। মাগরেবের নামাজের আগে আমাকে প্রচুর কাজ করতে হবে।'

আবার একা হওয়ার পর আওরঙ্গজেব জানালার ধারে একটা কৌচে বসে চোখ বুঁজে দুই হাত চিবুকের নিচে রেখে চিন্তায় মগ্ন হলেন। বিয়েটা দশ সপ্তাহের মধ্যে হবে আর তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এটাকে জমকালো করতে। সম্প্রতি তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, সাধারণ পোশাক পরবেন আর রত্নালঙ্কার পদদলিত করবেন, সেই কারণে এই উৎসবটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ করা থেকে থামানো যাবে না। এমন উৎসব করতে হবে যা তাঁর প্রজারা কখনও দেখেনি। বিয়ের উৎসবটি জমকালো করার এক মাত্র উদ্দেশ্য হল, সারা পৃথিবীকে মোগল সাম্রাজ্যের সম্পদ আর স্থায়িত্ব দেখান আর সর্বোপরি এই সাম্রাজ্যকে যে তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে রেখেছেন তাও সকলকে দেখান।

দিল্লির লাল কেল্লায় জাহানারার চমৎকার মহলের সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপে দাঁড়িয়ে আওরঙ্গজেব শোভাযাত্রা সহকারে বরের আগমন দেখছিলেন। মোগল কায়দার সবুজ পোশাকপরা পাশাপাশি দশজন করে মোট দুইশোজন বেহারা খাঁটি সোনার থালায় মণিমুক্তা, স্বর্ণমুদ্রা আর দামি মশলা গোলমরিচ, দারুচিনি আর লবঙ্গ নিয়ে সমান তালে পা ফেলে হেঁটে সবার সামনে এগিয়ে আসছে। ওদেরকে অনুসরণ করছে রূপালি শিরস্ত্রাণ আর বুকে বর্মপরা রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনীর একটি দল। ওদের কালো ঘোড়ার কেশর রেশমের মতো ঝিকমিক করছে।

এর পেছনেই সোনালি জ্যাকেটপরা চৌদ্দ বছর বয়সি আজম লম্বা গলা, বড় বড় চোখ আর ফ্যাকাসে পশমের একটি আখালটেক ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। আওরঙ্গজেব এই ঘোড়াটি তাকে বিয়ের উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। আমু দরিয়ার ওপারে জন্ম নেওয়া আখালটেক ঘোড়াগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী এবং টেকসই ঘোড়া। এই ঘোড়ায় চড়েই তাদের পূর্বপুরুষ চেঙ্গিস

খান তার বিজয় অভিযান চালিয়েছিলেন। আজমের একপাশে চব্বিশ বছর বয়সি মুয়াজ্জম, যে ইতিমধ্যেই বিবাহিত আর অন্যপাশে নয় বছর বয়সি আকবর। দুজনেই রুপালি রঙের পাগড়ি আর জ্যাকেট পরে রয়েছে। ওদের পোশাক আর পাগড়িতে বসানো হীরাগুলো রোদে আগুনের মতো ঝিকমিক করে জ্বলছিল। আওরঙ্গজেব সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। পার্থিব জিনিসের বিষয়ে গর্ব করাটা ঠিক না হলেও, ময়ূর সিংহাসনে বসার পর আর কখনও এমন অনুভূতি তাঁর হয়নি যা আজ এই প্রথম হল...

প্রথম সারির কুলিরা মহল থেকে চল্লিশ ফুট দূরে থাকতেই ওদেরকে সেখানেই থামার জন্য মহলের ছাদ থেকে তূর্যধ্বনির সংকেত শোনা গেল। কুলিরা সাথে সাথে থেমে পড়ে থালাসুদ্ধ হাত সামনে বাড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে পাঁচজন ডানে আর পাঁচজন বামে তিন পা এগিয়ে গেল। ওদের পেছনে দেহরক্ষীবাহিনীও ঘোড়ার রাশ টেনে দুই দিকে ভাগ হয়ে ঘোড়া দাঁড় করালো। দুই ভাইকে পেছন পেছন দুই পাশে নিয়ে মাঝখানের পথ দিয়ে আজম ওর ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল। মহলের সিঁড়ির গোড়ায় এসে তিনজনই ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল আর আজম সিঁড়ি বেয়ে উঠে আওরঙ্গজেবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বললো, 'আপনার দোয়া দিন বাবা।'

'আমার দোয়া তোমার উপর রয়েছে। এখন উঠে আমার সাথে ভেতরে এস। তোমার কনে সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

এখন যদিও দিনের আলো রয়েছে, তাসত্ত্বেও জাহানারার মহলে সোনার বাতিদানে লম্বা সুগন্ধিযুক্ত মোমবাতি জ্বলছে। এর সুগন্ধের সাথে ধূপ আর চাঁপা ও জুঁই ফুলের মালার সৌরভ মিশে লাল বেলেপাথরের স্তম্ভগুলোর চারপাশে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। মূল অনুষ্ঠানটি হবে মহলের প্রস্থ বরাবর এপাশ থেকে ওপাশে চলে যাওয়া উঁচু ছাদ আর মার্বেল পাথরের মেঝের বিরাট একটি কামরায়। অতিথিরা সেখানেই সমবেত হয়েছেন। আওরঙ্গজেব ঢুকেই দুইপাশে নজর বুলিয়ে দেখলেন সমস্ত আয়োজন ঠিক আছে কি-না। অসংখ্য তারা এমব্রয়ডারি করা সোনালি রঙের রেশমি কাপড়ের ঘোমটার আড়ালে ফুল আঁকা একটি মঞ্চে জানি বসে রয়েছে। মঞ্চের পাশেই একটি মার্বেল পাথরের তাকের উপর বিয়ের মুকুট রাখা ছিল, যেটা আওরঙ্গজেব আজমের মাথায় পরাবেন। এই মঞ্চটি কাশ্মির থেকে প্রজারা উপহার পাঠিয়েছে। জানির কোলের উপর আংটি পরা দুটি হাত ভাঁজকরা রয়েছে আর মেহেদি লাগানো দুই পা দেখা যাচ্ছিল।

মঞ্চের পেছনে পর্দা ঘেরা জায়গা থেকে জাহানারাসহ রাজপ্রাসাদের মহিলারা অনুষ্ঠান দেখবেন। তাঁর কথাতেই এই বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে, এটা রাজবংশের অতীতের ঘা নিরাময় করা ছাড়াও সাম্প্রতিক বিরোধের মীমাংসার পথ মসৃণ করবে। হিন্দুদের সাথে তাঁর আচরণ নিয়ে জাহানারার সাথে মতভেদ হওয়ার পর থেকেই তিনি অনুভব করছিলেন যে, দুজনের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে—এমনকি তিনি ভেবেছিলেন হয়তো জাহানারা তাঁর সাথে দিল্লি ফিরে যাবেন না। আগ্রা দুর্গে বন্দী জীবন কাটাবার বছরগুলোতে জানি তাঁর সাথেই ছিলেন। আর যেভাবে তিনি জানির সম্পর্কে কথা বলেছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল জানিকে তিনি নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসেন। এই বিয়েতে সম্মতি দিয়ে আর দিল্লিতেই বিয়ের অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা করে আওরঙ্গজেব চাচ্ছিলেন যে, জাহানারা রাজদরবারে ফিরে আসুন।

আজম কনের পাশে তার নির্দিষ্ট আসনে বসতেই আওরঙ্গজেব মোল্লাকে বিয়ে পড়াতে ইশারা করলেন।

মোল্লা প্রথম জানিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এই মানুষকে আপনার স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি?'

কয়েকপ্রস্থ ঘোমটার আড়াল থেকে তার পরিষ্কার জবাব শোনা গেল, 'হ্যাঁ।'

এরপর মোল্লার কথায় আজমও বিয়েতে তার মত দিলেন এবং যথারীতি বিয়ের দোয়া পড়তে শুরু করলেন। তারপর আওরঙ্গজেব চকচকে বিয়ের টায়রা মুকুটটি তাক থেকে তুলে তার ছেলের মাথায় পরিয়ে দিলেন। মুকুটের সোনার তারে বসানো মুক্তাগুলো হাওয়ায় ফুলের মতো কাঁপছিল। সবশেষে তিনি খানসামার হাত থেকে এক বাটি গোলাপজল নিয়ে তাতে আলতোভাবে দুই হাত ধুলেন, এরপর আরেকজন পরিচারক এক গ্লাস পানি দিতেই তিনি বিয়ের আনুষ্ঠানিক প্রথানুযায়ী তা সম্পূর্ণ পান করে বরকনের পবিত্র মিলন নিশ্চিত করলেন।

'নববধূ আর বর দীর্ঘজীবী হোক। তাদের মিলনে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক আর তারা অনেক সন্তানের জন্ম দিক!'

রাজকীয় ভোজে অংশ গ্রহণের জন্য যাঁদেরকে অবশ্যই আমন্ত্রণ করার কথা তাদের সবার জন্য জাহানারার ছোট্ট মহলে স্থান সংকুলান হওয়ার কথা নয়। সেজন্য আওরঙ্গজেব দিওয়ান-এ-আমের সামনে দুগের্র বিশাল খিলানে ঢাকা উঠানে বিশালাকায় চারকোণা তাঁবু টাঙাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফুলবাগান আর গোলাপজলের বুদ্বুদ উঠা ফোয়ারা পার হতেই তিনি জাফরান, ঘি আর মাখন দিয়ে রান্নাকরা খাবারের খুশবু অনুভব করলেন। সম্রাটের বাবুর্চিরা গত

কয়েকসপ্তাহ থেকেই রান্নার প্রস্তুতির জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে সর্বোৎকৃষ্ট সামগ্রী আনার জন্য বায়না দিয়ে চলেছিল। হিরাটের চারপাশের বিভিন্ন বাগান থেকে মিষ্টি রসালো তরমুজ, সুমিষ্ট আঙ্গুর আর ডালিম, পাঞ্জাব থেকে কাঠবাদাম আর আখরোট, কাশ্মির থেকে শুকনো খুবানি আর চেরি, রাজকীয় শিকারের জঙ্গল থেকে তিতির পাখি, কোয়েল জ্যান্ত ধরে দিল্লি নিয়ে আসা হবে, উত্তরের পাহাড়ি এলাকা থেকে খাদ্যের স্বাদগন্ধ বাড়াতে পুদিনা, মৌরি এবং ধনেপাতা, এবং দক্ষিণ থেকে গরম মশলা...

গুম গুম করে বেজে ওঠা নাকাড়া আর শিঙাধ্বনির সাথে সাথে সামনে পেছনে দেহরক্ষীদল নিয়ে আওরঙ্গজেব তাঁবুতে ঢুকলেন। তাঁবুর ঠিক মাঝখানে মখমলে ঢাকা একটি মঞ্চের উপর একটি নিচু টেবিল পাতা হয়েছিল, তিনি এই টেবিলের পেছনে তাঁর আসনে বসলেন। আবার নাকাড়া বাজিয়ে আজম আর অন্য শাহজাদাদের আগমন ঘোষণা করা হল। বর আওরঙ্গজেবের পাশে বসলেন আর মুয়াজ্জম আর আকবর একটু নিচে একটি ডিভানে বসলেন। তিনজনকেই খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। পেশিবহুল মুয়াজ্জম তার কাশ্মিরি রাজপুত মায়ের কাছ থেকে চওড়া কপাল, লম্বা টিকেলো নাক এবং শক্ত চোয়াল পেয়েছেন। মাত্র কিছুদিন আগে শাহজাহান জোর করে তাঁকে যে নওয়াব বাঈয়ের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন, তার চেয়েও মুয়াজ্জমের কপাল আর নাক অনেক সুন্দর। আজম আর বালক আকবরের সাথে তাঁদের পারসিক মা দিলরাস বানুর চেহারার খুব একটা মিল নেই। তিনি আওরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী ছিলেন, পুত্র আকবরকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। তবে এদের দুজনের মধ্যেই বিশেষত—আজমের মাঝে তিনি নিজের ছায়া খুঁজে পান। একটি মুহূর্ত তার মনে সবচেয়ে বড়ছেলে মোহাম্মদ সুলতানের চেহারাটা ভেসে উঠলো। তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করলে ইঁদুরের সাথে অন্ধকার কারাকক্ষে পঁচে মরার বদলে, আজ সেও এই উৎসবে সামিল হত। তবে মোহাম্মদ সুলতানের পরিণতি আল্লাহর সামনেই রয়েছে আর পৃথিবীর সামনেও রয়েছে। এজন্য তাঁর মনে কোনো আফসোস নেই...

সোনালি এমব্রয়ডারি করা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আওরঙ্গজেব ভোজ শুরু করার ইঙ্গিত দিলেন। সবুজ পোশাকপরা খানসামারা সর্বপ্রথম বড় বড় সোনার বারকোশে রোস্ট করা ময়ূর নিয়ে এল। ময়ূরের লম্বা উজ্জ্বল পালক ছড়িয়ে রয়েছে। আরো আনলো খাসি আর হরিণের মাংসের রোস্ট। এরপর এল পোলাও, যার উপরে ছড়ান রয়েছে সোনার পাতা মোড়ানো ফল আর বাদাম। আরো এল জাফরান দেওয়া ভাত, কাঠবাদাম আর কিসমিস দেওয়া সুগন্ধিযুক্ত

সদ্য সেঁকা রুটি আর ঢাকনা দেওয়া সোনালি আর রুপালি রঙের স্যুপভাণ্ডে আখনি দেওয়া মৃদু ফুটন্ত অবস্থায় বাবুর্চির মন-পসন্দ বিশেষ ধরনের রান্না। আওরঙ্গজেব খেতে পছন্দ করেন, তবে তিনি অন্যদের আগেই খাওয়া শেষ করেন, যাতে কেউ তাকে পেটুক মনে না করতে পারে। তারপর যখন স্ফটিকের পাত্রে বিভিন্ন ফল আর সোনালিপাতে মোড়ানো মিষ্টি টেবিলে টেবিলে পরিবেশন শুরু হল, তখন তিনি উঠে পড়লেন এবং সবুজ রেশমি ঝালর দেওয়া কাঠের পার্টিশনের ওপারে মেয়েমহলের দিকে গেলেন।

তিনি খুশি হয়ে দেখলেন যে, জাহানারা শোকের পোশাক খুলে অন্য পোশাক পরেছেন। গাঢ়নীল পোশাক পরে তিনি কনের একপাশে একটি কুশনে বসে রয়েছেন। আর আওরঙ্গজেবের মেয়ে জেবুন্নিসা আর তাঁর ছোট বোন গওহারা আরেক পাশে বসে রয়েছে। জাহানারাকে দেখে মনে হল তিনি খোশমেজাজেই আছেন, জেবুন্নিসা কিছু একটা বলে উঠতেই তিনি হেসে উঠলেন। তবে রওশনআরা কোথায়? তিনি চারপাশে চোখ বুলালেন, কিন্তু কোথাও তাকে দেখা গেল না।

তাঁকে দেখেই লজ্জাবনত জানি ঘোমটাটা আরেকটু টেনে নামিয়ে দিল, তবে তিনি এগোতেই জাহানারা বললেন, তোমার শ্বশুরের সামনে তোমার মুখ ঢাকার দরকার নেই।' একথার পর জানি ধীরে ধীরে সোনালি রঙের পাতলা রেশমি ঘোমটাটি ঠেলে সরিয়ে তাঁর দিকে তাকাল। একেবারে দারার মতো দেখতে, সেই একই ডিম্বাকৃতি মুখ, একই রকম ঘনভ্রু আর কালো চোখ, মসৃণ কপোল, যা তার ভাইয়ের বেলায় বেশ মেয়েলি মনে হত। কি ভাবছিল মেয়েটি? তিনি যে উদারতা দেখিয়ে স্বামী হিসেবে তাকে একজন শাহাজাদাকে দিচ্ছেন, এজন্য কি সে তার সঠিক মূল্যায়ন করছে, নাকি সে তার বাবার চরম পরিণতির কথা স্মরণ করছে? জাহানারা হয়তো তাকে বলেছেন অতীতকে ভুলে গিয়ে সবকিছু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে, যা তিনি নিজেই করেছেন। আর বর্তমানে যা হচ্ছে তার জন্য কৃতজ্ঞ হতে।

তিনি জানির দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বললেন, 'জানি, আমি তোমাকে আমার মেয়ে হিসেবে স্বাগত জানাচ্ছি। ইনশাল্লাহ আমার ছেলের সাথে তোমার বিয়েতে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে আর তোমরা এই বিয়েকে ফলপ্রসূ করে তুলবে।'

'ধন্যবাদ, জাঁহাপনা।'

'এই উপলক্ষে আমি তোমাকে, আমার বোন আর মেয়েদের সবাইকে উপহার হিসেবে দেবার জন্য রাজকোষাগার থেকে নিজ হাতে বাছাই করে কিছু রত্ন

এনেছি।’ তিনি ঘাড় কাত করতেই পাঁচজন বাঁদি, প্রত্যেকে একটি করে চামড়ার কাসকেট বয়ে নিয়ে এল। গম্বুজ আকৃতির ঢাকনি খুলতেই ভেতরে হীরা, রুবি, পান্না আর সমুদ্রনীল নীলকান্তমণি ঝলমল করে উঠলো। একটা কাসকেট একটু বড় ছিল—সেটা নববধূর জন্য আর অন্যগুলো তার বোন আর মেয়েদের জন্য। তবে একজন বোনকে সেখানে দেখা যাচ্ছে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘রওশনআরা কোথায়?’

গওহরা উত্তর দিল, ‘বিয়ে পড়ানোর সময় তিনি বলেছিলেন, তাঁর মাথা ধরেছে—আর তাই তাঁর ঘরে ফিরে যাচ্ছেন।’

‘আমি নিশ্চিত মাথাধরার কথা ভুলে গিয়ে হাকিম তাঁকে আমাদের সাথে যোগ দিতে বলবেন, তাহলে তা নিরাময় হবে। একজন নোকর পাঠিয়ে তাকে জানাও যে আমি অনুরোধ করেছি তিনি যেন এখুনি এখানে চলে আসেন, আমি তার আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করছি।’

আওরঙ্গজেব জাহানারার পাশে বসলেন। ওদের চারপাশে মহিলারা নিজেদের মধ্যে মৃদুকণ্ঠে কথা বলছিলেন, কেউ কেউ সামনে এগিয়ে নববধূ আর শাহজাদিদের উপহারগুলো দেখছিলেন। জুঁই ফুলের মিষ্টি সুবাস উদিপুরী মহলের কথা মনে করিয়ে দিল। তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী হেরেমের অন্যান্য মহিলাদের সাথে এখানে আসতে পারেন নি, তবে তিনিও এই বিয়ে উপলক্ষে তাঁর কাছে থেকে উপহার পাবেন। আওরঙ্গজেব নিজ হাতে তাঁর সুন্দর আসন্নপ্রসবা দেহ রত্নালঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে দেবেন...এমন সময় হঠাৎ তাঁবুর পর্দামহলের দিক থেকে লোকজনের উচ্চকণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল। পার্টিশনের অপর পাশ থেকে তার খানসামা বললো, ‘জাঁহাপনা, জরুরি সংবাদ এসেছে।’

আওরঙ্গজেব দ্রুত মেয়েমহল থেকে বের হয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী খবর?’

‘একজন কাসিদ—সংবাদবাহক এই মাত্র ঘোড়ায় চড়ে এসেছে। প্রায় বিশ হাজার জাট সেনা মথুরা আক্রমণ করে চারদিকে লুটপাট চালাচ্ছে।’

মথুরা এখান থেকে আগ্রার পথে মাত্র নব্বই মাইল দূরে! জাটদের হঠাৎ কি হল? আওরঙ্গজেব জানেন জাহানারা এখন বলবেন, হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে তিনি যে কর্মকাণ্ড শুরু করেছেন তার ফলশ্রুতিতে তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে জাটদের ধূমায়িত অসন্তোষ এখন প্রকাশ্য প্রজাবিদ্রোহে রূপ নিয়েছে। ঠিক আছে তাই যদি হয় হোক সেটা। এতে অরো ভালো হবে। এর অর্থ তাঁর শত্রুরা এখন জ্বলন্ত গোলা থেকে ইঁদুরের মতো ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এসেছে। আর তিনি তাদেরকে ধ্বংস করবেন, যার জন্য ওরা উপযুক্ত!

এক একটা মিনিট যাচ্ছে আর দিগন্তের উপর লাল ধূলির মেঘটি সগর্জনে আরো বড় হচ্ছে। বিশালদেহী রণ-হস্তির পিঠে হাওদায় সোজা হয়ে বসে আওরঙ্গজেব হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে সামনে দূরে বৃক্ষশূন্য বালুকাময় সমতলভূমির উপর দিয়ে ছুটে আসা ঘোড়সওয়াড় দলটির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। একটু পরই তিনি এক এক করে আলাদা লোকগুলোর অবয়ব আর সবার আগের ঘোড়সওয়াড়ির বর্শার চকচকে ডগাটি দেখতে পেলেন। তিনি জানতেন জাটরা অনভিজ্ঞ উচ্ছৃঙ্খল জনতা আর মনে হচ্ছে সেভাবেই ওরা হঠকারীর মতো তাঁর নিজের সুশৃঙ্খল বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে। আসুক ওরা।

বিদ্রোহের কথা কানে আসতেই তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং দ্রুত হঠাৎ গজিয়ে উঠা বিরোধী পক্ষের দ্বিগুণ সংখ্যক সেনা নিয়ে গঠিত দুটি দল সামনে পাঠালেন। একটি সেনাদল গেল আগ্রা থেকে আর অপরটি দিল্লি থেকে। তিনি নিজে পরবর্তী সেনাদলের সাথে চললেন। তবে তিনি যেরকম আশা করেছিলেন সেরকম দ্রুত বেগে ওরা চলতে পারলো না। ভারি ভারি কামান নেওয়ার কারণে তাদের চলার গতি একটু শ্লথ হয়ে পড়েছিল। তবে কামান নেওয়ার সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল, কেননা জাটদের কোনো কামান নেই আর এতে ওদের বিরুদ্ধে একটু বেশি সুবিধা পাওয়া যাবে। সময় বাঁচাবার জন্য তিনি রাতেও চলার নির্দেশ দিলেন, তবে কামান টেনে নিয়ে চলা বড় বড় সাদা ষাঁড়গুলো চলার গতি থামিয়ে ধপ করে বসে পড়লো। লম্বা চাবুক দিয়ে গাড়োয়ানরা বার বার আঘাত কষালেও, সারাদিন দীর্ঘপথ চলায় ক্লান্ত পশুগুলো আর উঠে দাঁড়াল না। গোলন্দাজ বাহিনী, পদাতিক বাহিনী, রসদবহর টানা গাড়ি আর শিবিরের অন্যান্য লোকজন সবাই একসাথে মিশে জট পাকাতে শুরু করলো। প্রায় বিশৃঙ্খল হয়ে পিছিয়ে পড়া সেনাদলটি ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ করে যাওয়ার সময় তাঁর কাছে খবর এল যে, শত্রুর গতিবিধি লক্ষ করার জন্য মূল দলের আগে একেবারে সামনের প্রান্তে ছোট অগ্রবর্তী দলটির উপর দুটি বাঘ উপরি আক্রমণ করে দুজনকে মেরে ফেলেছে। এই খবরটির উপর তিনি খুব একটা আস্থা রাখতে পারলেন না, কেননা বাঘ সাধারণত একাই শিকারের উপর আক্রমণ করে। এধরনের গুজব বরং আরো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলো। দলটি পুরোপুরি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ার আগেই তিনি রাতে চলা বাদ দিলেন।

আধখানা চাঁদের বেমানান আলোয় তাঁর সেনা কর্মকর্তারা ঘোড়ায় চড়ে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করছিল, তাদের দিকে লক্ষ করতে করতে তিনি ভাবছিলেন এই সুযোগে জাটদের আক্রমণ করার আশংকা নেই, কেননা ওরা এখনও অনেক দূরে রয়েছে। তবে সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁর এগিয়ে যেতে দেরি হওয়ার সুযোগটা নিয়ে ওরা সমস্ত লুণ্ঠিত মালামাল নিয়ে অনেক দূরের জঙ্গল আর মথুরা আর রাজপুতনার মাঝের মরুভূমিতে হারিয়ে যাবে। তবে ওরা যায় নি। ওদের নেতা গোকলা মোগল নগররক্ষী বাহিনী আর কোষাগারের উপর হামলা চালিয়েই চললো। তারপর আগ্রা থেকে আওরঙ্গজেব যে সেনাদলটি পাঠিয়েছিলেন, তাদেরকে কৌশলে এড়িয়ে গোকলা সরাসরি সম্রাটের মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করার ঔদ্ধত্য দেখিয়ে সামনে এগোতে শুরু করলো।

পরিকল্পনা মাফিক তাঁর নিজের সেনাসংখ্যা শত্রুর চারগুণ না হলেও, লড়াই আসন্ন হতেই আওরঙ্গজেব নিশ্চিত হলেন যে তাঁর কাছে এখনও যে পরিমাণ সৈন্য রয়েছে, তা গোকলাকে তার হঠকারিতার জন্য অনুতপ্ত হতে বাধ্য করবে। তাঁর হাতির কাছে দাঁড়ান দুজন সেনাকে তিনি চিৎকার করে নির্দেশ দিলেন, 'আমার সেনাপতিদের কাছে যাও। ওদেরকে বল জাটদের আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হতে। সামনের সারিতে অশ্বারোহীদল রাখতে বল, যাতে ওদের ঠিক পেছনে আমাদের শ্রেষ্ঠ গাদা বন্দুকধারী সেনাদলটিকে ওরা ঢেকে রাখে। আর সেই সাথে আমাদের সাথে আনা কামানগুলোও সাজাতে বল। জাটরা আক্রমণে সামনে এলেই আমাদের অশ্বারোহীদলটি দুই পাশে সরে গিয়ে শত্রুদেরকে আমাদের বন্দুকধারী সেনা আর গোলন্দাজদের মুখোমুখি করবে। তারপর শত্রুসেনার আক্রমণ যখন ভোঁতা হয়ে যাবে আর ওরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে, তখন অশ্বারোহীবাহিনী ওদের উপর চড়াও হয়ে ওদেরকে কচুকাটা করবে। আমি ঐ নিচু টিলার উপর থেকে যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ করবো। ইনশাল্লাহ, আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন আর আমরা জয়ী হব।'

প্রায় আধাঘণ্টা পর আওরঙ্গজেব তার পছন্দের জায়গা থেকে লক্ষ করলেন উন্মুক্ত জাট আশ্বারোহীসেনার প্রথম দলটি রণহুঙ্কার দিতে দিতে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে মাথা নিচু করে বর্শা বাগিয়ে এল। তাঁর নির্দেশমত বন্দুকধারী আর গোলন্দাজবাহিনীকে ঢেকে রাখা সামনের সারির মোগল অশ্বারোহী সেনাদলটির দিকে ওরা ছুটে এল। আবার তাঁর নির্দেশ মোতাবেক একেবারে শেষ মুহূর্তে মোগল অশ্বারোহীরা ডানে আর বামে ঘোড়া নিয়ে সরে গেল। ওরা সরে যাওয়ার সাথে সাথে তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করে দ্বিতীয় সারির সেনারা

গাদা বন্দুক আর কামানের গোলা ছুঁড়তে শুরু করলো। রণক্ষেত্র গাদা বন্দুকের পট পট আর কামানের প্রচণ্ড শব্দে ভরে গেল। একদুই মিনিট সাদা ধোঁয়ায় তিনি কিছুই দেখতে পারলেন না, অথচ তার মনে হচ্ছিল যেন অনেকক্ষণ ধরে এটা হচ্ছিল। হঠাৎ মৃদু হাওয়ায় ধোঁয়ার পর্দাটা পাতলা হয়ে যেতেই, তিনি দেখলেন অনেক জাট অশ্বারোহীসেনা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। আরোহীবিহীন ঘোড়াগুলো দ্রুত ছুটে পালাচ্ছিল। আহত ঘোড়াগুলো মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে কিংবা তাদের সওয়ারিদের মতো ভাঙ্গা পা নিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে।

তাঁর নিজের মোগল অশ্বারোহীসেনাদের সবুজ পোশাকে চেনা যাচ্ছিল। ওরা আবার এই এলোমেলো লড়াইয়ে ছুটে ফিরে এসে শত্রুসেনাদের উপর এলোপাতাড়ি তরোয়ালের কোপ চালাতে লাগলো। তবে ওরা কোনোভাবেই বেশি সুবিধা করতে পারছিল না। জাটদের বেপরোয়া আক্রমণের তীব্রতা এত প্রবল ছিল যে, ওরা মোগল বন্দুকধারী আর গোলন্দাজদের সারির কয়েক জায়গা ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়লো। এরপর জাটরা কাস্তে দিয়ে কাটার মতো করে কেটে মোগল বন্দুকধারীদের একটি সারির সৈন্যদেরকে রক্তাক্ত করে মাটিতে ফেলে দিল। তা সত্ত্বেও অন্য বন্দুকধারীরা উত্তেজিত হয়ে ইস্পাতের লম্বা দণ্ড দিয়ে তাদের বন্দুকে বারুদ আর গোলা ঢুকিয়ে আবার গুলি ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত হল। আবার কোথাও কোথাও জাট অশ্বারোহীদের তাড়া খেয়ে কিছু কিছু বন্দুকধারী অস্ত্র ফেলে দিয়ে পেছনের দিকে ঘুরে ছুটে পালাতে লাগলো। এ দৃশ্যটি দেখে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। লক্ষ করলেন পালাতে গিয়ে একজন বন্দুকধারী হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, তারপর সে আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই একজন জাট তার বর্শা দিয়ে তাকে গেঁথে ফেললো, উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে এই কাপুরুষের। তবে পদাতিক সেনারা কেন এটা বুঝতে পারে না যে, জ্বলন্ত চুল্লিতে ফেলা পাখির মত বর্শার ডগা দিয়ে অশ্বারোহী শত্রুরা তাদের বিদ্ধ করবে এই ভয়ে দুই হাত তুলে আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে প্রাণ ভয়ে পালানোর চেয়ে ওরা যদি একসাথে দাঁড়িয়ে অশ্বারোহীদের মোকাবেলা করতো তাতে ওদের জীবনের উপর তেমন ঝুঁকি ছিল না, বরং এতে সম্মান ছিল।

শুধু বন্দুকধারীই ছত্রভঙ্গ হয়নি, জাটরা গোলন্দাজ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কয়েকজন গোলন্দাজ সেনাকে মেরে কয়েকটি কামানও দখলে নিল। কয়েকজন শত্রু সেনা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সাথে আনা দড়ি দিয়ে কামানের নলের সাথে বেঁধে কামানের মুখ উল্টোদিকে ঘুরিয়ে মোগল সেনাদের দিকে কামান দাগার চেষ্টা করতে লাগলো। এত দ্রুত কেমন করে এত জাট

সৈন্য তার সেনাদের মধ্যে ঢুকতে পারলো? সম্ভবত ওরা একটি ঘোড়ার পিঠে দুজন করে সওয়ার হয়েছিল। যুদ্ধে সফল হবে এই ভেবে জাটরা দড়িসহ এসেছিল যাতে কামানগুলো হস্তগত করতে পারে।

লড়াইয়ের ময়দানের সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থা কোথায় তা দেখতে গিয়ে আওরঙ্গজেবের হৃতস্পন্দন বেড়ে গেল। তবে তিনি অবিচল থাকার চেষ্টা করলেন, ধীরস্থিরভাবে নড়াচড়া করলেন, কোন ধরনের অস্থিরতা প্রকাশ করলেন না, যাতে তাঁর হাবভাব দেখে তাঁর চারপাশের সৈন্যরা ঘাবড়ে না যায়। তাৎক্ষণিক বিপদটি টের পেলেন যখন দেখলেন কমলা রঙের রণবেশে একদল জাট অশ্বারোহী সেনা সংঘবদ্ধ হয়ে দ্রুত তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। এদের ঠিক মাঝখানে দুজন পতাকাবাহি সৈন্য বড় একটি কমলা রঙের পতাকা জোর হাওয়ায় পেছনে হেলে যাওয়া থেকে ধরে রাখার চেষ্ট করছে। লক্ষ করলেন এদের মাঝে ভারি গোঁফওয়ালা একজন লোক তাঁকে দেখিয়ে ইশারা করছে। এই লোক জাটদের নেতা গোকলা ছাড়া আর কেউ নয়।

হঠাৎ প্রথম সারির দুজন জাট অশ্বারোহী ঘোড়ার পাদানিতে দাঁড়িয়ে ওদের লম্বা নলের গাদা বন্দুক তাঁর দিকে তাক করলো। ওরা গুলি ছুঁড়তেই তিনি সাদা ধোঁয়া বেরুতে দেখলেন, তবে তিনি নড়াচড়া না করেই স্থির রইলেন, কেননা তিনি জানতেন তিনি ওদের বন্দুকের পাল্লা থেকে অনেক দূরে রয়েছেন। যুদ্ধের হট্টগোলের মধ্যে তিনি তাঁর হাতির কাঁধে বসা দুই মাহুতের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন, 'সামনে চল।' দুই মাহুতের মধ্যে পাকা চুলের বয়স্ক লোকটির সারা মুখ বসন্তের দাগে ভরা ছিল। সে আংকা—একটি ইস্পাতের দণ্ড দিয়ে হাতিটির গায়ে খোঁচা মেরে নিচু পাহাড় থেকে নেমে সমতলভূমিতে লড়াইয়ের ময়দানের দিকে নিয়ে চললো। শুঁড় তুলে হাতিটি উচ্চনাদ করে ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করলো। পাহাড়ের পাদদেশে নামতেই তাঁর অশ্বারোহী দেহরক্ষীবাহিনীর সদস্যরাও তাঁর চারপাশে কাছাকাছি অবস্থান নিল। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'সমস্ত বিজয় পতাকা উড়িয়ে দাও আর শিঙ্গা আর নাকাড়াবাদকদের আক্রমণের ইঙ্গিতসূচক নাকাড়া আর ভেরী বাজাতে বল। আমি আমার সৈন্যদের দেখাতে চাই যে, আমি শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য সামনে এগোচ্ছি। এতে তাদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে।' সবুজ পতাকাগুলো মেলে ধরতেই বাতাসে পতপত করে উড়তে শুরু করলো। সাথে সাথে ভেরী বেজে উঠলো আর শান্ত ঘোড়ার পিঠের দুইপাশে ঝুলানো শক্ত উঁটের চামড়ার ঢোলকের উপর দ্রুত কাঠির ঘা পড়তেই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো।

আওরঙ্গজেব তাঁর দেহরক্ষীদল নিয়ে গোকলার অশ্বারোহীদলটির দিকে এগোতে লাগলেন। তারপর আরেকজন জাট সেনা পাদানিতে দাঁড়িয়ে তার গাদা বন্দুক তাক করলো। এবার ওরা বন্দুকের পাল্লার মধ্যে ছিল। পাকাচুলো মাহুতটি শরীর মুচড়ে আওরঙ্গজেবের হাতির কাঁধ থেকে সামনের দিকে পড়ে গেল। তার সারা মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেল। দীর্ঘদিনের মাহুত মাটিতে পড়ে যেতেই হাতিটি একপাশে হেলে তার উপর পা ফেলা এড়াল। এতে হাওদাটি ভীষণভাবে দুলে উঠতেই আওরঙ্গজেব দুই হাতে হাওদার দুই ধার আঁকড়ে ধরে মাটিতে পড়ে যাওয়া সামলালেন। প্রায় সাথে সাথে দ্বিতীয় মাহুত প্রথম মাহুতের জায়গায় বসে হাতিটিকে স্থির করলো।
আওরঙ্গজেব তার পেছনে বসা খানসামাকে বললেন, 'শিগগির আমাকে একটা বন্দুক দাও।' লোকটি সাথে সাথে তাঁর হাতে একটি বন্দুক তুলে দিল। হাতির দাঁতের নকশা করা বাঁট শক্ত করে ধরে বেশ সাবধানে তিনি গোকলার দিকে লক্ষ স্থির করলেন। সে তখন তার বাঁকা তরোয়াল দিয়ে একজন মোগল দেহরক্ষী সেনার উপর কোপ মেরে চলছিল। আওরঙ্গজেব গুলি ছুঁড়তেই তাঁর দেহরক্ষীর ঘোড়াটি পেছনের দিকে লাফ দিতেই এর আরোহী মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে পড়ার আগে গোকলার তরোয়ালের আঘাতে সে আহত হল। আওরঙ্গজেবের গোলাটি গোকলাকে আঘাত না করলেও এটি পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ান আরেকটি ঘোড়ার মাথায় আঘাত করলো। সাথে সাথে ঘোড়াটি তার আহত আরোহীকে পিঠে নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। গোকলা তার ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে মাটিতে পড়ে পা ছুড়তে থাকা ঘোড়াটি এড়ালো, তারপর আওরঙ্গজেবের হাতির দিকে ঘোড়া ছুটাল। কঠোর চেহারার কয়েকজন জাট সেনা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তাকে অনুসরণ করলো।
আওরঙ্গজেব আবার খানসামাকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি আমার আরেকটা বন্দুক দাও।' লোকটি দ্রুত দ্বিতীয় বন্দুকটি তাঁর হাতে তুলে দিতেই তিনি আবার এর লম্বা নল বরাবর সতর্কতার সাথে লক্ষ্যস্থির করলেন। এমনসময় তাঁর হাতিটি মাটিতে পড়ে থাকা একটি মানুষের দেহের সাথে হোঁচট খেতেই আওরঙ্গজেবের ছোঁড়া গোলাটি এবার গোকলার কালো ঘোড়াটির ঘামে ভেঁজা দেহে আঘাত করলো। ঘোড়াটি মাটিতে পড়তেই গোকলা এক লাফে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে নামলো। মোগলদের তরোয়াল আর বন্দুকের হামলায় সে তার সমস্ত সঙ্গী হারিয়েছে। মাটিতে নেমেই সে তার কমলা রঙের আলখাল্লা উড়িয়ে বাঁকা তরোয়াল হাতে সামনের দিকে ছুটে চললো। লক্ষ্যবস্তু থেকে সে একশো ফুটের মধ্যে পৌঁছতেই আওরঙ্গজেব তাঁর রত্নখচিত খাপ থেকে

তরোয়াল বের করলেন। ঠিক তখনই তাঁর একজন দেহরক্ষী উজবেক সেনা ঘোড়ার পিঠ থেকে জাট নেতার উপর লাফিয়ে পড়লো। গোকলার হাত থেকে তরোয়াল পড়ে গেল আর মোগল সেনাটি তাকে টেনে মাটিতে ফেললো।
কয়েকমুহূর্ত লোকদুটো মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সুযোগমতো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিল। তারপর একসময় গোকলা তার কোমরের খাপ থেকে ছোরা বের করে উজবেক সেনাটির কুঁচকির গভীরে ঢুকিয়ে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতেই লোকটা কেঁপে উঠে দুই হাতে ক্ষতস্থান চেপে ধরলো। গোকলা কোনোমতে উঠে দাঁড়াল। চারপাশে তাকিয়ে সে বুঝলো সে এখন একা এবং শীঘ্রই তাকে মেরে ফেলা কিংবা বন্দী করা হবে। জাট নেতা হাত পেছনে দুলিয়ে হাতের ছোরাটি সোজা আওরঙ্গজেবের দিকে ছুঁড়ে মারলো। তার নিশানা খুব ভাল ছিল। ডগা উল্টিয়ে ছুরিটি সোজা উড়ে গেল, এবার আওরঙ্গজেব শরীরে একটা মোচড় দিয়ে সরে গেলেন। তারপরও ছুরিটি তাঁর বামকনুইয়ের নিচের অংশ ঘেসে পিছলে গেল। হাওদার একপাশে কাঠের কিনারায় ধপ করে বসে পড়ার আগে তিনি বাম হাতটি উঁচু করে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলেন।
আওরঙ্গজেবের বাম হাত আর দুই আঙুলের ফাঁক দিয়ে টপ টপ করে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো। এদিকে তাঁর দুই সৈনিক গোকলাকে দুদিক থেকে শক্ত করে চেপে ধরলো, তারপরও সে ছাড়া পাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগলো।
তিনি ওদেরকে বললেন, 'তাকে মেরে ফেলো না। পেছনে নিয়ে যাও। বিজয় নিশ্চিত করার পর আমি তার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেব। তাকে বন্দী করার খবর একবার ছড়িয়ে পড়লে আমাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে।
একজন সেনা কর্মকর্তা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'জাঁহাপনা, আপনার হাত কেটে গেছে, একটু অপেক্ষা করলে হত না, যাতে হাকিম ক্ষতস্থানটা পরিষ্কার করে একটা পট্টি বেঁধে দিতে পারেন।'
'না, সামান্য ছড়ে গেছে। তার চেয়ে বরং ওদের নেতা ধরা পড়ার পর ওদের মাঝে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, সে সুযোগটা এখন আমাদের নিতে হবে।'
ঘণ্টা দুয়েক পর সূর্য যখন মধ্যগগনে এসেছে আর বাতাস মাটি থেকে লাল ধুলি উড়িয়ে নিচ্ছিল, তখন দুইজন সিপাহি গোকলাকে ঠেলে নিয়ে এসে আওরঙ্গজেবের সামনে নতজানু করে বসালো। তিনি একটু দূরে সর্বাধিনায়কের লাল টকটকে তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে তিনি রাজকীয় আলখাল্লা পরেছেন আর হাকিম তার হাতের ক্ষতস্থান সেলাই করে নিখুঁতভাবে পট্টি বেঁধে দিয়েছিলেন। অবশ্যই তিনি ঠিক বলেছিলেন। গোকলা

বন্দী হবার খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে তার বেশিরভাগ সেনা লড়াই থামিয়ে পালিয়ে যেতে শুরু করলো। তবে পালবার সময়ও ওরা শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিল। আওরঙ্গজেব হতাশ হয়ে দেখলেন অধিকাংশ জাট সেনাই পালিয়ে গেছে, তিনি যে আশা করেছিলেন, দ্বিতীয় আরেকজনের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে ওরা আবার আক্রমণে ফিরে আসবে, তা আর হল না। তিনি তাঁর সৈন্যদের বললেন, জাটদের ধাওয়া করতে আর কোনো গ্রামবাসী যদি পলাতক কোনো জাট সেনা আশ্রয় দেয়, তবে পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে যেন আর কেউ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস না পায়।

আওরঙ্গজেব এবার গোকলার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি কেন আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলে সে সম্পর্কে তোমার সম্রাটকে তোমার কিছু বলার আছে?'

গোকলা তার ক্ষতবিক্ষত মুখ তুললো। তার বাহারি মোচ রক্ত মেখে জট পাকিয়ে গেছে তবে চাউনিতে এখনও নিঃশঙ্ক স্পর্ধা দেখা যাচ্ছে। সে বললো, 'আপনি আমাদের জীবন আর এখন আমাদের ধর্মের উপর যে অত্যাচার-অনাচার চালাচ্ছেন, তা থেকে আমার দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য আমি যা করণীয় করেছি। জাটদেরকে আপনার শাসন করার অধিকার আমরা স্বীকার করি না। আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল আপনাকে হত্যা করা। সেজন্য সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমি আমার লোকদেরকে পিছু হটতে দেই নি, আর সেজন্যই আমি সামনে এগোই। আমার কাছে আপনি অশুভের একটি প্রতিমূর্তি। যদি পৃথিবী থেকে আপনাকে সরিয়ে দিতে পারতাম, তবে আমার জীবনের বেঁচে থাকা সার্থক হত। তবে আমার একমাত্র গভীর দুঃখ যে, আমি ব্যর্থ হয়েছি।'

কথাগুলো বলার পর গোকলা দাঁড়াতে চেষ্টা করলো, তবে দুই প্রহরী তাকে আবার ঠেলে নিচে চেপে ধরলো।

আওরঙ্গজেব অতিকষ্টে রাগ সামলালেন। একজন সম্রাট হিসেবে একজন পরাজিত বিদ্রোহীর সাথে আর বেশিক্ষণ কথা বলাটা শোভা পায় না। সেরকম কিছু করার অর্থ গোকলা আর তার ঘৃণাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যা হওয়াটা ঠিক হবে না। তিনি বললেন, 'আমি নই, তুমি এখন মরবে। তোমার বিশ্বাসঘাতক দেহের প্রতিটি অঙ্গ আলাদা আলাদা করে কেটে টুকরোগুলো আগ্রা শহরের ফটকে ঝুলিয়ে রাখা হবে।' তারপর তাঁর পেছনে দাঁড়ান দেহরক্ষীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখুনি তাকে কোতল করার ব্যবস্থা কর। আর আমার নির্দেশ মতো সাথে সাথে তার দেহটির ব্যবস্থা নিতে বলবে। এই সাধারণ বিশ্বাসঘাতককে নিয়ে আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না, যতই সে উদ্ধত হোক।'

এইকথা বলে সম্রাট ধীরে ধীরে হেঁটে তাঁর লাল তাবুর দিকে ফিরে গেলেন, একবারও পেছন ফিরে গোকলার দিকে তাকালেন না। তাকে তখন প্রহরীরা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কোতল করার জন্য আর সে চিৎকার করে ছাড়া পাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগলো। আওরঙ্গজেব মন শান্ত হওয়ার পর ভাবলেন, বিজয়লাভের জন্য তাঁকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে। তারপর তাঁকে ভাবতে হবে কিভাবে অন্য ভয়ঙ্কর বিদ্রোহী শিবাজিকে ধরা যায়।

'রওশনআরা, তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম। আজকাল তোমার দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না।' জাহানারা ভাবলেন, সে নিশ্চয়ই শুনেছে আওরঙ্গজেব জাটদের পরাজিত করেছেন আর শীঘ্রই দিল্লি ফিরে আসছেন। তবে রওশনআরাকে দেখে খুব একটা খুশি মনে হল না। রঞ্জক দিয়ে লাল করা তার পাতলা ঠোঁটের রেখা আর চেহারা দেখে মনে হল বেশ চাপে রয়েছেন আর কোনো বিষয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছেন। জাহানারার পরিচারিকা তাকে একটা মিষ্টি খেতে সাধলেও তিনি হাত নেড়ে মানা করলেন। তারপর বসে চারপাশে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার ঘরটাতো আগের চেয়ে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। দেয়ালে ঝুলানো ঐ রেশমি পর্দাগুলো নতুন, তাই না? অবশ্য আওরঙ্গজেব তোমাকে সবচেয়ে ভালো জিনিস ছাড়া অন্য কিছু নিতে দেবেন না, তাই না?' কথাটা বলতে গিয়ে তার গলার স্বর ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

'রওশনআরা, তোমার কি হয়েছে বলতো?'

'এমন ভাণ দেখাচ্ছ যেন তুমি কিছুই জানো না!'

'সত্যি, আমি জানি না...বল না তোমার কি হয়েছে?'

রওশনআরা তার কোমরবন্ধে গুঁজে রাখা ভাঁজ করা একটি কাগজ টেনে বের করে বললেন, 'এটা! এটাই হল ব্যাপারটা!'

'কি এটা?'

ভাবাবেগে কাঁপতে কাঁপতে তিক্তকণ্ঠে রওশনআরা বললেন, 'আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে পাওয়া একটা চিঠি...সব দোষ তোমার! আমি জানি তার উপর তোমার কিরকম প্রভাব আছে। সে তোমাকে দাম দেয় আর শুধু তোমার কথা শুনে, কিন্তু তোমার কি দরকার ছিল তোমার পদবী ব্যবহার করে আমার ব্যাপারে নাক গলাবার? এখন এমন নির্দোষ সাজার চেষ্টা করো না। আমাকে তুমি বোকা বানাতে পারবে না। আমি ঠিক জানি তুমি কি করেছ... আওরঙ্গজেবকে আমার সম্বন্ধে নানারকম গল্প বলেছ।'

'তুমি কি বলছো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'জানো না? আওরঙ্গজেব যখন তোমাকে দরবারে ফিরিয়ে নিয়ে এল আর তুমি আমার জায়গাটা দখল করে পাদিশাহ বেগম হলে, একবারও আমার কথা ভাবলে না যে, আমি কি ভাবতে পারি...আমি...'

'রওশনআরা, আমি জানি এটা তোমার জন্য কষ্টকর হয়েছিল। বিষয়টা নিয়ে আমার উচিত ছিল তোমার সাথে আরো কথা বলা, কিন্তু আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি যে কি বলবো, সত্যি বলতে কি আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আর একই সাথে কখনও ভাবিনি যে তুমি এতটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে—।'

রওশনআরা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কেন এটা হয়েছিল? আমি বলছি শোন! তুমি ধরে নিয়েছিলে, যেরকম দারাও সবসময় মনে করতেন যে, সবার বড় হওয়ার কারণে সমস্ত সম্মান তোমার প্রাপ্য আর বাকি আমাদের সাথে ছোট বাচ্চা মনে করে সেরকম ব্যবহার করবে, যখন ইচ্ছা একটু খাতির করবে...'

ভাইয়ের কথা বলতেই জাহানারা অন্যদিকে মুখ ফেরালেন, যাতে তার বোন তার চেহারায় কষ্ট আর রাগ দেখতে না পায়। আওরঙ্গজেবের উত্থানকে রওশনআরা যেভাবে বর্ণনা করছিল, তাতে মনে হচ্ছিল এটা ভ্রাতৃঘাতী লড়াই নয়, যা রক্তপাত আর মৃত্যু ঘটিয়েছিল বরং এটা বাচ্চাদের একটা ঝগড়া। রওশনআরা সবকিছুকে একটা সংকীর্ণ, আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করতেন— হয়তো এছাড়া তার আর উপায় ছিল না, তাছাড়া তিনি স্পষ্টতই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আছেন। নিজের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে এনে জাহানারা তার বোনের কাছে হাঁটুগেড়ে বসে তার হাত ধরার চেষ্টা করলেন, তবে রওশনআরা তার দুহাত শক্ত করে নিজের কোলে ভাঁজ করে রাখলেন।

জাহানারা শান্তস্বরে বললেন, 'যত ইচ্ছা আমার সমালোচনা কর, তবে দারাকে নয়। তিনি এখন মৃত আর তুমি জান তিনি আমাকে কতটা আপন ভাবতেন...' তারপর বলতে চাচ্ছিলেন, *'তোমাকেও তাই ভাবার কথা; কেননা তিনি তোমারও ভাই ছিলেন'*, কিন্তু তার বদলে বললেন, 'এখন বলতো, একটু আগে যে আমাকে দোষ দিলে, আমি তোমার ব্যাপারে নাক গলিয়েছি, একথাটার মানে কি?'

'আওরঙ্গজেব অভিযানে যাওয়ার ঠিক আগে আমি তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তুমি জানো নিশ্চয়ই সেটা।'

'না জানি না, তারপর বল।'

'আমি তাকে বলেছিলাম আমার পদবী কেড়ে নিয়ে সে আমার মনে কতটা কষ্ট দিয়েছে। সে বললো সে সেটা বুঝতে পেরেছে...তাই সে আর তুমি দুজনে মিলে আমার জন্য অন্য কোনো দায়িত্ব দেবে...সে আমাকে মূল্য দেয় আর আমাকে ভালোবাসে। আমি তার কথা বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু এখন দেখলাম কথাগুলো সে আসলে সেই অর্থে বলেনি...কোনোটাই না!' রওশনআরার কপালে একটা শিরা দপদপ করতে লাগলো, চোখে পানি এসে গেছে।

'কেন নয়?'

'কারণ তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমার মতো দুর্গের ভেতরে আমিও একটা মহল পেতে পারি কি-না। সে কথা দিয়েছিল বিষয়টা বিবেচনা করবে...এমনকি এও বলেছিল কোনটা আমার জন্য ভালো হবে...তারপর দ্যাখো আজ একজন সংবাদবাহক এই চিঠিটা নিয়ে এসেছে, যাতে আওরঙ্গজেব লিখেছে সে আমার কথা রাখতে পারবে না। তোমার মতো আমাকে নিজস্ব আলাদা মহল দিয়ে সে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে নাকি খবর পেয়েছে যখন সে দূরে ছিল, তখন আমি মদের আসর বসিয়েছিলাম। আরো জানাল বেশ কিছুদিন আগে থেকে সে জানতো যে আমি মদ খাই—তবে এ বিষয়ে সে চোখ বুজে রাখতে চেয়েছিল, তবে ইদানীং আমার বাড়াবাড়ি করার খবর পেয়েছে—একদিন না-কি আমাকে বেঁহুশ অবস্থায় বিছানায় বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল আর এতেই সে সিদ্ধান্ত বদলেছে। সে আমাকে মদ খেতে সম্পূর্ণ নিষেধ করেছে আর বলেছে, আমি যেন কখনও আলাদা মহলের জন্য আর তাকে অনুরোধ না করি! কিন্তু সবচেয়ে খারাপ যে বিষয়টা তা হচ্ছে ...'

দাসিরা সবাই কামরা থেকে বের হয়ে গিয়েছিল আর ওরা একা ছিলেন। তারপরও রওশনআরা গলা নামিয়ে কথা বলছিলেন আর জাহানারা তার খুব কাছে এসে কথাগুলো শুনছিলেন। 'সে বললো, সে না-কি শুনেছে আমার গোপন প্রেমিক আছে। সে আমাকে সতর্ক করে বললো, যদি কেউ তাকে এর প্রমাণ দিতে পারে তাহলে ভয়াবহ পরিণতি হবে আর আমাকে জানাল, সে আমার কয়েকজন চাকরকে সরিয়ে দিয়ে তার বিশ্বস্ত লোকদের সে জায়গায় বহাল করবে, যারা তাকে আমার সমস্ত গতিবিধির খবরাখবর তাকে জানাবে। এটা অনেকটা কারাগারের মতো হয়ে দাঁড়াবে আর এর সবকিছু তোমার কীর্তি। তুমি আমাকে শাস্তি দিতে চাও, কেননা আমি তোমার পক্ষে দাঁড়াই নি। তুমি আসার আগে আওরঙ্গজেব আমাকে বিশ্বাস করতো...আমার উপর নির্ভর করতো ...আর এখন সবকিছু বদলে গেছে।' রওশনআরা এখন ফিসফিস করা

ছেড়ে কর্কশকণ্ঠে জাহানারাকে দোষারোপ করে কথা বলছিলেন। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আওরঙ্গজেব যখন ফিরে আসবে, তখন তুমি তার কাছে গিয়ে বলবে যে, তুমি যা বলেছো তা সত্যি নয়...কোনোটাই নয়!'

তার বোন তাকে এভাবে দোষারোপ করায় জাহানারা হতভম্ব হয়ে ভাবতে শুরু করলেন। কি করে তিনি তাকে বোঝাবেন যে, এগুলো কোনোটাই তার কাজ নয়? অবশেষে তিনি বললেন, 'আমার কথা শোন। তুমি নিশ্চিত হয়ে ভেবেছ যে, আওরঙ্গজবের চোখে আমি তোমাকে খারাপ দেখাতে চাই, তবে আসলে এটা আমি কখনও চাই না। আগ্রা দুর্গে এতগুলো বছর বাবার সেবায় একাকী কাটাবার সময়, শুধু জানি আমার সঙ্গী ছিল। তখন আমি সব সময় আমাদের সেই দিনগুলোর কথা ভাবতাম, যখন আমরা সবাই একসাথে মিলে হাসিখুশি আর আনন্দে দিন কাটাতাম। সেই সময়গুলো আর ফিরে আসবে না, যেমন মৃতও আর জীবিত হয় না। তবে তখন আমি বিশ্বাস করতাম আর এখনও করি যে, এককালে আমরা যেরকম ছিলাম তার কিছুতো উদ্ধার করতে পারি। সেজন্যই আওরঙ্গজেব যখন আমাকে দরবারে আসতে বললো, তখন আমি তার কথায় রাজি হলাম, যদিও আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। আমি আর কোনো বিভক্তি চাই না—আমি সমস্ত ক্ষত নিরাময় করতে চাই যাতে, শাহজাহান আর মমতাজের আর যেসব ছেলেমেয়ে আছে তারা যেন একটি পরিবার হয়ে থাকে।'

রওশনআরা এখন তাঁর কান্না থামিয়ে একাগ্র হয়ে জাহানারার দিকে তাকাল। এবার একটু সাহস করে জাহানারা আবার রওশনআরার হাত ধরতে চাইলে তিনি বাধা দিলেন না।

'বোন, আমি আমার মায়ের জীবনের কসম খেয়ে বলছি, আওরঙ্গজেব তোমার সম্বন্ধে যা যা শুনেছে তা আমি বলি নি। তবে এ ধরনের গুজব শোনার পর সে এরকম কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখাতে আমি অবাক হইনি। তুমি লক্ষ করনি সে কিরকম বদলে যাচ্ছে? ধর্মীয় বিশ্বাসে সে সবসময় গোঁড়া আর কঠোর নীতিপরায়ণ ছিল, তবে এখন—যা, আমার মনে হচ্ছে সমস্ত দুনিয়াই দেখতে পাচ্ছে—এগুলো আরো কঠোরতা আর সমস্ত কিছু ব্যাপী হচ্ছে। যেটাকেই সে ইসলামের সঠিক পথ মনে করছে, তাতেই সে আরো কঠোরভাবে লেগে থাকছে। আমি বিশ্বাস করি তার ভাবনা ঠিক নয়। আমি তাঁকে বার বার বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, এটা একটা বিপজ্জনক পথ। এটা খুবই সংকীর্ণ, এতে কোনো ধরনের আপস করার সুযোগ নেই আর এটি মানুষের দুর্বলতাকে কোনো ধরনের ছাড়ও দেবে না। কিন্তু সে আমার কথা শুনেনি—তুমি হয়তো

ভেবেছ তার উপর আমার খুব প্রভাব আছে, কিন্তু আসলে তা না। এখন যে সে তোমার উপর এত কঠিন হচ্ছে, এর কারণ তোমার আচরণ সম্পর্কে সে যা শুনেছে, তার মতে এটা আমাদের ধর্মবিশ্বাসের নীতির সাথে খাপ খায় না। তুমি দ্যাখো সে কিভাবে গানবাজনা বাদ দিয়েছে, কারণ সে মনে করে এটা যে আনন্দ দেয় তা আত্মপ্রশ্রয়ী আর সেই কারণে এটা শোনা গুনাহ। তবে এসবের মানে এই নয় যে আওরঙ্গজেব তোমাকে ভালোবাসে না...সে মনে করে সে যা করছে তা তোমার ভালর জন্যই করছে।'

জাহানারা তার হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই, রওশনআরা গাল থেকে ঘসে চোখের পানি মুছলেন। তারপর গলায় ঝুলানো একটা রিবন থেকে দামি পাথর বসানো ছোট্ট আয়নাটা নিয়ে মুখ পরীক্ষা করলেন। লেপ্টে যাওয়া সুর্মার দাগ মুছে উঠে দাঁড়ালেন। জাহানারা ভাবলেন, তিনি কি তাঁর বোনকে বুঝাতে পেরেছেন? তবে একটা কথা তাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে হবে। মদ খাওয়া একটা ব্যাপার তবে একজন শাহজাদির গোপন প্রণয়ী নেওয়াটা ...তাদের পূর্বপুরুষদের যুগে এ ধরনের ঘটনায় সাথে সাথে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হত। এমনকি এখনও ধর্মের ব্যাপারে আওরঙ্গজেব যেরকম কঠোর মনোভাব দেখাচ্ছে, সেক্ষেত্রে কে জানে সে কি করে ফেলবে, যদি হাতে-নাতে রওশনআরাকে পরপুরুষের সাথে অশোভন অবস্থায় ধরে ফেলে? তাঁকে অবশ্যই তাঁর বোনকে সাবধান করতে হবে, তবে কথাগুলো বলার সময় তাকেও বুঝে শুনে বলতে হবে। হয়তো তিনি রওশনআরাকে বুঝাতে পেরেছেন যে, তাঁর ভাই তাঁর সম্পর্কে যা যা শুনেছে, তা জাহানারা বলেন নি, তবে এর মানে এই নয় যে তাঁর প্রতি রওশনআরার বৈরি মনোভাব কেটে গেছে। বিশ্বাস অর্জন তো অনেক দূরের কথা।

'রওশনআরা, একটা কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। আমার কথায় কিছু মনে করো না, তবে তুমি কিন্তু বলেছো যে, আওরঙ্গজেব গুজব শুনেছে যে তোমার গোপন প্রণয়ী আছে। আচ্ছা...তুমি কি এমন কিছু করেছ যে কারণে লোকে হয়তো ভাবতে পারে যে বিষয়টা আসলেই তাই?' রওশনআরা তাঁর দিকে তাকালেন তবে কিছুই বললেন না আর জাহানারার মনটা দমে গেল। তিনি আবার বললেন, 'রওশনআরা—দয়া করে...'

'দয়া করে কি বলবো? তোমাকে এমন কথা বলবো যা তোমার বিষয় নয়? যদি আমার গোপন প্রেমিক থাকেও—এর মানে বলছি না যে আছে—আর থাকলেই বা কি? মোগল সম্রাটের কন্যারা যেহেতু বিয়ে করতে পারে না, তার মানে এই নয় যে তারা জীবনের আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবে—এরকমভাবে

আমার দিকে তাকিও না। তুমি কে বিচার করার? তুমি আর তোমার সেই ইংরেজ—নিকোলাস ব্যালেনটাইনের ব্যাপারটাই বা কি? তুমি তো সবসময় ভাণ করতে যে তুমি একেবারে শুদ্ধ, কিন্তু আমি জানি তুমি করতে। আর সেজন্য আমি বাবাকে কথাটা বলেছিলাম, তবে একারণে নয় যে ব্যাপারটা আমি অনুমোদন করি না। তুমি একজন ভণ্ড-তপস্বী ছিলে, তাই তোমাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম। এখনও যেরকম হয়েছে!'

'রওশনআরা তুমি বুঝতে পারছো না...আমি এখানে কোন বিচার করতে বসি নি, আমি শুধু তোমাকে সাহায্য করতে চাচ্ছি। তোমাকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে...'

কিন্তু তাঁর বোন তাঁর কথায় কান দিলেন না। বরং তিনি পেছনে ঘুরে কামরা থেকে বের হয়ে গেলেন। জাহানারা তাঁর বোনের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তবে একমুহূর্ত পর তিনি আর তাঁর বোনের রাজকীয় অবয়বটা দেখছিলেন না, তাঁর চোখে তখন ভেসে উঠেছে একটি যুবকের চেহারা। চুল আর গায়ের রঙ গমের মত আর চোখ দুটো গ্রীষ্মের আকাশের মত নীল। রওশনআরা ভুল বলেছিলেন। তিনি আর নিকোলাস প্রেমিক-প্রেমিকা ছিলেন না। তবে দুজনের মাঝে বিচ্ছেদের পর এতগুলো বছরে তিনি কখনও তার কথা ভুলতে পারেন নি আর ভাবতেন অন্য জীবনে কি হবে কে জানে...'

বাদামি ঘোড়ায় চড়ে আওরঙ্গজেব লাহোর দরজা দিয়ে দিল্লির লালকেল্লায় প্রবেশ করলেন। তাঁর আগে আগে চলা দেহরক্ষীবাহিনীর বুকের বর্মে বিকেলের রোদ ঠিকরে পড়ে ঝিকমিক করছিল, মূল সেনাবাহিনী আরো পেছনে রয়েছে। জাটদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করায় তিনি নীরবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। কিছুক্ষণ পর সূর্য দিগন্তের নিচে ডুবে যাওয়ার পর তিনি হাতির পিঠে চড়ে শহরের রাস্তা দিয়ে জামে মসজিদে গিয়ে আন্তরিকতার সাথে নামাজ আদায় করবেন। সাদা কারুকাজ করা বেলে পাথরের মসজিদটি পুরো সাম্রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আর সবচেয়ে বড়। তাঁর বাবা শাহজাহানের আমলে পাঁচহাজার শ্রমিক আর কারিগরের ছয় বছর লেগেছিল এটা নির্মাণ করতে আর দশ লক্ষ রুপিরও বেশি খরচ পড়েছিল। এটি তাঁর বাবার এমন একটি কীর্তি যার জন্য তিনি সত্যি গর্ববোধ করেন।

আওরঙ্গজেব ঘোড়া নিয়ে কেল্লার বিশাল আঙিনায় ঢুকলেন। পরে তিনি তার সেনা কর্মকর্তাদের ডেকে এনে পুরস্কারস্বরূপ, টাকা, ঘোড়া, সুন্দর তরোয়াল

আর সম্মানসূচক আলখাল্লা বিতরণ করবেন, যারা গোকলার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে বিশেষ বীরত্বসূচক অবদান রেখেছিল। তবে এখন তাঁর মন কেবল উদিপুরী মহলের দিকে কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে, যিনি মাত্র চার দিন আগে তাঁকে একটি পুত্র সন্তান উপহার দিয়েছেন। এটা আরেকটি শুভ লক্ষণ যে, উপর থেকে তাঁর উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে।

তিনি হেরেমে ঢুকতেই একটার পর একটা দরজা খুলে গেল আর তাঁর কানে বাজতে লাগলো, 'সম্রাট আসছেন' চিৎকারটি। রওশনআরার মহলে ঢোকার দরজার কাছাকাছি পৌঁছার পর তিনি সেখানে দাঁড়ালেন না। এখন তাঁর বোনের সাথে দেখা করার ইচ্ছা নেই আর তিনি হয়তো সেখানে নেই। খুব সম্ভব অন্যান্য বোনদের সাথে তিনি এখনও জালি দেওয়া বেলকনিতে রয়েছেন, যেখান থেকে রাজকীয় মহিলারা তাঁর আনুষ্ঠানিক আসা-যাওয়া লক্ষ করতে পারেন। তবে উদিপুরী তাঁর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন...

মহলে ঢুকতেই তিনি গোলাপ আতরের খুশবু পেলেন, এটা উদিপুরী মহলের প্রিয় সুগন্ধি, ঠিক যেরকম তাঁর মা মমতাজের তা ছিল। দরজার বাইরে হেরেমের দাঁড়ান পরিচারকের প্রতি ইশারা করে তাকে চলে যেতে বলে তিনি ভেতরের কামরায় ঢোকার দরজা ঠেলে খুললেন। চৌকাঠে পা দিয়েই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। উদিপুরী কৌচের উপর আধশোয়া হয়ে রয়েছেন। লম্বা কালো চুল কাঁধের উপর এসে পড়েছে আর তিনি একমনে তাঁর বাচ্চার দুধ খাওয়া দেখছেন। সেই সুদূর ককেশাস পর্বত এলাকায় তাঁর নিজ দেশ জর্জিয়ায় যত উচ্চ পরিবারেরই হোন, কোনো মা তার বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবার জন্য ধাত্রী রাখেন না। কি সুন্দর দৃশ্যটি—মা আর তাঁর সন্তান তাঁর মায়ের নীল শিরাওয়ালা শুভ্র মসৃণ স্তন থেকে দুধ চুষে খাচ্ছে।

তাঁকে দেখেই উদিপুরীর দুচোখে খুশির ঝলক দেখা দিল। তিনি বললেন, 'আওরঙ্গজেব আসুন, আপনার ছেলেকে দেখুন।' পাতলা কালো চুলের ছোট্ট মাথাটা কোলে ধরে তিনি শিশুটিকে বুক থেকে সরিয়ে নিয়ে আওরঙ্গজেবের দিকে তুলে ধরলেন। দুধ খাওয়া থেকে সরিয়ে নিতেই শিশুটি ছোট ছোট পাগুলো ছুঁড়তে ছুঁড়তে কান্না জুড়ে দিল। আওরঙ্গজেব তাকে কোলে নিলেন।

তিনি উদিপুরীর দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বললেন, 'আমি এর নাম দিতে চাই কম বক্স। মোল্লারা বলেছে এই নামটি শুভ। তুমি খুশি তো এই নামে?'

উদিপুরী ঘাড় কাত করে সায় দিলেন।

কম বক্সের ছোট্ট নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকাতেই আওরঙ্গজেব আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন, তার দম বন্ধ হয়ে এল। পৃথিবীর অশুভ কোনো কিছুর ছোঁয়া এই

শিশুটির গায়ে এখনও লাগেনি। এই ছেলেটি তার অন্যান্য ভাইদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, হয়তো—বৃদ্ধবয়সে এই ছেলেই তাঁর অবলম্বন হবে। তবে একমাত্র আল্লাহই জানেন ভবিষ্যতে তার নিজের আর এই শিশুটির কপালে কি লেখা আছে। তবে তিনি প্রার্থনা করলেন যেন কম বক্সের প্রতি তাঁর অনুভূতি সবসময় যেন এরকমই থাকে। ছেলেটি যেন কখনও জানতে না পারে, শীতলতা আর প্রত্যাখ্যানের কষ্ট, যা তিনি নিজে তাঁর বাবার হাতে সহ্য করেছিলেন।

অধ্যায় : পাঁচ

জাদুকরী রওশনআরা

'জাঁহাপনা শীঘ্র উঠুন, খাজাসারা—খোজা এখুনি আপনার বোন রওশনআরার ঘরে যেতে আপনাকে অনুরোধ করেছেন।'

আওরঙ্গজেব টের পেলেন, উদিপুরী তাঁর পাশেই নড়ে উঠলেন। জোর করে দুচোখ খুলে তিনি পিটপিট করে তাকিয়ে দেখলেন হেরেমের পরিচারক একটা মোমবাতি উঁচু করে ধরে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে?'

'তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, জাঁহাপনা।'

'আমি এখুনি যাচ্ছি।' তাড়াতাড়ি উঠে, আরেকজন পরিচারকের বাড়িয়ে ধরা আলাখাল্লা গায়ে জড়িয়ে তিনি হেরেমের নীরব করিডোরের মধ্য দিয়ে হেঁটে রওশনআরার ঘরের দিকে চললেন। কচ্ছপের খোলের মতো কারুকাজ দরজাটি হাট করে খোলা রয়েছে। ভেতরে জাহানারা, গওহরা আর কয়েকজন মহিলা ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দুজন পাগড়িপরা হেকিম রওশনআরা যে বিছানায় শুয়ে রয়েছেন, তার উপর ঝুঁকে রয়েছেন। আওরঙ্গজেব সামনে এগোতেই কাঁপা কাঁপা মোমবাতির আলোয় তাঁর দীর্ঘ দেহের ছায়া ফেললো। ভারি কাঁচের চশমাপরা বয়স্ক হেকিমটি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং বুকে এক হাত রেখে তাঁকে সম্মান জানালেন। আওরঙ্গজেব দেখলেন অন্য কমবয়সি চিকিৎসকটি তাঁর বোনের ডান কব্জির কাছে একটি ইস্পাতের পাত্র ধরে রয়েছেন তাতে উজ্জ্বল লাল ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ধরছেন।

আওরঙ্গজেবের বিশ্বাসই হচ্ছিল না, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এনার কি হয়েছে? খুব খারাপ কিছু হয়েছে?' তাঁর যতদূর মনে পড়ে ছেচল্লিশ বছরের জীবনে তিনি একদিনের জন্যও রওশনআরাকে তেমন অসুস্থ হতে দেখেন নি।

'আমরা এখনও কোন কিছুতে নিশ্চিত হতে পারি নি, জাঁহাপনা। মাত্র কয়েকমিনিট আগে আমরা এসেছি। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি তাঁর শরীরের তাপমাত্রা খুব বেড়ে গেছে আর তিনি একটু পর পর

জ্ঞান হারাচ্ছেন। হৃৎস্পন্দনও খুব দ্রুত হচ্ছে। হৃৎস্পন্দনের গতি কমাবার জন্য আমি আমার সহকর্মীকে সামান্য রক্ত বের করতে বলেছি। তাছাড়া তাকে শান্ত করে জ্বর কমাবার জন্য আফিম গাছের রস দিয়ে একটা নির্যাস বানিয়েছি।'

আওরঙ্গজেব বিছানার অন্যপাশে হাঁটুগেড়ে বসে রওশনআরার বামহাতটি তাঁর নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'রওশনআরা...' হাতটা খুব ভারী আর প্রাণহীন মনে হলো যেন, তাঁর আত্মা তার দেহ ছেড়ে চলে গেছে। রওশনআরার দুচোখ বন্ধ আর হেকিমরা যেরকম বলেছিলেন, ঘামে ভেজা পাতলা চাদরের নিচে তাঁর বুক দ্রুত উঠানামা করছিল। তিনি তাঁর হাতটা একটু মুচড়ে ধরতেই রওশনআরার দুচোখের পাতাগুলো তিরতির করে কেঁপে উঠলো। 'রওশনআরা এটা আমি ...আওরঙ্গজেব।'

ধীরে ধীরে মনে হল অনেক কষ্ট করে রওশনআরা চোখ খুললেন। তাঁর দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে একটু বিভ্রান্ত মনে হচ্ছিল। তিনি কোনোমতে বললেন, 'আওরঙ্গজেব...এটা কি আসলেই তুমি?'

'হ্যাঁ অবশ্যই আমি। তুমি এখনও অসুস্থ বোন। হেকিমসাহেবরা এসেছেন, ওরা বলেছেন শীঘ্রই তোমাকে সুস্থ করে তুলবেন।' কথাটা বললেও তাতে খুব জোর ছিল না, এমনকি নিজের কানেও তেমন মনে হল না। হেকিমরা না বললেও তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে তাঁর বোন খুবই অসুস্থ—এটা তাঁর চেহারা দেখে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে।

'আওরঙ্গজেব...আমি তোমার সাথে একটু একা কথা বলতে চাই। দয়া করে অন্যদেরকে চলে যেতে বল।'

আওরঙ্গজেব পেছন ফিরে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা দলটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দয়া করে কিছুক্ষণের জন্য আমাদেরকে একা রেখে আপনারা বাইরে যান।' তারপর হেকিম দুজনের দিকে মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনারাও একটু বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।' তরুণ চিকিৎসকটি তখন মাত্র রওশনআরার রক্ত নেওয়া শেষ করেছিলেন। এখন তিনি সাদা মসলিনের কাপড় দিয়ে দ্রুত রওশনআরার হাতে একটা পট্টি বেঁধে দিলেন, তারপর যন্ত্রপাতির চামড়ার ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে অন্যান্যের অনুসরণ করে বাইরে চলে গেলেন।

'এখন আমরা একা, রওশনআরা বল।'

তিনি আবার চোখ বুঁজলেন। আওরঙ্গজেব তাঁর মুখের উপর থেকে মেহেদি রং করা একগুচ্ছ চুল টোকা দিয়ে সরিয়ে দিতেই রওশনআরা আবার কথা বলা শুরু করলেন। তবে এত আস্তে বলছিলেন যে, কথাগুলো শোনার জন্য

আওরঙ্গজেব তার কাছে আরেকটু ঝুঁকলেন। কি বলতে চাচ্ছেন তিনি? আওরঙ্গজেবের মনে হল তিনি শুনতে পেলেন, 'আমি দুঃখিত...খুবই দুঃখিত... আমি এটা বুঝাতে চাই নি...তোমাকে বুঝতে হবে।'

'রওশনআরা অস্থির হয়ো না। চুপ করে শোও।'

'না, আমাকে বলতেই হবে. ' এবার তার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার হল আর তিনি চোখ খুললেন। কোনোমতে শক্তিসঞ্চয় করে নিজেকে একটু উপরের দিকে উঠিয়ে বালিশে হেলান দিলেন। তারপর একটু দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'আওরঙ্গজেব, দয়া করে আমার কথা শোন। আমি জানি আমি... আমি তোমাকে হতাশ করেছি। কিন্তু আমার কিছুই করার ছিল না...আমি মদ খেয়েছিলাম, কেননা এতে আমি আনন্দ পেয়েছিলাম। আর আমি তোমার সাথে প্রতারণা করবো না, এমন একসময়ে যখন মৃত্যু আমার কাছে চলে এসেছে... দুই-একবার আমি গোপন প্রণয়ী নিয়েছিলাম, ঠিক যা তুমি সন্দেহ করেছিলে। খুব কঠিনভাবে আমাকে বিচার করো না... আমি শুধু চেয়েছিলাম কেউ আমাকে নিয়ে ভাবুক... কারও কাছাকাছি হতে চেয়েছিলাম... একটু উষ্ণতা অনুভব করতে চেয়েছিলাম। যাইহোক আমি চেষ্টা করেছিলাম—এমনকি যখন জাহানারা বাবার সাথে আগ্রা দুর্গেছিলেন আর আমি ছিলাম তোমার পাশে। যদিও আমার মনে সন্দেহ ছিল তোমার আসলে আমাকে প্রয়োজন নেই কিংবা আমার ব্যাপারে তোমার কোনো মাথাব্যথা নেই। তোমার জন্য এতকিছু করার পরও তুমি শুধু আমাকে সয়ে করে গেছ। এটা ঠিক নয়, আওরঙ্গজেব। এমনকি জাহানারা মুক্ত হওয়ার আগেও আমি অনুভব করেছি যে তুমি আমাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছ, যেন আমার কোনো গুরুত্ব নেই। আমি একা হয়ে পড়লাম, যেরকম প্রায় সারাজীবন ছিলাম—মা মারা যাওয়ার পর থেকে। এরকম ভাবা কি ভুল ছিল? আমার মনে হচ্ছে আমার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে...আমার মনে হয় আমার আর বেশি সময় নেই। আমি কী জাহানারার মতো তোমার কাছে আপন? দয়া করে বল?'

আওরঙ্গজেব হতবাক হয়ে গেলেন, তার মুখে কোনো কথা জোগাল না। তাহলে গোপন প্রেমিক নেবার কথাটা তাহলে সত্যি...তিনি বুঝতে পারলেন তিনি আর রওশনআরার কপালে হাত বুলাচ্ছেন না। তাঁর যন্ত্রণাকাতর মুখ দেখে অনেক চেষ্টার পর এক হাত বাড়িয়ে আবার তাঁর কপাল ছুঁলেন। এমনকি যে সময়ে তাঁর নিজের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা, তখনও তাঁর মনে জাহানারার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। তাঁকে মিনতি করছেন বলার জন্য যে, জাহানারা নয় তিনিই তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই

পৃথিবীতে তাঁর শেষ মুহূর্তে হয়তো কয়েকটি মিষ্টি কথা তাকে শান্ত করবে, তবে তিনি মিথ্যা কথা বলতে পারবেন না, বলবেনও না, বিশেষত সেই নারীকে যে এমন ঘোরতর পাপ করেছেন।

রওশনআরা স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁকে কিছু একটা বলতেই হবে।

তিনি বললেন, 'রওশনআরা, তুমি সম্পূর্ণ ভুল ভেবেছ যে, আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ নই। আমি অবশ্যই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। সেই শুরু থেকেই আমার সংগ্রামের দিনগুলোতে তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছ যখন খুব কম লোকই তা করেছিল। আর হ্যাঁ, আমি অবশ্যই তোমাকে ভালোবাসি... একথাটা জিজ্ঞেস করার দরকার পড়ে না। আমি...' একটা মুহূর্ত তিনি অনুভব করলেন তিনি দুর্বল হয়ে বলতে যাচ্ছিলেন সেই কথাটা, যা রওশনআরা তার মুখ থেকে শুনতে চাচ্ছিলেন। তারপর নিজের মনকে শক্ত করে বললেন, 'আমাকে এখন যেতে হবে। তবে আমি তোমার আরোগ্যলাভের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চাইবো, আমার মোল্লাদেরকেও দোয়া করতে বলবো।' এক টুকরা কাপড়ের কোণা গোলাপজলে ভিজিয়ে তাঁর মুখ থেকে ঘাম মুছলেন তারপর তাঁর কপালে একটা চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোলেন।

'আওরঙ্গজেব...'

তিনি তাঁর ক্ষিণ কণ্ঠের ডাক শুনলেন, তবে আর ফিরে তাকালেন না। আর কি বলবেন তাকে? তিনি তাঁর বোন এবং তিনি তাঁকে ভালোবাসেন, তবে এর বেশি আর তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারেন না। তাঁর নিজের কথাতেই তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি একজন পাপী।

পাশের ছোট ঘরটিতে সবাই অপেক্ষা করছিলেন, জাহানারা একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁর একহাত ধরে বললেন, 'তাঁর অবস্থার কোনো ধরনের পরিবর্তন হলে আপনি সাথে সাথে আমাকে খবর দেবেন।' জাহানারা মাথা কাত করে সায় দিলেন। মহিলারা সবাই আবার রোগীর কামরায় ঢুকতেই তিনি সেখান থেকে বের হয়ে উদিপুরীর মহলে না গিয়ে তাঁর নিজের কামরায় গেলেন। তিনি কথা দিয়েছিলেন, তাই সেখানে পৌঁছে মার্বেল পাথরের মেঝেতে জায়নামাজ বিছিয়ে রওশনআরার জন্য নামাজে বসলেন। যখন নামাজ শেষ করলেন, একটুকরো সোনালি আলোর ছটা জানালার খড়খড়ি দিয়ে ভেতরে এসে পড়লো। মুখে সূর্যের আলোর প্রয়োজন অনুভব করে তিনি বারান্দায় বের হয়ে এলেন। দিগন্তের উপর সূর্যের সোনালি চাকাটি উঠে আসতেই নতুন একটি দিনের শুরু হল। একটু সময় তিনি নিবিষ্টভাবে

অবলোকন করলেন, যে দিল্লি নগরী তাঁর সামনে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রথম উনানের ধুঁয়া চক্রাকারে ভোরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

একটুপরই তাকে সভাসদের সাথে আলোচনায় বসতে হবে। বোনের এমন অসুস্থতা তার উপর তাঁর লজ্জানক স্বীকৃতির কথা বাদ দিলেও, রাজকাজে মন বসাতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু দায়িত্ব পালন করতেই হবে। এটা তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্য, তাছাড়া আরো কিছু জরুরি বিষয় নিয়ে তাঁকে কথা বলতে হবে। বিশেষত হিন্দু কৃষক আর ছোট ছোট বণিকদের ভিন্ন মার্গের এক সম্প্রদায়ের খবর এসেছে, যারা ভিনদেশী প্রথা অনুসরণ করে, তাঁর একজন সুবেদার সতর্কবার্তা পাঠিয়ে জানিয়েছে যে, এরা প্রজাবিদ্রোহ প্রচার করছে।

ভেতর গিয়ে সুবেদারের পাঠানো প্রতিবেদনটি তুলে নিলেন, যাতে মন্ত্রণাসভায় যাওয়ার আগে আরেকবার পড়ে নিতে পারেন। তবে রওশনআরার চিন্তা তাঁর মনোযোগ বার বার সেদিকে নিয়ে যাচ্ছিল। দুজনের মাঝে বয়সের ব্যবধান মাত্র একবছরের—ছোটবেলায় তাঁরা কত কাছাকাছি ছিলেন। যেরকম তাদের বড় দারা আর জাহানারা ছিলেন। রওশনআরার একটি পোষা বেঁজি ছিল, যা নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে খেলা করতেন। তাঁদের মায়ের মৃত্যুর পর দুজনের মনে যে দুঃখযাতনা হয়েছিল, তা ওদের দুজনকে আরো নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল...অথচ একটু আগে রওশনআরা অভিযোগ করলেন যে, তিনি একাকীত্বে ভুগছিলেন আর এর জন্য তাঁকেই দায়ী করলেন। কখন তিনি এটা বুঝতে পারলেন যে, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন আর তা অর্জনের জন্য তিনি কাউকে আস্থায় নিতে পারবেন না—রওশনআরাসহ আর সবাইকে বাদ দিয়ে সমস্ত ভাবনা নিজের মনে রাখতে হবে? যদিও তারপর থেকেই কারও প্রয়োজন কিংবা কারও উপর নির্ভর না করার জন্য তিনি নিজেকে প্রশিক্ষিত করে তুলেছিলেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি তাঁর বোনকে ভালোবাসেন না। নিশ্চয়ই রওশনআরা তা বুঝতেন? নিজের শালীনতার সীমা অতিক্রম করার কারণে তিনি আওরঙ্গজেবকে দোষারোপ করতে পারেন না। এর জন্য দায়ী তাঁর নিজের লালসা, আওরঙ্গজেবের ব্যর্থতা নয়।

'আওরঙ্গজেব...' ডাক শুনে ঘুরে তিনি জাহানারার দিকে তাকালেন। 'সব শেষ। আমার হাতে মাথা রেখেই সে মারা গেছে। তবে মারা যাওয়ার আগে কেবল তোমার নাম উচ্চারণ করছিল। আর শেষ মুহূর্তটিতে তার মুখে মৃদু হাসির রেখা ছিল—এমন মিষ্টি সে হাসি—আর এমনভাবে আমার দিকে তাকাল ঠিক যেরকম ছোটবেলায় তাকাত...'। জাহানারার দুগাল বেয়ে চোখের পানি নেমে এল, তিনি তাঁর ভাইয়ের কাছে এগিয়ে তাঁকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন।

'চেয়ে দেখুন জাঁহাপনা। ওদের চেহারা সম্পর্কে যা শুনেছিলাম তা সত্যি।' পাটের বস্তার ভেতর থেকে কাটা মুণ্ডুটা সাদা মার্বেল পাথরের মেঝেতে পড়ে সামান্য গড়িয়ে তারপর থামল। খোলা বিস্ফোরিত চোখদুটো আওরঙ্গজেবের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মুণ্ডুটা দেখতে একটু অদ্ভুত ধরনের। যে কর্মকর্তাটি লোকটিকে একজন গুপ্তচর হিসেবে পাকড়াও করে কোতল করেছিল, সে বলেছিল এদেরকে 'সতনামি' বলা হয়। এরা মাথার চুল আর ভ্রু কামিয়ে ফেলে। গুপ্তচরটির বেশ আগে মৃত্যু হয়েছিল, মুণ্ডুটির চামড়ায় বিভিন্ন ধরনের নকশা ছিল আর ইতোমধ্যে এতে পচন ধরতে শুরু করেছে। গা বমি বমি করা মৃত্যুর গন্ধ আওরঙ্গজেবকে অসুস্থ করে তুললো।

তিনি বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে! আমি তোমাকে অবিশ্বাস করার কথা ভাবি নি। মাথাটা বস্তায় ভরে ফেল। আমার কর্মচারী এটা সরিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে।' ছোট ছোট দাড়িওয়ালা বেলুচি সেনা কর্মকর্তাটি—মুণ্ডুটি তোলার জন্য হাতড়িয়ে বেড়াল। মাথায় কোনো চুল না থাকায় কাজটা সহজ ছিল না। শেষপর্যন্ত এটা তুলে সে বস্তায় ভরলো আর একজন চাকর মাথাসুদ্ধ বস্তাটা এক হাত তফাতে রেখে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে কামরা থেকে বের হয়ে গেল।

আওরঙ্গজেব বললেন, 'আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না যে এধরনের অদ্ভুত সম্প্রদায় আছে—হিন্দুস্তানে বিভিন্ন ধরনের ভুল ধর্মীয় বিশ্বাস গজিয়ে উঠেছে। শুকর, গরু থেকে শুরু করে মাছ, মুরগি সবকিছু যেসব মানুষ খুশিমনে খায় আর যাদের এধরনের উদ্ভট প্রথা আছে, যেখানে নারী-পুরুষ একসাথে অংশ গ্রহণ করে, তারা কখনও আমার ক্ষমতার বিরুদ্ধে মোটেই হুমকি নয়। সে স্থানীয়ভাবে হোক আর ক্ষণস্থায়ীভাবেই হোক।'

'জাঁহাপনা এটা সত্যি ওরা কি খায় তা নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না আর নারী ও পুরুষ একসাথে দল বেঁধে থাকে। তবে সমস্যা হচ্ছে এখান থেকে বেশি দূরে নয় এই দিল্লিতেই নারনউল নামে একটি স্থানে ওরা একজন ধর্মোন্মাদ নেতা পেয়েছে—তাও আবার পুরুষ নয়, জটপাকানো চুলের একজন বয়স্ক মহিলা। জ্বলজ্বলে চোখের মহিলাটি নিজেকে একজন জাদুকরী হিসেবে ঘোষণা করছে। সে এমন তীব্র ভাবাবেগ আর এমন বাচনভঙ্গি ব্যবহার করে যে, তার অনুসারীরা সম্পূর্ণ মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে ওদেরকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে, যদি ওরা তার কথামতো কাজ করে তাহলে তার যাদুমন্ত্র আর যাদুর ওষুধ খেলে তলোয়ারের আঘাত আর বন্দুকের গুলি ওদের কিছুই করতে পারবে না। তার শক্তিতে ওদের এত গভীর বিশ্বাস জন্মেছে যে, বাহুতে তার

বানিয়ে দেওয়া মন্ত্রপূত কবচ পরে ওরা তার নেতৃত্বে একটি-দুটি নয়, আমাদের বেশ কয়েকটি ছোট আকারের নগররক্ষী বাহিনীকে পরাভূত করেছে। অত্যন্ত ধীরে ধীরে গোপনে, ছদ্মবেশে কিংবা অনেক সময় নর্দমার মধ্য দিয়ে—এমনকি মল-নর্দমার মধ্য দিয়ে ঢুকে ওরা ভেতর থেকেই হামলা করেছে। বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, গায়ে মলদূষণ হওয়া নিয়ে ওদের কোনো পরোয়া নেই। মোটেই পরোয়া করে না।'

কর্মকর্তাটি একমুহূর্ত দম নেওয়ার জন্য থেমে আবার হুড়মুড় করে বলা শুরু করলো, 'আচমকা যেন জাদুমন্ত্রে হঠাৎ উদয় হয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে যে, জাদুকরীর জাদুর মায়ায় ওরা দেয়াল ভেদ করে এসেছে আর ওরা অলঙ্ঘনীয়। এতে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে আমাদের সমস্ত সেনা আর সেনা কর্মকর্তারা দুর্বল হয়ে সাহস হারিয়ে ফেলে। তারপর ওরা চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে পালিয়ে যায়। এই সতনামিদের আতঙ্ক এমন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে যে, ওরা এখনও মাত্র পাঁচহাজার হলেও পায়ে হেঁটে প্রকৃতপক্ষে কোনো বাধা ছাড়াই দিল্লির দিকে এগিয়ে আসছে। আর চলার পথে দলে দলে কৃষকরা ওদের সাথে যোগ দিচ্ছে। গুপ্তচরের যে মুণ্ডুটা আমি আপনাকে দেখিয়েছি, তাকে এখান থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে একটা গ্রাম থেকে ধরেছিলাম। আমি খবর পেয়েছি ওদের মূল দলটি দিল্লি থেকে এর দ্বিগুণ দূরত্বে রয়েছে। এভাবে তাড়াতাড়ি আলুথালু বেশে আপনার সামনে হাজির হওয়ার জন্য অনুগ্রহ করে আমাকে মার্জনা করবেন জাঁহাপনা। তবে আমার মনে হয় আত্মরক্ষা করার মতো যথেষ্ট সৈন্য আমাদের হাতে নেই। কারণ আমাদের মূল সেনাবাহিনী এখন পাঞ্জাবে শিখদের মোকাবেলা করছে। আমি সত্যি আতঙ্কিতবোধ করছি।' তারপর সে নীরব হল।

আওরঙ্গজেব কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শান্ত হও, জওয়ান। আমাদের সিপাহিদের আতঙ্ক মনে হচ্ছে এমন ছোঁয়াচে যে, তা তোমার গলায় চেপে বসেছে। একজন সেনা কর্মকর্তার মনের ভেতরের উদ্বেগ যাইহোক, তা বাইরে প্রকাশ করা যাবে না। এটা তুমি ঠিক বলেছ যে আমাদের সেনাবাহিনীর মূল অংশ গুরু তেগ বাহাদুরের নেতৃত্বে শিখদের মোকাবেলা করছে। তবে ওদের তাই করার কথা। শিখরা আমাদের শাসনের বিরুদ্ধে একটি দীর্ঘস্থায়ী হুমকি। ওরা সাহসী, সুশৃঙ্খল আর উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। ওদের ধর্মমত—আমাদের মতো না হলেও, তুমি যে জাদুকরীর প্রলাপ বকার কথা বলেছ তার চেয়ে অনেক সুসঙ্গত।'

সেনা কর্মকর্তাটি কাঁধ সোজা করে দাঁড়াল, তবে তার চেহারায় তখনও উদ্বেগের ছাপ রয়ে গেছে। সে বললো, 'জাঁহাপনা, আমি অসঙ্গত আপনাকে আতঙ্কিত

করতে কিংবা নিজেকেও অতিরিক্ত আতঙ্কগ্রস্ত দেখাতে চাই নি। সেনাবাহিনীকে কোথায় আপনি মোতায়েন করবেন, সে ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি উদ্বিগ্ন—আর স্বীকার করছি এখনও তাই—বুঝতে পারছি না কেমন করে এই সতনামিদের প্রতিরোধ করবো।'

আওরঙ্গজেব বললেন, 'সে ভাবনা আমার। এখন তুমি যাও, বিষয়টা নিয়ে আমাকে ভাবতে দাও।' তারপর সেনা কর্মকর্তাটি ঝুঁকে তাঁকে সালাম জানিয়ে দরজার দিকে এগোতেই আওরঙ্গজেব নরম কণ্ঠে বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি ছুটে এসে খবরটা দিয়েছ, সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এধরনের হুমকির খবর যত তাড়াতাড়ি আমি পাবো তত দ্রুত আমি ওদের মোকাবেলা করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারবো।'

লোকটি চলে যাওয়ার পর আওরঙ্গজেব কয়েক মিনিট বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দিল্লি শহরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। লোকজনের বিশ্বাসপ্রবণতা দেখে তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন। কোনো শুভ বা অশুভ লক্ষণ, জাদু আর ফকিরের বিভিন্ন ধরনের কেরামতি ও প্রলাপ বকার উপর তাদের অন্ধ বিশ্বাস তাদের কোনো আধ্যাত্মিক উন্নতি না করলেও তাদের অসুস্থ মনে ঠিকই প্রভাব ফেলে। হিন্দুস্তানের মানুষদেরকে তাদের ভুল দেখিয়ে দিয়ে সঠিক পথে আনাটা তাঁর কর্তব্য। এটা করাটা তাঁর শাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে, যা তিনি নিজের জীবনে করেছেন। তবে তাঁর এখনকার কাজ হলো এই অদ্ভুত সতনামি আর তাদের জাদুকরীকে দ্রুত সম্পূর্ণরূপে দমন করা। কেননা একবার এরা ছড়িয়ে পড়লে তাঁর সার্বভৌমত্বের উপর হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু কি করে এটা করা সম্ভব, যেখানে তাঁর বেশিরভাগ সেরা সেনা পাঞ্জাবে রয়েছে, এটা একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ সেনা কর্মকর্তাটির আচরণ তাকে পরিষ্কার দেখিয়েছে যে, উদ্বেগ আর প্রায় আতঙ্ক কত দ্রুত সবচেয়ে অনুগত ব্যক্তিকেও প্রভাবিত করতে পারে।

শহরের দিকে তাকিয়ে তিনি মনে মনে একের পর এক সম্ভাবনার কথা ভাবতে লাগলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল আর রান্নার চুলার আগুন অন্ধকার ভেদ করে ফুটকি দিয়ে জ্বলে উঠতে লাগলো। তারপর তাঁর মনে ধারণাটা এল। প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড এড়াতে হলে তাঁকে আগুন দিয়েই আগুনের সাথে লড়াই করতে হবে। তাঁর নিজের লোকজন আর সৈন্যরা যদি জাদুমন্ত্র আর তাবিজ-কবচে বিশ্বাস করে, তাহলে তিনিও তাদেরকে দেখাবেন যে, তিনিও এসব প্রয়োগ করতে পারেন। মুসলিম সৈন্যদের রক্ষা করার জন্য ইমামদের বলবেন যথারীতি দোয়াকালামের ব্যবস্থা করতে আর যেসব হিন্দু বিভিন্ন দেবদেবীতে

বিশ্বাস করে তাদের ব্যাপারেও হিন্দু পুরোহিতরাও সেরকম ব্যবস্থা নেবে। যারা একটু অনিচ্ছুক হবে, তাদের ক্ষেত্রে 'দান' করলে ঠিকই কাজ দেবে। সতনামিদের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে সৈন্যরা দিল্লি ত্যাগ করার আগে এসব দোয়া আর মন্ত্র পার্চমেন্ট কাগজে লিখে কাগজগুলো পতাকায় সেলাই করে ইমাম আর পুরোহিতরা সেনাদলের সামনে প্রদর্শন করবে। পরের দিন সেনাবাহিনী যখন রওয়ানা দেবে, তখন সবার আগে এগুলো থাকবে। আর তাদের মনে সাহস যোগানোর জন্য তিনি নিজে এই সেনাদলের নেতৃত্ব দেবেন। এই বাহিনী মূলত্ব অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গঠিত হবে, যাতে পায়ে হেঁটে আসা সতনামিদের বিরুদ্ধে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা যায়। তাছাড়া এদের বেশিরভাগই মাত্র কিছুদিন পূর্বে সাধারণ কৃষক ছিল।

আরেকবার তাঁর বিশাল যুদ্ধহস্তীর পিঠে সোনার পাতে মোড়া হাওদায় বসে আওরঙ্গজেব মাথার উপর হাত তুলে অশ্বারোহী বাহিনীকে সতনামিদের উপর আক্রমণ করার ইঙ্গিত দিলেন। ওরা তখনও এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে অস্ত্র হাতে নেবার চেষ্টা করছিল। দিল্লি থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে ধীরে বয়ে চলা যমুনার একটি উপনদীর কর্দমাক্ত তীরে ওরা যখন রাতের জন্য শিবির স্থাপন করতে যাচ্ছিল, তখন তিনি তাঁর সেনাদল নিয়ে অতর্কিতে ওদের উপর আক্রমণ করলেন। তাঁর কথাই ঠিক ছিল। মুসলিম আর হিন্দু ধর্মগুরুরা যে প্রার্থনা তৈরি করে দিয়েছিলেন, তাতে সেনাদলের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছিল। ওরা মাত্র ছয় ঘণ্টায় দিল্লি থেকে এই দূরত্ব পেরিয়ে এসেছিল। এখন তাঁর সৈন্যদের মধ্যে কোনো আতঙ্ক দেখা যাচ্ছে না। বরং ওরা উল্লাসে চিৎকার করতে করতে বল্লম সোজা করে কিংবা তরোয়াল খাপমুক্ত করে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। বিশেষত লখনৌ থেকে আসা মুসলিম আর রাজস্থান থেকে আসা হিন্দু সেনারা তাদের যার যার ধর্মীয় পতাকা উড়িয়ে চলছিল। দূরদর্শিতা দেখিয়ে তিনি তাদেরকে একেবারে সামনে না রেখে মাঝখানের সারিতে রেখেছিলেন, কেননা কোনো একজন পতাকাবাহীর মৃত্যু কিংবা দোয়া এবং মন্ত্রলেখা পতাকা কাদায় পড়ে গেলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন সত্নামি ছুটে আসা মোগলদের দিকে তীর ছুঁড়লো। ঘাড়ে তীরের আঘাতে আহত হয়ে একেবারের সামনের একটি ঘোড়া মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, সাথে সাথে এর সওয়ারিও ডিগবাজি খেয়ে ঘোড়াটির মাথার উপর দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আরেকজনের পায়ে তীর বিঁধতেই সে তার ঘোড়ার

নিয়ন্ত্রণ হারাতেই ঘোড়াটি একপাশে ঘুরে গেল। যাইহোক আওরঙ্গজেব তাঁর মাহুতকে বললেন তাঁর অশ্বারোহীবাহিনীকে অনুসরণ করতে, যাদের প্রথম দলটি ইতোমধ্যেই সতনামিদের মাঝে ঢুকে পড়েছিল। তবে বেলুচি সেনা কর্মকর্তাটি যা অনুমান করেছিল তার চেয়ে সতনামিদের সংখ্যা অনেক বেশি মনে হল। এদের বেশির ভাগেরই হাতে ছিল তীর-ধনুক আর কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি করা সাধারণ মানের বিভিন্ন হাতিয়ার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সতনামিদের পতন শুরু হল। কেউ কেউ মোগল সেনাদের ঘোড়ার চাপে পিষ্ট হল আর অনেকে মোগল সেনাদের তরোয়ালে কাটা পড়লো। অনেকেই মরছিল, তবে আহত হলেও কেউ পেছন ফিরে পালাতে চেষ্টা করলো না। অর্ধনগ্ন কংকালসার দেহের একজন সতনামির মুখ তরোয়ালে কেটে গেলেও সে তার কাস্তে দিয়ে ক্ষেতে ধান কাটার মতো ধীরে সুস্থে ছুটে চলা ঘোড়ার পায়ে আঘাত করে চললো। মাংসপেশি কেটে যাওয়ায় দুটি ঘোড়া হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল, তারপর একজন মোগল সেনা বর্শা দিয়ে তাকে গেঁথে ফেললো।

নেংটিপরা লম্বা, বলিষ্ঠ গড়নের আরেকজন সতনামি লাফ দিয়ে মোগল বাহিনীর একটি কালো ঘোড়ার ঘাড়ের উপর চড়ে বসে কেবল গায়ের জোরে আর ইচ্ছাশক্তি দিয়ে টেনে আরোহীসহ ঘোড়াটিকে মাটিতে টেনে নামাল। তারপর হতবুদ্ধি হয়ে পড়া মোগল সৈন্যটির হাত থেকে তরোয়াল কেড়ে নিয়ে তার গায়ে ঢুকিয়ে দিল। তার দেখাদেখি অন্যান্য সতনামিরাও তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করলো। সবাই সফল হল না, কেউ ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল আবার কেউ ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হল। তবে প্রায় বিশজন মোগল সেনা মাটিতে পড়ে গেল। কেউ কেউ নদীর তীরে কাদার উপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রইল আবার কেউ কেউ চারপাশ থেকে ছুরি আর বর্শা দিয়ে একনাগাড়ে কুপিয়ে চলা সতনামিদের প্রতিহত করে যেতে লাগলো। যাইহোক শীঘ্রই নদীর তীরে স্তূপ হয়ে পড়ে থাকা সতনামিদের লাশের সংখ্যা দেখে বুঝা গেল লড়াই মোগলদের সপক্ষেই যাচ্ছে। তারপরও শরীরের কয়েক জায়গায় আহত হয়ে পড়ে যাওয়া পর্যন্ত বাকি সতনামিরা মাটি কামড়ে ধরে লড়াই করে চললো।

আওরঙ্গজেবের যুদ্ধহস্তীটি সতনামি শিবিরের কেন্দ্র থেকে সামান্য দূরে মোগল অশ্বারোহী বাহিনীর প্রথম সারির কাছাকাছি পৌঁছতেই বড় একটি তাঁবু থেকে দশবারোজন লোক হৈ হৈ করে ছুটে বেরিয়ে এল। এদের কয়েকজনের হাতে গাদা বন্দুক ছিল আর তা ওরা আওরঙ্গজেবের দিকে নিশানা করার চেষ্টা করতে লাগলো। আওরঙ্গজেবের দুজন দেহরক্ষী ওদেরকে আক্রমণ করলো,

তবে তার আগেই একজন সতনামি গুলি ছুঁড়লো। মাথায় গুলির আঘাত লেগে একজন দেহরক্ষী তার ঘোড়ার ঘাড়ের উপর লুটিয়ে পড়লো। আতংকিত ঘোড়াটি ছুটে নদীতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো আর আরোহীর দেহটি মুখ নিচু করে কাদাভরা পানিতে পড়ে গেল। সবুজ পাগড়িপরা দীর্ঘদেহের অপর দেহরক্ষীটি তার বীরত্ব দেখিয়ে চললো। সে তিনজন সতনামি বন্দুকবাজকে ঘায়েল করলো। লোকগুলো তাদের লম্বা নলের বন্দুক সোজা করে ধরার আগেই সে ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝুঁকে তরোয়াল দিয়ে অর্ধনগ্ন সতনামিদের হাড্ডিসার শরীরে কুপিয়ে চললো।

একজন সতনামি গাদা বন্দুক ছুঁড়তেই ক্ষিপ্রগামী ঘোড়াটি ঘুরিয়ে সে ধাক্কা দিয়ে বন্দুকের নলটি সরিয়ে লোকটির কামানো মাথায় তরোয়ালের কোপ মেরে মাথাটা কেটে দুভাগ করে দিল। দ্বিতীয় সতনামিটি দ্রুত তার প্রাচীন বন্দুকটি ঘুরিয়ে বন্দুকের বাট দিয়ে দেহরক্ষীর ঘোড়াটির গলায় আঘাত করলো। যন্ত্রণায় চিহিহি করে ঘোড়াটি পেছনের পা উঁচু করে আরোহীকে পিঠ থেকে ফেলে দিল। সতনামিটির পায়ের কাছে মোগল দেহরক্ষীটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, তরোয়াল হাত থেকে ছুটে গেল। সতনামিটি আবার বন্দুকের কুঁদো উঁচু করে দেহরক্ষীটির তলপেটে আঘাত করলো। শরীর ভাঁজ করে মোগল সেনাটি উঠে বসতেই সত্নামিটি তার পাগড়িপরা মাথা লক্ষ্য করে বন্দুকের কুদো চালালো, তবে মোগলসেনাটি ঠিক সময়ে শরীর মুচড়ে সরে গেল। তারপর সে কোমর থেকে ছুরি বের করে সতনামিটির নগ্ন উরুতে বাটপর্যন্ত ছুরির ফলাটি ঢুকিয়ে দিল। লোকটি সেদিকে মোটেই খেয়াল না করে আবার তার বন্দুকের কুঁদো উঠিয়ে আঘাত করলো। তবে দেহরক্ষী বন্দুকের কুঁদোটা ধরে ফেলে এক টানে সতনামিটির হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। তারপর অতিকষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে বন্দুকের কুঁদোটা দিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে কয়েকবার সতনামিটির মুখে আঘাত করে তার নাকমুখ থেতলে দিল।

ইতোমধ্যে অন্য সতনামিটি আওরঙ্গজেবের দিকে গুলি ছুঁড়লো। গুলি লেগে হাওদার কাঠের ছাদের একটি অংশ ভেঙ্গে গেল। আওরঙ্গজেব চিৎকার করে মাহুতকে বললেন, 'ঐ লোকটা আবার গুলি ভরার আগেই তার উপর হাতি চালিয়ে দাও।' সাথে সাথে মাহুত তাঁর নির্দেশ মেনে হাতি এগিয়ে নিল। তবে হাতিটি সতনামি বন্দুকধারীর কাছে পৌঁছাবার আগেই, যে দেহরক্ষীটি লড়াই করছিল, সে লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। লোকটির পায়ের গোড়ালি ধরে তাকে টেনে মাটিতে নামিয়ে তার হাত থেকে গাদা বন্দুকটা ছিনিয়ে নিল। তারপর ঘুসি মেরে তাকে অজ্ঞান করে ফেললো।

যে তাঁবুর আড়ালে বন্দুকধারীরা লুকিয়ে ছিল, এখন সেই তাঁবুর কাপড় এক টানে সরিয়ে ছোটখাট কঠোর চেহারার লম্বা পাকাচুলের একটি নারী মূর্তি দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে বের হয়ে এল। সে বার বার উচ্চারণ করে চললো, 'আমি জাদুকরী! আমি জাদুকরী!' জাদুকরীটি ডানে বামে না তাকিয়ে মাথা উঁচু করে সোজা আওরঙ্গজেবের হাতিটির দিকে হেঁটে চললো। কয়েকজন দেহরক্ষী ভয়ে পিছিয়ে এল। কেউ তাকে থামাতে এগিয়ে এল না। আওরঙ্গজেবের হাতির সামনে এসে থেমে সে সম্রাটের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে চিৎকার করে বললো, 'আপনি আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না। আপনার অস্ত্র দিয়ে আমাকে আর আমার অনুসারীদের উপর আঘাত করলে, তা আবার সেরে যাবে আর আমরা আবার জেগে উঠবো। তবে আমি যেখানে আঘাত করবো, তা কখনও সারবে না। আমি মনে আঘাত করবো। আমি অভিশাপ দিচ্ছি আপনি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবেন, তবে কখনও আপনার পরিবারে কিংবা রাজত্বে শান্তি খুঁজে পাবেন না।'

আওরঙ্গজেব কোনো উত্তর না দিয়ে পেছনে বসা আর্দালিকে বন্দুকটা দিতে বললেন। হাতে তুলে নিয়ে জাদুকরীর দেহের দিকে লক্ষ্যস্থির করলেন। সে মোটেই ঘাবড়াল না, বরং আওরঙ্গজেবের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার তার সেই সম্মোহনকর মন্ত্র আউড়াতে শুরু করলো। একটি মুহূর্ত আওরঙ্গজেব থমকালেন, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে গুলি ছুড়লেন। জাদুকরীর হাড়জিরজিরে বুক থেকে ফিনকি দিয়ে লাল টকটকে রক্ত বের হয়ে তার পুরোনো পাতলা মসলিনের পোশাক রাঙিয়ে দিল, কিন্তু তার চেহারায় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না এমনকি চোখের পাতাও কাঁপলো না। সে স্থির দৃষ্টিতে আওরঙ্গজেবের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখ থেকে গল গল করে রক্ত বের হয়ে চিবুক ভিজিয়ে দিলেও সে তখনও সেই মন্ত্র আউড়ে চললো। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটু ভেঙ্গে সামনের দিকে মুখ করে দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করে কাদার উপর মুখ থুবড়ে পড়তেই মন্ত্র থেমে গেল।

আওরঙ্গজেব নির্দেশ দিলেন, 'তার দেহটি নিয়ে যেসব শহর আর গ্রাম সে দখল করেছিল সেসব জায়গায় ঘুরিয়ে দেখাও। প্রত্যেক জায়গায় একজন করে সতনামি বন্দীকে কোতল করবে আর লাশগুলো শিকলে বেঁধে ফেলে রাখবে পচার জন্য, যাতে কারও মনে সন্দেহ না থাকে যে ওরা মারা গিয়েছে আর তার অনুসারীরা যে কোনো মানুষের মতোই মরণশীল।' তারপর মাহুতের দিকে ফিরে বললেন, 'হাতি ঘুরাও। আমরা এখন দিল্লি ফিরে যাবো।' সন্ধ্যার অন্ধকার পথ দিয়ে হাতি চলা শুরু করতেই তিনি সামনে যে কাজগুলো বাকি

আছে সেগুলোর কথা ভাবতে শুরু করলেন—পাঞ্জাবে শিখ বিদ্রোহীদের দমন করতে হবে, শিবাজি দক্ষিণে ধীরে ধীরে তার শক্তি সংহত করছে, তাকে আবার ধরতে হবে, আর সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পারস্যের সহায়তায় উচ্ছৃঙ্খল উপজাতিরা যে বিদ্রোহ শুরু করেছে তাও দমন করতে হবে। এতকিছু ভাবনার পরও সেই মহিলার কথাগুলো তাঁর মাথায় তখনও প্রতিধ্বনিত্ব করছিল। যতই তিনি নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন যে, ঐ মহিলাটি একজন বিকৃতমস্তিষ্ক কাফের আর তিনি একজন বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং এমন একটি ধর্মের অনুসারী যেখানে এই ধরনের অভিশাপের কোনো স্থান নেই, তারপরও তাঁর মন থেকে কথাগুলো চলে যাচ্ছিল না।

সিফিরকে দেখে একটু অস্থির মনে হচ্ছিল, বিয়ের মুকুটের নিচে তার চোখে সতর্ক দৃষ্টি দেখা যাচ্ছে। তাকে নিরীক্ষণ করে আওরঙ্গজেব ভাবলেন, দীর্ঘ বারো বছর গোয়ালিয়রের দুর্গে আটক থাকার পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের একটু সন্ত্রস্ত থাকাটাই স্বাভাবিক। লাল কেল্লায় মূল ময়দানে বিয়ের অনুষ্ঠান তখন শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। সিফিরের চৌকোণা চওড়া কপাল আর মুখের সাথে তার বাবা দারা শিকোহর চেহারার কোনো মিল নেই। অথচ তার বোন জানির সাথে তার বাবার বেশ মিল রয়েছে। হয়তো সে তার প্রয়াত মা নাদিরার মতো দেখতে হয়েছে। আওরঙ্গজেব ভ্রু কুঁচকালেন। অনেক চেষ্টা করেও তিনি নাদিরার কথা কিছুই মনে করতে পারলেন না, শুধু এটুকু মনে পড়লো যে, তাঁর ভাই সবার চেয়ে তাঁকেই বেশি ভালোবাসতেন আর যখন তিনি আর দারা তাঁর সেনাদলের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছিলেন, তখন পালাবার সময় পথেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

এই বিয়ের ধারণাটিও জাহানারার মাথা থেকে এসেছিল। তিনি আওরঙ্গজেবকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'বন্দী সিফিরকে গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে মুক্ত করে তাকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়ে তুমি আবার সবার কাছে প্রমাণ করবে যে, আমাদের পারিবারিক কলহের দিনগুলোর অবসান হয়েছে। আর আমাদের মধ্যে যদি কেউ আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করতে চাইলেও, এই বিয়ে তা অনুৎসাহিত করবে।' তবে এই সিদ্ধান্তটি নিতে আওরঙ্গজেব বেশ লম্বা সময় নিলেন। দারার অনেক সমর্থক এখনও রয়েছে। তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেকেই তাঁকে হটিয়ে দারার একমাত্র জীবিত ছেলেকে সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্র করতে পারে। মোগল রাজবংশের মাঝে যে বিভক্তি হয়েছে তার অবসান ঘটাবার জন্য

তিনি যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, তা জাহানারাকে দেখাবার জন্য তিনি ভারসাম্য বজায় রেখে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিফিরকে মুক্ত করার ঝুঁকি নিলেন। অবশেষে অনেক ভেবে একটি উপায় বের করলেন, যাতে জাহানারার ইচ্ছা পূরণের সাথে সাথে তাঁর নিজের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা যায়। যদিও সিফিরকে গোয়ালিয়র ফিরে যেতে হবে না, তবে সে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও পাবে না—অন্তত এখুনি নয়। নববধূকে নিয়ে সে বরং দিল্লির যমুনা নদীর সেলিমগড় দ্বীপে থাকবে। আরাম আয়াসেই জীবন কাটাবে আর কোনো কিছুর অভাব হবে না, তবে বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকবে আর গুপ্তচরেরা সবসময় তার উপর নজর রাখবে।

রুপালি সুতা দিয়ে বোনা ঝিকমিক করা বিয়ের ঘোমটায় ঢাকা দীর্ঘাঙ্গি যে তরুণীটি সিফিরের পাশে বসে রয়েছে, সে আওরঙ্গজেবের নিজেরই মেয়ে—জুবদাতুন্নেসা। সম্রাট আকবরের সময় থেকে শুরু করে এই প্রথম একজন মোগল সম্রাটের মেয়ের বিয়ে হল। অবশ্য এটিও জাহানারার কারণেই হয়েছে। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এটা ঠিক নয় যে, একজন সম্রাটের মেয়ে বিয়ে করতে পারবে না? স্বামী-সন্তানের সুখ থেকে কেন তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে?' আওরঙ্গজেব অনুভব করলেন, এই কথাগুলো রওশনআরার মৃত্যুর ঠিক আগের কথাগুলো প্রতিধ্বনিত্ব করছে। তিনি জাহানারার চোখে বেদনার আভাস দেখতে পেলেন—সেটা নিজের জন্য কিংবা রওশনআরার জন্য কিংবা হয়তো উভয়ের জন্যই হতে পারে।

সিংহাসনের সম্ভাব্য দাবিদার প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য সীমিত করার জন্য সম্রাট আকবর যে নিয়ম প্রচলিত করেছিলেন, এযাবত তিনি তা নিয়ে কখনও প্রশ্ন তুলেন নি। তবে এই মোল্লারা তাঁকে জানালেন যে, কোরআনে এর কোনো ভিত্তি নেই। তাছাড়া তিনি দেখলেন যে, এটি যৌন অপরাধ উৎসাহিত করতে পারে। রওশনআরা তাঁর যৌনাচারের কারণ হিসেবে একেই দায়ী করেছিলেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, সম্ভবত এই নিয়মটি এর উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম রাজবংশের ভেতরে যে সংঘাত চলেছে, এটি তা প্রতিরোধ করতে পারে নি। বিষয়টি নিয়ে অনেক বিবেচনা করে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, আবেগ নির্ভর এবং অযৌক্তিক আইন দিয়ে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা যাবে না। সাম্রাজ্য দৃঢ়ভাবে টিকিয়ে রাখার—সর্বোত্তম এবং একমাত্র উপায় হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষার উপর ভিত্তি করে সরকার ও পরিবার, উভয়ের উপর কঠোর এবং অটল নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। তাঁর অনেক পূর্বপুরুষ তাঁদের জীবনের পরবর্তী বছরগুলোতে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন—মদ,

আফিম এমনকি মেয়ে-মানুষে মজে গিয়ে এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন। অথচ তাঁদের উচিত ছিল নির্মমভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব ঘোষণা করা। তিনি সে ভুলটি করবেন না। রাজত্বের শুরুতে তিনি যেরকম কঠোর হাতে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, শেষেও সেরকম নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবেন। কাজেই তাঁর মেয়েদের বিয়ে হলে তিনি সেরকম কোনো হুমকির আশংকা করেন না।

আওরঙ্গজেব উঠে দাঁড়িয়ে নববধূ আর বরকে শেষবারের মতো দোয়া করে হাস্যোজ্জ্বল অতিথিদের মধ্য দিয়ে হেঁটে বিয়ের আসর থেকে বের হয়ে গেলেন। খাওয়া-দাওয়া আর আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে বিয়ের আসর অনেক রাত পর্যন্ত চলবে। তাকে এখন অনেক জরুরি বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে। পেশোয়ার থেকে তাঁর সুবেদার খবর পাঠিয়েছে যে, পারস্যের শাহ্-এর কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিদ্রোহীরা দিন দিন আরো শক্তিশালী আর অবাধ্য হয়ে উঠেছে। সব সময়ের মতো মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ওরা মোগল সাম্রাজ্য এলাকার ভেতরের গ্রামগুলোর উপর আক্রমণ চালিয়ে ধূলিসাৎ করছে আর শান্তিপ্রিয় বণিকদের কাফেলার উপরও লুটপাট চালাচ্ছে।

শীঘ্রই তাঁকে আবার সামনে থেকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধাভিযানে বের হতে হবে। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় এবার তিনি ভালোবাসা ও সহমর্মিতার বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ একটি রাজপরিবার রেখে যাচ্ছেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে যে কোনো সময়ের তুলনায় এবারই প্রথম ওরা এরকম একতাবদ্ধ হয়েছেন। এই বিয়েটি এই একতার একটি জোরালো প্রতীক হয়ে থাকবে।

অধ্যায় ছয়

উত্তরের দস্যুদল

আওরঙ্গজেব চাদর টেনে তুলে নাক-মুখ ঢাকলেন। উত্তর দিক থেকে বয়ে আসা দমকা হাওয়ার সাথে ধূলি আর কাঁকর চাবুকের মতো মুখে এসে পড়ছিল। পারস্যের সহায়তায় আফগান এলাকায় যে বিদ্রোহ চলছে, তা দমন করার জন্য তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে অমসৃণ পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া একটি গিরিপথ দিয়ে সামনে এগোচ্ছিলেন। অন্তত এখনকার মতো তিনি পাঞ্জাবের লড়াকু শিখদের হুমকি শেষ করে এসেছেন। তাদের প্রধান নেতা তেগবাহাদুর এখন দিল্লিতে তাঁর লাল কেল্লার মূল ফটকের শোভাবর্ধন করছে। অবশ্য এখনও বাকি আছেন শিবাজি। তবে জানমালের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির পরও মোগল সেনারা মারাঠিদের হুমকি-ধামকি দাক্ষিণাত্যের মাঝে সীমিত করে রেখেছে।

ধূলিময় বাতাস বেশ ঠাণ্ডা ছিল, আওরঙ্গজেব পশমি আলখাল্লাটা শক্ত করে গায়ে জড়িয়ে নিলেন। এসময় মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পূর্বপুরুষ বাবরের কয়েকটি কথা তাঁর মনে পড়লো, যা তিনি ছোটবেলায় পড়েছিলেন। হিন্দুস্তানের গরমের প্রতি অপছন্দ আর ওক্সাস নদীর ওপারে তাঁর নিজদেশ ফারগানার শীতল পর্বত আর বরফে ঢাকা নদীর জন্য তাঁর আকুলতার কথা বাবর লিখেছিলেন। সেই তখনকার দিনে কি সুদীর্ঘ পথ মোগলরা পাড়ি দিয়েছিলেন... তারপর কিরকম বদলে গেলেন। রুক্ষ, হাওয়ায় উড়িয়ে নেওয়া এই পাহাড়গুলো যেমন তাঁর কাছে ভিনদেশী মনে হচ্ছিল, ঠিক তেমনি দেড়শো বছর আগে হিন্দুস্তানের উষ্ণ সমতলভূমিও বাবরের কাছে তাই মনে হয়েছিল।

তন্ময় হয়ে আওরঙ্গজেব এসব ভাবছিলেন, তারপর হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এসে দেখলেন তাঁর সামনের ঘোড়সওয়ারীদের চলার গতি ধীর হয়ে এসেছে। আরো সংকীর্ণ দুই ধার উঁচু একটি গিরিপথে ঢোকার চেষ্টা করতে গিয়ে ওরা একে অপরের সাথে ধাক্কাধাক্কি শুরু করেছে। এই গিরিপথটিতে চারজনের বেশি অশ্বারোহী চলার মতো জায়গা নেই। আধঘণ্টা পর তাদেরকে অনুসরণ করে

যখন তিনি রাজকীয় হাতির পিঠে চড়ে ছায়াঘেরা গিরিপথের মাঝে ঢুকলেন—সেনাবাহিনীর পূর্বেকার বিন্যাসে ফিরে আসার জন্য একটু সময় লেগেছিল আর অগ্রগামী দলটিও তাঁর আগে প্রায় এক মাইল দূরে চলে গিয়েছিল। মাঝখানে একা পড়ে গিয়ে আওরঙ্গজেব একটু শীতলতা অনুভব করলেন। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন পাথর আর ছোট ছোট নুড়িপাথরে ঢাকা পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে শরতের সূর্য ঢাকা পড়েছে। একচিলতে যে আকাশ দেখা যাচ্ছিল সেখানে হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার করতে করতে কতগুলো কালো প্যাঁচা এসে অন্ধকারে ঢেকে দিল। একটি মুহূর্ত তাঁর মনে হল উপরের পাথরের মাঝে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। ওটা কি গাদা বন্দুকের গুলি চালানোর ক্রমাগত পট পট শব্দ? নাকি শুধু ছুটে চলা মেঘ ছায়া সৃষ্টি করেছে আর অনেক দূরে বাজ পড়ার মৃদু গুড়গুড় শব্দ? তারপর হঠাৎ তাঁর সমস্ত দেহরক্ষী তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে তাদের ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলো। ঘোড়াগুলো তখন মৃদু হ্রেষাধ্বনি করে বিপদসঙ্কেত দিল।

সামনে কি হয়েছে দেখার জন্য আওরঙ্গজেব তাঁর দেহরক্ষীবাহিনীর একজন সেনা কর্মকর্তাকে বলতে যাবেন, এমন সময় তিনি একটি চিৎকার শুনতে পেলেন, 'আমার পথ ছাড়। আমাকে জাঁহাপনার কাছে গিয়ে খবর পৌছাতে হবে।' তারপর দেখলেন সামনের একটু হট্টগোলের মধ্য থেকে একজন তরুণ অশ্বারোহী বেরিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ান দেহরক্ষীদের সারির সামনে থামলো। আওরঙ্গজেব আদেশ করলেন, 'ওকে আসতে দাও।' সাথে সাথে দেহরক্ষীরা দুপাশে সরে দাঁড়াল। একমুহূর্ত পর তিনি হাত তুলে তরুণটিকে প্রথানুযায়ী সম্রাটকে কুর্নিশ করা থেকে বিরত করে বললেন, 'ঐসব লৌকিকতা এখন থাক। সামনে কি হয়েছে? কেউ হামলা করেছে?'

'হ্যাঁ জাঁহাপনা। আমার বাবা ইউসুফ খান আজ অগ্রগামী দলের নেতা। সামনের বাঁক ঘুরে গিরিপথের সবচেয়ে সংকীর্ণ পথে ঢুকতেই পাহাড়ের চূড়া থেকে একপশলা গুলিবৃষ্টি হল। সামনের সারির কয়েকজন ঘোড়সওয়ার ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে গেল। আমার মনে হয় দু-তিনজন আহত হয়েছিল—ওদের ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে সওয়ারিসহ দ্রুত গিরিপথের উপরের দিকে কিছুটা পথ ছুটে গেল। আমার বাবা দলের পরবর্তী সারির রক্ষী সেনাদেরকে ঘোড়া থেকে নেমে আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। বিশেষত তিনি বরকন্দাজদের বললেন গাদা বন্দুকে গুলি ভরে প্রস্তুত হতে। গুলিগুলো কোথা থেকে এসেছিল তা দেখার জন্য তারপর আমরা উপরের দিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। তবে কাউকে দেখা গেল না—তারপর হামলাকারীরা দ্বিতীয়বার গুলিবর্ষণ

করে আমাদের কয়েকজনকে হতাহত করলো। হট্টগোলের মধ্যে আরো কয়েকটা ঘোড়া ছুটে পালাল।

'পরেরবার আমাদের শত্রুরা গুলি ছোড়ার সময় যেসব জায়গা থেকে ধোঁয়া বের হয়েছিল, সেদিকে লক্ষ্য করে বাবা আমাদের বন্দুকধারী সেনাদেরকে গুলি ছুঁড়তে বললেন। উপরে উঠে শত্রুপক্ষের গতিবিধি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তারপর তিনি চারজন গুপ্তদূতকে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে বললেন। যাইহোক ওরা পাথুরে পাহাড়ের গায়ে পা রাখার জায়গা খুঁজে কোনোমতে উঠার চেষ্টা করতেই উল্টোদিকের চূড়া থেকে আবার গুলি বর্ষণ হল। দুইজন দুই হাত দুই দিকে ছুঁড়ে নিচে পড়ে গেল। একজন নিচে গিরিপথের পাথুরে পথে পড়ে গিয়ে মাথা ফাটাল। অন্যজনের দেহটি পাহাড়ের পাথুরে গা বেয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে স্থির হয়ে রইল। আমার বাবা চিৎকার করে বাকি গুপ্তদূতদের ফিরে আসতে বললেন, তারপর রক্ষীবাহিনীর বাকি সদস্যদের পিছু হটে বাঁক পেরিয়ে নিরাপদে অবস্থান নিতে বললেন। তারপর তিনি আমার কাছে এসে বললেন দ্রুত ছুটে গিয়ে আপনাকে খবরটা জানাতে।

'ওখানে কয়জন হামলাকারী আছে?'

'আমি ঠিক জানি না। তবে এক একবার গুলিবর্ষণের সময় মনে হয়েছিল একসাথে অনেক গাদা বন্দুক ব্যবহার করা হয়েছিল। আর প্রত্যেকবার বিশ থেকে ত্রিশজন মানুষ কিংবা ঘোড়া আহত হয়ে পড়ে গিয়েছিল। যে দূরত্ব থেকে হামলাকারীরা গুলি ছুঁড়ছিল তাতে আমার ধারণা, দশটির মধ্যে একটা গুলি লক্ষ ভেদ করার কথা। সে হিসেবে শত্রুর সংখ্যা তিনশোর কম হবে না।'

'তুমি যা বললে, তাতে আমার মনে হচ্ছে সংখ্যাটা আরো বেশি হবে। গিরিপথটি ওরা বন্ধ করে দিয়েছে?'

'আমারও তাই মনে হয়। এখানে আসার ঠিক আগে আমি একজন সেনাকে উপরে উঠে দেখতে বলেছিলাম। সে উপরের ঢাল থেকে চিৎকার করে জানাল সামনের আরেকটি বাঁকের কাছে পথের উপর গাছের গুড়ি-ডালপালা আর বড় বড় পাথর ফেলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। তবে তার দেখার ভুলও হতে পারে।'

'আমার তা মনে হয় না।' এই কথাটি বলে আওরঙ্গজেব থেমে কিছুক্ষণ ভাবলেন। অজানা সংখ্যক তবে যথেষ্ট পরিমাণে হামলাকারী আর সামনে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ থাকার অবস্থায় পিছু হটাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তিনি তরুণটিকে বললেন, 'তুমি তোমার বাবার কাছে ফিরে যাও। তাকে বল পিছু হটে আসতে।' তারপর সম্রাট তার দেহরক্ষীদেরকে বললেন, 'সৈন্যসারি ধরে

পেছনে গিয়ে অন্য অধিনায়কদেরকে বল পেছনে ফিরে যেতে, তবে সতর্ক করে দেবে ওরা যেন সামনে আর পেছনের দলের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে শৃঙ্খলা মেনে চলে। সেনাদলের কোনো অংশ যেন অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে।’

সেদিন সন্ধ্যায় গিরিপথের ঢোকার মুখে একটি সমতল জায়গায় তাঁবু স্থাপন করা হল। আগুন জ্বালাবার পর আওরঙ্গজেব একটি সমরসভা ডেকে অধিনায়কদের আসার অপেক্ষা করছিলেন। যেরকম আশা করা হয়েছিল, সেনা প্রত্যাহার সেরকম হলেও তিনি প্রায় একশো সেনা হারিয়েছিলেন। বেশিরভাগ পাহাড়ের উপর থেকে গাদা বন্দুকের গুলি লেগে নিহত হয়েছিল। এছাড়া হঠাৎ দু-একজন উন্মত্ত হামলাকারী চিৎকার করতে করতে তাদের লুকোনো জায়গা থেকে বের হয়ে আফগান তলোয়ার হাতে সৈন্যদলের উপর হঠাৎ হামলা করেছিল। কয়েকজনকে হতাহত করার পর ওরাও যথারীতি নিহত হল।

ইউসুফ খানের নেতৃত্বে অগ্রগামী বাহিনীর শেষদলটি যখন গিরিপথ থেকে বের হয়ে আসছিল, তখন তিনটি ঘোড়া গিরিসঙ্কট ধরে ওদের দিকে ছুটে আসছিল। প্রতিটি ঘোড়ার জিনের উপর সবুজ পোশাকপরা মোগল সৈন্যের দেহ শোয়া অবস্থায় ছিল। ওদের হাত-পা একসাথে ঘোড়ার পেটের সাথে রশি দিয়ে বাঁধা ছিল। ইউসুফ খানের সেনারা রশি কেটে দেহগুলো আতঙ্কিত ঘোড়াগুলোর পিঠ থেকে নামিয়ে দেখতে পেল ওরা তাদেরই লোক, প্রথম আক্রমণের সময় যাদের ঘোড়াগুলো সামনের দিকে ছুটে গিয়েছিল। ওদেরকে ভয়ঙ্করভাবে বিকলাঙ্গ করা হয়েছে। একজনের লিঙ্গ কেটে তার মুখে পুরে দেওয়া হয়েছে। অন্য দুজনের চোখ খুবলে নেওয়া হয়েছে, নাকের ছিদ্র কেটে ফাঁক করে দেওয়া হয়েছে আর কান আর জিহ্বাও কেটে নেওয়া হয়েছে। মৃতদেহগুলোর সাথে কোনো বার্তা ছিল না, তবে এর অর্থ পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। এই পাহাড়ি এলাকার বন্য মানুষের মাঝে মোগল আইন চলবে না।

সেনাপতিরা এগিয়ে আসছিলেন। সবার আগে ছিলেন মারওয়ারের শাসক, রাজা যশবন্ত সিং। কমলা রং-এর যুদ্ধবেশপরা তার একজন যোদ্ধা আগে আগে একটি অগ্নিশিখার প্রতীক সম্বলিত পতাকা বয়ে নিয়ে আসছিল। তাকে দেখার সাথে সাথে আওরঙ্গজেবের আরেকজন রাজপুত সেনাপতি—আম্বারের অশোক সিং-এর কথা মনে পড়ে গেল। কয়েকবছর আগে যখন বলখ আর সমরকন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান হয়েছিল, তখন একই রকম পরিস্থিতিতে সেনা

প্রত্যাহার করার নির্দেশ তিনি অমান্য করেছিলেন। বরং তিনি এবং তার অনেক সৈন্য অদ্ভুত এক ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের সম্মান রাখার উদ্দেশ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে প্রাণ দিয়েছিলেন।

যেসব অঞ্চল সরাসরি মোগল শাসনে রয়েছে, কেবল সেসব জায়গার আওরঙ্গজেব হিন্দু প্রজাদের উপর বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন। তাঁর অধীনস্থ সামন্ত রাজ্যগুলো এর আওতার বাইরে ছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল রাজস্থান, যারা আগের নিয়মেই চলতো। দূরদর্শিতা দেখিয়ে তিনি এই পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন, তবে সব সময়ের জন্য নয়। সময় সুযোগ এলে তিনি এই তেজস্বী রাজপুতদের উপরেও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন। দীর্ঘদিন থেকে এদের উপর তাঁর আস্থা নেই। এদের পরিবর্তনশীল ব্যক্তিত্বের তল পাওয়া বেশ কঠিন। কেননা এদের 'মৃত্যু অথবা বিজয়'—এই কৌশলটি সামরিক বা যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত কৌশলের সাথে খাপ খায়। আর ওদের কুফরি ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বলার কিছুই নেই, এদের ধর্মীয় প্রথানুযায়ী নারীরা স্বামীর সাথে জলন্ত চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণবিসর্জন দেয়।

কোন রাজপুত রাজা অবশ্য এ পর্যন্ত তাদের স্বধর্মের লোকদের প্রতি তিনি যে আচরণ করছেন, সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিবাদ করে নি। তবে তাঁর গুপ্তচরেরা তাদের আশঙ্কা সম্পর্কে তাঁকে জানিয়েছিল। সেকারণেই উত্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধাভিযানে সাধারণত যা করা হত তার চেয়ে অনেক বেশি রাজপুত সৈন্য এবং সেনাপতি তিনি তাঁর সেনাদলে সংযুক্ত করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এদের দেহমনকে অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত রাখা, আর কোথাও হিন্দু কোনো সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দিলে তা থেকে ওরা যেন দূরে থাকে। বিশেষত যশবন্ত সিং-এর বিশ্বস্ততা নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে তাঁর সন্দেহ ছিল। গৃহযুদ্ধের সময় তিনি অতিদ্রুত, বেশ সহজভাবে পক্ষবদল করে আওরঙ্গজেবের পক্ষে চলে এসেছিলেন।

আওরঙ্গজেব এবার বললেন, 'তাঁবুর ভেতরে আসুন যশবন্ত সিং।' রাজপুত রাজা মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে ভেতরে ঢুকলেন, তাকে অনুসরণ করে অন্যান্য সেনাপতিও ঢুকলেন। সবাই ভেতরে ঢোকার পর আওরঙ্গজেব ঘুরে নিজেও ঢুকে তারপর বললেন, 'আপনারা সবাই বসুন। আমাদেরকে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে সামনে এগোবার সবচেয়ে ভাল উপায় কোনটি। তবে সবার আগে জানতে হবে, আজ রাতে আমাদের এই শিবিরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট প্রহরী আর পাহারা-চৌকির ব্যবস্থা করা হয়েছে কি-না।'

যশবন্ত সিং উত্তর দিলেন, 'অবশ্যই করা হয়েছে, জাঁহাপনা। আমরা প্রহরীর সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে তিনগুণ বৃদ্ধি করেছি আর সীমানা রেখার চারপাশ ঘিরে অশ্বারোহী সেনাদল টহল দিচ্ছে।'

'বেশ ভাল। আর আগামীকালের জন্য আপনাদের মতামত কী?'

যশবন্ত সিং আবার উত্তর দিলেন, 'পাহাড়ি এই উপজাতিদের সম্পর্কে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। তা থেকে আমি বলতে পারি, রাতের বেলা ওরা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে। আর তা যদি ওরা নাও করে, তাসত্ত্বেও জোর করে গিরিপথ পার হওয়ার চেষ্টা করা বোকামি হবে। আমাদেরকে ওদের পাশ কাটিয়ে বা এড়িয়ে যেতে হবে। এটা খুব একটা কঠিন হবে না। এখানে ইতোপূর্বেকার আমার কয়েকটি সফল অভিযানের কথা মনে পড়ে, এই পাহাড়গুলোর মধ্য দিয়ে আরো অনেক গিরিপথ আছে।

আওরঙ্গজব মৃদু হাসলেন। যশবন্ত সিং-এর উপদেশটি বেশ ভাল। সামরিক দক্ষতা আর অভিজ্ঞতা নিয়ে তার বেশ গর্ব রয়েছে। তার এই আত্মতৃপ্ত মতামতটি সম্রাটকে একটি ধারণা দিয়েছে—যা এই রাজপুত রাজাটি পছন্দ করবেন না। তবে এতে ক্ষতিকর কিছু করা থেকে তিনি দূরে থাকবেন আর কয়েক বছরের জন্য সম্রাটের ক্ষমতার কেন্দ্র থেকেও দূরে থাকবেন। এই অভিযানটি বিজয় লাভের পর তিনি এই পার্বত্য এলাকায় যশবন্ত সিং-এর নিজ দাবিকৃত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তাকে জানাবেন, নতুন এই পদের জন্য তিনিই একমাত্র উপযুক্ত প্রার্থী আর সেজন্য যশবন্ত সিংকেই তিনি বিদ্রোহীসুলভ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সুবেদার নিযুক্ত করবেন।

খাইবার গিরিপথের কাছেই তাঁবুতে যশবন্ত সিং শুয়ে রয়েছেন, তার চোখে ঘুম নেই। তাঁবুর চারপাশ ঘিরে শীতের হাওয়ার গর্জন শোনা যাচ্ছে, বাতাসে তাঁবুর ক্যানভাসের দেয়াল কাঁপছিল। পারস্যের মদদে যে বিদ্রোহী আর দস্যুদল উত্তরের গিরিপথ দখল করেছিল আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনী অতিদ্রুত তাদেরকে হটিয়ে দিয়ে গিরিপথগুলো মুক্ত করলো। তবে একাজে সহায়তার জন্য রাজপুতরা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে তাকে এখানকার সুবেদার নিযুক্ত করায় বিস্মিত হওয়ার সাথে সাথে তিনি বেশ হতাশও হয়েছিলেন। তবে সম্রাট যখন তার অভিজ্ঞতার গদগদ প্রশংসা করছিলেন আর জোরালোভাবে বলেছিলেন যে এই পদের জন্য তিনিই শ্রেষ্ঠ, তখন তাঁর সম্রাটের এই সিদ্ধান্তে প্রশ্ন করার কোনো কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

এটা বেশ কয়েকমাস আগের কথা। এখানকার শাসনকর্তৃত্ব পাওয়ার পর তার পূর্বসুরিদের মতো তিনিও আবিষ্কার করলেন যে, এই পার্বত্য উপজাতিদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা কি কঠিন ব্যাপার। উপজাতিরা তার সীমান্তবর্তী দুর্গে আক্রমণ চালাতো, আর তার রসদ সরবরাহ ব্যবস্থার উপর অতর্কিত হামলা করতো। প্রতিটি হামলার পর তাদেরকে ধরার আগেই ওরা অদৃশ্য হয়ে যেত। তাদের গাদা বন্দুকের পাল্লা তার নিজের সেনাদের চেয়ে বেশি ছিল আর পাহাড়ি ছাগলের মতো ওরা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উঠানামা করতো। এছাড়া কোনো মোগল সৈন্য তাদের হাতে ধরা পড়লে ওরা বন্দী সেনার উপর অত্যন্ত জঘন্যভাবে বর্বর নৃশংসতা চালাত। আর এতে অন্যদেরকে বাধ্য করতো দলে ভারী হয়ে তাদের পিছু করতে। কেবল যে কোনো ছুতায় ওদের নিজেদের মধ্যে লড়াই করার স্বাভাবিক প্রবণতাই ওদেরকে সম্পূর্ণ প্রদেশে ছড়িয়ে পড়া ও দখল করা থেকে বিরত রেখেছে। বিশেষত তার রাজপুত সেনারা পার্বত্য অঞ্চল, এর আবহাওয়া আর স্থানীয় অধিবাসীদেরকে সমানভাবে ঘৃণা করে। সমতল এলাকার অন্যদের মতো তিনি নিজেও বেশ কয়েকবার সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হয়েছেন আর দিন দিন এটা এখন ঘন ঘন হচ্ছে।

নতুন করে ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটায় তাঁবুটি আবার কেঁপে উঠলো। যশবন্ত সিং কেঁপে উঠলেন। এক গাদা ভেড়ার চামড়ার কম্বল শরীরে জড়িয়ে আর তাঁবুর এক কোণে পিতলের পাত্রে কাঠ-কয়লার আগুন জ্বলা সত্ত্বেও ঠাণ্ডায় তার হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠতে লাগলো। চোখ বুজে তিনি মুখে রোদের উত্তাপের কথা মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তার মনে পড়লো সেই বহুদূর চলে যাওয়া অপূর্ব সুন্দর রাজস্থানি মরুভূমিতে সূর্যাস্তের সময় তার বিশাল বেলে পাথরের দুর্গ মেহরানগড় কিরকম লাল হয়ে যেত। আর কি কখনও তিনি তার স্বদেশ দেখতে পাবেন? কোন কারণে তার এতে সন্দেহ হচ্ছে। এখানকার আবহাওয়া আর অসুখবিসুখ তাকে কাবু করে ফেলছে। সূর্য, চন্দ্র আর আগুনের অধিবাসীর একজন পুত্রের কি পরিণতি হয়েছে, এই ঠাণ্ডা, রুক্ষ দেশে অরাজক উপজাতিদের সাথে লড়াই করার জন্য তাকে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। এমন একজন সম্রাট এই দণ্ডাদেশ দিয়েছেন, যাকে তিনি কখনও ভালোবাসেন নি, শুধু নিজের স্বার্থ বা সুবিধার কারণে তাঁর কাজ করছেন। অথচ তাকে এখানে ফেলে রেখে তিনি নিজে দিল্লি চলে গেছেন। হয়তো দেবতারা তাকে এই শাস্তি দিয়েছেন, কেননা শাহজাহান জীবিত থাকতেই তিনি আওরঙ্গজেবের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন। তবে সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হল তিনি অনুভব

করতেন যে, সম্রাট তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না—তবে তার মানে এই নয় যে সম্রাট কাউকে বিশ্বাস করেন। আর বিশেষত যশবন্তের নিজের জাতি বা ধর্মের কাউকেই বিশ্বাস করেন না।

আর যদি তিনি এই শীতল সুদূর পাহাড়ি অঞ্চলে মারা যান তাহলে মারওয়ারের কি হবে? তার একমাত্র পুত্র জগত সিং তার সাথে উত্তরের যুদ্ধাভিযানে এসেছিল, সেও ছয়মাস আগে নিহত হয়েছে। শত্রুদের অতর্কিত আক্রমণে তার ঘোড়াটি আহত হয়ে তাকে গভীর খাদে ফেলে দেয়। তার বংশের অনেক রাজপুত্র সিংহাসনে বসতে চাইবে। তিনি কোনো একটি ব্যবস্থা না করলে সেখানে গৃহযদ্ধ বেঁধে যাবে আর সেই সুযোগে মোগলরা তার রাজ্য দখল করে নেবে। ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি আবার কাশতে শুরু করলেন, কাশির সাথে ফেনার মতো রক্ত বের হয়ে এল। সাথে সাথে ভেজা একটা কাপড়ের টুকরা দিয়ে ঠোঁট মুছলেন। এই কাপড়টা আজকাল সব সময় তার কাছেই থাকে। আর দেরি করা যাবে না। তিনি পরিচারককে ডেকে বললেন, ‘একটা কাগজ আর কলম নিয়ে এস।’

ভেড়ার চামড়ার কম্বল গায়ে জড়িয়ে বসে তিনি কাঁপা কাঁপা হাতে তার মুখ্য মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখতে শুরু করলেন। তার উত্তরাধিকার কে হবে সে বিষয়ে তার ইচ্ছার কথা লিখলেন। তার দুইজন স্ত্রী এখন সন্তানসম্ভবা। যদি একজনের ছেলে হয় তবে সে হবে পরবর্তী রাজা। দুজনেরই ছেলে হলে, প্রথম যার জন্ম সে হবে উত্তরাধিকারী। আর যদি কারও পুত্র সন্তান না হয়, তবে তার ভাইয়ের ছেলে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে। চিঠি লেখা শেষ করার পর কাগজে গরম মোমের প্রলেপ দিয়ে তার সীলমোহর দিয়ে ছাপ মেরে দিলেন। তারপর যশবন্ত সিং শুয়ে পড়লেন, বাইরে ঝড়ো বাতাস প্রচণ্ড শো শো শব্দ করে চললো। পরিশেষে এখন মৃত্যু যদি শীঘ্রই চলেও আসে তিনি তার রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পেরেছেন, অবশ্য তার মনে হচ্ছে মৃত্যু আসলেই সন্নিকটে।

অধ্যায় : সাত

একজন রাজার সিংহাসনে আরোহণ– রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান

দিল্লির লাল কেল্লার দেওয়ান-ই-খাসে আওরঙ্গজেব তাঁর সামনে পা ভাঁজ করে বসে থাকা সভাসদদের দিকে তাকালেন। এদের মাঝে তাঁর দুই মধ্যম পুত্রও বসে রয়েছে। উপদেষ্টাদের সভায় আজম আর আকবরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের উপস্থিতিতে তিনি তাদের বুদ্ধিমত্তা যাচাই করতে পারবেন আর সেই সাথে তাদেরকে সরকার পরিচালনার কৌশল শেখাবেন, যা তাঁর বাবা তাঁকে শেখাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এছাড়া শীঘ্রই তিনি তাদেরকে সুবেদার হিসেবে নিযুক্ত করবেন, যেরকম বড় ছেলে মুয়াজ্জমকে গুজরাটের সুবেদার নিযুক্ত করেছেন। তবে এখন তাঁকে আরো জরুরি একটি বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে। গতকাল একজন কাসিদ কাবুলের কাছে যশবন্ত সিং-এর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসেছে।

আওরঙ্গজেব বললেন, 'আপনারা সকলে জানেন আজ কেন আপনাদেরকে এখানে আমি ডেকেছি। যশবন্ত সিং মারা গেছেন। এমন একজন মানুষ যার আনুগত্য প্রশ্নাতীত ছিল না, তার মৃত্যুতে আমি খুব বেশি শোক প্রকাশ করার ভান করতে পারি না। কাজেই শুধু শুধু মিথ্যা ভাবাবেগ না দেখিয়ে আমি সময় নষ্ট করবো না। তার চেয়ে বরং মারওয়াড়ের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থার বিষয়ের দিকে আমরা কথা বলবো।' তারপর তিনি তাঁর কোষাধ্যক্ষ সাদাচুলের আবদুল আসিফের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যশবন্ত সিং-এর কর্মকর্তারা কি বাৎসরিক বকেয়া কর রাজকোষে জমা করেছে?'

'না জাঁহাপনা।'

'তাহলে ওরা বকেয়া কর পরিশোধ করা পর্যন্ত প্রশাসনের ভার নিতে মারওয়ারে আপনার লোক পাঠাবেন।'

আজম জিজ্ঞেস করলেন, 'মারওয়ারের অধিরাজ হিসেবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারের বিষয়ে আপনি কী করবেন?'

'যে কাসিদ যশবন্ত সিং-এর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসেছিল, সে সাথে করে তার শেষ ইচ্ছাপত্র আর উইলের একটি অনুলিপিও নিয়ে এসেছিল। হঠকারিতা করে সে এই উইলে কে উত্তরাধিকারী হবে তা লিখেছে অথচ একটি করদ রাজ্যের চুক্তির নিয়মে রয়েছে, তার ইচ্ছার কথা পরিষ্কার উল্লেখ করে শেষ সিদ্ধান্ত অধিরাজ হিসেবে আমার হাতে ছেড়ে দেওয়ার কথা। একাজটি করে সে তার নিজের এবং স্বজাতির চরিত্রানুযায়ী ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে। যশবন্ত সিং অবশ্য আমার কাজ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে, তাই আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ হব না। তার দুই বিধবা স্ত্রী শরৎকালে কাবুল থেকে ফেরার পথে লাহোরে দুটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে। আমি ওদেরকে দিল্লিতে ডেকে পাঠাবো যাতে ন্যায় সিদ্ধান্ত নিতে পারি। ইতোমধ্যে আমি অস্থায়ীভাবে প্রশাসক হিসেবে মারওয়ারে আমার রাজকর্মচারী নিযুক্ত করবো যাতে রাজপুতরা বুঝতে পারে যে, আমার সাম্রাজ্যে আমার শাসনক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবার ক্ষেত্রে তারা ব্যতিক্রম নয়। মারওয়ারে যাওয়ার জন্য যে রাজ কর্মচারীদেরকে বাছাই করা হবে, তাদেরকে অবশ্যই শক্ত মুসলিম, কঠিন চরিত্রের অধিকারী, বিশ্বস্ত এবং দায়িত্ব-কর্তব্যে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি হতে হবে। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের মতো হিন্দু ধর্মীয় উৎসব নিষিদ্ধ করে ওরা ফরমান জারি করবে। এছাড়া আমি ওদেরকে আদেশ করছি একটি বিখ্যাত হিন্দু মন্দির বেছে নিয়ে তা ধ্বংস করবে। এটি মারওয়াড়ি আর রাজপুতনার অন্যান্য রাজ্যগুলোর অধিবাসীদের মধ্যে একটা সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করবে। যাতে ওরা আমার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে, যা জীবিতকালে যশবন্ত সিং-এর আচরণে আর মৃত্যুর আগে তার শেষ ইচ্ছায়ও দেখা যায় নি।'

আকবর বললেন, 'কিন্তু বাবা, মোগল কর্মকর্তাদের আগমনে মারওয়াড়িরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে। আর আপনি যদি ওদের একটিও পবিত্র স্থান ভেঙ্গে ফেলেন, তবে সেটা আগ্রাসন কিংবা বিনা উস্কানিতে একটি লড়াইয়ের নমুনা হিসেবে দেখা হবে না? এই লোকগুলোতো আমাদের মিত্র। আর বিশেষত এমন একটি সময়ে আমরা ওদেরকে ক্ষুব্ধ করে তুলছি, যখন ওরা ওদের মৃত রাজার শোকপালন করছে। তাছাড়া এমনিতেই আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছে—দাক্ষিণাত্যে শিবাজি ছাড়াও সাম্রাজ্যের অন্যান্য এলাকাতেও বিদ্রোহ চলছে, তাই না? এধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার আগে আমাদের কি আরো বিবেচনা করা উচিত না?'

এমন সময় আজম বলে উঠলো, 'তুমি সব সময় কাজে না লেগে দেরি করার কারণ খুঁজে বেড়াও। তুমি কি কখনও কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারো না ভাই?'

আওরঙ্গজেব ভাবলেন, ধীরস্থির এবং সবার প্রিয় আকবরের তুলনায় আজম তার মৃত ইরানি মায়ের দুর্দমনীয় মেজাজ পেয়েছে। আযম অবশ্য ঠিকই বলেছে। আকবরকে শিখতে হবে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্মের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই একমাত্র উপায়। তবে অধৈর্য আর উগ্র আজমেরও কিছু শেখার দরকার আছে—সভাসদদের সামনে তার জিহ্বা সামলাতে হবে। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে শাহজাদাদের ঝগড়া করা উচিত নয়। ভ্রু কুঁচকে তিনি এক হাত তুললেন। বাবার চোখে ভর্ৎসনার আভাস পেয়ে আজম চুপ করলো। আকবরকে দেখে মনে হচ্ছিল ভাইয়ের মন্তব্য শুনে সে মনে কষ্ট পেয়েছে। আওরঙ্গজেব আকবরের দিকে ফিরে বললেন, 'আকবর, যেটা তোমার কাছে বৈধ প্রশ্ন মনে হয়েছে তা তুমি আলোচনায় পেশ করেছ, তবে একবার নিজেকে প্রশ্ন কর   রাজপুতরা কি আসলেই আমাদের মিত্র? ওরা আমাদের ধর্মের নয় আর আমাদেরকে সামন্তপ্রভু স্বীকার করেছে, কেননা আমাদের উদারতা থেকে ওরা উপকৃত হচ্ছে। ওদের উপর প্রাথমিক বিজয়লাভের পর আমার প্রপিতামহ সম্রাট আকবর ওদের প্রতি খুব বেশি উদারতা দেখিয়েছিলেন। আর তাই করেছিলেন তোমার পিতামহ—তিনি ওদের কাছ থেকে কেবল ভাসা-ভাসা আনুগত্যের শপথ খুঁজেছিলেন। আর তারপর যখন নতুন একজন রাজপুত রাজা সিংহাসনে বসলো, ওরা সবাই তাদের ঔদ্ধত্য আর অহঙ্কার দেখাতে উৎসাহিত করলো। রাজপুতরা একটি উচ্চণ্ড এবং বিশৃঙ্খল জাতি। ওদের সাথে প্রশংসা আর আপসমূলক আচরণ না করে, আমাদের পূর্বপুরুষদের উচিত ছিল ওদের উপর আমাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। এখন যশবন্ত সিং-এর মৃত্যুর পর তাদের কাজকর্মে বিশৃঙখল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, কাজেই এই সুযোগে মারওয়াড়িদেরকে ওদের উপরে আমার ক্ষমতার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে। আর যদি ওরা আমাকে অমান্য করে তাহলে ওরা নয়, আমরা উপকৃত হব। আশা করি তুমি সেটা বুঝতে পেরেছ আকবর?'

আকবর শান্তভাবে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, বুঝেছি বাবা।'

দিল্লি কেল্লার কেন্দ্রীয় উঠানের পানির ফোয়ারার পাশ দিয়ে দ্রুত হেঁটে আওরঙ্গজেব হেরেমের চন্দনকাঠের ফটকের দিকে চললেন। ফটকের সামনে দাঁড়ান দুজন তুর্কি নারী প্রহরী ফটক খুলে ধরতেই মেয়েমহলের রোজমেরি, প্যাচুলি আর কস্তুরির মৃদু সুগন্ধ তাকে ঢেকে ফেললো। লাল মখমলের পর্দা ঝুলানো উদিপুরী মহলের আবেদনময় প্রমোদমহলের দিকে না ঘুরে জাহানারা হেরেমে

এলে যে অনাড়ম্বর কামরাগুলো ব্যবহার করেন সেদিকে চললেন। জাহানারা তাঁর পরিচারিকাকে পাঠিয়ে তাঁকে দেখা করার জন্য অনুরোধ জানাবার সাথে সাথে তিনি এখানে চলে এসেছেন। জাহানারাকে দেখলে তিনি খুশি হবেন। তিনি যা ভেবেছিলেন, সাম্রাজ্যের পাদিশাহ বেগম হিসেবে জাহানারা তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে পালন করছিলেন। তিনি যথাযথ আনুষ্ঠানিকতার সাথে রাষ্টদূত এবং করদরাজ্যের রাজাদের স্ত্রীদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন, তাঁর কথা ও বুদ্ধি দিয়ে তাদেরকে মুগ্ধ করছিলেন। এছাড়া বিপদগ্রস্ত রাজ কর্মকর্তা ও অন্যান্য বিধবার সাহায্যের আবেদনের জবাব দিচ্ছিলেন। হেরেমের খোজাদের প্রশাসন দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছিলেন। এতগুলো নারী যেখানে একত্রে বসবাস করছেন, স্বভাবতই সেখানে তাদের পরস্পরের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি আর হিংসাবিদ্বেষ হতে পারে, তিনি সেগুলোরও সমাধা করছিলেন। তাঁর আলাদা ভবনের নির্জনতায় আশ্রয় নেওয়ায় সম্ভবত পরবর্তী কাজটি সহজ হয়েছিল।

আওরঙ্গজেব কামরায় ঢুকে দেখলেন জাহানারা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর পায়ের আওয়াজ শুনে তিনি মাথা উঁচু করে ঘুরে তাকালেন। আওরঙ্গজেব অবাক হয়ে দেখলেন তিনি ভ্রু কুঁচকে রয়েছেন, মুখের হাসিতে আর কালো চোখে কোনো উষ্ণতা নেই। কোনো ভনিতা না করে, কোনো ধরনের সম্ভাষণ না করে তিনি প্রথমে কথা বললেন, 'আমি গুজব শুনতে পেলাম, মারওয়াড়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া আর হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে নানা-ধরনের বিধি-নষেধ আরোপ করার পরও তুমি সন্তুষ্ট না হয়ে যারা তোমার স্বধর্মের নয় তাদের সবার উপর জিজিয়া কর আরোপ করতে চাচ্ছ। বিধর্মীদের উপর করারোপের প্রথা সম্রাট আকবর উঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমার এটা বিশ্বাস হচ্ছে না। এটা সম্পূর্ণ পাগলামি।'

হঠাৎ এরকম প্রচণ্ড আক্রমণে আওরঙ্গজেব একটু ইতস্তত করতে লাগলেন। যেভাবেই হোক ভুল বুঝার কারণে জাহানারা যা সত্যি বিশ্বাস করেন তাই বলছিলেন। তাঁর চারপাশে আর যারা আছেন—এমনকি তাঁর পরিবারের সদস্যদের মতোও জাহানারা নিজের স্বার্থে প্রণোদিত হয়ে চলেন না। তিনি যতদূর সম্ভব কণ্ঠস্বর শান্ত এবং নিচু করে বললেন, 'হ্যাঁ। আমি আমাদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী জিজিয়া কর আরোপ করতে যাচ্ছি। এটা করার জন্য আমাকে সমালোচনা না করে বরং তোমার উচিত আমাদের পূর্বপুরুষদের সমালোচনা করা যারা এ প্রথা বিলোপ করেছিলেন।'

জাহানারা প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আওরঙ্গজেব, তুমি কি করে এটা করতে পারলে? আর আমাকে আগে বলোনি কেন? আমাদের পূর্বপুরুষরা যা

করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে গেছেন তুমি তার সমস্ত পরিত্যাগ করছো। এই কর উঠিয়ে দিয়ে তাঁরা আমাদের জনগণের মাঝে একতা আর সমতা আনার চেষ্টা করছিলেন। তুমি ভুলে গেছ এটা মুসলিম দেশ নয়—আমি তোমাকে আগেই বলেছি এখানকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই হিন্দু। কিন্তু তুমি এমন আচরণ করছো, যা বিভক্তি আর বিদ্রোহ ডেকে আনছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা যদি এমন আচরণ করতেন, তাহলে আমাদের সাম্রাজ্য কখনও টিকে থাকতে পারতো না। তুমি আমার কথা শোন...আমার কর্তব্য তোমার সাথে মনখোলা হওয়া। নাছোড়বান্দার মতো যদি এতে অটল থাক, তাহলে তোমার অনেক বিশ্বস্ত প্রজাকে দূরে সরিয়ে দেবে। আর তাদের তীব্র ক্রোধ আমাদের মাথায় আঘাত হানবে। শূন্য থেকে তুমি এমন একটি ঝড় ডেকে আনবে, যা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কেন তুমি এটা দেখতে পাচ্ছ না?' জাহানারা থামলেন, তার চোখমুখ লাল হয়ে রয়েছে।

'আমি আবার বলছি, করারোপ করাটা আমাদের ধর্মীয় প্রথানুযায়ী একজন শাসকের অবশ্য পালনীয়। আর আমি প্রচলিত মতে বিশ্বাসী একজন মুসলিম শাসক।' কথাটি বলার সময় অনেক চেষ্টা করেও আওরঙ্গজেব তার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা লুকাতে পারলেন না। তারপর বলে চললেন, 'আমি দুঃখিত যে কথাটা আগেই তোমাকে বলা হয়নি, তবে এ ব্যাপারে তোমার প্রতিক্রিয়া আমি আগে থেকে আঁচ করতে পেরেছিলাম। তাছাড়া তোমার সাথে ঝগড়া করার আমার কোনো ইচ্ছে ছিল না। এজন্য আমি আন্তরিকভাবে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তবে তোমাকে একটা বিষয় বুঝতে হবে যে, এগুলো তোমার বিবেচনার বিষয় নয়। একজন নারী হিসেবে বাইরের পৃথিবীর ব্যাপারে আমার দিক নির্দেশনা তোমার গ্রহণ করা উচিত, যেরকম আমাদের পারিবারিক বিষয়েও তোমার উপদেশ আমি প্রায়ই মেনে চলি।'

জাহানারা তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। একটা মুহূর্ত তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি হয়তো তাঁকে আঘাত করতে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি আওরঙ্গজেবের সামনে হাঁটুগেড়ে বসে তাঁর দিকে তাকিয়ে অনুনয় করে বললেন, 'দয়া করে বিয়ষটি আরেকবার বিবেচনা কর! আমার জন্য আর আমাদের বংশের খাতিরে।' এবার তিনি তাঁর দুই পা চেপে ধরে বললেন, 'যদি তুমি এবিষয়ে অটল থাক তবে আমাদের সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।'

আওরঙ্গজেবের আর কিছুই বলার ছিল না। এনিয়ে আর তর্ক করা মানে নিজেদের মধ্যে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা আরো গভীর করে তোলা। দুজনের মধ্যে কেউ হয়তো এমন কিছু বলে ফেলবেন—যার জন্য হয়তো পরে অনুতপ্ত হতে

হবে। কাজেই অতীতের কথা না তোলাই ভাল। বোনের হাত থেকে অত্যন্ত ধীরে ধীরে নম্রভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি পেছনে ঘুরে আড়ষ্টভাবে হেঁটে কামরা থেকে বের হয়ে গেলেন।
জাহানারা ডেকে উঠলেন, 'আওরঙ্গজেব! দাঁড়াও...' কিন্তু তিনি একবারও ফিরে তাকালেন না।

দিল্লির লালকেল্লায় আওরঙ্গজেব রাজমুকুট খুলে একটি কাপড়ের টুকরা দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। একজন তরুণ পরিচারক—কোরচি লম্বা গলার একটি জগ থেকে একটি রত্নখচিত পেয়ালায় শীতল তরমুজের শরবত ঢেলে তাঁর হাতে তুলে দিল। এইমাত্র তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে জিজিয়া কর পুনরায় চালু করার ঘোষণা দিয়ে এসেছেন। হিন্দুদের তাৎক্ষণিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া এড়াতে তিনি যে ঝারোকা বেলকনি থেকে ঘোষণাটি দিয়েছিলেন দরবারের কর্মকর্তারা তার নিচের প্রথম সারিতে উলেমা আর দরবারের মুসলিম সদস্যদের বসার ব্যবস্থা করেছিলেন। মুসলিম পল্টন থেকে প্রচুর সেনা হাতের কাছে অপেক্ষমাণ ছিল। ঘোষণাটি দেওয়ার পর ভিড়ের পেছন দিক থেকে সামান্য প্রতিবাদের চিৎকার শোনা গিয়েছিল। তাঁর ধারণা, একই রকম প্রতিক্রিয়া অন্যান্য স্থানেও হবে।
আওরঙ্গজেব শরবতে একটা লম্বা চুমুক দিলেন। বেলকনির হাওয়া বেশ গরম আর গুমোট ছিল। এমনকি পাখিরাও আকাশে না উড়ে ঝাঁক বেঁধে ছাদে বসে রয়েছে। বর্ষা আসার আর বেশি দিন বাকি নেই, বৃষ্টির সাথে সাথে শীতল স্বস্তি মিলবে। হঠাৎ তাঁর শরীর কেঁপে উঠতেই পেয়ালা থেকে শরবত ছলকে পড়লো। তিনি তো অসুস্থ নন, কিন্তু আসলেই কী তাই? গরমে কিংবা এখুনি যা করে এসেছেন তার কারণে কী মানসিক চাপ হয়েছে? না, আবার আরো জোরে কেঁপে উঠলো—ভূমিকম্প হচ্ছে, বেশ বড় ধরনের ভূমিকম্প। নিচু টেবিলের উপর রাখা শরবতের জগটি মাটিতে পড়ে গেল। ফেনিল গোলাপি রং-এর শরবত নীল আর বাদামি রং-এর ইরানি গালিচার উপর পড়ে ভিজিয়ে দিল। একই সাথে ঝুলন্ত দুটো তেলের বাতি মাটিতে পড়তেই কাঁচ ভেঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আওরঙ্গজেব একটা থাম আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলালেন। হাতির দাঁতের কাজকরা একটি আয়না মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল। বাইরে ধপ করে একটা শব্দ হল। বেলকনির চতুর্দিকে সূক্ষ্ম কারুকাজ করা বেলে পাথরের রেলিং-এর একটা অংশ ভেঙ্গে পড়েছে। এর পরপরই

বেলকনির দরজার বেলে পাথরের চৌকাঠে আঁকাবাঁকা ফাটল দেখা দিতেই কিছু ফেঁটে যাওয়ার ভারী আরেকটি শব্দ পাওয়া গেল। আর বিশ ফুট নিচে মাটিতে পড়ে বেলকনির বেশিরভাগ অংশই অদৃশ্য হয়ে গেল। কম্পন থেমে গেছে, তবে আরো কয়েকবার ধুপ করে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল। ছাদের কিছু অংশ আর দুর্গের ছাদে কামান-গোলা নিক্ষেপের জন্য ছিদ্রবিশিষ্ট বেলেপাথরের বুরুজের সমতল ছাদ নড়বড়ে হয়ে ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল।
থাম ছেড়ে আওরঙ্গজেব একটা জানালার কাছে ছুটে গিয়ে বাইরে তাকালেন। পাখিগুলো চক্রাকারে আকাশে উড়ছে আর ভীত হয়ে চিৎকার করছে, উড়ন্ত পাখিগুলোর কারণে আকাশ কালো হয়ে রয়েছে। বুরুজের ছাদের একটি বড় টুকরা সাদা মার্বেল পাথর পানির ফোয়ারার উপর পড়তেই ফোয়ারাটি ভেঙ্গে গেল। ছড়ছড় করে প্রবল বেগে পানি পড়ে মার্বেল পাথরের উঠান ভাসিয়ে দিল। ছাদের লাল টালি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে মার্বেল পাথরের পায়ে চলা পথের উপর ছড়িয়ে পড়লো। উঠানের এক কোণে একজন শ্রমিক—সম্ভবত একজন মালি দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রয়েছে আর আরেকজন মালি তার মাথার সাদা পাগড়ির প্যাঁচ খুলছিল। খুব সম্ভব এটা দিয়ে সে অপর লোকটির পায়ের নিচের যে জায়গায় কেটে রক্ত ঝরছিল তাতে বাঁধন দেবে। দুর্গের যতটুকু অংশ আওরঙ্গজেব দেখতে পাচ্ছিলেন, তাতে কেবল এই একজনকে দুর্ঘটনায় আহত মনে হচ্ছে। কিন্তু হেরেম আর জাহানারার অট্টালিকার কি অবস্থা? তাঁর নিজের দালানটির মতো জাহানারার ভবনটিও একইরকমভাবে নির্মিত হওয়ায় আশা করা যায় সেটি হয়তো অক্ষত রয়েছে, তবে তাকে সেটা জানতে হবে। তিনি ঘুরে কোরচির দিকে তাকালেন, সে তখন কাঁপা কাঁপা হাতে মাটি থেকে জগটি তুলছিল।
'ওটা এখন থাক। তুমি এক ছুটে গিয়ে দ্যাখে এস হেরেম আর জাহানারা বেগমের দালানের কোনো ক্ষতি হয়েছে কি-না।' তারপর তাঁর মনে পড়লো, কেল্লার দেয়ালের চারদিকে সাধারণ মানের বাড়িঘর ছড়িয়ে রয়েছে। তারপর বললেন, 'আর দেহরক্ষী দলের সেনা কর্মকর্তাদের শহরে গিয়ে দেখতে বল সেখানে কিরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।'
ঘণ্টাখানেক পর তিনি খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন যে, হেরেম আর জাহানারার মহলে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। হেরেমে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, তবে গুরুতর ক্ষতি বলতে কেবল, উপর থেকে চুনসুরকি খসে পড়ে একজন পরিচারকের পায়ে বড় ধরনের আঘাত লেগেছে। হেকিমরা তার ভাঙ্গা পা কেটে ফেলতে যাচ্ছেন।

তারপর তাঁর দেহরক্ষী দলের প্রধান তাঁকে শহরের অবস্থা বললো, 'জাঁহাপনা, শহরে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শহরের উত্তরের ফটকের একটি অংশ ভেঙ্গে পড়েছে। খিলানের উপরের মূল পাথরটি ভেঙ্গে পড়ে একটি গাধা-গাড়ি আর এর গাড়োয়ানকে চাপা দিয়েছে। ফটকের একজন দাড়োয়ান মাথায় সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছে, এখনও কথা বলতে পারছে না। বাঁচবে বলে মনে হয় না। যমুনা নদীর তীরের কাছে শহরের দেয়ালের দশফুট অংশ ভেঙ্গে পড়েছে। এর কাছে একটি মসজিদের মিনার ভেঙ্গে পড়েছে আর একটি হিন্দু মন্দিরের পেছনের দেয়ালও ভেঙ্গে দুই টুকরা হয়ে গেছে। বেশিরভাগ কাদা-মাটির ইটের তৈরি ঘরবাড়ি ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। কয়েকটি ঘরের ধ্বংসাবশেষের নিচে লোকজন আটকা পড়েছে। অন্যান্য জায়গায় কাঠের ভাঙ্গা টুকরা আর ছাদের খড় ঘরের ভেতরে চুলার আগুনে পড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে। কোনো কোনো জায়গায় আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।'

আওরঙ্গজেব বললেন, 'আগুন নিভাতে আর ভেঙ্গে পড়া বাড়ি-ঘরের নিচে চাপাপড়া লোকজনকে উদ্ধার করতে সৈন্য পাঠাও। আগুন নেভাবার জন্য দরকার পড়লে অন্য বাড়িও ভাঙ্গতে বলবে। আর কোষাধ্যক্ষকে বল যারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের মধ্যে টাকা বিতরণ করতে।'

'আমি এখুনি ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছি, জাঁহাপনা। তবে একটা কথা আপনাকে জানাতে চাচ্ছিলাম। হিন্দুদের মধ্যে কিছু লোক চিৎকার করে বলছিল, আপনি আবার জিজিয়া কর চালু করায় ভগবান রুষ্ট হয়ে ভূমিকম্প ঘটিয়েছেন।'

'এটা পুরাদস্তুর অযৌক্তিক আর বাজে কথা। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—আর সেই সাথে ওদের সবারই ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। বরং আমি বলবো এটা আল্লাহর কাছ থেকে অবিশ্বাসীদের জন্য একটা সতর্ক বার্তা হয়ে এসেছে, যাতে ওরা নিজের আত্মা আর ধনদৌলতেরও স্বার্থে সঠিক পথে ফিরে আসে।'

'জাঁহাপনা আপনি যা বলেছেন, তা অবশ্যই সঠিক। তবে আমি খোলা মনে বলতে চাই, এই সহজ সরল লোকগুলোর তাদের হিন্দু ধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বাস রয়েছে। কোনো যুক্তি-তর্ক, তা যতই যুক্তিসংগত হোক তাদেরকে টলাতে পারবে না।'

আওরঙ্গজেব মাথা নাড়লেন। জিজিয়া কর পুনরায় চালু করে তিনি আল্লাহর সামনে সঠিক রয়েছেন, পরিণতি যাই হোক না কেন। এ নিয়ে দিল্লির কিংবা সাম্রাজ্যের অন্য কোথাও কোনো ধরনের বিদ্রোহ দেখা দিলে দরকার পড়লে তা দমন করার জন্য তিনি সৈন্যদের প্রস্তুত থাকতে বলবেন।

ভোরের একটু আগে রায়গড় দুর্গের মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনি শুনে শিবাজির ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার পেট গুড়গুড় করে উঠলো। অবশ্য এর কারণ হচ্ছে এর আগের দিনটি তিনি উপবাস আর প্রার্থনায় কাটিয়েছেন—তবে ভোজন আর উৎসবের সময়ও হয়ে এসেছে। গত চার মাস ধরে তিনি তার অভিষেকের দিনটি নিয়ে পরিকল্পনা করে আসছিলেন। যত সামান্যই হোক খুঁটিনাটি প্রত্যেকটা বিষয় তিনি নিজে দেখাশুনা করছিলেন। এমনকি এসম্পর্কে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিশদ বিষয় পড়েছেন যাতে সিংহাসনে আরোহণের যে ধর্মীয় নিয়মাবলি রয়েছে তা খুঁজে বের করে পুনঃপ্রচলন করতে পারেন। মোগলদের অত্যাচারী শাসনে এগুলো সবাই প্রায় ভুলে গিয়েছিল। রাজ্য শাসনের পবিত্র স্বভাব ধর্মটি যে তিনি কত ভাল বুঝেন, তা সবার সামনে তুলে ধরার জন্য জনসমক্ষে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানে গিয়ে পরিশোধনের যাবতীয় ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান পালন করেছেন। এর ফলে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা তাকে পৈতা প্রদান করলেন। তাদের সহযোগিতার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি সারা হিন্দুস্তান থেকে পঞ্চাশ হাজার ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করে এনে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে তারা মারাঠার রাজা হিসেবে তার রাজ্যাভিষেক প্রত্যক্ষ করতে পারে।

শিবাজি উঠলেন, অপেক্ষমাণ সেবকদের সহায়তায় পবিত্র গঙ্গাজল দিয়ে মাথা আর সারা দেহ ধুলেন। পুরোহিতরা এই গঙ্গাজলে মন্ত্রোচ্চারণ করে পবিত্র করে দিয়েছিল। তারপর তিনি ধবধবে সাদা সুতির ঢিলা লম্বা একটি পোশাক পরলেন। সেবকরা তার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল, তারপর বাহুতে বাজুবন্ধ, পায়ে নূপুর আর গলায় খাঁটি সোনার হার পরিয়ে দিল। তারপর যখন তিনি একা হলেন, তখন কয়েকটি ধূপকাঠি জ্বেলে ঘরের এককোণে একটি ছোট্ট বেদির সামনে এসে হাঁটুগেড়ে বসে মাথা ঝুঁকলেন। প্রার্থনা শুরু করতেই তার মাথাটা একটু টলে হালকা হয়ে এল, বুঝতে পারলেন এটা ক্ষুধার কারণে নয় ...এটা হচ্ছে উত্তেজনা আর প্রত্যাশার একটি মিশ্রণ, তবে একটি অবাস্তবতার অনুভূতিও রয়েছে। তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, অবশেষে এই দিনটি এসেছে।

একমনে তখনও ধ্যান করে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কামরায় কারোও ঢোকার শব্দ পেয়ে ঘুরপাক খেয়ে উঠা ধূপের ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিত গগা ভট্টোর ছিপছিপে লম্বা দেহ আর তীক্ষ্ণ কালো চোখদুটো দেখতে পেলেন।

পুরোহিত বললেন, 'আসুন প্রভু। লগ্ন উপস্থিত হয়েছে।'

রাজা হিসেবে তাকে পবিত্র ঘোষণা করার জন্য পুণ্য নগরী বানারসি থেকে এই বিখ্যাত পণ্ডিত এবং ঋষিকে দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ি এলাকার রায়গড়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি ভালো করেছেন। গগা ভট্টের উপস্থিতি তার নিজ মারাঠি জনগণের উপর তার শাসনে একটি পবিত্র কর্তৃত্ব এনে দিয়েছে আর হিন্দুধর্মাবলম্বী অন্যান্য যারা আছেন তারা সবাই নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে তার কাছে সমবেত হবেন।

পুরোহিতকে অনুসরণ করে শিবাজি উঠান পার হয়ে মন্দিরে ঢুকলেন। ভেতরে গাঁদাফুলে ঢাকা শিবের বাহন নন্দির-ষাঁড়ের একটি পাথরের মূর্তির কাছেই সোনালি রং-এর একটি নিচু বসার চৌকি রাখা ছিল। তার স্ত্রী সয়রা বাঈ আর বড় ছেলে শম্ভাজি অভিষেক আসনের পেছনে দাঁড়িয়েছিল। পুরোহিত আর সভাসদরা সবাই দলবেঁধে মন্দিরের ভেতরে চারদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শিবাজি বসার পর গগা ভট্ট তার সামনে একটি সোনার বাটি এগিয়ে নিয়ে বললেন, 'শিবাজি, মা গঙ্গার এই পবিত্র জল ছিটিয়ে আমি আপনাকে মারাঠিদের রাজা হিসেবে পবিত্র করছি। আপনার শাসন সুদীর্ঘ আর ন্যায়পরায়ণ হোক, যাতে আপনি প্রজাদের আশীর্বাদ ধন্য হয়ে উঠুন আর দেবতারা আপনার অনুকূল হোন।' তারপর একটি সোনার চামচ দিয়ে বাটি থেকে গঙ্গাজল তুলে শিবাজির মুখে আর মাথায় তিনবার ছিটিয়ে দিলেন। তারপর পবিত্র জলে ভরা সোনার জগ হাতে মুখ্য মন্ত্রীরা এগিয়ে এলেন, তারাও নতুন রাজার গায়ে গঙ্গাজল ছিটালেন। তারপর ষোলজন ব্রাহ্মণ নারী, অশুভ আত্মাকে দূর করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকে হাতে একটি করে সোনার থালায় পাঁচটি তেলের প্রদীপ নিয়ে তাঁকে ঘিরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে প্রদক্ষিণ করলো।

তারপর এল ওজন নেওয়ার অনুষ্ঠান—এটি রাজ্যাভিষেকের একটি প্রাচীন হিন্দু প্রথা, যা তিনি আবার এখানে চালু করেছেন। ওজনের ভারে হিমশিম খেতে খেতে চারজন পুরোহিত ওজন মাপার বিশাল একটি দাঁড়িপাল্লা নিয়ে মন্দিরের ভেতরে ঢুকলো।

'আসুন মহারাজ।'

গগা ভট্ট স্মরণ করিয়ে দিতেই শিবাজি উঠে দাঁড়ালেন—ভেজা পোশাকটি গায়ের সাথে লেপ্টে রয়েছে, তারপর হেঁটে দাঁড়িপাল্লার কাছে গিয়ে একটি পাল্লায় উঠে আসন গেড়ে বসলেন। মনে মনে ভাবলেন, কি দুঃখ আমি কত হালকা, এরকম একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্যেও তার ঠোঁটে মৃদু হাসির উপক্রম হচ্ছিল। আমি যদি আরো মোটা আর ভারী হতাম তাহলে যে গরিবরা এই দান পাবে তারা হয়তো আরো উপকৃত হত। অনুষ্ঠান শুরু হতেই কয়েকজন পুরোহিত কয়েকটি সোনার বাট অপর পাল্লার উপর রাখলো। তিনি জেনেছেন এককালে এ ধরনের

অনুষ্ঠানে সাতটি মূল্যবান ধাতুর মধ্যে এটিই প্রথমে দেওয়ার প্রথা ছিল। তিনি উপরের দিকে উঠতেই একটু কেঁপে উঠলেন। তারপর এল রূপার মুদ্রা, এরপর তামা, দস্তা, টিন, সিসা এবং সবশেষে লোহা। এরপর দেওয়া হল জায়ফল আর লবঙ্গ, তারপর লবণ, কর্পূর এবং মিহি সুতিবস্ত্র এবং সবার শেষে খাদ্যসামগ্রী। পাকা হলুদ কলা থেকে শুরু করে পাকা আম, রসাল মিষ্টি, ঘি এবং উজ্জ্বল সবুজ পান পাতা।

মন্দিরের সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর শিবাজি তার স্ত্রী-পুত্রসহ নিজের মহলে ফিরে গেলেন। সাদা পোশাকটি খুলে ভারী এমব্রয়ডারি করা একটি লাল টকটকে রেশমের পোশাক পরলেন। সয়রা বাঈ নিজেও দামি রেশমি পোশাক এবং প্রচুর অলঙ্কার পরেছিলেন। তিনি শিবাজির শরীর থেকে সাদামাটা অলঙ্কারগুলো খুলে উজ্জ্বল রত্নখচিত গাদা গাদা বালা, আংটি পরিয়ে দিলেন। তার হাতের চামড়া দেখা যাচ্ছিল না। সবকিছু পরিয়ে দেবার পর তিনি বললেন, 'এবার আপনাকে একজন সত্যিকার রাজার মতো দেখাচ্ছে, যা আপনি আসলেই তাই।' এরপর গলায় দামিপাথর বসানো একটি হার পরিয়ে দিলেন আর মাথায় পরালেন ঝিকমিক করা মুক্তাখচিত একটি লাল পাগড়ি। সয়রা বাঈ শিবাজির মতোই দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন, তাই পাগড়িটি পরাবার সময় তাকে পায়ের আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়নি। তারপর স্ত্রী ও পুত্রকে পিছনে নিয়ে শিবাজি সিংহাসন দরবারের দিকে এগিয়ে গেলেন। সবার পেছনে একজন বাহক তার তরবারি, তীর এবং ধনুক বয়ে নিয়ে আসছিল। তার চলার সাথে সাথে শিঙ্গা আর ঢোলক বেজে উঠলো। তারপর জ্যোতিষীদের গণনা মোতাবেক কাঁটায় কাঁটায় সঠিক মুহূর্তে দরবারে ঢুকলেন। তারপর তিনি সিঁড়ি বেয়ে অষ্টভুজ সিংহাসনে উঠতেই, সেবকরা অপেক্ষমাণ অতিথিদের উপর ছোট ছোট সোনালি ও রুপালি পদ্মফুল ছিটিয়ে দিল। সমাগত অতিথিদের মধ্যে ছিল দুর্গ এবং এর চারপাশের গ্রামগুলোর হাজার হাজার মানুষের মধ্যে বাছাই করা অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু লোক, যারা তার অভিষেক উৎসব পালন করবেন। আর রাজ সিংহাসনের পেছনে গগা ভট্ট দাঁড়িয়ে ছিলেন।

শিবাজি সিংহাসনে বসতেই গগা ভট্ট তার মাথার উপর একটি লাল ছাতা মেলে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'জয় হোক মহারাজার!' এবার শিবাজিকে একজন রাজা হিসেবে প্রথম কথা বলতে হবে।

তিনি হাত তুলে সবাইকে চুপ হতে ইশারা করলেন। তারপর বললেন, 'ভাইসব, আমি এখানে রায়গড়ে আপনাদের সামনে আপনাদের রাজা হিসেবে এসেছি। এটি একটি পবিত্র ভূমিকা। আমার নিজ মারাঠি ভাইয়েরা ছাড়াও সমস্ত হিন্দু

ভাইদের রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব এটি আমার উপর তুলে দিয়েছে। তবে কেমন করে আমি দায়িত্ব পালন করবো, যখন একটি ভিনদেশি হানাদার আমাদের দেশ, আমদের জীবন আর আমাদের আত্মার উপর তাদের ছায়া ফেলেছে? মোগল স্বৈরশাসক আমাদের ইচ্ছামত নিজ ধর্ম পালনে আমাদেরকে নিষেধ করেছে। তার কাছে আমরা মারাঠিরা হলাম পরজীবী কীট। তিনি আমাদেরকে ইঁদুর বলেন—তবে আমরা তাকে দেখিয়ে দেবো যে, আমরা হলাম সিংহ। আমি উপস্থিত সবার সামনে—আর অন্যান্য যারা এই অত্যাচারী শাসকের নিপীড়নে ভুক্তভোগী তাদের সবার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি—যে, এই মোগলদেরকে বিতাড়িত করবো। ইতোমধ্যে আমি কি প্রমাণ করিনি যে, বুদ্ধিতে আমি তাদেরকে হারাতে পারি? তিনি আমাকে তার ক্ষমতার আওতার মধ্যে নিয়েছিলেন, কিন্তু আমি এই দেশের মাটির মিহি বালুর মতো তার আঙুলের ফাঁক গলে বের হয়ে এসেছি, যে দেশে তার কোনো অধিকার নেই। আপনাদের সহায়তায় আমি বিজয়ী হবো আর হিন্দুস্তানে শান্তি আর ন্যায়বিচার ফিরিয়ে আনবো!' তারপর শিবাজি উঠে দাঁড়ালেন, তার অস্ত্রগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়ানো অপেক্ষমাণ সেবককে ইশারা করলেন কাছে আসতে। তারপর তার তরবারি হাতে নিয়ে মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'ধ্বংস হোক মোগল সাম্রাজ্য!' সাথে সাথে চারপাশে সবাই তার প্রতিধ্বনি করে উঠলো, 'ধ্বংস হোক মোগল সাম্রাজ্য!'

হঠাৎ শিবাজি পটকা ফাটার মতো কড় কড় আর কামানের ভারী গোলার মতো গুম গুম শব্দ শুনতে পেলেন—কি ব্যাপার কামানের গোলার শব্দ নয়তো? প্রজাদের মাথার উপর দিয়ে দরবারের খোলা দরজা দিয়ে বাইরে উঠানের বাইরে দেখতে পেলেন বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। শব্দটি ছিল বজ্রপাতের। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বর্ষা, আশীর্বাদস্বরূপ সেই বৃষ্টি এসেছে, যা হিন্দুস্তানের মাটি আর মানুষকে পরিপুষ্ট করে—এতদিন পর আজ এল। এটা দেবতাদের কাছ থেকে আসা একটি সংকেত, যে তিনি, শিবাজি, মোগলদেরকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেবেন—যেন এর কোনো অস্তিত্বই কোনোকালে ছিল না।

অধ্যায় আট

রানিগণ

মারওয়াড়িদের গাদা বন্দুকের গুলি এড়াতে আকবর ঘোড়ার ঘাড়ের দিকে সামনে ঝুঁকলেন। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন লাল পাগড়িপরা মারওয়াড়ি সৈন্যরা তাঁবু থেকে ছুটে পালাচ্ছে। ওরা ধূলিময় প্রান্তরের মাঝে একটি নিচু পাথুরে পাহাড়ের চারপাশে তাঁবু খাটিয়েছিল। তাঁর চতুর্দিকে তাঁর সৈন্যরাও তা দেখতে পাচ্ছে। তিনি পূর্বদিক থেকে আক্রমণ করেছিলেন, যাতে মোগলরা যখন ওদের উপর হামলা করবে তখন উদীয়মান সূর্য ওদের চোখের সামনে থাকবে। এত তাড়াহুড়া করে কাজ করে ওরা বোকামির পরিচয় দিয়েছে। তাদের ভালোভাবে জানা উচিত ছিল যে, তার বাবা কখনও প্রকাশ্য অবাধ্যতাকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়েন না.   .উচিত শাস্তি সময়ের ব্যাপার মাত্র।

যখন আওরঙ্গজেব যশবন্ত সিং-এর দুই বিধবাকে নবজাত পুত্র সন্তানদেরকে নিয়ে দিল্লি আসতে বললেন, তখন মনে হয়েছিল ওরা তাঁর কথায় রাজি হয়েছেন। রানিরা যাত্রা শুরু করে পানিপথ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। এরপর একজন মারওয়াড়ি সংবাদবাহক আওরঙ্গজেবের কাছে এসে জানাল যে, একজন রানি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং তাকে আবার যাত্রা শুরু করার আগে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে। এর এক সপ্তাহ পর মোগল চর খবর আনলো যে, রাতের অন্ধকারে মারওয়াড়িরা শিবির গুটিয়ে তাদের দেশের দিকে দ্রুত ফিরে যাচ্ছে।

আওরঙ্গজেব সাথে সাথে আকবরকে নির্দেশ দিলেন পাঁচশো অশ্বারোহী সেনার একটি বাহিনী নিয়ে পলাতকদের ধরে আনতে। যথারীতি সৈন্য জড়ো করে যাত্রা শুরু করতে করতে আকবর একটু বেশি সময় নিলেন। মোগল চরেরা খবর পাঠাল পলাতকরা ইতোমধ্যেই মারওয়াড়ের সীমানায় পৌঁছে গেছে। মোগল সেনার অগ্রবর্তী দলটি মারওয়াড়িদের অবস্থানের আট মাইল পূর্বদিকে একটি পাহাড়ের পেছনে লুকিয়ে আকবরের জন্য অপেক্ষা করছিল। এদিকে

রানিরা তাদের দলবলসহ একই জায়গায় তিনদিন ধরে তাঁবু খাটিয়ে বসে রয়েছেন আর কোনো কারণবশত ওদের আর সামনে এগোবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। যেহেতু ওরা মারওয়াড়ের কাছেই পৌঁছে গেছেন, তাই হয়তো ভেবেছেন যে আওরঙ্গজেবের হাত থেকে নিরাপদ হয়েছেন। কিংবা একজন রানি হয়তো আসলেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আকবর একবার ভেবেছিলেন ওদেরকে একটা সুযোগ দেবেন, যাতে ওরা রানি আর বাচ্চাদেরকে তার হাতে তুলে দেয়—কেননা তার চরেরা তাঁকে খবর দিয়েছিল যে, শিবির রক্ষায় কেবল ষাট থেকে সত্তর জন সৈন্য রয়েছে। তবে তিনি রাজপুত যোদ্ধাদের নীতি ভালোভাবে জানতেন যে, ওরা কখনও তা করবে না। কাজেই অতর্কিতে আক্রমণ করলে তার নিজের ক্ষয়ক্ষতি কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে...।

তাঁর চারপাশে লাল বালু উড়ছিল আর মারওয়াড়িদের প্রথম তাঁবুটা মাত্র পঞ্চাশ গজ সামনে দেখা যাচ্ছে, কাজেই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করার মতো আর সময় আকবরের হাতে নেই। গাদা বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার আওয়াজে বাতাস ভারী হয়ে এসেছে। তার বাম পাশে একজন সেনা কর্মকর্তা ঘোড়ার জিন থেকে উল্টে পড়ে পেছন পেছন আসা সৈন্যদের ঘোড়াগুলোর নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। আরেকজন অশ্বারোহী সৈন্য ঊরুতে গুলির আঘাতে ঘুরে পড়ে গেল। তিনি যে রকম আশা করেছিলেন, মারওয়াড়িরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও রানিদের জীবন রক্ষায় নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছে। রসদবাহী দুটো গাড়ির মাঝে কয়েকটা পিপা রাখা ছিল, আকবরের ঘোড়া সহজেই পিপাগুলো টপকে গেল। আকবর তরোয়াল বের করে বাগিয়ে ধরলেন, যাতে সামনে কোনো আক্রমণকারী এলে আঘাত করতে পারেন। পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দে বুঝা গেল, দেহরক্ষী দল তার সাথেই রয়েছে। একজন দেহরক্ষী চিৎকার করে উঠলো, 'জাঁহাপনা, আপনার বামে তাকান!' লাগাম টেনে নিয়ে আকবর তার ঘোড়াটি ঘুরাতেই কয়েকটি পাথরের আড়ালে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা একজন মারওয়াড়ি একটা বল্লম ছুঁড়ে মারলো। ঠিক সময়মতো আকবর সামনের দিকে লাফ দিতেই বল্লমটা তার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে একটা গাড়ির গায়ে বিঁধলো। দেহরক্ষী তার ঘোড়ার পিঠ থেকে একটু নিচু হয়ে তরোয়ালের এক কোপ মারতেই আক্রমণকারী হাত-পা ছুঁড়ে পাথরের উপর পড়ে গেল। তার গলা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো।

তাঁর চারপাশে তিনি ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের ঠোকাঠুকির আওয়াজ শুনতে পেলেন। প্রচণ্ড লড়াই চলছে। চোখের এক কোণ দিয়ে আকবর লক্ষ করলেন

একজন মারওয়াড়ি বরকন্দাজ তার গাদা বন্দুকের লম্বা ইস্পাতের নলটি একটি গাড়ির পাশে রেখে একজন মোগল কোরচির দিকে ধীরে সুস্থে তাক করছে। বেচারি মোগল সেনাটি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে টলমলভাবে হাটছিল। ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে এগিয়ে আকবর ছেলেটিকে এক ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিতেই ছেলেটির জীবন রক্ষা হল। তবে একই সাথে বন্দুকধারী গুলি ছুঁড়তেই গুলিটা আকবরের গাল ঘেঁসে উড়ে গেল। জোরে একবার নিশ্বাস নিয়ে আকবর ঘুরে তাকালেন। মারওয়াড়িরা পিছু হটতে শুরু করেছে। বেশির ভাগই শিবিরের মাঝখানে পাহাড়ের চূড়ায় সাদা দুটো তাঁবুর দিকে যাচ্ছিল। এই তাঁবুগুলো অন্যান্য তাঁবুর তুলনায় বেশ বড়। রানিরা নিশ্চয়ই এই তাঁবুগুলোর মধ্যে রয়েছেন...

আকবর আবার ঘোড়া ছুটিয়ে তার লোকদের সাথে তাঁবু দুটোর দিকে ছুটলেন। প্রায় ছয়ফুট দূরে মাটিতে স্তূপকরা কতগুলো ঘোড়ার পিঠে ঝুলানো থলের পেছন থেকে খাটো, মোটা এবং বলশালী একজন মারওয়াড়ি লাফ দিয়ে বের হয়ে এল। লোকটি তার ডান হাত পেছন দিকে নিতেই আকবর একটি ছুরির ধাতব ফলার ঝলকানি লক্ষ করলেন। তবে মারওয়াড়ি লোকটি ছুরিটি ছুঁড়ে মারার আগেই একজন দেহরক্ষীর তরোয়ালের আঘাতে লোকটির চিবুক কেটে ফাঁক হয়ে দাঁত বের হয়ে গেল। সারা মুখ লাল টকটকে রক্তে ভরে গিয়ে লোকটি পেছন দিকে পড়ে গেল। আকবর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। এই হচ্ছে যুদ্ধের সৌভাগ্য—তাঁর পেছন ফেরারও অবকাশ ছিল না।

এবার প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন মারওয়াড়ি সেনা মোগলদের দিকে অস্ত্র তাক করে তাঁবু দুটো ঘিরে গোল হয়ে অবস্থান নিল। সম্ভবত এরাই কেবল বাকি ছিল। অবশ্য ওদের আর কোনো সুযোগ নেই, সকলেই মারা পড়বে...যদি ওরা যুক্তির কথায় কান না দেয়। আকবর আর হতাহতের সংখ্যা বাড়াতে চাইছিলেন না, তিনি নিজেই গত কয়েক মিনিটে অন্তত তিনবার বেঁচে এসেছেন।

তিনি তাঁর লোকদের ডেকে বললেন, 'থামো!' ঘোড়া থেকে নেমে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। তবে যদি কেউ আক্রমণ করে, সাথে সাথে একদিকে লাফ দিয়ে সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে মারওয়াড়িদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন, 'কেন তোমরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেবে? তোমরা যথেষ্ট সম্মান নিয়ে লড়েছ, তবে দেখতে পাচ্ছ তোমরা সংখ্যায় কত কম। আমি কথা দিচ্ছি রানিদের কোনো সম্মান হানি হবে না। তাদেরকে আমাদের হতে তুলে দাও, আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি তাদেরকে দিল্লির রাজদরবারে নিয়ে যাওয়া হবে আর সেখানে এরা মারওয়াড়ের রাজপরিবারের উপযুক্ত যথাযথ মর্যাদা পাবেন।'

তার কথায় সবাই চুপ হল। মনে হচ্ছে রাজপুতরা অস্ত্রগুলো আরো শক্ত করে ধরলো।
আকবর আবার চেষ্টা করলেন, 'আমার কথা শোন। শত শত বছর ধরে মোগল আর রাজপুতরা কি পাশাপাশি লড়াই করে নি? আমরা কি ভাই ভাই নই? তোমাদের রক্ত কি আমার নিজের পরিবারে বইছে না? তবে যদি আর প্রতিরোধ করার চেষ্টা কর, তাহলে তোমাদেরকে ধ্বংস করা ছাড়া আমার হাতে আর কোনো পথ খোলা থাকবে না।'
ঠিক সেই মুহূর্তে একটি তাঁবুর ঝাপ খুলে গেল আর একজন মহিলা কমলা রং-এর কাপড়ে জড়ানো ছোট একটি শিশুকে কোলে নিয়ে বের হয়ে এলেন। এমব্রয়ডারি করা তার জাফরানি রঙয়ের শাড়ির আঁচলের ঘোমটা তার মুখ ঢেকে এত নিচে নামানো ছিল যে, আকবর তার চেহারা দেখতে পেলেন না, তবে তিনি তার সরু হাতে ভারী সোনার চুড়ি আর বালা দেখতে পেলেন।
'দয়া করে...এই লড়াই এখানেই শেষ হোক। অনেক মৃত্যু হয়েছে, আমি চাই না আর কোনো স্ত্রী আর মা তাদের প্রিয়জনকে হারিয়ে শোক করুক, যেরকম আমি আমার স্বামী যশবন্ত সিংকে হারিয়ে শোক করছি। রানিদের বাঁচাতে এই বীর সৈনিকরা তাদের জীবন বিসর্জন দিতে চাইছে, কিন্তু আমি তা হতে দিতে চাই না। আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। আপনি যে কথা দিয়েছেন তাতে আমি বিশ্বাস রাখবো। আমি আর আমার পুত্র অজিত সিং আপনার কাছে আত্মসমপর্ণ করছি আর আমার সৈন্যদেরকে বলছি হাতিয়ার নামিয়ে রাখতে।'
রাজপুত সৈন্যরা একে অন্যের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করলো আর একজন বলে উঠলো, 'কেমন করে আমরা আমাদের ধর্মবিশ্বাস আর ঐতিহ্যের শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করবো?'
মহিলাটি আবার বলে উঠলেন, 'আমি হাদি, আমার প্রয়াত স্বামীর জ্যেষ্ঠ রানি। আমি যা আদেশ করছি তা তোমরা পালন করবে।' কমবয়সী হলেও তার কণ্ঠস্বর দৃঢ় এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক ছিল। আকবর ভাবলেন, এরা সত্যি একটি যোদ্ধা জাতি, কি নারী কি পুরুষ। তাকিয়ে দেখলেন বাচ্চাটি জেগে উঠে কেঁদে উঠতেই সোজা হয়ে দাঁড়ান হালকা-পাতলা গড়নের মহিলাটি বাচ্চাটিকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন।
'ভদ্রে, আমি যে কথা দিয়েছি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'
অন্য সাদা তাঁবুটির ঝাপ উঠিয়ে বেগুনি রঙের শাড়ি পরা দ্বিতীয় আরেকজন মহিলা ঘোমটায় মুখ ঢেকে বের হয়ে এলেন। তিনিও হাদির মতো ভারী ভারী

গহনা পরে রয়েছেন। 'আমি আমার বোনের কথা আর আপনার উত্তরও শুনেছি আর আমিও তার মতো আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে এসেছি। আমি রানি শিল্পা, আমার বাচ্চা তাঁবুর ভেতরে সেবিকার কাছে রয়েছে।' তার কণ্ঠস্বর শুনে রানি হাদির চেয়ে একটু বয়স্ক মনে হল। একটু বেঁটে হলেও তার আচরণ একজন রানির মতোই।

আকবর নরম স্বরে বললেন, 'অনুগ্রহ করে আপনারা তাঁবুতে গিয়ে আরাম করুন। ততক্ষণে আমি আপনাদের সন্তান আর অন্যান্য মহিলাসহ আপনাদের দিল্লি নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় উটের ব্যবস্থা করছি। রানিরা তাঁবুতে ফিরে যাওয়ার সাথে সাথেই আকবর মারওয়াড়িদেরকে নিরস্ত্র করার জন্য তার লোকদের নির্দেশ দিলেন। আর তাঁবুগুলোর ভেতরে আর কেউ লুকিয়ে রয়েছে কি-না তা দেখার জন্য সেখানেও তল্লাশি চালাতে বললেন। তার সৈন্যরা আহত মোগল সেনাদের যত্ন নিতে শুরু করতেই তিনি মারওয়াড়িদেরকেও তাদের আহত সহযোদ্ধাদের সেবা আর মৃতদের দাহ করার সুয়োগ দিলেন।

চিতার আগুন নিভু নিভু হয়ে এসেছে আর সূর্যও পশ্চিমে ডুবতে শুরু করেছে। আকবরও যাত্রা শুরু করার জন্য তৈরি হয়েছেন। নারী আর শিশুদেরকে উটের পিঠের দুইপাশে ঝুলানো বড় বড় ঝুড়িতে বসান হল। আকবরের লোকেরা কাছের গ্রাম থেকে এগুলো কিনে এনেছিল। বাদবাকি নিরস্ত্র মারওয়াড়ি সৈন্যরা নিজেদের ঘোড়ার পিঠে চললো। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের জখমে বড় ধরনের পট্টি লাগান ছিল। মোগল অশ্বারোহী সেনারা পুরো দলটিকে ঘিরে চললো। কোনো মারওয়াড়ি সৈন্য রানিদের উদ্ধার করার জন্য কোনো ধরনের চেষ্টা করলে তা প্রতিহত করার জন্য ওরা সতর্ক রইল। আকবর বেশ সন্তুষ্ট হয়েছেন। একজন সম্মানীয় মানুষ যে ধরনের কাজ করা উচিত তিনি শুধু তাই করেন নি, তার বাবাও খুশি হবেন দেখে যে, তিনি পলাতকদের পাকড়াও করে দিল্লিতে নিয়ে এসেছেন।

তিন সপ্তাহ পর অস্পষ্ট দিগন্তে দিল্লির দেয়াল আর মিনারের চূড়ার আকৃতি দেখা গেল। সফরটি ক্লান্তিকরভাবে ধীর হলেও, উটগুলোর ধীর গতির জন্য ধন্যবাদ দিতে হয়, কেননা এতে মেয়েদের কষ্ট হয়নি। বিষয়টির নিষ্পত্তি করার শুরু থেকেই আকবরের মন প্রফুল্ল ছিল, এখনও তাই রয়েছে। মারওয়াড়ি কোনো যোদ্ধাদল তাদের পিছু নেয়নি। শুধু একবার একটি বিপজ্জনক মুহূর্ত এসেছিল, এক সন্ধ্যায় যখন টহলদাররা টহল দিচ্ছিল, তখন একটি বাঘ চমকে

গিয়ে একটি জঙ্গল থেকে বের হয়ে শিবিরে ঢুকে পড়েছিল। আকবর তাঁবুর চাদোয়ার নিচে বসে মশালের আলোয় কিছু একটা পড়ছিলেন, বাঘটি তার কাছ দিয়ে আবার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সময় তিনি বাঘের ডোরাকাটা তামাটে দেহটি আর লণ্ঠনের মতো জ্বলজ্বলে চোখ দুটো কেবল এক ঝলক দেখতে পেলেন।

অবশেষে অশ্বারোহী দল আর ভারী ওজন বয়ে নিয়ে আসা উটগুলো ধুঁকতে ধুঁকতে লাহোর ফটকের নিচ দিয়ে দুর্গে ঢুকতেই আকবরের মন খুশিতে ভরে উঠলো। যদিও তিনি আগেই তার সফলতার খবর দিয়ে সংবাদবাহক পাঠিয়েছিলেন, তারপরও নিজে বাবাকে পুরো বিষয়টি বলার জন্য তার মনে বেশ আগ্রহ ছিল। তাঁকে ছাড়াও সম্রাট তাঁর সকল ছেলেকে প্রায়ই তাদের কাজের সমালোচনা করতেন। এবার আওরঙ্গজেবও তাকে প্রশংসা না করে পারবেন না। ভেতরের একটি উঠানে পৌঁছার পর আকবর পুরো দলটিকে থামতে বলে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে লাগাম একজন সহিসের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। তারপর একজন কোরচিকে ডেকে বললেন, 'হেরেম থেকে প্রহরীদের ডেকে এনে এই উটগুলোকে মেয়েমহলে নিয়ে যেতে বল, যাতে মহিলারা লোকের নজরের আড়ালে উট থেকে নামতে পারেন। তারপর তাদেরকে সোজা হেরেমে আমার বোন জেবুন্নিসার কাছে নিয়ে যেতে বল। আমি আগেই তাকে চিঠিতে লিখে জানিয়েছি এদের থাকার জন্য উপযুক্ত কামরার ব্যবস্থা করতে। আর তাদেরকে খুবই সম্মানসহকারে দেখাশুনা করবে। এই মহিলারা মারওয়াড়ের রানি।'

রানিদের আরাম-আয়েসের সব ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পর সন্তুষ্ট হয়ে আকবর হাত-মুখ ধুয়ে আর এক গ্লাস পানি খেয়ে বাবার মহলের দিকে রওয়ানা দিলেন। সম্রাট তখন নিচু একটি ডেস্কের সামনে বসে কিছু পড়ছিলেন, কোরচি আকবরের উপস্থিতির খবর দিতেই তিনি মুখ তুলে বললেন,

'তাহলে তোমার অভিযান সফল হয়েছে?'

'হ্যাঁ, বাবা। যদিও মারওয়াড়িদের কাবু করতে আমি যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে বেশি সময় লেগেছিল। তবে আমার ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে, তাদের সীমন্তের প্রায় কাছে পৌঁছে ওরা সেখানেই থেমে তাঁবু খাটিয়ে কয়েকদিন অবস্থান করেছিল।'

'হ্যাঁ, চিঠিতে সেকথা তুমি জানিয়েছ। তবে বিষয়টি একটু অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। এখন আমাকে সবকিছু খুলে বল, বিশেষত ঐ শিবিরটি সম্পর্কে— সেখানে কতজন মারওয়াড়ি সৈন্য ছিল, অস্ত্র কি ছিল, ওদেরকে কাবু করতে

কত সময় লেগেছিল। কোনোকিছু বাদ দিও না। তুমি তো জান খুঁটিনাটি বিষয়কে আমি খুবই মূল্য দেই।'

যতদূর মনে পড়লো, আকবর সবকিছু খুলে বললো, তারপর তার বাবার অভিনন্দনের জন্য অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু আওরঙ্গজেব গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন, তার ভ্রু কুঁচকে রয়েছে। অবশেষে বললেন, 'কতজন রাজপুত সেনা তুমি বললে শিবিরের প্রতিরক্ষায় ছিল?'

'প্রায় সত্তর জন। এর বেশি নয়।'

'এই বিষয়টি তোমার কাছে অদ্ভুত মনে হয় নি যে, মারওয়াড়িরা তাদের রানি আর সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারের প্রতিরক্ষার জন্য এত কম সেনা কেন রেখেছিল?'

'না। সংখ্যায় কম হলেও মারওয়াড়িরা দৈত্যের মতো লড়াই করেছিল...আমার ত্রিশজন লোক নিহত হয়েছিল। আমি সব সময় ভাবতাম একজন রাজপুত অন্য যেকোনো পাঁচজন সৈন্যের সমান।'

'হ্যাঁ, তারা আসলেই ভালো যোদ্ধা। তবে অনেক সময় ব্যর্থ গৌরবের কাজকে ভালো কৌশল হিসেবে মনে করে ভুল করে। তবে তা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই।'

আকবর সম্রাটের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, 'তবে কোন বিষয়টি নিয়ে আপনি উদ্বিগ্ন বাবা?' তার পেটে একটু অস্বস্তিকর অনুভূতি হল। তবে তার প্রশ্নটি এড়িয়ে আওরঙ্গজেব তাকে একটি প্রশ্ন করতেই তার অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল।

'তুমি বলেছ সীমান্তের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছার পর মারওয়াড়িরা সেখানেই থেমে পড়ে। এ খবরটি তুমি কি ভাবে জানতে পেরেছিল?'

'আমার অগ্রবর্তী দলের সদস্যদের কাছ থেকে খবরটি জেনেছি। ওদের একজন আমার কাছে এসে খবর দিল যে ওরা মারওয়াড়িদের খুঁজে পেয়েছে আর বাদবাকিরা আড়ালে লুকিয়ে ওদের প্রতি নজর রাখছে। মূল সেনাদল নিয়ে আমি যখন ওখানে পৌছলাম, তার আগে ওরা তিনদিন ধরে মারওয়াড়িদের উপর নজর রাখছিল।'

'তারপরও ব্যাপারটি তোমার কাছে একটু অস্বাভাবিক মনে হয় নি? কেন মারওয়াড়িরা অতি দ্রুত ওদের দুর্গে চলে গেল না? ওরা তো জানতোই যে আমি ওদের পেছনে সেনা পাঠাব। তাহলে কেন এমন জায়গায় রয়ে গেল, যেখানে ওরা অরক্ষিত হয়েছিল?'

'হয়তো কোনো একজন রানি কিংবা বাচ্চাগুলোর মধ্যে কোনো একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল আর তাদের বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন ছিল। মরুভূমিতে প্রচণ্ড গরম ছিল আর

আওরঙ্গজেব তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'মহিলারা এখন কোথায় রয়েছে?'

'হেরেমে জেবুন্নিসার তত্ত্বাবধানে রয়েছে।'

'ঠিক আছে, আমি একবার ওদের সাথে দেখা করতে যাব। এমনি সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ। তুমিও সাথে আসতে পার।' আওরঙ্গজেব উঠে দ্রুত কামরা থেকে বের হয়ে গেলেন। আকবর প্রথমে একটু ইতস্তত করলেন, তারপর তিনিও তাঁর বাবাকে অনুসরণ করলেন। তিনি জেবুন্নিসার মহলে পৌঁছে শুনলেন আওরঙ্গজেব তার বোনকে বলছেন, 'ঐ মহিলাদের এখানে আসতে বল। আমি এখুনি তাদের সাথে দেখা করতে চাই।'

'তারা মনে হয় বেশ ক্লান্ত...এখনও নিজেদেরকে ঠিকমতো ঘরে গুছিয়ে উঠতে পারে নি...'

আওরঙ্গজেব একটু কড়া কণ্ঠে বললেন, 'যাই হোক। আমি যা বলছি তা কর জেবুন্নিসা।'

'ঠিক আছে আপনি যা বলেন। আমি নিজে গিয়ে ওদেরকে নিয়ে আসছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে জেবুন্নিসা দুই রানিকে নিয়ে ফিরে এলেন। এখন দুজনেই মারওয়াড়ের জাতীয় রং উজ্জ্বল হলুদ শাড়ি পরে রয়েছেন—আর দুজনেরই মাথা সোনালি রেশমি কাপড়ের ঘোমটায় কয়েক ভাঁজে ঢাকা রয়েছে।

কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই আওরঙ্গজেব বললেন, 'আপনারা দুজনের ঘোমটা খুলে মুখ দেখান।'

আকবর হতাশার অনুভূতি নিয়ে কথা শুনছিলেন। এরা রাজ পরিবারের মহিলা। তিনি কথা দিয়েছিলেন এদের যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করা হবে। এখন কোথায় গেল সেই প্রতিশ্রুতি?

মহিলা দুজন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আওরঙ্গজেব শীতল কণ্ঠে বললেন, 'আমি সম্রাট। আমি আপনাদেরকে আদেশ করছি মুখ দেখাতে আর নয়তো অন্য কাউকে দিয়ে করাবো।'

রানি শিল্পা প্রথমে সম্রাটের আদেশ পালন করলেন। মেহেদি লাগান হাত দিয়ে ঘোমটা ঠেলে মুখ থেকে সরিয়ে দিলেন, তবে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আওরঙ্গজেব আদেশ করলেন, 'আমার দিকে তাকান।' ধীরে ধীরে তিনি মুখ তুললেন। আকবরের মনে হল, তার বয়স প্রায় ত্রিশ, দেখতে বেশ সুন্দরী। গোলাকার মুখ আর ভারী ঠোঁট।

এরপর আওরঙ্গজেব রানি হাদির দিকে ফিরে বললেন, 'এবার আপনি।' মাথা থেকে ঘোমটা সরিয়ে আওরঙ্গজেবের আদেশের জন্য অপেক্ষা না করে তিনি সরাসরি তাঁর দিকে তাকালেন। আকবর কল্পনা করেছিলেন—ডিম্বাকৃতি মুখ আর বড় বড় উজ্জ্বল চোখ নিয়ে তিনি খুবই সুন্দরী। ঠাণ্ডা চোখে আওরঙ্গজেব যেভাবে তাদেরকে নিরীক্ষণ করছিলেন, তাতে মনে হল শিল্পার মতো তিনি তেমন ঘাবড়াননি।

'আপনাদের মধ্যে বড় রানি কে?'

হাদি সাথে সাথে উত্তর দিলেন, 'আমি।'

'আপনাকে দেখে বেশ কমবয়সী মনে হচ্ছে। যশবন্ত সিং-এর সাথে বিয়ের কত বছর হল?'

'চার বছর।'

'কিছুকাল আগে আমার সাম্রাজ্যের হয়ে যুদ্ধ করার সময় তার শরীরে বড় ধরনের একটি যখম হয়েছিল। সেটা শরীরের কোন জায়গায় হয়েছিল বলতে পারেন?'

এই প্রথম হাদিকে দেখে একটু অনিশ্চিত মনে হল।

'যশবন্ত সিং-এর সন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন, কাজেই যথেষ্ট অন্তরঙ্গ নিশ্চয়ই ছিলেন। সেক্ষেত্রে আপনার এটা জানার কথা, তাই না? আমি আবার বলছি, যখমটা কোথায় হয়েছিল?'

এক মুহূর্ত পর হাদি বললেন, 'এটা...এটা বুকে হয়েছিল।'

আওরঙ্গজেব এবার শিল্পার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার কি মনে হয়? ইনি কি ঠিক বলেছেন?'

ঢোক গিলতে গিলতে শিল্পা হাদির দিকে তাকিয়ে তারপর বললেন, 'হ্যাঁ...হ্যাঁ ...বুকে হয়েছিল।' হাদি তখনও এক দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তার চেহারা শান্ত হলেও আকবর দেখলেন তিনি দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন। আওরঙ্গজেব সামনে হাদির দিকে এগিয়ে সরাসরি তার দিকে তাকালেন। হাদি পিছু হটলেন না, বরং গর্বিতভাবে আওরঙ্গজেবের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরপর আওরঙ্গজেব শিল্পার কাছে গিয়ে তাকেও একইভাবে নিরীক্ষণ করলেন।

পরিশেষে সম্রাট বললেন, 'আপনারা আমার ছেলেকে বোকা বানাতে পারলেও এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে বিশ্বাস করাতে পারেন নি।'

'এ আপনি কি বলছেন? আমরা মারওয়াড়ের রানি। আপনার ছেলে আমাদের কথা দিয়েছিলেন যে, আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা হবে। অথচ আপনি

আমাদের মুখ ঢেকে রাখার অধিকার লঙ্ঘন করেছেন। আর এখন আরো অপমান করছেন।'

'চমৎকার অভিনয় করেছেন। তবে আর ভান করে লাভ নেই। আমি যতদূর জানি যশবন্ত সিং-এর একমাত্র যখম হয়েছিল তার উরুতে। আপনারা আসলে কে? মারওয়াড়ের বাজার থেকে মোটা ঘুষ নিয়ে আনা অভিনেত্রী নিশ্চয়ই?'

হাদির দুই চোখ জ্বলে উঠলো। তিনি বললেন, 'এটি সত্যি আমরা রানি নই। তবে আমরা মারওয়াড়ের উচ্চ অভিজাত ঘরের মহিলা। আমরা যথোপযুক্ত সম্মান পাওয়ার যোগ্য।'

'যদি সেরকম ব্যবহার আমার কাছ থেকে আশা করেন, তবে সবকিছু বলুন। আর যদি আমার কথা অমান্য করেন তবে পরিণতি খুবই খারাপ হবে।'

'আমরা দুই রানির সহচরী এবং তাদেরকে আমরা ভালোবাসি। যখন আমাদের চরেরা খবর আনলো যে, আপনার ছেলে সৈন্য নিয়ে দ্রুত আমাদের অনুসরণ করছেন আর কয়েকদিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন, তখন আমরা আসল রানিদের বদলে নিজেরা রানি সাজতে রাজি হলাম। যখন আমরা তাঁবু খাটিয়ে অপেক্ষা করছিলাম কখন আপনার সৈন্যরা এসে আমাদের ধরে ফেলবে, তখন বাচ্চাসহ আসল রানিরা আমাদের বেশিরভাগ সৈন্য নিয়ে মারওয়াড়ি পার্বত্য এলাকার গভীরে ঘোড়া ছুটিয়ে আপনাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। আমরা সম্মান নিয়ে আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। এখন ইচ্ছা করলে আমাদেরকে মেরে ফেলতে পারেন, তবে বাচ্চাগুলোকে দয়া করে রেহাই দিন। ওরা আমাদের সন্তান আর এত ছোট যে, এই প্রতরাণার ঘটনায় তাদের ভূমিকা নিয়ে আপনি তাদেরকে দোষী করতে পারেন না।'

হাদির কথা বলা শেষ হলে আকবর তার বাবার দিকে তাকালেন। বেশিরভাগ যেরকম হয়, তিনি তার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করতে পারলেন না তার মনে কি ভাবনা চলছে। শেষপর্যন্ত আওরঙ্গজেব বললেন, 'ঠিক আছে। আমি আপনার কথা বিশ্বাস করলাম। জেবুন্নিসা, এই মহিলাদেরকে তাদের কামরায় আটকে রাখ, আর যে পর্যন্ত আমি এদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত না নেই ততদিন এদেরকে কড়া পাহারা দিয়ে রাখবে। আকবর তুমি এসো আমার সাথে।'

বাবাকে অনুসরণ করে তাঁর মহলের দিকে চলতে চলতে আকবরের আবার মন খারাপ হয়ে গেল। এই মহিলারা তাকে কিরকম বোকা বানিয়েছেন। যদি তিনি সেখানে তাদেরকে প্রশ্ন করতেন, তাহলে হয়তো সত্যিটা আবিষ্কার হত আর তিনি আসল রানি আর তাদের বাচ্চাদের ধরতে পারতেন। বাবার সাথে একা

হওয়ার পর তিনি অপেক্ষা করছিলেন, কখন তার সমালোচনা করবেন, তবে অবাক হলেন যখন দেখলেন চিন্তামগ্ন হলেও তাকে দেখে মনে হল না যে রেগেছেন। দুটি পেয়ালায় আনারের রস ঢেলে একটি আকবরের হাতে দিয়ে তাকে বসতে ইশারা করলেন।

তারপর এমন কোমল কণ্ঠে কথা বললেন যে, আকবর বেশ অবাক হলেন, 'আশা করি এটা তোমার জন্য একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে। যদিও তুমি ভেবেছিলে যে, তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ, কিন্তু আসলে তা করো নি। কেন? কারণ তুমি তোমার শত্রুর মনের ভেতরে ঢুকতে পারোনি, এটাই হল যুদ্ধের প্রথম নিয়ম। বরং তুমি বোকার মতো বিশ্বাস করছো, যা বিশ্বাস করতে চেয়েছো, যা দেখতে চেয়েছো তাই দেখেছো। আর তাই মারওয়াড়িরা বেশ সহজে তোমার সাথে চালাকি করেছে, যেরকম একজন সেবিকা একজন শিশুর সাথে করে। এক হাতে একটি মিঠাই লুকিয়ে রাখার ভান করে, অথচ ওটা আসলে সব সময় অন্য হাতেই ছিল। তুমি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ। এখন তোমার গভীরভাবে চিন্তা করা শেখার সময় হয়েছে...।

আকবর মনোযোগ দিয়ে তার বাবার উপদেশবাণী শুনে চললেন—একই বয়সে তিনি নিজে কিরকম তাঁর ছেলের বিপরীত আচরণ করতেন, তাঁর নিজের বিচক্ষণতা আর দূরদর্শিতার একের পর এক উদাহরণ দিয়ে তাকে একটি বার্তা দিলেন। ধীরে ধীরে আকবরের মন থেকে তিক্ততা দূর হয়ে স্বস্তি ফিরে এল। তার বাবা ঠিকই বলেছেন—তার আরো সাধারণ জ্ঞান খাটান উচিত ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের এভাবে তার সাথে কথা বলার প্রয়োজন ছিল না, যেন তিনি একজন তরুণ কোরচি যে কখনও যুদ্ধ করেনি। সেই সাথে তিনি বুঝতে শুরু করলেন, নারী আর শিশুদের পিছু নেওয়ার অভিযানটি কিরকম তিক্ত মনে হল, যখন নকল রানি হাদি আরো রক্তপাত এড়াতে তার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন তখন তিনি কি খুশি হয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি আশ্বস্ত হওয়ার কারণে চালাকির সম্ভাবনাটি তার চোখে পড়েনি।

'...আমার জায়গায় হলে এখন তুমি কি করতে আকবর?'

'সেনাবাহিনী পাঠিয়ে আসল রানিদেরকে ধরে দিল্লি নিয়ে আসতাম।'

'এটা একটা সহজ উত্তর। তুমি একবারও বিষয়টা নিয়ে ভাবার চেষ্টা করোনি কিংবা আমি এতক্ষণ কি বলেছি তাও ঠিকমতো শোননি। আমি তোমাকে বলেছি সব সময় জানার চেষ্টা করবে অন্যেরা কি ভাবছে আর এটা নিজের পরিবারে যেমন ঘটে তেমনি শত্রুর বেলায়ও একইভাবে খাটে। আমাকে যতটুকু তুমি জেনেছ, তারপর তোমার নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত আমি কি

আদৌ এ ধরনের সোজা কাজ করতে পারি কি-না। আর তোমার ভেবে দেখা উচিত ছিল আর কোনো উপায় আছে কি-না আর এও দেখতে হবে কোনটা তোমার কাছে সবচেয়ে ভালো মনে হতে পারে।'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আকবর বললেন, 'কিন্তু কেন রানিদের পিছু নেবেন না?'

'বিষয়টা নিয়ে একবার ভেবে দ্যাখো! আর বেশি দিন নয়, দুই রানির মধ্যে ঝগড়া লেগে যাবে আর তারা যার যার নিজ সন্তানকে সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা করতে গিয়ে দুই পক্ষ লড়াই করে মারওয়াড়কে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলবে। এসব করে ওরা মারওয়াড়কে আরো দুর্বল করে ফেলবে আর আমাদেরকে প্রতিহত করার ক্ষমতা ধ্বংস করে ফেলবে।'

'তাই যদি হয়, তবে আপনি কেন আমাকে রানিদের গ্রেফতার করে আনতে পাঠালেন?'

'দুটি কারণে। প্রথমত, যদি আমি কোনো ব্যবস্থা না নিতাম তাহলে ওরা আমাকে দুর্বল ভাবতো। দ্বিতীয়ত, মোগলদের রক্তপাত করার জন্য আমি মারওয়াড়িদেরকে উস্কে দিতে চেয়েছিলাম। আমি মনে মনে খুশি হয়েছিলাম, যখন রানিরা আমাকে অমান্য করে মারওয়াড়ে ফিরে যেতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এমনকি তাদের পালিয়ে যেতেও প্ররোচিত করেছিলাম—তাদের শিবিরে আমার গুপ্তচর পাঠিয়ে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিলাম যে, দিল্লির আসার পর আমি রানিদেরকে কারাগারে বন্দী করে রাখবো আর বাচ্চাগুলোকে হত্যা করবো। আর যতটা আশা করেছিলাম এই ফন্দিটা তার চেয়ে আরো ভালো কাজে লেগে গেল। তোমার কয়েকজন সৈন্য হত্যা করে আর তোমার সাথে প্রতারণা করে মারওয়াড়িরা তাদের দেশে আমার অভিযান চালাবার যথেষ্ট কারণ তৈরি করলো। এই গর্বিত রাজপুতদের দীর্ঘদিন প্রশ্রয় দিয়েছি, পদবী আর সম্মান দিয়েছি যা ওদের প্রাপ্য নয়। এবার তাদেরকে অবনত আর বাধ্য হতে শেখাব আর তাদের রাজ্যকে আমার সাম্রাজ্যের একটি অংশ করে নেবো। আর তুমি, আমার ছেলে হবে এই বিজয়ের ঘটক। তুমি আবার মারওয়াড় ফিরে যাবে, এবার শক্তিশালী একটি মোগল সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে বিজয়ী হয়ে ফিরবে।'

আকবর কিছু বললেন না। এই প্রথম বড় একটি অভিযানে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব পাওয়ার উল্লাসে মারওয়াড়িদের বিরুদ্ধে তার বাবার চক্রান্ত সম্পর্কে তার মনে যে সংশয় ছিল তা এখনকার মতো মুছে গেল।

অধ্যায় : নয়

ভূতের রাজ্য

গরম এত তীব্র ছিল যে, চামড়ার হাওদার ছাউনির ছায়ার নিচে থেকেও আকবরের মাথা টন টন করছিল। সেই একঘেয়ে কমলা রংয়ের মরুভূমি, সবুজ পাতা কিংবা ফুলের এতটুকু চিহ্ন নেই। তার কাছে মোটেই আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে না। ২০,০০০ সেনার শক্তিশালী একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে মারওয়াড়ে এসেছে—দুই সপ্তাহ হল। এই দুই সপ্তাহের মাঝে মোগলরা একটিও গুলি ছুড়েনি কিংবা একবারও তরোয়াল খাপ থেকে বের করতে হয়নি। বরং মনে হচ্ছে যেন ওরা একটি ভূতুড়ে রাজ্যে এসে পড়েছে—প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি মাটির কেল্লা পরিত্যক্ত, প্রত্যেকটা কূপ পাথর দিয়ে ভর্তি। একমাত্র জীবিত প্রাণী বলতে কয়েকটা নেড়ি কুকুর আর কিছু ময়ূর নিচু ধূলিময় গাছের ডালে বসে পেখম ঝাঁপটে আতঙ্কিত হয়ে কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করছে।

তবে শীঘ্রই তিনি তার সেনাবাহিনী নিয়ে মারওয়াড়ের শাসকদের শত শত বছর ধরে গর্ব বিশাল মেহরানগড় দুর্গে পৌঁছে যাবেন। মূল মারওয়াড়ি সেনাবাহিনী নিশ্চয়ই সেখানে অবস্থান নিয়ে রয়েছে। আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানিয়ে চারদিন আগে তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ওরা দূতকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল। মারওয়াড়িরা কি পরিকল্পনা করছে? দুর্গের দেয়ালের নিচে তার সাথে লড়াই করবে নাকি তাকে বাধ্য করবে দুর্গ অবরোধ করার? সম্ভবত শেষেরটাই হবে—তবে ওদেরকে উৎখাত করতে অনেক মাস ধরে অবরোধ চলবে...

ঘণ্টাখানেক পর আকবরের যুদ্ধহস্তিটির পা নরম বালুর গভীরে ডেবে যেতেই হাতিটি এমনভাবে দুলে উঠলো যে, তাকে হাওদার দুপাশের কারুকাজ করা কিনারা আঁকড়ে ধরে তাল সামলাতে হল। কয়েকটি বালিয়াড়ির চূড়ার পর দূরে মেহরানগড় দেখা গেল। ঝিকমিক করা কুয়াশার মধ্য দিয়ে ঠিক বুঝা যাচ্ছিল না এর চূড়াটি কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে আর কোথা থেকে দুর্গের খাড়া ধূসর

দেয়াল শুরু হয়েছে। এমন সময় ঘোড়া ছুটিয়ে একজন মোগল চর এসে তার সামনে হাজির হল। তার ঘোড়াটি জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল।

লোকটি বললো, 'জাঁহাপনা, ছয়জনের একটি দল ঘোড়া ছুটিয়ে মেহরানগড়ের দিক থেকে সমতল ভূমি পার হয়ে আমাদের দিকে আসছে। প্রায় বালিয়াড়ির গোড়ার কাছে পৌঁছে গেছে, তবে এখান থেকে আপনি ওদেরকে দেখতে পাবেন না। আমরা কি ওদের বাধা দেবো?'

'আমি নিজে একবার ওদেরকে দেখতে চাই। একটা ঘোড়া নিয়ে এসো।' কয়েকমিনিট পর তামাটে রঙয়ের একটি ঘোড়ায় চড়ে দুজন দেহরক্ষীসহ আকবর চরের পেছন পেছন বালিয়াড়ির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললেন। তারপর ওরা একটি পাহাড়ের আড়ালে এসে পৌঁছে দেখলেন আরো তিনজন মোগল চর সামনে উঁকি দিচ্ছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দ্রুত আকবর তাদের সাথে যোগ দিলেন। ওদের একজন বললো, 'ঐ যে দেখুন জাঁহাপনা।'

আকবর তার আঙুলের নির্দেশ বরাবর তাকালেন। হ্যাঁ, তাদের প্রায় ঠিক নিচে অশ্বারোহী দলটি বালিয়াড়িতে উঠতে শুরু করেছে। ওরা নিশ্চয়ই জানে তার সেনাবাহিনী অন্য পাশে রয়েছে...ধুলার মেঘ অবশ্য অনেক দূর থেকে দেখা যায়। ওরা কি চাচ্ছে? তিনি সতর্কদৃষ্টিতে ওদেরকে লক্ষ করলেন। লোকগুলোর গায়ের জামা বিবর্ণ কমলা রঙের, প্রায় বালুর মতো একই রং। এত কম লোকের সাথে লড়াই করা যায় না আর যেহেতু ওরা মোটেই নিজেদেরকে লুকাতে চেষ্টা করছে না, তার মানে গুপ্তচর হওয়ার সম্ভাবনাও কম। ওরা হয়তো আলাপ-আলোচনা করতে এসেছে। আকবর বললেন, 'ওরা মারওয়াড়ি, আমি নিশ্চিত।' তারপর একজন চরের দিকে ঘুরে বললেন, 'আমার মনে হয় ওরা কথা বলতে এসেছে। তবে নজর রাখবে আর যদি সন্দেহজনক কিছু দেখো তাহলে সাথে সাথে খবর পাঠাবে। এমনও হতে পারে আমাদের মনোযোগ অন্যদিকে সরাবার জন্য ওদেরকে পাঠান হয়েছে, যাতে মূল সেনাদল আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। তবে সেরকম আমার মনে হচ্ছে না—কেননা যদি ওদের সেনাবাহিনী আমাদের কাছাকাছি হবার চেষ্টা করে, এই অবস্থান থেকে আমরা সহজেই ওদের দেখতে পাবো।'

মাথা ব্যথার কথা ভুলে গিয়ে আকবর মূল সেনাদলের কাছে ফিরে গিয়ে ছোট একটি দল পাঠালেন শত্রুর অশ্বারোহী দলটিকে নিরস্ত্র করে তার কাছে নিয়ে আসতে। তারপর আবার হাতির পিঠে চড়ে প্রচণ্ড গরমে ঘামতে ঘামতে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আধ ঘণ্টা পর তার লোকেরা মারওয়াড়িদেরকে নিয়ে ফিরে এল। বালিয়াড়ির উপর চড়ার পরিশ্রমে ওদের চমৎকার কালো

ঘোড়াগুলোর নাক দিয়ে ফেনা বের হচ্ছিল। ওদের হাতে ছুরি, তরোয়াল, বল্লম কিছুই নেই, সব তার লোকেরা ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। তারপরও বুঝা যাচ্ছে এরা যোদ্ধা। এখন ওরা বালুর উপর ছড়িয়ে দাঁড়াতেই ওদের হাঁটা, চলা, দাঁড়াবার ধরন দেখেই তা বুঝা যাচ্ছে। আকবর বললেন, 'আমি আকবর, সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র। তোমরা কে আর কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ?'
অশ্বারোহীরা একে অন্যের দিকে তাকাল। অন্যদের চেয়ে একজনের পরনে ছিল দামি পোশাক, গলায় ভারী সোনার হার ঝুলছিল এবং কানে সোনার দুল। সে বললো, 'আমরা মারওয়াড়ের বিশেষ দূত। আপনি যে দাবি করেছেন তার জবাব নিয়ে আমরা এসেছি, আমরা আমাদের দুর্গসহ আত্মসমর্পণ করছি।' জিনের সাথে ঝুলানো একটি রেশমি কাপড়ের থলে থেকে সে একটি ভাঁজ করা কাগজ বের করলো। তারপর আকবরের ইশারা করতেই একজন কোরচির হাতে তুলে দিল।
আকবর চিঠিটা নিয়ে মোমলাগানো সিলমোহরটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন একজন রাজপুত যোদ্ধাকে পিঠে নিয়ে একটি ঘোড়া পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে রয়েছে। তারপর সিলমাহরটি ভাঙ্গলেন। তিনি আশা করেছিলেন চিঠির ভাষা হবে, অবাধ্যতা, এমনকি অপমানজনক। তবে বার্তাটি ছিল চমৎকার ফার্সিতে লেখা সহজসরল, *আপনি দুর্গ চেয়েছেন। ইচ্ছা করলে তা দখল করে নিন। এটা এখন আপনার।* নিচে সই করেছে, দুর্গাদাস রাথোর, মারওয়াড়ের রাজপ্রতিভূ। মারওয়াড়িরা অভিজাতরা আসল রানি হাদির ছেলেকে রাজা করে, সে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত দুর্গাদাসকে তার রাজপ্রতিভূ নিযুক্ত করেছে। মারওয়াড়ের হয়ে কেউ তার চেয়ে বেশি অধিকার নিয়ে কথা বলতে পারে না।
'তোমরা চিঠিতে কী লেখা আছে, তা জান?' লোকগুলো মাথা নেড়ে সায় দিল।
'শুধু এই বার্তা নিয়ে এসেছ? আর কোনো বার্তা নেই?'
কানের সোনার দুলপরা লোকটি বললো, 'আর কিছুই নেই।'
'ঠিক আছে। দুর্গাদাসকে বল আমি দুর্গসহ তার আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। আর আশা করি অতি শীঘ্রই মারওয়াড়ের সেনাবাহিনীও আত্মসমর্পণ করবে, যাতে সবার ভালো হবে আর আমরা এই রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারি। আমার লোকেরা তোমাদেরকে সমতল ভূমি পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেখানে গিয়ে তোমরা তোমাদের অস্ত্র ফিরে পাবে আর কোনো বাধা ছাড়াই চলে যেতে পারবে।'
মারওয়াড়িরা ঘোড়ায় চড়ে চলে যেতেই তার বাবার কথাগুলো আকবরের মনে পড়লো: *শত্রুর মনে নিজেকে ঢোকাও।* নিঃশর্তভাবে মারওয়াড়িরা কেন তাদের

প্রধান দুর্গটি ছেড়ে দিল? এর মানে কি শুরু হওয়ার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে? এভাবে মুখের কথায় মেহরানগড় ছেড়ে দিয়ে তাকে এত সহজে বোকা বানানো যাবে না। তিনি নিজে তার অধিকাংশ লোক নিয়ে এখানে থেকে প্রচুর বরকন্দাজসহ একটি শক্তিশালী অগ্রবর্তী দল সামনে পাঠাবেন। সমতল ভূমি পার হতে গিয়ে কোনো প্রতিরোধের সামনে না পড়লে আরো সামনে এগিয়ে দুর্গে ঢুকে পুরোপুরি তল্লাসি চালাবে।

বালিয়াড়ির একটি সুবিধামত জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি লক্ষ করলেন ঘণ্টাখানেক পর অগ্রবর্তী দলটি পাহড়ের গোড়ায় পৌঁছেছে। তারপর আঁকাবাঁকা খাড়া পথ বেয়ে চারশো ফুট উচ্চতায় দুর্গের দিকে উঠতে শুরু করেছে। দুর্গের বুরুজ থেকে কামানের গোলার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কিংবা গাদা বন্দুকের শব্দ শোনার জন্য তিনি অপেক্ষা করে রইলেন, তবে একটু পরই দুর্গ-প্রাচীর হতে আগে থেকে নির্ধারিত করা দশটি জ্বলন্ত মশালের সঙ্কেত দিয়ে তার লোকেরা জানাল যে, দুর্গ দখল করা হয়েছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই স্নিগ্ধ বাতাস বইতে শুরু করলো, আকবর তখনও হাতির পিঠে বসা অবস্থায় দুর্গের দুতলা সিংহ দুয়ারের দিকে এগিয়ে চললেন। দুর্গাদাসের সিলমোহরের মতো এখানেও দরজার উপরের পাথরের চৌকাঠের উপর অশ্বারোহীসহ একটি তেজস্বী ঘোড়ার মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। পাথরের কাজগুলো দেখে মনে হল বেশ প্রাচীন। কয়শো বছর ধরে মারওয়াড়িরা এই রাজ্য শাসন করে এসেছে? মোগলরা হিন্দুস্তানের শাসক হওয়ার অনেক আগে থেকে হবে নিশ্চয়ই...।

দ্বিতীয় আরেকটি ফটকের নিচ দিয়ে যাওয়ার পর আকবর তার বাম পাশে সাদা চুনকাম করা একটি দেয়াল দেখতে পেলেন। দেয়ালটির উপর এক সারি ছোট ছোট লাল হাতের ছাপ দেখা যাচ্ছে। এগুলো কি তিনি জানেন—এগুলো হচ্ছে বিধবা রাজমহিষীদের হাতের ছাপ। স্বামীর চিতায় সহমরণে যাওয়ার পথে ওরা এই ছাপ রেখে যান। একে বলা হয় সতি। যশবন্ত সিংয়ের মৃত্যুর পর সন্তান সম্ভবা না হলে হাদি আর শিল্লারও কী একই নিয়তি হত? ছোটবেলায় তিনি একটি কাহিনী শুনেছিলেন, কিভাবে তার মতো একই নামের সম্রাট আকবর যখন শুনতে পেলেন, ফতেহপুরে একজন বিধবাকে স্বামীর চিতায় পোড়ানো হবে, তখন তিনি সাথে সাথে ঘোড়ায় ছুটিয়ে সেখানে গিয়ে মহিলাটিকে উদ্ধার করেন।

ছায়াঘেরা পাথর বসানো পায়ে চলা পথসহ উঠান আর মাথার উপরের কারুকাজ করা বেলকনিতে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আকবর হাতির পিঠে চড়ে বেলেপাথরের

দুর্গের মধ্যখানে এসে উপস্থিত হলেন। ভারী কংক্রিটের দেয়াল, শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে তীক্ষ্ণ খাঁজকাটা। আর হাতি যাতে ফটক ভেঙ্গে ঢুকতে না পারে, তাই ফটকের উপর তীক্ষ্ণ খুঁটা বসানো হয়েছে। আরেকটি ফটকের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর তিনি একটি খোলা জায়গায় এসে পৌঁছলেন, যার চারদিকে সুন্দর কয়েকটি চৌকোণা ঘর রয়েছে। এগুলো নিশ্চয়ই রাজার থাকার ঘর।

যে ঘরে যশবন্ত সিং থাকতেন, সে ঘরে এসে স্থিত হওয়ার পর আকবর শরীর-মন শিথিল করার চেষ্টা করলেন। মেহরানগড় তার অধীনে এসেছে, তাসত্ত্বেও তিনি মন থেকে এই চিন্তাটা ঝেরে ফেলতে পারছিলেন না যে, কোনো না কোনোভাবে হোক মারওয়াড়িরা আবার হয়তো নতুন কোনো ফন্দি এঁটে তাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছে। আর আগের মতোই তিনি অন্ধ হয়ে রয়েছেন, তা দেখতে পাচ্ছেন না। দীর্ঘদিন ধরে মেহরানগড় অবরোধ করতে হবে ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। আর এখন হয়তো তাকে অবরোধ করে ফেলবে এ চিন্তায় তাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে। কিন্তু তা হতে পারে না। কেবল পাঁচহাজার সৈন্য দুর্গে এসে ঘাঁটি গেড়েছে। বাকি সেনারা পাহাড়ের গোড়ার চারপাশে শিবির স্থাপন করেছে। জানালা দিয়ে দেখলেন বাইরে অসংখ্য চুলার আগুন অন্ধকার ভেদ করে জ্বলছে। তিনি পাহাড় ঘিরে তিনগুণ পাহারা আর খুঁটির বেড়া বসাতে নির্দেশ দিলেন। না, এবার মারওয়াড়িরা এখানে তাকে আর চমকে দিতে পারবে না।

তাহলে ওরা কি করতে চাচ্ছে? আগামীকাল আরো কয়েকজন চর পাঠাবেন; পাহাড়ের নিচে চারদিকে এলোমেলোভাবে যে মাটির ঘরগুলো রয়েছে, সেখানে হয়তো কেউ এখনও আছে, যে হয়তো কোনো খবর দিতে পারে। তারপর তার কয়েকজন বুড়ো কর্মচারীর কথা মনে পড়লো, যারা তাদের দুর্বল শরীরের কারণে দুর্গেই থেকে গিয়েছে। এদের মধ্যে কেউ হয়তো মারওয়াড়ি সেনাবাহিনী কোথায় আছে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা দিতে পারে। দরজার কাছে গিয়ে তিনি একজন কোরচিকে ডেকে বললেন, 'আমি শুনেছি কয়েকজন মারওয়াড়ি চাকর এখানে আছে। ওদেরকে এখানে ডেকে আন।'

তিনজন বুড়ো লোককে সাথে নিয়ে কোরচি ফিরে এল। কুঁচকানো মুখের লোকগুলোকে ভীত মনে হচ্ছিল। আকবর বললেন, 'ভয় পেয়ো না। তোমরা কারা বল?'

সবচেয়ে বুড়ো লোকটি উত্তর দিল। লোকটির পিঠ এতো কুঁজো যে, কেবল চার ফুট হবে সে লম্বায়। কচ্ছপের মতো সামনে গলা বাড়িয়ে সে হাতির দাঁতে বাঁধানো একটা লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে বললো, 'আমরা

যশবন্ত সিংয়ের কর্মচারী। বেশি বয়সের কারণে অক্ষম হয়ে পড়ার পর আর কাজ করতে পারি নি। তিনি আমাদেরকে দুর্গে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমরা এখানে খাবার আর ভাতা পেয়ে থাকি।'

'যদি আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দাও, তবে দেখবে যে আমিও একজন দয়াশীল মানুষ।'

আকবরের কথা শুনে কচ্ছপের মতো গলা যে লোকটির, সে তার সঙ্গীদের দিকে তাকাল। লম্বা, হাড় জিরজিরে একটি লোক, ঢিলা করে পরা বিশাল একটি লাল পাগড়িতে তার মাথা প্রায় ঢাকা পড়েছিল। ছানি পড়া চোখে সে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিল না। সে বললো, 'আমি এককালে আমার প্রয়াত প্রভুর পেয়াদা ছিলাম। আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করতে পারি।'

'আমি শুধু জানতে চাই মারওয়াড়ি সেনারা কোথায় আছে?' প্রশ্নটি করলেও আকবর ভাবলেন তিনি খামাখা প্রশ্নটি করলেন। কিছু জানলেও বুড়ো লোকটি কেনই বা এমন কথা বলবে, যাতে তার স্বজাতির ক্ষতি হতে পারে।

তবে আকবর অবাক হলেন, যখন লোকটি দাঁতহীন মাড়ি বের করে হেসে বললো, 'তাহলে আপনি জানতে চান আমাদের সৈন্যরা কোথায় আছে? একটু পরই তো আপনি তাদেরকে খুঁজে পাবেন, কাজেই এখনই তা বললে ক্ষতি কী? ওরা সবাই আরাবল্লি পাহাড়ে চলে গেছে—সমস্ত সৈন্য আর তাদের পরিবার। সাথে রাজকোষের সমস্ত ধনদৌলত নিয়ে গেছে।...আপনি একটি খালি দুর্গ দখল করেছেন, তবে মারওয়াড় পান নি।' বুড়ো লোকটি জিহ্বা দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করলো।

আবার যখন একা হলেন, তখন গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। তার বাবাও আগে থেকে একথা ভাবেন নি। রাজপুতদের গোঁয়ার্তুমি আর বৃথা সাহসিকতা সম্পর্কে আওরঙ্গজেব যা দাবি করতেন, তার বিপরীতে মারওয়াড়িরা একান্ত বাধ্য না হলে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিতে মোটেই ইচ্ছুক মনে হচ্ছে না। অদৃশ্য একটি শত্রুকে তিনি কিভাবে পরাস্ত করবেন? তার বাবার সমালোচনামুখর চেহারাটা মনে পড়ে গেল...শুনতে পেলেন তার ব্যর্থতায় তাকে অপমানজনক কথা বলছেন। না, তাকে পাহাড়ে গিয়ে মারওয়াড়িদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে।

মেঘ শূন্য আকাশের সূর্য ওদের উপর প্রচণ্ড তাপ ছড়াচ্ছিল আর আকবরের চোখ বেয়ে টপ টপ করে ঘাম ঝরছিল। দুই মাইল লম্বা কাফেলার একেবারে শেষ মাথায় মালবাহী উটগুলোর ফোঁস ফোঁস করে দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস ফেলার

শব্দ ধীরে ধীরে তার কানে কমে এল। তিনি পেছনে এসে দেখছিলেন মালপত্র নিয়ে পশুগুলো ঠিকমতো তাদের পিছু পিছু আসছে কি-না। খুশি হলেন দেখে যে, কেবল গুটিকয়েক লোক পিছিয়ে পড়েছে আর কয়েকটি মাত্র উট অসুস্থ হয়ে মরুভূমিতে পড়ে রয়েছে। ওদের মাথার উপর আকাশে চক্কর দেওয়া শকুনগুলো শীঘ্রই পশুগুলোকে নিয়ে ভোজে বসবে আর হয়তো কয়েকটি মানুষও এর মধ্যে থাকবে।

তারপর হঠাৎ তিনবার শিঙ্গা বেজে উঠার শব্দ শুনতে পেলেন। সেনাপতিদের বলা ছিল, কোনো বিপদ এলে এভাবে সতর্ক সঙ্কেত দিতে। শব্দটি অগ্রবর্তী দল থেকে এসেছিল, ওরা সামনে আরাবল্লি পাহাড়ের পেছনে তার দৃষ্টির আড়ালে ছিল। ঘোড়ার পেটে পা দিয়ে গুঁতো মেরে আকবর কাফেলার পাশ দিয়ে সামনে ছুটতে ছুটতে দেহরক্ষী দলকে চিৎকার করে কাছাকাছি থাকতে বললেন। পাথুরে জমিনের উপর দিয়ে ঘোড়ার খুরের ঠকাঠক শব্দ করে এগিয়ে একটি পাহাড় ঘুরতেই সামনে দেখা গেল জাফরানি রংয়ের পোশাকপরা একদল ঘোড়সওয়ার গরম কুয়াশার মধ্য থেকে বের হয়ে আসছে। মোগল অগ্রবর্তী দলের প্রথম সারির উপর আক্রমণ করতে উদ্যত শত্রুদের খোলা তরোয়ালের উপর রোদ পড়ে ঝলকাচ্ছে।

মোগল অগ্রবর্তী দলটি বেশ ধীরগতিতে এগোচ্ছিল, তবে কয়েকমুহূর্ত পর মারওয়াড়িদের আকস্মিক হামলার ধাক্কায় অগ্রবর্তী দলটি টলমল করে সামান্য পিছু হটে এল। আতঙ্কিত হয়ে কয়েকটি ঘোড়া পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হল। অন্য কয়েকটি পাঁজরে আঘাত পেয়ে পড়ে গেল, আরোহীদেরকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেললো। তিনজন মারওয়াড়ি একজন মোগল পতাকা বাহককে ঘিরে ধরলো। তরবারির এক কোপে সে একজন মারওয়াড়িকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিল, তবে এতে তার নিজের ঘোড়ার লাগাম তার হাত থেকে ছুটে যাওয়ায় সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললো। ঘোড়াটা একপাশে হেলতেই আরেকজন মারওয়াড়ি তার তরোয়ালের ডগা মোগল পতাকাবাহকের গলায় বিঁধিয়ে দিল। লোকটি ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লো, তবে তার বাম পা পাদানিতে আটকে গেল। আতঙ্কিত ঘোড়াটি আরোহীর দেহটি পেছন পেছন টেনে নিয়ে ছুটে চললো, লোকটির মাথা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে চললো। আরেকজন মারওয়াড়ি মাটিতে পড়ে থাকা মোগল পতাকাটি তুলে নিয়ে বিজয়োল্লাসে চেচিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চললো। মোগল অশ্বারোহীদের প্রথম সারির পেছনে গাদা বন্দুকধারী একটি মোগল পল্টনও আসছিল। তবে বিপদ সঙ্কেত পাওয়ার পর ওরা বন্দুকে গোলা ভরারও সময় পায়নি আর বন্দুক রাখার জন্য যে তেপায়া কাঠামো ওরা পিঠে

বেঁধে বহন করছিল, সেগুলো নামিয়ে প্রস্তুত হওয়াতো দূরের কথা। কয়েকজন মোগল বন্দুকধারী অবশ্য দ্রুত হাতে বন্দুক ছুঁড়ে দুইতিনজন মারওয়াড়িকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্যান্য মারওয়াড়িরা ওদেরকে ঘিরে ফেলে কাস্তে দিয়ে ধান কাটার মতো ওদেরকে কোপতে লাগলো।

সম্ভবত পাঁচমিনিটও পার হয় নি, এদিকে আকবর তখনও মাথা নিচু করে ঘর্মাক্ত ঘোড়াটি ছুটিয়ে যেদিকে লড়াই হচ্ছিল সেদিকে ছুটে চলছিলেন। তারপর তার সবুজ পোশাকপরা দেহরক্ষী দল নিয়ে চারদিকে চিৎকার-চেচামেচি আর যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভারী গোঁফওয়ালা একজন রাজপুত অশ্বারোহীর উপর তরোয়াল চালিয়ে আকবর লোকটির উরু যখম করলেন তবে সেই সাথে একটি রাজপুত বল্লম তার বুকের বর্মে আঘাত করতেই তিনি পেছনের দিকে টলে পড়লেন। ভাগ্যিস ভারী ইস্পাতের বর্মটি কেবল সামান্য বেঁকে গিয়েছিল। আরেকজন রাজপুত সোজা-লম্বা তরোয়াল নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তার দিকে এগোতেই তিনি তাকে আঘাত করলেন। তবে তাড়াহুড়ার কারণে আকবরের তরোয়াল লোকটির গায়ে না লাগলেও আঘাত এড়াতে সে একদিকে সরে যাওয়ায় সে নিজেও তার তরোয়াল চালাতে পারলো না। তারপর সে আবার তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে লম্বা তরোয়ালটিকে বল্লমের মতো সামনে তাক করে আকবরকে আক্রমণ করতে ছুটে এল। তবে আকবরের কাছে পৌঁছার আগেই একজন দেহরক্ষী তার ধারালো তরোয়াল দিয়ে এমন জোরে লোকটির গলায় আঘাত করলো যে, তার মুণ্ডুটি ধর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল আর তার জাফরান রংয়ের পোশাকপরা মুণ্ডুহীন ধড়টি কয়েক মুহূর্ত ঘোড়ার পিঠে খাড়া হয়ে থেকে তারপর মাটিতে পড়ে গেল। আকবর লক্ষ করলেন আরেকজন মারওয়াড়ি তার ঘোড়ার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। লোকটি তার সামনে দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় তিনি হাওয়ায় উড়তে থাকা লোকটির আলখাল্লার একপ্রান্ত খামচে ধরে টান দিলেন। মারওয়াড়িটি ঘোড়ার পিঠ থেকে পেছনে মাটিতে আকবরের ঘোড়ার খুরের নিচে পড়ে গেল। এ ঘটনায় আকবরের ঘোড়াটিও আতঙ্কিত হয়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হল। আকবর তার তামাটে রংয়ের ঘোড়াটির গলা আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলালেন তবে আতঙ্কিত পশুটিকে শান্ত করতে তার কিছু সময় লাগলো।

ঘোড়াটি শান্ত হওয়ার পর তিনি আর কোনো লক্ষ্যবস্তু আছে কি-না দেখার জন্য চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন মারওয়াড়িরা রণেভঙ্গ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে পালাচ্ছে। ওদের হামলা করার এখনও এক ঘণ্টাও পার হয় নি। দুয়েকজন

অশ্বারোহী থেমে নিচু হয়ে আহত আর ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়া সঙ্গীদের তুলতে চেষ্টা করছিল। একজন মারওয়াড়ি বামহাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে ডান হাত দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা তার এক সঙ্গীকে তুলতে যাচ্ছিল, এমন সময় একজন মোগল বরকন্দাজ তার পিঠে গুলি করলো। লোকটি দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে তার সঙ্গীর উপর পড়ে গেল। তারপর মৃত্যু যন্ত্রণায় বালুতে পা ছুঁড়তে লাগলো।

চারপাশে তাকাতে তাকাতে আকবর ভাবলেন, এই নিঃস্বার্থ রাজপুত যোদ্ধাদের ব্যক্তিগত সাহসিকতা নিয়ে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতে পারবে না। তিনি চাচ্ছিলেন তার লোকজনদের জড়ো করে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাওয়া শত্রুর পিছু নিতে। তবে অনেক মানুষ আর ঘোড়া আহত হওয়ায় আর চারদিকে বিশৃঙ্খলা আর বিভ্রান্তির কারণে প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় লেগে গেল যথেষ্ট অশ্বারোহী নিয়ে আবার তৈরি হতে। আরেক ঘণ্টা পর তিনি ঢেউয়ের মতো উঁচুনিচু বালুময় পাহাড়ি এলাকার ভেতরে ঢুকে কেবল মারওয়াড়িদের ঘোড়ার খুরের ছাপ পেলেন। তবে ছাপগুলো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। মনে হল মারওয়াড়িরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

আকবর তার দেহরক্ষী দলের প্রধানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কী সবচেয়ে বড় দলটির পিছু নেব।'

সে বললো, 'আমার মনে হয় তা ঠিক হবে না, জাঁহাপনা। তারা হয়তো আমাদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে পাহাড়ি এলাকার আরো গভীরে নিয়ে যেতে চাইছে। যেখানে ওরা আবার একত্রিত হয়ে অতর্কিতে আমাদের উপর হামলা করতে পারে। তাছাড়া একটু পরই সূর্য ডুবে যাবে। অন্ধকার হতে আর বেশি সময় নেই।'

আকবর মাথা নেড়ে সায় দিলেন। লোকটি ঠিক বলেছে। তার চেয়ে ভালো হয় মূল বাহিনীর কাছে ফিরে গিয়ে পরদিন ভোরে চর পাঠিয়ে মারওয়াড়ি দলটির অবস্থান খুঁজে দেখা। এই ক্ষতিটির কথা বলার পর তার বাবা কিরকম প্রতিক্রিয়া দেখাবেন, তিনি তা আন্দাজ করতে পারলেন। তবে আরো ক্ষয়ক্ষতি কিংবা রাতের বেলা আকস্মিক আক্রমণে নিজের জীবন হারানোর চেয়ে সেটা ভালো।

আওরঙ্গজেবের তরুণ কোরচি কুর্নিশ করে তাকে জানালো, 'জাঁহাপনা, এখুনি একজন কাসিদ-বার্তাবাহক আপনার পুত্র শাহজাদা আকবরের কাছ থেকে জরুরি বার্তা নিয়ে এসেছে।' একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সম্রাট সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের

সুবাহগুলো থেকে যে খাজনার হিসাব এসেছে তা একপাশে সরিয়ে রাখলেন। এগুলো পড়ে তিনি খুব একটা খুশি হননি। অন্য রাজ্যগুলোতেও যে পরিমাণ যেমন হওয়ার কথা ছিল তার চেয়ে কম খাজনা আদায় হচ্ছে। তাঁর আশংকা অবাধ দুর্নীতি এর জন্য দায়ী। তাঁর সুবেদাররা আর তাদের কর্মকর্তারা মনে করেছে যে তাঁর সমস্ত মনোযোগ বিদ্রোহ দমনে আর বিদেশি আক্রমণের দিকে আচ্ছন্ন থাকায় ওরা তাঁর নজর থেকে অনেক দূরে রয়েছে। কাজেই ওরা এই সুযোগে ঘুষ নিতে পারবে কিংবা যে অর্থ খাজনা হিসেবে আদায় হচ্ছে তার কিছু অংশ সবার অজান্তে নিজেদের পকেটে ঢুকাতে পারবে। যখনই তিনি দিল্লির কোষাগারের দপ্তর থেকে অনুসন্ধান করার জন্য কোনো গোমস্তা বা কর-পরিদর্শক পাঠাতেন, তারা সাধারণত তাকে আশ্বস্ত করতো যে সব ঠিক আছে। তবে অধিকাংশ মানুষই অর্থের জন্য অসৎ কাজ করতে তৈরি আর সত্যিকার বিশ্বস্ততা আজকাল একেবারে বিরল আর তাদেরকেও হয়তো ঘুষ দিয়ে কেনা যায়। একমাত্র সমাধান হচ্ছে তার নিজেকে একটি রাজকীয় তদন্ত ও অনুসন্ধান কর্ম চালাতে হবে আর কিছু নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাকে পুরস্কার কিংবা শাস্তি কমিয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রকাশ করার জন্য রাজি করাতে হবে।

কিন্তু তিনি নিজে সব জায়গায় যেতে পারেন না। তিনি এখানে আজমিরে এসেছেন রাজস্থান আর মারওয়াড়ের বিরুদ্ধে আকবরের অভিযানের কাছাকাছি থাকতে। বড় ধরনের কোনো বিপর্যয় না হলেও তিনি যা আশা করছিলেন অভিযানটি সেরকম হচ্ছে না। তবে বেশ কিছুদিন হল তার ছেলের কাছ থেকে কোনো খবর আসছে না, কাজেই এই কাসিদের কাছে নিশ্চয়ই কোনো খবর থাকতে পারে। তিনি কোরচিকে বললেন, 'আমি এখুনি খবরটা দেখবো।'

তরুণ কোরচিটি বহুব্যবহৃত একটি চামড়ার থলে থেকে একটি সিলমোহর করা কাগজ বের করে তাঁর সামনে ধরে বললো, 'আমি এটা নিয়ে এসেছি জাঁহাপনা।'

আওরঙ্গজেব কাগজটা নিয়ে দ্রুতহাতে সিলমোহরটি ভাঙ্গলেন। চিঠির উপরের আনুষ্ঠানিক সালাম ইত্যাদি বাদ দিয়ে তিনি সরাসরি বার্তাটির মূল বিষয়বস্তু জানার জন্য পড়া শুরু করলেন। যতই পড়তে লাগলেন ততই তার ভ্রু কুঁচকাতে শুরু করলো।

আকবরের অভিযানে কিছুই ফল হয় নি। চিঠির শুরুতে তিনি মারওয়াড়িদের লড়াই করার কায়দা বর্ণনা করেছেন। ওরা অতর্কিতে আক্রমণ করছে, আজ এখানে, কাল ওখানে আর সবসময় ছোট ছোট দলে হামলা করে তার সেনাবাহিনীর অনেক লোককে হতাহত করে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় হামলাগুলো সন্ধ্যার পর হচ্ছে, যাতে ওরা সহজে পালিয়ে যেতে পারে।

মোগল সৈন্যরা একটি নিয়মিত সেনাবাহিনীর বদলে এ ধরনের শত্রুর সাথে লড়াই করতে অভ্যস্ত নয়, যারা দস্যুর মতো আচরণ করছে। তিনি মারওয়াড়িদেরকে প্রলুব্ধ করে পাহাড়ি অঞ্চলের ভেতর থেকে সমতল ভূমিতে আনতে পারছেন না, যাতে ওদের সাথে পরিকল্পিত ও সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী সমন্বয়ে মুখোমুখি লড়াই করা যায়। সেখানে তার অধিক সৈন্যসংখ্যা আর উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও, বিশেষত কামানগুলোর ব্যবহার প্রভাব ফেলতে পারতো। তার সৈন্যরা মারওয়াড়িদের পিছু নিয়ে পাহাড়ি এলাকায় ঢুকতে অনিহা প্রকাশ করছে। অতর্কিত হামলার ভয়ে ওরা এ ধরনের ভূখণ্ডে লড়াই করতে সতর্ক, অভিজ্ঞতা থেকে এই ভীতিটি অংশত যুক্তিযোগ্য। দিন দিন ওরা আরো সতর্ক হয়ে কাছাকাছি দলবদ্ধ হয়ে থাকছে। বিপদের প্রথম কোনো ইঙ্গিত পাওয়ার সাথে সাথে তার চর আর পাহারাদারেরা পিছু হটে মূল সেনাবাহিনীর কাছাকাছি চলে আসছে। কাজেই শত্রুর কাছাকাছি হওয়ার জন্য তিনি যথেষ্ট তথ্যও পাচ্ছেন না। যখনই কোনো কেল্লা দখল করছেন তখনই দেখছেন সেটা খালি। আর রাজপুতদের আক্রমণের ভয়ে তার লোকেরা এ ধরনের স্থানে ঘাঁটি গাড়তেও অনিচ্ছুক হয়ে পড়ছে। আকবর পুরো বিপাকের একটি সারাংশ এভাবে তুলে ধরলেন

রাজপুত রণকৌশল আর নিজদেশের অলিগলি-সবজায়গা সম্পর্কে তাদের সম্যক জ্ঞানের সামনে আমাদের সেনাবাহিনীর সংখ্যাধিক্য আর উন্নত অস্ত্রশস্ত্র অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। আমি অবশ্যই স্বীকার করছি—আর সেই সাথে ক্ষমা চাচ্ছি—যে আপনার জন্য যে বিজয় আমি অর্জন করতে চেয়েছিলাম তা থেকে এখনও অনেক দূরে রয়েছি।

সর্বাধিনায়কের লাল রঙয়ের তাঁবুর মধ্যে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে পায়চারি করতে করতে আওরঙ্গজেব, একটার পর একটা বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে ভেবে চললেন। সবজায়গায় বিদ্রোহ চলছে—শিবাজি নিজেকে মারাঠার রাজা ঘোষণা করার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছে আর পর্বতে তার সুরক্ষিত আশ্রয় থেকে এখনও সমস্ত দাক্ষিণাত্য জুড়ে লুটতরাজ চালিয়ে বেড়াচ্ছে। তবে এছাড়াও তাঁকে পুরো প্রশাসন ঢেলে সাজাতে হবে এবং দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। এর মানে মারওয়াড়িদের প্রতিরোধ ক্ষমতা দ্রুত শেষ করে দিতে হবে। আকবর কি তাঁর হয়ে এই কাজটি করতে পারবে? তিনি খুব একটা নিশ্চিত হতে পারছেন না। সর্বতোভাবে তাঁর ছেলে একজন দক্ষ সেনাপতি বটে আর আজম যেরকম মাঝে মাঝে হঠকারিতা করে সেরকমও নয়। তবে মনে হয় না যে, তার বাবার হাতে সে একটি বিপর্যয়

তুলে দেবে, তবে নিশ্চিত বিজয়ও কি এনে দিতে পারবে? সে কি নিজেকে দুর্বল দেখাচ্ছে? তার উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তা পালনে সে কতটুকু অঙ্গীকারবদ্ধ এবং নিবেদিত প্রাণ? সে লিখে জানিয়েছে যে, তার বাবার জন্য সে বিজয় আনতে চাচ্ছে, তবে তাকে নিজের এবং তার ভবিষ্যতের জন্য বিজয় অর্জন করতে হবে। তিনি যে প্রতিবেদন পেয়েছেন, তা থেকে জানা যাচ্ছে যে, কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাঁর ছেলে ব্যাপকভাবে তার সেনা কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করতে, তাদের মতামত বিবেচনা করতে এবং তাদের সাথে এ বিষয়ে বিতর্ক করতে পছন্দ করে। ঐকমত্যের এ ধরনের ইচ্ছা তাকে জনপ্রিয় করেছে, তবে একজন অধিনায়কের জন্য দক্ষতা এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার সুস্পষ্টতা জনপ্রিয়তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর আওরঙ্গজেব তাঁর কোরচিকে ডেকে কাগজ-কলম আনতে বললেন। তারপর আকবরকে একটি চিঠি লিখতে শুরু করলেন। চিঠির প্রথম কথাগুলোই ছিল ভর্ৎসনার...

তোমার লোকেরা তোমার কথা মানতে বিমুখ, একথা স্বীকার করে তুমি নিজেকে যেমন লজ্জিত করেছ তেমনি আমাকেও লজ্জায় ফেলেছ। একজন মোগল শাহজাদা কখনও তার অধীনস্থ লোকদেরকে তাকে প্রভাবিত করতে অনুমতি দিতে পারে না। আর কিভাবে, কখন যুদ্ধ হবে সে সম্পর্কে কিছু নির্দেশ করাতো দূরের কথা। একজন নেতাকে নেতৃত্ব দিতে হবে, আর তুমি তা করতে অনিচ্ছুক মনে হচ্ছে। মারওয়াড়িদের রণকৌশল নতুন কিছু নয়, যা তোমার বিশ্বাস। বরং এগুলো শিবাজি আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি, উভয়ের কৌশলের মতো একই রকম। কাবুলের বণিকদের উপর যে দুর্বৃত্তরা লুণ্ঠন চালাচ্ছিল, তাদেরকে দমন করার জন্য আমি কি নিজে সফলভাবে আমার সেনাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে পেশোয়ারের বাইরে গিরিপথে নিয়ে যাই নি? দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আর বিদ্রোহীদের কঠিন শাস্তি দিয়ে কী সেখানে সবকিছু অবসান করি নি?

আমার বিশ্বাস মারওয়াড়িদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের এই আক্রমণে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো শক্তিশালী নেতা হিসেবে তুমি নিজেকে তুলে ধরতে পারো নি। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তোমার বদলে মুয়াজ্জম গুজরাটের সুবেদারি ছেড়ে তোমার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে যাবে। যাইহোক আমি তোমাকে এখুনি আরেকটা সুযোগ দিচ্ছি, যাতে তুমি নিজেকে দায়মুক্ত করতে পার আর প্রমাণ করতে পার যে, তোমার সম্পর্কে আমি যে আপত্তি তুলেছি, তা ভিত্তিহীন।

আমার কাছে খবর এসেছে যে, মেওয়ারিরা তাদের জ্ঞাতিভাই আর মারওয়াড়ের একই ধর্মাবলম্বী ভাইদের সাথে মিলে সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে যাচ্ছে। আমি দু'টি সেনাবাহিনীর সমাবেশ করতে যাচ্ছি, এরা মেবারে ঢুকে তাদেরকে দমন করবে। একটি অগ্রসর হবে পূর্বদিক থেকে আর অন্যটি যাবে দক্ষিণ দিক থেকে। তুমি এখানে ফিরে এসে দক্ষিণের বাহিনীর নেতৃত্ব নেবে। আর তোমার ভাই আজম পূর্বদিক থেকে অগ্রসর হওয়া বাহিনীর নেতৃত্ব দেবে। আমি নিজে পুরো সমরাভিযানের তত্ত্বাবধান করবো। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন, এবার তুমি তোমার নতুন নেতৃত্ব নিয়ে আমাকে আর হতাশ করবে না।

সিদ্ধান্তটি নিয়ে তাকে জানাতে পেরে খুশি হয়ে আওরঙ্গজেব দ্রুত চিঠিটা শেষ করলেন। কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক কিংবা ব্যক্তিগত বিদায় সম্ভাষণ না দিয়ে কেবল সই করলেন। তারপর লিখলেন—*আল্লাহর মেহেরবাণীতে—হিন্দুস্তানের সম্রাট।*

অধ্যায় দশ

আওরঙ্গজেব সাবধান

ছোট্ট মোগল দুর্গটি থেকে তখনও কমলা রংয়ের অগ্নিশিখা তারা-ভরা সন্ধ্যার আকাশের দিকে উঠছিল। শিবাজি সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। তপতি নদীর একটি উপশাখা যেখানে মূল নদীর সাথে মিশেছে, তার উপকূলরেখা থেকে অগ্রবর্তী উচ্চভূমির উপর দুর্গটির অবস্থান। দুর্গ থেকে সামনেই একটি জলাভূমি দেখা যায়। দুইদিন আগে তিনি তার লোকজনসহ পাহাড়ের আশ্রয় থেকে বের হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। অগ্রবর্তী দল নিয়ে তার ছেলে সম্ভাজী দুর্গ আক্রমণ করার আগেই দুর্গরক্ষাকারী মোগল সেনাদল দুর্গের ইটের দুই দেয়ালের ভারী ফটক বন্ধ করে দিয়েছিল। যাইহোক তারপর অবশ্য মোগলরা খুব একটা প্রতিরোধ করেনি। পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা ওরা তার নিজের সেনাদলকে উদ্দেশ্য করে অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে গোলাবর্ষণ করেছিল। মুখোমুখি আক্রমণ করে প্রাণহানি করার তার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না। তাই তিনি দুর্গরক্ষাকারী মোগল সেনাদের মনোবল পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তার সেনাদলকে দুর্গ অবরোধ করে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আজ সাময়িক অস্ত্রবিরতির পতাকা বৈঠকের তিনি প্রস্তাব দিলেন, মোগলরা অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করলে তাদেরকে নিরাপদে দুর্গ ছেড়ে যেতে দেওয়া হবে। মোগলরা সাগ্রহে প্রস্তাবটি গ্রহণ করলো। তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় যত্নবান ছিলেন এবং আত্মসমর্পণকারী সেনাদেরকে কোন ধরনের দৈহিক নির্যাতন কিংবা এমনকি টিটকারী দেওয়া থেকেও তার লোকদের বিরত রেখেছিলেন। এতে বরং ভালোই হবে, কারণ যদি এরা আবার মোগল সেনাবাহিনীর চাকরিতে ফিরে যায়, তবে তার উদারতার কথা তাদের অধিনায়কদের জানাবে। তবে তার সন্দেহ সবাই হয়তো মোগলদের অধীনে চাকরিতে নাও ফিরে যেতে পারে। এদের কাহিনীতে উজ্জীবিত হয়ে অন্যান্য মোগল সেনারা তার আক্রমণ বলিষ্ঠভাবে প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে।

দুর্গসহ এতে আর যেসব অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী আর অস্ত্রশস্ত্র তার প্রয়োজন ছিল না, সেগুলো পোড়ানো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এরপর লুটের মাল তার সৈন্যদের মধ্যে বিলি-বন্টনের ব্যবস্থা করা হবে। তারপর পাশে পুত্র সম্ভাজিকে নিয়ে বিজয়-ভোজে পৌরাহিত্য করার কথা। সাধারণত এসব আয়োজনের দিকে তিনি সব সময় উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকেন, তবে আজ তিনি খুব একটা সুস্থবোধ করছেন না। মাথায় যন্ত্রণা আর জলাভূমির অসংখ্য মশার কামড়ে সারা গায়ে চুলকাচ্ছিল আর পেকে উঠে পুঁজ হচ্ছিল। সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা পড়তেই তিনি দেখলেন তার সৈন্যরা অনেকেই গায়ে কম্বল জড়িয়েছে অথচ তিনি গরমে ঘামছিলেন। কপালে হাত দিয়ে দেখলেন সেখানে ঘাম জমেছে। এছাড়া দুর্গ আত্মসমর্পণের ঘটনার উত্তেজনার পর তার হৃৎস্পন্দন এখনও স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসে নি। এখনও বুক ধুকপুক করছে। তার মনে হচ্ছিল তিনি বুকের ধুকপুকানির শব্দটি শুনতে পাচ্ছিলেন।

যাইহোক। একটু পরই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। পেছনে ঘুরে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে বিজয়োৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। তাঁবুর ভেতরে একটু ঠাণ্ডা মনে হল। বেশ ভাল। তার পরিচারক একটি তেপায়া তাকের উপর একটি মাটির বাটিতে পানি রেখে গিয়েছিল। পাশেই রাখা একটুকরা সুতির কাপড় তুলে নিয়ে ঝুঁকে পানিতে ভেজালেন। তারপর ভেজা কাপড়টা দিয়ে কপালের ঘাম মুছার জন্য কাপড়ের টুকরাটি তুলতে গিয়েই হঠাৎ তার মনে হল পানির বাটিটা যেন ঘুরে ঘুরে তার দিকে উঠে আসছে। তার মাথায় রক্ত চড়ে গেল, তিনি জ্ঞান হারিয়ে পানির বাটিটির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতেই বাটিটা তেপায়ার উপর থেকে মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল। আর তিনিও মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

আবার চোখ খুলতেই শিবাজি দেখলেন, সম্ভাজি, তার হেকিম আর তার কয়েকজন পরিচারক তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে?'

হেকিম উত্তর দিল, 'আপনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়েছিলেন প্রায় তিনঘণ্টা যাবত। আপনার পরিচারক আপনাকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে বিছানায় শুইয়ে তারপর আমাকে ডেকে এনেছে।'

শিবাজি উঠে বসার চেষ্টা করলেন, তবে আবার ক্লান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে গেলেন। তার গায়ের পাতলা সুতির চাদর আর পরনের সমস্ত জামা-কাপড় মনে হচ্ছে ভেজা। ওরা কি তার জ্ঞান ফেরাবার জন্য গায়ে পানি ছিটিয়েছিল? মুখে হাত বুলিয়ে দেখলেন ঘামে ভেজা। সারা গা কাঁপছে, নিশ্চয়ই খুব জ্বর

হয়েছে। খুব কষ্ট করে চোখ মেলে ওদের দিকে তাকালেন। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে সবাই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বললেন, 'আমি কি খুব অসুস্থ? সত্যি কথা বল...আমাকে জানতে হবে...আমি কি মারা যাচ্ছি?'

'জানি না...মহারাজ। তবে আমার মনে হয় আপনি গুরুতর অসুস্থ।'

শিবাজি আবার চোখ বুজলেন, শরীরে শক্তি সঞ্চয় করার চেষ্টা করলেন। তার এখনও অনেক কিছু করা বাকি রয়ে গেছে। তবে তিনি অনুভব করছিলেন যে, তার হাত-পায়ের আঙুল আসাড় হয়ে যাচ্ছে। একজন মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন কি এরকম অনুভূত হয়? তিনি সবসময় ভাবতেন তার জীবনের শেষদিনটি একটি যুদ্ধের ময়দানে কাটবে—একজন যোদ্ধার সম্মানজনক মৃত্যু, এরকম কাঁপতে কাঁপতে জলাভূমির জ্বরে ভুগে জীবন শেষ হওয়া নয়।

আবার চোখ খুলে ছেলেকে ইশারা করলেন কাছে আসতে। তারপর বললেন, 'আমার হয়তো আর বেশি সময় নেই সম্ভাজি। মনোযোগ দিয়ে শোন। মোগল নিপীড়ন থেকে আমার দেশবাসী আর আমার ধর্মকে মুক্ত করার পথে আমি অনেক দূর এগিয়েছি...তবে আরো অনেক অনেক দূর পথ পাড়ি দিতে হবে। তবে আমার আশংকা একা পাড়ি দিয়ে এই অভিযান সম্পূর্ণ করার জন্য তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার চলে যেতে হবে। এটি সহজ পথ নয়, তবে পুত্র, আমাকে কথা দাও, তুমি সমস্ত মানসিক বিভ্রান্তি আর বিহ্বলতা এড়িয়ে হিন্দুস্তানের মানুষদের তোমার পেছনে নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব এপথে এগিয়ে যাবে।' কথাগুলো বলতে গিয়ে তার নিঃশ্বাস নিতে আরো কষ্ট হচ্ছিল। তারপর বলে চললেন, 'তোমরা সবাই মিলে একটি অপ্রতিরোধ্য জোয়ার সৃষ্টি করে মোগল হুমকি ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিও। তোমাকে যা যা শিখিয়েছি সব মনে রেখো...আঘাত করবে জোরে এবং দ্রুত, একবার এখানে আরেকবার ওখানে। একটি ছায়ার মতো ছলনাময় হবে আর তখন হেঁচড়িয়ে চলা তাদের সেই বিশাল সেনাবাহিনী কখনও তোমাকে ধরতে পারবে না।' শিবাজির চোখের আলো নিভে এল। তার আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যেতেই শরীরে একবার খিঁচুনি উঠতেই শরীর ঝাঁকি দিয়ে উঠলো। তারপর তিনি চিরদিনের জন্য স্থির হলেন। সম্ভাজি নিচু হয়ে তার বাবার কপালে চুমু খেল। তারপর সে বললো, 'আমি মনে রাখবো বাবা।'

সব সময় যুদ্ধ শুরু হতেই আওরঙ্গজেব তার বিশ্বস্ত হাতির পিঠে কারুকাজ করা হাওদায় শান্ত হয়ে বসে থাকতেন। দুজন মাহুত হাতিটির কাঁধের দুইপাশে

বসতো আর হাওদায় আওরঙ্গজেবের পেছনে তার গাদা বন্দুকগুলো নিয়ে একজন চাপরাশি আর একজন দেহরক্ষী বসে থাকতো। হাতিটির চতুর্দিকে অশ্বারোহী দেহরক্ষীবাহিনী তাঁকে পাহারা দিয়ে চলতো। এরা সবাই অভিজ্ঞ যোদ্ধা এবং ধর্মপ্রাণ মুসলিম। তাঁর মতো ওদের সবার মনোযোগ সামনের দিকে, মুয়াজ্জমের সেনাবাহিনী আরাবল্লী পাহাড়ে একটি মারওয়াড়ি দুর্গে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

আওরঙ্গজেবের নির্দেশনায় মুয়াজ্জম একজন ধৃত বন্দীর উপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন। যা করতে আকবরের বিবেক মেনে নেয় নি। লোহার শলাকা ব্যবহার করে তরুণ মারওয়াড়ি চরের কাছ থেকে তথ্য টেনে বের করা হয়েছিল। তার তথ্য মোতাবেক মোগল সেনার উপর আরেকটি হামলা করার আগে মারওয়াড়িরা প্রার্থনা করতে এই দুর্গে সমবেত হচ্ছে। আবার তার বাবার নির্দেশনায় মুয়াজ্জম সাথে সাথে আক্রমণে না গিয়ে তার চরকে দেখতে পাঠালেন, মারওয়াড়িদের সমবেত প্রার্থনা শেষের দিকে আসতেই সে মুয়াজ্জমকে সতর্ক করলো। তারপর মুয়াজ্জম দ্রুত তার সেনাদলকে এগিয়ে নিয়ে আক্রমণের জন্য অবস্থান নিয়ে প্রস্তুত হলেন।

আওরঙ্গজেব দেখে খুশি হলেন যে, মুয়াজ্জম সুস্পষ্টভাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, তবে সেই সাথে যথেষ্ট দূরদর্শিতা দেখিয়ে কাজে নেমেছেন, আজমের মতো নয়। আজম তাড়াহুড়া করে পশ্চিমে মেওয়াড়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি অধৈর্য হয়ে আর ঝোঁকের বশে যে কৌশল নিয়েছিলেন তাতে বরং উল্টো ফল হয়ে প্রচুর প্রাণহানি ঘটেছিল। আওরঙ্গজেব তার ছেলেকে বাংলায় সুবেদার করে পাঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় একজন বিশ্বস্ত উজবেক সেনাপতিকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এদিকে দক্ষিণ দিক থেকে আকবর ধীর গতিতে মেওয়াড়ের দিকে এগোলেও, তার বাবা বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলেন যে, মারওয়াড়ের ব্যর্থতার পর তিনি সফলতার সাথে প্রচুর এলাকা দখল করে ধরে রেখেছেন।

তবে এখন আওরঙ্গজেবের সমস্ত মনোযোগ মুয়াজ্জমের দিকে। তিনি তাঁর হাতির পিঠে হাওদায় বসে সবেমাত্র সবুজ পতাকা উড়িয়ে কামান দাগার জন্য নির্দেশ দিতে শুরু করেছিলেন। এই অভিযানে ব্যবহার করার জন্য তিনি পাহাড়ি এলাকার মধ্য দিয়ে দ্রুত কয়েকটি কামান আনতে পেরেছিলেন। প্রধানত তুর্কি গোলন্দাজ সৈনিকরা বিধ্বস্ত গ্রামাঞ্চলের উপর দিয়ে কামানগুলো টেনে নিয়ে এসেছিল। এই কামানের গোলায় দুর্গের দেয়াল যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তো ভালই হবে। তবে এই কামানগুলো দাগার ফলে যে পরিমাণ ধোঁয়া

বের হবে তা পদাতিক সৈনিকদের সামনে এগোবার সময় তাদের আড়াল দেবে। কয়েকজন পদাতিক সেনা সাথে গাদা বন্দুক নিয়েছিল যাতে, কোনো মারওয়াড়ি দুর্গের ছাদের কার্নিশের উপর দিয়ে মাথা উঁচু করলেই তাকে গুলি করে ফেলে দেবে। আর অন্যরা চারজন চারজন করে দল বেঁধে কাঁধে মই নিয়ে এগোচ্ছিল আর অন্যদলটি বারুদের পাত্র ফটকের গায়ে রেখে তাতে আগুন জ্বেলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। আওরঙ্গজেব আর মুয়াজ্জম ভেবেছিলেন ধোঁয়া আক্রমণকারীদের রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে, তাই ওরা আশপাশের এলাকার ঝোপঝাড় থেকে ডালপালা এনে কেটে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য একজায়গায় স্তূপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কামানের ধোঁয়ার সাথে আরো ধোঁয়া বাড়াবার জন্য এই জ্বালানিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তোপ দাগা শুরু হতেই শুকনো ডালপালার স্তূপে কমলা রংয়ের অগ্নিশিখা দেখা গেল। ধোঁয়ার চাদরের নিচে ঢেকে সৈন্যরা লুকিয়ে এগোবার আগেই আওরঙ্গজেব দেখলেন গোলার আঘাতে ফটকের পাশের দেয়াল থেকে কয়েকটি পাথরের টুকরা ভেঙ্গে পড়েছে। ঘন ধোঁয়ার পর্দায় ঢাকা আড়ালের মধ্য দিয়ে বরকন্দাজ বাহিনী এগিয়ে চললো, তাদেরকে অনুসরণ করলো মই-বাহক আর পদাতিক সেনা, যারা মই বেয়ে আক্রমণে যাবে। দুই পাশে বারুদের ছোট ছোট পাত্র ঝুলিয়ে জোয়াল কাঁধে একদল সৈন্য তখনও সামনে এগোবার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিল।

একটু পরই আওরঙ্গজেব গাদা বন্দুকের ফট ফট আওয়াজ শুনতে পেলেন। কমলা রঙেয়ের পাগড়িপরা মারওয়াড়ি সৈন্যরা বুরুজের ছাদের ছিদ্র দিয়ে গাদা বন্দুকের নল বের করে গুলি করছে আর মোগল বরকন্দাজরাও সমানে তার প্রত্যুত্তর দিচ্ছে। একজন মারওয়াড়ির প্রথমে মাথা তারপর হাত-পা শূন্যে ছুড়ে মাটিতে পড়লো। ধোঁয়ার উপরে দুর্গের দেয়ালের গায়ে একটি মইয়ের মাথা দেখা গেল। তারপর পরই একজন মোগল পদাতিক সেনাকে দেখা গেল দুর্গের কিনারা বেয়ে বুরুজে উঠার চেষ্টা করছে। দুজন মারওয়াড়ি তার দিকে ছুটে এসে ধাক্কা দিয়ে মইসহ মোগল সৈন্যটিকে নিচে মাটিতে ধোঁয়া মাঝে লড়াইয়ের ময়দানে ফেলে দিল। একই প্রক্রিয়ায় দু-তিনবার চেষ্টা করার পর অবশেষে একজন মোগল সেনা দুর্গের ছাদে উঠে পড়লো। সে আরেক জনকে মই থেকে উপরে উঠার জন্য সাহায্য করছিল, এমন সময় একজন মারওয়াড়ি সেনা তরোয়ালের আঘাতে তাকে দেয়াল থেকে ফেলে দিল আর অপর মোগল সেনাটিকেও ফেলে দেওয়ার পর সে নিজেও মোগল গাদা বন্দুকের গুলির আঘাতে নিচে পড়ে গেল।

বাতাসে ভেসে ধোঁয়া ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। আগুন জ্বালাবার জন্য মোগলরা খুব বেশি পরিমণে খড়কুটা জমা করতে পারে নি। আর নিজেদের লোকদেরকে আহত করার ভয়ে কামান থেকেও ঘন ঘন গোলা ছোঁড়া সম্ভব ছিল না, কাজেই সেখান থেকেও ধোঁয়া কমে এসেছিল। ধোঁয়া কমে আসতেই আওরঙ্গজেব দেখলেন দুর্গের দেয়ালের নিচে মাটিতে অনেক মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। কিছু মোগল সেনা লাশের স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে দুর্গের ছাদের দিকে গুলি ছুঁড়ছিল। তারপর দ্রুত কয়েকবার আগুন জ্বলে উঠার সাথে সাথে দুর্গের মূল ফটকের কাছ থেকে একের পর এক কানফাটা গুড়ুম গুড়ুম শব্দ পাওয়া গেল। কামানের গোলার আঘাতে দেয়ালের যে জায়গায় পাথর ভেঙ্গে গিয়েছিল সেখানে বারুদের পাত্র বহন করে যে মোগল সৈন্যরা ফটক উড়াতে গিয়েছিল ওরা তাদের কাজে সফল হয়েছে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মানুষের দেহ,পাথর আর ভাঙ্গা কাঠের টুকরা শূন্যে উড়ে গেল। ধোঁয়া কমে আসার পর দেখা গেল মূল ফটকের একটি পাল্লা আংশিক ভেঙ্গে চুরমার হয়ে একটি মাত্র কব্জা থেকে কোনোমতে ঝুলছে। আর এরপাশের দেয়ালও ভেঙ্গে গেছে।

মোগল পদাতিক সেনারা এখন খোয়ার উপর দিয়ে হুড়াহুড়ি করে দুর্গে ঢোকার চেষ্টা করতে লাগলো। মারওয়াড়িরা তখনও আপ্রাণ লড়ে চলেছে। দুর্গের উপর থেকে ছোঁড়া মারওয়াড়িদের গাদা বন্দুকের গুলির আঘাতে কয়েকজন মোগল সেনা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আবার বর্শা হাতে কয়েকজন মারওয়াড়ি ফটকের পাশে ভাঙ্গা দেয়ালের কাছে ছুটে এসে মোগল সেনাদের লম্বা বর্শা ছুঁড়ে বিদ্ধ করলো। ভাঙ্গা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে দুর্গে ঢোকার জন্য মুয়াজ্জম হাতের ইশারায় কয়েকজন মোগল অশ্বারোহী সেনাকে সামনে এগিয়ে যেতে বলছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে ওরা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে এগোল। দ্রুত ছুটে যাওয়ার সময় ওরা মাটিতে পড়ে থাকা কিছু মোগল সেনার মৃতদেহ মাড়িয়ে গেল আর আহত যেসব সৈন্য তাদের যখমি-দেহ কোনোমতে টেনে গড়িয়ে গড়িয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, তাদেরকেও ঘোড়ার খুরের আঘাতে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিল। দ্রুত দুবার দুর্গের ছাদের দিক থেকে গাদা বন্দুকের গুলিবর্ষণ হল। গুলির আঘাতে সাথে সাথে কয়েকজন অশ্বারোহী সেনা ঘোড়াসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। যারা বেঁচেছিল তারা আবার ঘুরে নতুনভাবে আক্রমণ করার জন্য দলবেঁধে প্রস্তুত হল।

আক্রমণকারী মোগল অশ্বারোহী সেনারা দুর্গে ঢোকার চেষ্টা করার সময় মারওয়াড়ি বন্দুকধারীরা ছাদের আড়াল থেকে বের হয়ে তাদেরকে গুলি করার চেষ্টা করতেই নিচে থেকে মোগল বরকন্দাজরাও দুর্গের ছাদের বেশ কয়েকজন

মারওয়াড়ি বন্দুকধারীকে গুলি ছুড়ে মারতে সক্ষম হয়েছিল। কাজেই আবার যখন মোগল অশ্বারোহীরা আক্রমণ করলো তখন উপর থেকে গাদা বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ বেশ কমে এসেছিল। তারপরও অশ্বারোহী সেনারা ভাঙ্গা ইট-সুরকির স্তূপ, মানুষ, পশু আর আহতদের ডিঙ্গিয়ে ভেতরে ঢুকতে না পেরে আবার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পিছিয়ে গিয়ে পুনরায় হানা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হল।

তবে ওরা সামনে এগোবার আগেই ভাঙ্গা দেয়ালের কাছে কমলা রঙয়ের রণবেশ পরা একদল মারওয়াড়ি এসে উপস্থিত হল। কিছু লোক ঘোড়ার পিঠে আর বাকিরা হেঁটে। উপরে ছাদের দিকে তাকিয়ে আওরঙ্গজেব দেখলেন সেখানে এখন কেউ নেই আর মোগল পদাতিক সেনারা মই থেকে বিনাবাধায় ছাদে নামছিল। তারপর ফটকের ভাঙ্গা পাল্লাটি সরিয়ে আরো কিছু মারওয়াড়ি সেখানে হাজির হয়ে প্রায় সাথে সাথে ভাঙ্গা দেয়ালের পাশে জমায়েত অন্যান্য মারওয়াড়ীদের সাথে মিলে ওরা একযোগে মোগলদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। উদ্যত অস্ত্র হাতে রণহুঙ্কার দিতে দিতে ওরা ছুটে এল। মারওয়াড়িরা পাগলের মতো প্রাণ দিচ্ছিল, আওরঙ্গজেব ভাবলেন, ঠিক একই রকমভাবে অনেক বছর আগে আমু দরিয়ার ওপারে অশোক সিং তার লোকজনসহ প্রাণ দিয়েছিল। মোগল বরকন্দাজ আর গোলন্দাজ সেনারা ছুটে আসা বেশ কয়েকজন মারওয়াড়ি সেনাকে গোলার আঘাতে মাটিতে ফেলে দিল। তবে ওদের কয়েকজন কামানগুলোর মাঝে এসে কয়েকজন তুর্কি গোলন্দাজ সেনাকে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করলো। তবে এরপর ওরাও মারা পড়লো। ক্রমান্বয়ে মারওয়াড়ি সৈন্যের সংখ্যা কমে এল।

হঠাৎ দশ-বারো জন মারওয়াড়ি অশ্বারোহী সৈন্য সম্রাটের হাতিটি দেখতে পেয়ে আক্রমণ করার জন্য সেদিকে ছুটে গেল। সাথে সাথে মোগল বরকন্দাজরা গুলি ছুঁড়ে কয়েকজনকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিল। যারা জীবিত ছিল, তারা আওরঙ্গজেবের কাছে আসার আগেই তাঁর দেহরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা ঘোড়া ছুটিয়ে, তাদেরকে ঘিরে ধরে সকলকে তরোয়ালের আঘাতে হত্যা করে মাটিতে ফেলে দিল। আওরঙ্গজেব ভাবলেন, এই রাজপুতরা অপরিণত শিশুর মতো কিরকম বিচারবুদ্ধিহীন বোকা।

সেদিন সন্ধ্যায় সর্বাধিনায়কের টকটকে লাল তাবুতে তিনি আর মুয়াজ্জম চুপচাপ বসে ছিলেন। বাইরে ওদের লোকজন আনন্দ উৎসবে মেতেছিল। এই বিজয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এতে মারওয়াড়ের দরজা তার সেনাবাহিনীর সামনে খুলে যাবে। এই একবারের জন্য আওরঙ্গজেব তাঁর সৈন্যদের মদ খাওয়ার

দিকে চোখ বন্ধ করে রইলেন, অথচ অন্য সময় এর জন্য তিনি চাবুক মারার শাস্তি দিতেন। তিনি ঢুলতে শুরু করলেন, যতই বয়স হচ্ছে খাওয়া-দাওয়ার পর এই প্রবণতাও বেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একজন কোরচি ভেতরে ঢুকতেই তিনি চমকে জেগে উঠলেন। সে বললো, 'দিল্লি থেকে একজন কাসিদ একটি বার্তা নিয়ে এসেছে আর তাকে বলা হয়েছে পৌছার সাথে সাথে সে যেন বার্তাটি শুধু আপনার হাতে তুলে দেয়।'

আওরঙ্গজেব দাঁড়িয়ে বললেন, 'নিয়ে এস তাকে।'

কয়েক মুহূর্ত পর কোরচি বার্তাবাহককে ভেতরে নিয়ে এল। দীর্ঘ পথ চলার পরিশ্রমে ঘর্মাক্ত লোকটি আওরঙ্গজেবকে কুর্নিশ করে বার্তাটি তাঁর হাতে তুলে দিল।

'দ্রুত ছুটে আসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। যাও, বাইরে গিয়ে সবার সাথে আনন্দ কর। এটা তেমার পাওনা হয়েছে।'

কাসিদ আর কোরচি বের হয়ে যাওয়ার পর আওরঙ্গজেব সিলমোহর ভেঙ্গে চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন। সাধারণত কঠোর চেহারার আওরঙ্গজেবের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল, তিনি বললেন, 'আনন্দ কর মুয়াজ্জম। শিবাজি জ্বরে ভুগে মরেছে।'

'খুশির কথা। এটা আমাদের সাম্রাজ্যের জন্য বিরাট একটি খবর। তবে সম্ভাজি কি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে না তো?'

'আমাদের তাই ধরে নিতে হবে। তবে সে তার বাবার মতো তেমন নেতা নয়। কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে তার সময় লাগবে, আর সে হয়তো মারাঠিদের একত্রিত করে রাখতে পারবে না। ঐ নারকী কাফের শিবাজির মৃত্যুতে নিশ্চিতভাবে রাজপুত আর মারাঠিদের আমাদের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলনে একত্রিত হওয়ার ঝুঁকি দূর হয়ে গেল।' আওরঙ্গজেবের মুখে চওড়া হাসি দেখা দিল। সবকিছু তার অনুকূলে ঘটে চলেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সহায় হয়েছেন।

আকবর দুহাতে চোখ আড়াল করে সূর্যের বিপরীতে তাকালেন। ঝিকিমিকি তাপের কুয়াশার মধ্য দিয়ে ছোট্ট মেবারি শহর দেসুরির বাড়িঘরের ছাদ আর দালান-কোঠা দেখা যাচ্ছে। চরেরা খবর দিয়েছে শত্রুসেনারা শহর ছেড়ে চলে গেছে। তার ইচ্ছে এখানে ঘাঁটি করে তার সৈন্যদেরকে বিশ্রাম দেবেন, তারপর মেবারের রানার শক্ত ঘাঁটি কুম্ভগড়ের দিকে এগোবেন। মেবারে তার সমরাভিযান সফল হয়েছে, মেওয়াড়িদেরকে তাদের কেন্দ্রের দিকে ঠেলে

দিয়েছেন। তিনি সবসময় চেষ্টা করেছেন, চলার পথে যেসব জায়গা তিনি দখল করেছিলেন, সেখানে জমি আর সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি যেন কম হয়। তার আশা যে বিদ্রোহ চলছে, তা শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। আর বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তিনি যেরকম নরম থাকার চেষ্টা করেছেন, তাতে আশা করা যায় যে, মেওয়াড়িদের সাথে বিরোধও হয়তো সহজে মিটিয়ে ফেলা যাবে। তার বাবা যাই ভাবুন, মোগলদের উত্থানে রাজপুতদের সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর তার ধারণা উভয়ের স্বার্থেই তারা আবার মৈত্রিবন্ধনে আবদ্ধ হবেন। তার ফুফু জাহানারারও তাই বিশ্বাস। তিনি মমতাভরে তাকে যেসব চিঠি লিখতেন তাতে প্রায়ই সুফি শিক্ষকদের লেখার উদ্ধৃতি দিতেন যাতে তাদের উভয়ের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয় যে, কিছু সময় পার হলেই রাজপুত আর মোগল—হিন্দু আর মুসলিম সবাই একদিন আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করবে। কেবল তাদের মনমেজাজ ঠাণ্ডা হতে আর দুঃসময়ের স্মৃতি ম্লান হওয়ার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন।

তার কেবল ইচ্ছা হত তার বাবার ঘন ঘন পাঠান বার্তাগুলো যেন তার ফুফুর চিঠিগুলোর মতো একই রকম মনোমতো হোক। আজ সকালেই আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে দীর্ঘ, গুরুগম্ভীর শেষ চিঠিটি এসেছে। চিঠিতে তার বাবা মারওয়াড়ে মুয়াজ্জমের গৌরবময় অভিযানের কথা তুলে ধরেছেন। ছেলের দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে শত্রুকে ধ্বংস করা আর তার যে কোনো ধরনের ভিন্নমত প্রকাশ কঠোর হাতে থামিয়ে দেওয়ার সক্ষমতারও উচ্চপ্রশংসা করেছেন। আবার সেই সাথে মনে হল যেন, আওরঙ্গজেব ধরেই নিয়েছেন যে, মেবারে আকবরের নিজের সমরাভিযানও সফল হবে। নিশ্চিতভাবেই তিনি অবশ্য তার সাফল্যে তেমন প্রশংসা করেন নি, বরং আরো ভালভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছেন আর তার অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে অহেতুক উপদেশ আর মেওয়াড়িদের প্রতি আরো কঠোর আচরণের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন। মারওয়াড়ের সেনাবাহিনীর অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি এখনও তার মনে পীড়া দিচ্ছে। অন্যান্যের উপদেশ শুনতে আর তাদের সাথে পরামর্শ করতে পছন্দ করেন, এটা নিয়ে তার বাবার তাকে তিরস্কার করাটা সঠিক হয় নি। ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও অন্য সব বিষয়ে আওরঙ্গজেব কেবল তাঁর নিজের মত খাটানোটাই একমাত্র উপায় মনে করতেন। অনেক সময় উপকারী মন্তব্য করলেও তার বাবা সেটাকে রাজবৈরীর কাছাকাছি সমালোচনা মনে করতেন। তিনি চাইতেন তাঁকে সবসময় এমন লোকজন ঘিরে থাকুক, যারা সামরিক কৌশল আর ধর্মীয় গ্রন্থের বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যার সাথে সমভাবে অংশীদার

হোক। কোনো বিষয়ে দ্বিতীয়বার ভাবার জন্য কেউ তাকে অনুরোধ করুক, তা তিনি চাইতেন না। এতে তিনি সাম্রাজ্যের অনেক অংশের সাথে যোগাযোগ আর মূল্যবান উপদেশের অনেক উৎসও হারিয়ে ফেলেন।

তারপরও তার আশা, একবার কুম্ভগড় দখল করলেই তার বাবা নিশ্চয়ই তার সদগুণাবলির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করবেন। তবে প্রথমে তাকে দেসুরি দখল করতে হবে। তাহাব্বুর খান যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তিনি সেখানে এগিয়ে গেলেন। এই সেনা কর্মকর্তাকেই প্রথমে সেনাবাহিনীর মেবার আক্রমণের এই শাখার ভারপ্রাপ্ত সেনানায়ক করে পাঠানো হয়েছিল। আকবরকে তার উপরে দেওয়ায় তাকে অসন্তুষ্ট মনে হয় নি। তবে সেরকম হওয়ারও কোনো কারণ ছিল না। ওরা একে অপরকে সারাজীবন ধরে জেনে এসেছে। তাহাব্বুর খানের মা, শিশুকালে আকবরের স্তন্যদান করার কাজে নিযুক্ত ধাত্রী ছিলেন আর তাই দুজনে দুধ-ভাই ছিলেন। অনেক সময় রক্তের বন্ধনের চেয়েও এই সম্পর্ক শক্তিশালী মনে করা হয়। নিশ্চিতভাবে ওরা একে অপরের সঙ্গ পছন্দ করতেন আর ওদের পরস্পরের মাঝে বিশ্বাসের বন্ধনও অটুট ছিল। সর্বোপরি ওদের অভিযানের সফলতায় তাহাব্বুর খানের সামরিক কুশলতার যথেষ্ট অবদান ছিল। আকবর তার বাবাকে নিয়মিত যে খবর পাঠাতেন তাতে মুক্তকণ্ঠে একথা জানাতেন।

আকবর জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কী দেসুরিতে ঢুকতে পারবো?'

'হ্যাঁ পারবো। অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্য কেউ কোথাও ঘাপটি মেরে আছে কি-না কিংবা এ ধরনের আর কিছু দেখার জন্য আমি চর পাঠিয়েছিলাম। ওরা কিছুই খুঁজে পায়নি—মেওয়ারি সেনাদের কোনো চিহ্নই কোথাও নেই।'

'খুব ভাল। তাহলে চল আমরা এগোই।'

এক ঘণ্টার একটু আগে ওরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে খোলা ফটক দিয়ে দেসুরি শহরের মধ্যখানে ধূলিধূসর একটি খোলা ময়দানে পৌঁছলো। জায়গাটি জনমানব শূন্য, কেবল দুটো পথের কুকুর ছায়ায় বসে জিহ্বা বের করে নিজেদের শরীর চাটছে। ওদের অগ্রগতির সফলতায় ওরা দুজন একে অপরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। হঠাৎ আকবরের মনে হল তার বাবা কিংবা তার পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্যের তুলনায়, তাহাব্বুর খানের সাথে তিনি অনেক সচ্ছন্দবোধ করেন।

তিনদিন পর আকবর দেসুরির খালি পড়ে থাকা সবচেয়ে বড় বাড়িটির উঁচু ছাদের একটি কামরায় একটি নিচু পালঙ্কে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এখানেই তিনি তার সদর দফতর স্থাপন করেছেন। কামরাটির দেয়ালগুলোতে উজ্জ্বল লাল, হলুদ আর কমলা রঙয়ের পর্দা টাঙানো ছিল। এই রঙগুলো রাজপুতদের খুব প্রিয়। কামরার তিন কোণায় কুলুঙ্গিতে আয়না ঘেরা কাঁচের বাতিদানে

মোমবাতি জ্বলছিল। আর চতুর্থ কোণে একটি হিন্দু দেবতার মূর্তি ছিল। আকবর তার পরিচারকদের এটা নষ্ট করতে কিংবা এর সামনে উৎসর্গ করা ধূপ আর সামনে ছড়িয়ে থাকা শুকিয়ে যাওয়া গাঁদা ফুলগুলো সরাতে নিষেধ করেছিলেন। কোরচি ঢুকতেই তিনি উঠে বসলেন।

'জাঁহাপনা, মেবারের রানার কাছ থেকে যুদ্ধবিরতির পতাকা নিয়ে একজন দূত এসেছে।'

আকবরের মন নেচে উঠলো। একজন রাজদূত কেবল শান্তি চুক্তির শর্ত আলোচনা করার জন্য আসতে পারে—যে শান্তির জন্য তিনি নিজে অতি উৎসাহী ছিলেন। অন্যায্যভাবে কঠোর হবেন না।

তিনি বললেন, 'তাহাব্বুর খান আর অন্যান্য জ্যেষ্ঠ সেনা নায়কদের এখানে আসতে বল, তারপর আমি দূতের সাথে কথা বলবো।'

কোরচি বললো, 'জাঁহাপনা, সে বলেছে; রানা তাকে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন, সে যেন একা আপনার সাথে দেখা করে।'

'কেন তা কি বলেছে?'

'না। তবে সে আমাকে বিশেষভবে বলেছে রানা ব্যক্তিগতভাবে তাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন।'

আকবর প্রথমে ভেবেছিলেন প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বিশেষ করে তাহাব্বুর খানের কাছে কোনোকিছু গোপন করতে চান না। তবে এমনও হতে পারে, রানার আত্মসম্মান এত বেশি যে, আনুষ্ঠানিক আলোচনা করার আগে সম্ভাব্য শর্তের বিষয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাকে বাজিয়ে দেখতে চান।

'ঠিক আছে। তাকে বল আমি একান্তে তার সাথে দেখা করবো।' তারপর একটা কথা মনে পড়তেই তিনি বললেন, 'তবে তাকে বলবে, তার সাথে কোনো অস্ত্র আছে কি-না তা দেখার জন্য আমার কাছে আসার আগে তার দেহতল্লাসী করা হবে।'

আধঘণ্টা পর রাজপুত দূত এল। দীর্ঘদেহী সাদা গোঁফওয়ালা একজন লোক। পঞ্চাশের উপর বয়স, সুন্দরভাবে মাথায় কমলা রঙয়ের পাগড়িপরা, গায়ে জ্যাকেট আর সাদা পাতলুন পরা লোকটিকে পথ দেখিয়ে আকবরের কোরচি ভেতরে নিয়ে এল। ভেতরে এসে সে মাথা নুইয়ে শাহজাদাকে সম্মান দেখাল। কোরচি কামরা থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর প্রথমে আকবর কথা বললেন, 'রানার একজন দূত হিসেবে আমি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের মধ্যে এখন বিরোধ চললেও আমি তার এবং তার লোকজনের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে ফেলি নি।'

'একথা শুনলে তিনি অবশ্যই খুশি হবেন, জাঁহাপনা।'

'এখন বলুন, কেন তিনি আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।'

'তিনি আমাকে কিছুই বলতে বলেন নি, শুধু এই চিঠিটা আপনার হাতে দিতে বলেছেন। এটা পড়ার পর আপনি যদি কোনো উত্তর দিতে চান, তা ফেরত নিয়ে আসতে বলেছেন।' এই কথা বলে সে তার পোশাকের ভেতর থেকে একটি সিলমাহর করা কাগজ বের করলো।

'কেন তিনি চাননা যে আমি আর আপনি আমাদের দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করি?'

'সত্যি বলতে কী, তিনি মনে করেন আপনার বাবার সাম্রাজ্যে দেয়ালেরও কান আছে। এর বেশি আমি কিছু বলতে পারি না।'

আকবর ভ্রু কুঁচকালেন। এই চিঠির বিষয়বস্তু কি হতে পারে? এটা জানতে চাইলে তাকে দূতের প্রস্তাবে রাজি হতে হবে। এটা না করার কোনো কারণ তিনি পেলেন না। 'ঠিক আছে। চিঠিটা দিন। আমার লোক শহরের আরামদায়ক কোনো জায়গায় আপনার থাকার ব্যবস্থা করবে। তবে আশা করি আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, সেখান থেকে আমি আপনাকে বের হবার অনুমতি দেবো না। কারণ সে চেষ্টা করলে আপনি আমার সেনাবাহিনী আর অস্ত্রসম্ভার দেখে ফেলবেন।'

'আমি বুঝেছি, জাঁহাপনা। আমি অপেক্ষা করবো, যতক্ষণ না আপনি কোনো ধরনের উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন।'

দূতের চলে যাওয়ার পর আকবর সিলমোহর ভেঙ্গে চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন। চিঠিটা পড়তে পড়তে তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল আর হৃৎ স্পন্দন দ্রুত হতে লাগলো।

আমি এই চিঠিটি লিখছি গভীর দুঃখ নিয়ে, কেননা আমরা যে যুদ্ধ করছি—সে যুদ্ধ মেবারের সৃষ্টি নয়। কেন আমরা আমাদের নিজেদের মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছি, যারা দীর্ঘকাল যাবত শত্রু নয় মিত্র ছিল? আমার মনে হয় আপনি আমার অনুভূতির অংশীদার হবেন আর আশা করবো আমাকে অতিবিশ্বাসী ভাববেন না, যদি বলি যে, আপনার নামটি সঠিক হয়েছে। আপনার মতো একই নামের এবং আপনার মহান পূর্বপুরুষ সম্রাট আকবর, যার স্মৃতি চিরদিন হিন্দুস্তানে অম্লান থাকবে, তাঁর মতোই আপনার পরাক্রম আর ন্যায়বোধ সুবিদিত। মহান আকবর জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানি লোকের বন্ধু

ছিলেন। হিন্দু প্রজাদের বিরুদ্ধে আরোপিত ঘৃণ্য আইন বিলোপ করে তিনি তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন। আমি শুনেছি আপনার বাবা ঐ আইনের অনেক আবার চালু করায় আপনি অখুশি হয়েছেন।

মহান আকবর রাজপুত রাজ্যগুলোর একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মোগলদের মতো রাজপুতরাও একটি যোদ্ধা জাতি। তিনি আমাদেরকে তাঁর সেনাবাহিনীর নের্তৃত্বের পদে বসিয়েছিলেন। আমাদের রাজকুমারিদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আপনার শরীরেও রাজপুত রক্ত বইছে। আপনার প্রপিতামহ সম্রাট জাহাঙ্গির একজন রাজপুত রাজকুমারির গর্ভজাত সন্তান ছিলেন, যেরকম ছিলেন আপনার পিতামহ সম্রাট শাহজাহান।

আমি নিশ্চিত আপনি এগুলো বুঝতে পারছেন আর মনে মনে আপনি মোগল এবং অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলোর মধ্যে শান্তি চান, ঠিক যেরকম আমিও চাই। তবে নিয়তির কী পরিহাস, অনেক রাজপুত শাসক বলে থাকেন যে, আজ আপনার বাবা আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসে আছেন, অথচ সে জায়গায় আপনি থাকলে সূর্য, চন্দ্র এবং তারার সন্তানদের মাঝে ন্যায়বিচার আর ঐক্য এনে সম্রাট আকবরের মতো গৌরব ও ন্যায়ের সাথে রাজত্ব করতে পারতেন।

আমি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে লিখছি আর আশা করি যে, আপনি আমার সাথে দেখা করতে রাজি হবেন, যাতে আমরা আলাপ-আলোচনা করে আমাদের মধ্যে যে বিভক্তি আছে তা দূর করে সবার ভাগ্য উন্নত করার সর্বোত্তম একটা উপায় খুঁজে বের করতে পারি। আপনার কাছ থেকে একটি উত্তর পাওয়ার জন্য আমি আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি, যাকে সম্প্রতি আমি শত্রুর বদলে একজন বন্ধু মনে করছি। আমার বিশ্বাস বিপর্যয় থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে যদি তিনি তা প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে আমি তাই মনে করবো।

আকবর বারবার চিঠিটা পড়লেন। সম্রাট আকবরের সাথে তুলনা করার আনন্দ আর রানার শেষ বাক্যটিতে বিদ্রোহের উত্তেজনা, এ দুইয়ের মিশ্রণ রয়েছে। আচ্ছা রানা কি একথার ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, ওরা দুজনে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে আকবরকে সিংহাসনে বসাবেন? কথায় তা পরিষ্কার প্রকাশ না করলেও, অর্থটি তাই দাঁড়ায় আর দূত যে চরম গোপনীয়তার প্রতি জোর দিয়েছিল, তারও একটা ব্যাখ্যা এতে পাওয়া যায়। এমনকি প্রস্তাবটি বিবেচনা করার বিষয়ে তার নিজের ইচ্ছা দেখে আকবর অবাক হয়ে গেলেন। রানা মনে করেন, তিনি আওরঙ্গজেবের চেয়ে ভালোভাবে

সাম্রাজ্য শাসন করতে পারবেন আর তার বাবা যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছেন তা সংশোধন করতে পারবেন...কিন্তু আসলেই কি তা পারবেন? তবে মনে মনে বিশ্বাস করলেও তার নিজের ইচ্ছার বিষয়ে এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের কথা তিনি কখনও ভাবেন নি। তবে তিনি কিভাবে নিশ্চিত হবেন যে, রানার কথাগুলোর মানে আসলে এই? আরো কথা হল, মোগল সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী আর সভাসদদের সমর্থন পাবেন, একথা ভেবে কি নিজের সাথে প্রতারণা করছেন না তো? কোনোভাবেই তিনি নিশ্চিত হতে পারছেন না...আরেকটি মতামতের প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে দুধভাই তাহাব্বুর খান ছাড়া আর কে ভালো হতে পারে?

আধঘণ্টা পর তাহাব্বুর খান শান্তভাবে বললো, 'আমিও একমত যে, এই চিঠিতে মনে হচ্ছে আপনার বাবার বিরুদ্ধে একটি মৈত্রী করার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।' ওরা দুজনে একা শহরের দেয়ালের চারদিকে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেড়াতে আলাপ করছিল। ভেবেচিন্তে ওরা ঠিক করেছিল এ ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়ে খোলা জায়গায় ঘোড়ায় পিঠে বসে কথা বলাই সবচেয়ে ভালো হবে।

'তোমার কী মনে হয়, এ-বিষয়ে আমার কী করা উচিত?'

'আমার মনে হয় সবার আগে আপনাকে বিবেচনা করতে তবে, রানা আপনার জন্য একটা ফাঁদ পেতেছে কি-না। একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে আপনাকে টেনে নিয়ে, সে ব্যাপারটা আপনার বাবার কাছে ফাঁস করে দিয়ে আপনাকে আর অভিযানকে ধ্বংস করে দিতে পারে।'

আকবর বললেন, 'তিনি একজন সম্মানীয় লোক। আমার বিশ্বাস হয় না এরকম একটা কাজ তিনি করতে পারেন।' এখন তার মনে যে সন্দেহের সুতা দানা বেঁধে উঠছে তার সাথে মনে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা একসময় জেগে উঠেছিল এই দুইয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চেপে রাখা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তারপর আবার বললেন, 'তোমার কী মনে হয় আমি যদি বাবার বিরুদ্ধে যাই তাহলে কী কোনো ধরনের সমর্থন পাবো?'

তাহাব্বুর খান কিছুক্ষণ চুপ থেকে অবশেষে বললো, 'আমার বিশ্বাস আপনি পাবেন। আমি জানি আপনি আমার সমর্থন পাবেন। তবে তাড়াহুড়া করাটা ঠিক হবে না।'

'আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, তাহাব্বুর খান। সামরিক বিষয়ে তুমি অনেক সময় আমাকে সঠিকভাবে সতর্ক করেছ। তবে এখন যদি কোনো ব্যবস্থা না নেই তাহলে আর হয়তো কোনো সুযোগ পাওয়া যাবে না। অন্তত রানার সাথে দেখা করতে রাজি হয়ে দেখি না, তিনি কী বলতে চান?'

'আর আপনার অতি-সন্দিগ্ধ বাবা যদি সাক্ষাতের কথাটা জেনে যান? সব জায়গায় তাঁর গুপ্তচর ছড়িয়ে আছে। আমরা জানি তিনি আপনার সদর দফতরে

কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছেন—ইকবাল বেগ আর হানিফ খান, এদুটো নাম করা যায়। এদের কাজ হচ্ছে কেবল সব খবর তাঁকে জানানো। আপনি কি আপনার সবচেয়ে বড় ভাই মোহাম্মদ সুলতানের দুর্ভাগ্যের অংশীদার হতে চান? বাকি জীবন কারাগারে কাটিয়ে সেখানেই মৃত্যু বরণ করতে চান?'

আকবর একটু ভাবলেন। চতুর্দিকে ছড়ানো তার বাবার গুপ্তচরের জালের কথা তাহাব্বুর খান ঠিকই বলেছে। তারপর একটা ধারণা তার মাথায় এল—যা ভেবে তিনি নিজেকে সাবাস দিলেন, এমনকি তার বাবার মতো চতুর এবং সূক্ষ্মবুদ্ধির মানুষও এই পরিকল্পনাটার কথা ভেবে গর্ব বোধ করতেন। 'আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ রানার এই চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানে না। তবে অনেকে জানবে যে, একজন মেওয়ারি দূত এসেছে আর তার আসার কারণের বিষয়টি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করবে। আমি চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলবো আর সকলে জানবে যে, আত্মসমর্পণের শর্ত নিয়ে আলোচনা করার জন্য রানা আমার সাথে সাক্ষাৎ করার প্রস্তাব দিয়েছে। তারপর আমি বাবাকে লিখে জানাব যে, আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে রাজি হয়েছি। এতে তাঁর কাছে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না আর এদিকে রানার সাথেও গোপনে সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন হবে না।'

এক মুহূর্ত পর তাহাব্বুর খান মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো, 'এতে কাজ হতে পারে। আর যে পুরস্কার পাওয়া যাবে তার কারণে বাকি ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে।'

আধঘণ্টা পর আকবর তার কামরায় ফিরে রানাকে উদ্দেশ্য করে লেখা ছোট চিঠিটা সিলমোহর করলেন। এতে শুধু দেখা করার জন্য তিনি রাজি একথা বলা হয়েছে, কি উদ্দেশ্যে সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয় নি। এই চিঠিটা তার বাবার হাতে পড়লেও আর এর বিষয়স্ত পড়লে কোনো ক্ষতি হবে না, কেননা এর আগেই আওরঙ্গজেব তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা অন্য চিঠিটাও পেয়ে যাবেন, যাতে আকবর লিখেছেন যে, আত্মসমর্পণের শর্ত আলোচনা করার জন্য একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থ করা হয়েছে। দুটো চিঠিই জায়গামতো পাঠাবার জন্য কোরচির হাতে দিয়ে আকবর কামরাটির এককোণে একটি আয়না লাগানো কুলুঙ্গির কাছে গেলেন যেখানে একটি মোমবাতি জ্বলছিল। সেখানে তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা রানার চিঠিটা জ্বলন্ত মোমবাতির শিখায় পোড়ালেন। তারপর পুরোপুরি এটা নষ্ট নিশ্চিত করার জন্য পোড়া ছাইগুলো মাটিতে রেখে জুতার তলি দিয়ে পিষলেন। তারপর তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি তার বাবার শাসনের বিরুদ্ধে গুরুতর কিছু করা পরিকল্পনা করছেন!

অধ্যায় এগার

তখ্‌তইয়া তক্তা!–সিংহাসন না-কি কফিন!

কালো একটি ঘোড়ার উপর দীর্ঘদেহী একজন মানুষকে দেখিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আকবর তাহাব্বুর খানকে বললেন, 'দ্যাখো! মেবারের রানা কেবল একজন উপদেষ্টা সাথে নিয়ে এসেছেন। এ বিষয়ে আমরা দুজনেই একমত হয়েছিলাম।' পামগাছে ছাওয়া ছোট মরুদ্যানটির দিকে রানা এগোতেই তার ঘোড়ার রত্নখচিত লাগামে সকালের রোদ পড়ে ঝিকমিক করে উঠলো। দুই সেনাবাহিনীর মধ্যখানে এই জায়গাতেই ওরা তাদের সাক্ষাতের স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। রানার সাথের একমাত্র অশ্বারোহী সঙ্গীটিকে দেখে বেশ কমবয়সি মনে হল। অবশ্য সেটা রানার বিষয়। পামগাছের ছায়ার নিচে এসে রানা ধীরে ধীরে ঘোড়া থেকে নামলেন। তারপর পেছন পেছন তার সঙ্গীকে নিয়ে হেঁটে সামনে যেখানে আকবর আর তাহাব্বুর খান দাঁড়িয়েছিলেন সেদিকে এগোতে শুরু করলেন। ওরা একটি শামিয়ানার নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এর আগের সন্ধ্যায় আকবরের লোকেরা শামিয়ানাটি এখানে খাটিয়েছিল।

আকবর এক পা সামনে এগোতেই অবাক হয়ে দেখলেন রানা মাথা নুইয়ে তাকে সম্মান দেখাতে শুরু করছেন। আকবর বললেন, 'এখন লৌকিকতা বাদ দিন। আপনি কি বলতে চান তা জানতে আমি আগ্রহী। কৌতূহলি মানুষের চোখ-কানের নজর থেকে আমরা এখন অনেক দূরে। কাজেই মন খুলে কথা বলুন যাতে, আমরা পরস্পরের উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝতে পারি।'

'আমি অবশ্যই সবকিছু পরিষ্কার করে বলবো। আমি এসেছি মারওয়াড়ের রাজপ্রতিভূ আর আমার নিজের তরফ থেকে। আমরা উভয়েই মনে করি আপনার নামে যাঁর নাম, সেই মহান সম্রাট আকবরের মতোই সাম্রাজ্যের সকল মানুষের প্রতি আপনার সহনশীলতা এবং বিবেচনাবোধ রয়েছে।'

আরেকবার রানা তাকে প্রশংসা করায় আকবর মৃদু হেসে বললেন, 'আমার সেই মহান পূর্বপুরুষের প্রতি আমারও গভীর শ্রদ্ধাবোধ আছে। আমার শুধু

কামনা যদি আমি তাঁর মহত্ত্বের সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারতাম, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। তবে তাঁর তুলনায় আমি কিছুই না।'

'আপনার এই বিনয় আপনাকেই মানায়, জাঁহাপনা। তবে এর বিচারের ভার অনুগ্রহ করে আমার হাতে ছেড়ে দিন। আপনি আমাকে মন খুলে কথা বলতে বলেছেন। আমি আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করছি। হিন্দু প্রজাদের বিরুদ্ধে আপনার বাবার গোঁড়ামি সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দেবে। রাজপুত রাজ্যগুলোর মতো দীর্ঘদিনের মিত্রকে শত্রুতে পরিণত করবে আর তুচ্ছ অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে ধন-সম্পদের অপচয় হবে। এটি করতে গিয়ে তিনি বিদেশি হামলাকারীদের জন্য হিন্দুস্তানকে একটি অরক্ষিত, সহজ লক্ষ্যবস্তু করে তুলবেন। নীতিগতভাবে তিনি যা সঠিক মনে করেন এবং এর পেছনে যে কঠিন বিশ্বাস রয়েছে তার চরম প্রকৃতির বিষয়ে তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত। আর তিনি এমন একগুঁয়ে যে তার মত বদলানো যায় না। এছাড়া আমাদের বিরুদ্ধে আর আমাদের অন্য হিন্দুভাইদের বিরুদ্ধে তাঁর সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, অনেকেই আর স্বেচ্ছায় তাঁকে তাদের শাসক হিসেবে মেনে নেবে না। যদিও আমরা বিশ্বাস করি আগে আমরা পরস্পরের মধ্যে লড়াই করলেও তখনকার সময়ের তুলনায় হিন্দুস্তানের রাজ্যগুলো মোগল অধিরাজত্বে অনেক শক্তিশালী হয়েছে, তবুও তাঁকে সরাতে হবে আর আকবর, আপনিই হচ্ছেন সবার স্বাভাবিক পছন্দ।'

রানা তার অভিপ্রায় এবার সুনিশ্চিত করে বলার পর আকবর এমন অভিভূত হলেন যে, তার মুখে সাথে সাথে কোনো উত্তর যোগাল না। রানার চিঠি তার মাঝে যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিল তা নিয়ে তিনি খুব একটা ভাবেন নি। তাহাব্বুর খানের সাথে আলোচনা আর নিজের মনের সাথে দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের ইচ্ছা আরো গভীর হয়। তবে যখন এসেছে তা মুখে প্রকাশ করার তিনি ইস্ততত করতে লাগলেন। বিষয়টি নিয়ে তার মনে যখন ঝড় চলছিল, তখন তাহাব্বুর খান বলে উঠলো, 'আমাকে মার্জনা করবেন, তবে আমরা কী করে জানবো যে আপনি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে সম্মান জানাবেন?'

রানার কালো চোখে আগুন জ্বলে উঠলো। 'একজন রাজপুতের দেয়া কথা কি সব সময় ঠিক হয় নি? তবে আপনারা যদি আমাকে সন্দেহ করেন, সেজন্য বলছি, আমার পাশে যে তরুণকে দেখেছেন সে আমার ছেলে। যদি তিনি চান, তাহলে আমার প্রতিশ্রুতির আন্তরিকতা প্রমাণের জন্য তাকে আমি শাহজাদার জিম্মায় ছেড়ে দেবো।'

অবশেষে আকবর পুরোপুরি মনস্থির করে কথা বললেন, 'আমি নিজেও মনে করি আমার বাবা তাঁর কর্মকাণ্ড দিয়ে সাম্রাজ্যের ক্ষতি করছেন। আপনার কথা আর আমার উপর যে আস্থা রেখেছেন তা প্রকাশ করায়, তা থেকে আমি শক্তি পেয়েছি। এখন তাহাব্বুর খান আর আমি দুজনে মিলে আপনাদের আর সাম্রাজ্যের অন্যান্য জায়গা থেকে যাদেরকে আমাদের পতাকার তলে টেনে আনতে পারবো, তাদের সকলকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত।'

শেষ পর্যন্ত কথাটি তিনি বলেই ফেললেন। তার বাবার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয় পদক্ষেপটি নেবার জন্য রাজি হলেন, যদিও জানেন যে, তার বাবা এজন্য কখনও তাকে ক্ষমা করবেন না। যেমন মোহাম্মদ সুলতানকে করেননি। তবে তিনি যেরকম প্রত্যাশা করেছিলেন, সেরকম ভয়ে কেঁপে উঠেন নি, বরং তার মাঝে এক নতুন শক্তির সঞ্চার হল আর সেই সাথে আত্মবিশ্বাসও জেগে উঠলো। তিনি তার বাবাকে দেখিয়ে দেবেন তাকে ছোট করে, তার সহনশীলতা আর সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য মানুষের সাথে আপস-মীমংসা আর তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার ইচ্ছাকে অবজ্ঞা করে তিনি ভুল করেছেন।

আকবর বললেন, 'আমি আপনার মৈত্রীর প্রস্তাব গ্রহণ করছি। আমরা সবাই মিলে আমার পূর্বপুরুষ আকবরের সময়ে মোগল সাম্রাজ্য যেরূপ গৌরবময় অবস্থায় ছিল, তা আবার ফিরিয়ে আনবো। আমি জানি রাজপুতেরা কথা দিয়ে কথা রাখে। কাজেই রাজপুতদের আন্তরিকতা প্রমাণের জন্য আপনার ছেলেকে জিম্মি হিসেবে রাখার প্রয়োজন নেই।' কথা বলা শেষ করে আকবর হেঁটে সামনে এগিয়ে রানাকে আলিঙ্গন করলেন। কয়েক মুহূর্ত পর তাকে ছেড়ে দিয়েই আবার বললেন, 'এখন আমাদের অভিযানের পরিকল্পনা শুরু করতে হবে, তাই না? প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমি যতবেশি সম্ভব আমার নিজের সেনাবাহিনীর সদস্যদের আমার পতাকাতলে আনার চেষ্টা করবো। আর তাহাব্বুর খান আর আমি আশা করি ওদের সবাই আমার দলে আসবে, কি বল তাহাব্বুর?' তার দুধ-ভাই মাথা নেড়ে সায় দিল।

রানা বললেন, 'আমি যখন জানবো আপনি এটা করতে সফল হয়েছেন, তখন আমিও আমার সেনাবাহিনী নিয়ে আপনার সাথে যোগ দেব। এছাড়া মারওয়াড় আর অন্য যেকোনো রাজপুত রাজ্যকে রাজি করাতে পারলে তাদেরকেও এতে শামিল করবো। তবে আমাদেরকে দ্রুত কাজ করতে হবে। আমার চরেরা আমাকে নিশ্চিত করে জানিয়েছে—এটা আপনারও জানা উচিত যে, আপনার বাবা মুয়াজ্জমের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আজমিরে ফিরে গেছেন। আপনার ভাই আযম বাংলার সুবেদার পদে যোগ দেবার জন্য চলে

যাওয়ার পর আওরঙ্গজেবের সাথে এখন বড়জোর আটশোর মতো সৈন্য রয়েছে। আপনার নিজের বিপুল সংখ্যক সেনা অন্যদের তুলনায় আজমির আর আপনার বাবার অনেক কাছে রয়েছে। এটা আপনার জন্য একটা বড় সুযোগ, তিনি কিছু বুঝার আগেই আপনি এখুনি তাকে বন্দী করে সিংহাসন দখল করতে পারেন। আর এতে নিশ্চিত অনেক কম প্রাণহানি হবে।'

আকবর দেসুরিতে তার শীতল কামরায় ফিরে গেলেন। মাত্র দুই ঘণ্টা আগে তার সেনা কর্মকর্তারা তার বাবাকে সিংহাসনচ্যুত করার পরিকল্পনায় রাজপুতদের সাথে মৈত্রী করার বিষয়ে তাকে প্রায় সর্বসম্মত সমর্থন দিয়েছে। তিনি তার সৈন্যদের সামনে গিয়েছিলেন। রণহস্তির হাওদার উপর দাঁড়িয়ে তিনি অঙ্গীকার করলেন যখন তিনি সম্রাট হবেন তখন সকলকে পুরস্কৃত করা হবে আর এর নিদর্শনস্বরূপ পরদিন সকালে দেসুরি ছেড়ে যাওয়ার আগে আজ সন্ধ্যায় একটি ভোজের ঘোষণা দিলেন। তার কথা শুনে সবাই প্রবল উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো।
তবে এরপরই জানা গেল ইকবাল বেগ তার কয়েকজন সৈন্যসহ ঘোড়া ছুটিয়ে বের হয়ে গেছে—সম্ভবত বিদ্রোহের খবর তার বাবাকে দেওয়ার জন্যই সে চলে গেছে। তাদের চলে যাওয়ার খবরটি হানিফ খান দিয়েছিল। সেই সাথে সে ইকবাল বেগের চলে যাওয়াকে নিন্দা জানিয়ে আকবরের প্রতি তার নিজের আনুগত্যের কথা বললো, আবার সেই সাথে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে তার অবস্থানও তুলে ধরলো। অবশ্য আকবর তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন নি। হানিফ খানকে সতর্ক নজরদারিতে রাখতে হবে। আর এটা তাকে নিশ্চিত করতে হবে।
এটা জানাকথা যে বিদ্রোহের খবরটি শীঘ্রই তার বাবার কানে গিয়ে পৌঁছাবে। সত্যি বলতে কি এই বিদ্রোহটি শাহজাহানের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেব যে বিদ্রোহ করেছিলেন ঠিক সেরকমই। এখানে ইকবাল বেগ না হলে অন্য কেউ হত। আর তাতে কী আসে যায়? রাজপুতদের সাথে নিয়ে তিনি আজমির পৌঁছার আগে তার বাবা অতিরিক্ত সেনা ডেকে আনার সময় পাবেন না। তবে বাবাকে সম্মান দেখিয়ে অবশ্যই একটা চিঠি লিখে সমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা করে জানাতে হবে, তিনি কী করতে যাচ্ছেন আর কেনইবা করতে চাচ্ছেন। নিচু টেবিলের সামনে বসে আকবর একটা টুকরা কাগজ নিলেন। দ্রুত চিঠি লিখে ঘোড়া বদল করে করে রাজকীয় সংবাদবাহক পাঠালে তার চিঠিটা ইকবাল বেগের আগেই তার বাবার হাতে পৌঁছে যেতে পারে।

জানালা দিয়ে অস্তগামী সূর্যের আলো আজমির দুর্গের দেওয়ান-ই-আমের ভেতরে এসে পড়ছে আর অনেক থামের লম্বা লম্বা অন্ধকার ছায়া সাদা মার্বেল পাথরের মেঝের উপর পড়ছিল। আওরঙ্গজেব তার ছেলের সংক্ষিপ্ত চিঠিটি পড়ছিলেন। তিনি এই প্রথম আকবরের বিদ্রোহের কথা শুনলেন আর চিঠিতে যা পড়ছিলেন তা তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। তবে হাতের লেখা আকবরের আর সিলমোহরও তার। যতই তিনি বিষয়টা নিয়ে ভাবলেন ততই তার মনে শীতল রাগ দেখা দিল। কি করে তার এই ছেলে—যে কি-না মারওয়াড়ের বিরুদ্ধে একটি সমরাভিযানও সফল করতে পারে নি—সে আওরঙ্গজেবের চেয়ে নিজেকে সাম্রাজ্য শাসন করার উপযুক্ত মনে করতে পারলো? তার কী দুঃসাহস যে, এমন বিশ্বাসঘাতকতা করে তার বাবা আর তার ধর্মের শত্রু রাজপুতদের সাথে হাত মেলাতে পারলো? তিনি সব সময় আকবরকে নমনীয় আর দুর্বল ভাবতেন, বিদ্রোহ করা তো দূরের কথা সে কখনও সবার আড়ালেও তার বাবার মতের বিরুদ্ধে কোনোদিন উঠে দাঁড়ায় নি। এটা নিশ্চয়ই রাজপুতদের বিশ্বাসঘাতকতা, তারা তাকে মহান বানিয়ে তার মতিভ্রম ঘটিয়েছে। পুরো চিঠি জুড়ে হিন্দু আর মুসলিমের মাঝে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা আর জিজিয়া কর তুলে দেবার বিষয়ে মেকি আর লোক দেখানো ধার্মিক লোকের মতো মন্তব্য করা হয়েছে। তার মতোই একই নামের সম্রাট আকবরের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা আর পানির মতো পাতলা সুফিবাদের প্রতি তার বিশ্বাসের কারণে সে রাজপুতদের কথায় সহজেই প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। তারা তাকে আগেকার সময়ের তথাকথিত সমতা এবং ধর্মসহিষ্ণুতার দিকে ফিরে যেতে অনুরোধ করেছে।

তবে তার ছেলে তার চেয়েও বেশি মনের আসল ভাবনা গোপন রেখে চলেছিল? এটা তিনি কখনও সম্ভব হতে পারে ভাবেন নি। এটা হয়তো নীতি বিবর্জিত রাজপুতদের চতুরতা দিয়ে প্ররোচিত আবেগ তাড়িত একটি বিদ্রোহ শুধু নয়। হয়তো আকবর বেশ আগে থেকে এটা পরিকল্পনা করে রেখেছিল। সে তার ভাইদেরও তার সাথে জড়িত করেনি তো? এখন মনে পড়ে গেল তাঁর নিজের পরিকল্পনার কথা, কিভাবে তিনি সাম্রাজ্যের একটি অংশ দেবার লোভ দেখিয়ে, তাঁর ভাই মুরাদ আর শাহ সুজাকে রাজি করিয়েছিলেন, দারা শিকো আর তাঁদের বাবার বিরুদ্ধে তাঁর সাথে হাত মেলাতে। তার মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে কত সহজে তারা তার প্রস্তাবটি লুফে নিয়েছিলেন।

তবে মুয়াজ্জম বেশ সতর্ক আর আত্মবিশ্বাসহীন। মারওয়াড়িদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় বেশ সতর্কতার সাথে বাবার দিক নির্দেশনা মেনে চলেছিল

আর রাজদরবারে সহজে মুখ খুলতো না—তাকে মনে হয় এতো সহজে সন্তানোচিত দায়িত্ব পালনের পথ থেকে প্রলুব্ধ করে কুকর্মে প্ররোচিত করা যাবে না। আর এর পরিণতিতে কী হতে পারে সে ভয়তো আছেই।

তবে আজমের ব্যাপারে কী হতে পারে? আজম আর আকবর একই মায়ের পেটের আপন ভাই আর বয়সেও কাছাকাছি, মুয়াজ্জম তা নয়। সে বেশ বদমেজাজি আর আকস্মিক আবেগে চলে। যদিও জানির সাথে বিয়ের পর মনে হয় সে একটু শান্ত হয়েছে। তবে তাঁর সেনাপতিদের সূত্র থেকে তিনি জানতে পেরেছেন যে, আজম ইতোমধ্যেই এলাহাবাদ ছাড়িয়ে তার সৈন্যদল নিয়ে গঙ্গার বুকে নৌকা বেয়ে বাংলার সুবেদারের নতুন পদে যোগ দেওয়ার জন্য চলে গেছে। এতে বুঝা যাচ্ছে আকবরের ভাইয়েরা হয়তো এতে জড়িত নয় আর এই বিদ্রোহ আসলে কেবল রাজপুত আর তার ছেলের মধ্যেই সীমিত। এই হঠকারিতার জন্য তাদেরকে অবশ্যই ভুগতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে গিয়ে তিনি মনে একটি ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পারলেন, আকবরের সেনাবাহিনী রাজপুত লুটেরা জোটের সাথে মিলে তাঁকে বাইরের সাহায্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে। তার চেয়ে ভাল হবে বরং আজমির দুর্গে অবস্থান করে তাঁর সেনাদলকে দুর্গ রক্ষায় মোতায়েন করবেন, তারপর সুযোগ বুঝে লোকজনসহ এখান থেকে বের হওয়ার একটা পথ খুঁজবেন। দুর্গটি বেশ সুরক্ষিত এবং তাঁর আটশো সেনাও এখান থেকে বড় ধরনের সেনাবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালাতে পারবে। আজমির কোষাগার থেকে সোনা বিলিয়ে সৈন্যদের মনোবল চাঙ্গা রাখার ব্যবস্থা করবেন। আর এখুনি মুয়াজ্জমকে খবর দিতে হবে, যেন সে তার সৈন্য নিয়ে অবিলম্বে তাঁর কাছে চলে আসে, তবে তাকে এর কারণটি বলা যাবে না। তাঁর ছেলের প্রতিক্রিয়া থেকে শীঘ্রই বুঝা যাবে এই বিদ্রোহে সে জড়িত কি-না।

এছাড়া তাকে ভেবে বের করতে হবে তার স্বপক্ষে আরো সমর্থক যোগাড় করা যায় কি-না আর সেই সাথে আকবর আর তার মিত্রদের পরিকল্পনা কিভাবে বানচাল করা যায় তাও ভেবে বের করতে হবে। লড়াইয়ের ময়দানে যেমন যুদ্ধ হয় তেমনি তা মানুষের মনেও হয়। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর আল্লাহর সহায়তা নিয়ে তিনি যেকোনো বিদ্রোহীর চেয়ে শ্রেয়তর প্রমাণিত হবেন। এমন সময় দরজায় কেউ করাঘাত করতেই তাঁর চিন্তার সূত্র কেটে গেল। একজন কোরচি হাজির হয়ে বললো, 'জাঁহাপনা, ইকবাল বেগ এসেছেন। তিনি এখুনি আপনার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন। তিনি বলেছেন তার কাছে আপনার জন্য অত্যন্ত জরুরি খবর রয়েছে।'

'তাকে বল সে অনেক দেরি করে ফেলেছে। আমি আমার ছেলের বিশ্বাসঘাতকতার সমস্ত খবর পেয়েছি আর সে ব্যাপারে ব্যবস্থাও নিচ্ছি।'

সেই সন্ধ্যায় আজমির দুর্গে তাঁর কামরায় একাকী আওরঙ্গজেব ভেড়ার মাংসের তন্দুরি মশলা, দই আর নান রুটি দিয়ে অতি সাধারণ রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। খাবার চিবোতে চিবোতে তিনি তাঁর ছেলের বিদ্রোহ কিভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে দমন করা যায় তা নিয়ে ভাবছিলেন, এমন সময় কামরার ছায়াঘেরা দরজার ঝালর কেঁপে উঠলো আর আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা একটি মূর্তি উদয় হল। কে আসতে পারে এসময়ে না বলে কয়ে? তার হাত চলে গেল কোমরে গোঁজা ছোরার দিকে, তারপর সাথে সাথে দেখলেন তাঁর বোন জাহানারা এসেছেন। মুয়াজ্জমের শিবির থেকে ফেরার পর জাহানারাও আজমিরে তাঁর কাছে চলে এসেছিলেন। তিনি এগিয়ে কামরার আরো ভেতরে আলোর কাছে আসতেই দেখা গেল তাঁর চোখে পানি আর দুই হাত বিক্ষিপ্তভাবে অনবরত কচলাচ্ছেন। তিনি বললেন, 'আওরঙ্গজেব, আমি এইমাত্র আকবরের ব্যাপারটা শুনলাম। আমি সবসময় তাকে একজন মর্যাদাবান মানুষ ভাবতাম...বল ব্যাপারটা আসলে সত্যি না। আমার মনে হয়না আমি এটা সহ্য করতে পারবো...এটা কি করে হতে পারে...' তার মুখ থেকে কথা হারিয়ে গেল।

'হ্যাঁ, এটা সত্যি। আকবর বিদ্রোহ করেছে।'

'তুমি এখন কী করবে? আমরা আবার আমাদের পরিবারে রক্তপাত আর ঘৃণা আনতে দিতে পারি না. অবশ্যই না.

তাঁর শক্ত মনের বোনকে এরকম ভেঙ্গে পড়তে তিনি আর কখনও দেখেন নি। আওরঙ্গজেব তাঁর বোনের দুই হাতের কব্জি ধরলেন। তাঁর সারা শরীর কাঁপছিল, আওরঙ্গজেব তাঁর চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, 'শান্ত হোন। আমার উপর বিশ্বাস রাখুন। আমি ইতোমধ্যেই তাকে ধরে ফেলার পরিকল্পনা করে ফেলেছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তা কেমন করে হবে?'

'কারণ আমি এটা করে ছাড়বো। আকবর কিংবা হঠাৎ গজিয়ে উঠা আর কেউ আমাকে ভয় দেখাবে কিংবা আমার সাম্রাজ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে, তা আমি হতে দেব না। সে তার কৃতকর্মের জন্য অবশ্যই ভুগবে।'

'আকবর তোমার ছেলে, অথচ তুমি এমনভাবে তার সম্পর্কে কথা বলছো, যেন সে একজন বাইরের লোক।'

'এখন সে আমার কাছে একজন অচেনা মানুষ।'

'আওরঙ্গজেব, দয়া করে...এত শীতল হইও না। তাকে কিছু হলেও দয়া দেখাও।'

'কেন.হব? আমার কাছ থেকে সিংহাসন দখল করার জন্য সে বিধর্মী রাজপুতদের আমার বিরুদ্ধে ভিড়িয়েছে। আমার কাছে এসে বস, আমি তোমাকে সবকিছু খুলে বলছি সে কি করেছে। তারপর ভেবে দেখো সে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য কি-না।'

বিদ্রোহের বিষয়টি আর এর সমর্থকদের সম্বন্ধে তিনি যা জানতেন সবকিছু বলার পর তার বোনের অস্থিরতা মনে হল একটু কমে এল। এখন আর তাঁর দুই হাত একবার মুঠো করে আবার খুলে দেওয়া ছেড়ে স্থির হয়ে কোলের উপর পড়ে রইল। আওরঙ্গজেবের বলা শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ সময় পার হওয়ার পর জাহানারা কথা বললেন, 'আমাকে ক্ষমা কর। তোমার মনের এই অস্থির অবস্থায় আমার এখানে আসাটা উচিত হয় নি। তবে...' এতটুকু বলে একটু থামলেন, যেন কি ভাবে কথাটা বলবেন তা মনে মনে সাজাচ্ছেন। তারপর বললেন, 'আমার অবশ্য তোমাকে কিছু কথা বলা উচিত, যা আমি জানি তুমি শুনতে চাও না।'

'বল।'

জাহানারা বেশ ধীরে সুস্থে আর ভেবে চিন্তে তাঁর কথা শুরু করলেন আর সেই সাথে ডান হাতের আঙুল দিয়ে শালের এক প্রান্ত পেঁচাতে লাগলেন। 'আকবরের বিদ্রোহ করাটা ভুল হয়েছে। সম্পূর্ণ ভুল। ছেলে হয়ে এভাবে বাবাকে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করা কোনো যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায় না। আমি এটা তাকে বলবো, ঠিক যেরকম অনেক বছর আগে তুমি আমাদের বাবার বিরুদ্ধে একটা সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলে। আর আমি—'

'কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। আমি যখন বাবার বিরদ্ধে গিয়েছিলাম, তখন সেটা করেছিলাম আমাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য। তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন আর দারা আর তার খারেজি মতবাদে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। এটা ছিল আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্য।'

'এ বিষয়ে আমরা কখনও একমত হতে পারবো না, তবে পুরোনো যখম খুঁচিয়ে তোলার এখন সময় নয়। তুমি কর্তব্যের কথা বলছো? বর্তমান আর ভবিষ্যৎ ঝগড়া নিবারণ করা কী আমাদের কর্তব্য নয়? আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি...যদি আমরা একসাথে কাজ করি তাহলে এই বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আগেই আমরা থামাতে পারি। আমাকে আকবরের শিবিরে যেতে দাও...আমি তাকে দেখাবো সে কিরকম ভুলভাবে চালিত হয়েছে।'

'না। আমি এটা সম্পূর্ণ নিষেধ করছি।'

জাহানারা দমে গেলেন। আওরঙ্গজেবের চেহারা একগুঁয়ে দেখাল। জাহানারার মনে পড়লো ছোটবেলায় তিনি এরকমই জেদি ছিলেন। তিনি বললেন, 'তুমি

যদি আমাকে কিছু করতে না দাও, তবে দয়া করে বেশি দেরি হওয়ার আগেই তুমি নিজে তোমার তরফ থেকে মিটমাটের প্রথম পদক্ষেপটি নাও। যদি এটা কর, আমি নিশ্চিত আকবর আর রাজপুতরাও আসলে এতে সাড়া দেবে। তারা হয়তো ইতোমধ্যে এ ধরনের তাড়াহুড়া করার জন্য আফসোস করছে।'

'তুমি যা করতে বলছো, তা করলে আমাকে ওরা দুর্বল মনে করবে। বিদ্রোহীদের প্রতি এগিয়ে যাওয়াটা আমার কাজ নয়। বরং তাদেরকেই আত্মসমর্পণ করে উচিত বিচারের জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন স্বীকার করতে হবে, যাতে পুরো সাম্রাজ্য—পুরো পৃথিবী বুঝতে পারে বিশ্বাসঘাতকের কী হয়।'

'যদি তাদের নেতা তোমার ছেলে হয় তাও?'

'বরং আরো বেশি, কারণ, সে শুধু শাসকের সাথে একজন প্রজার যে আনুগত্যের বন্ধন আছে তা ছিন্ন করে নি, সে ছেলের সাথে বাবার সম্পর্কের বন্ধনও ছিন্ন করেছে। আমি তোমাকে মিথ্যা আশ্বাস দেব না—সবচেয়ে বেশি আকবর আশা করতে পারে, তা হল তার ভাই মোহাম্মদ সুলতানের মতো বাকি জীবন গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হয়ে কাটান।'

'তুমি কি বলছো একবার ভেবে দেখ। শুধু একজন শাসকের মতো নয় বাবার মতোও আচরণ কর। এককালে তুমি বিশ্বাস করতে, সেটা সঠিক হোক আর ভুল হোক, যে তোমার আর তোমার মতামতের প্রতি বাবার কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। আকবরও হয়তো তোমার ব্যাপারে তাই ভাবতে পারে। আমি জানি সে অসন্তুষ্ট হয়েছে, কারণ তুমি তার খুব বেশি সমালোচনা কর। তুমি যদি তাকে আরো ভালোবাসতে, তার প্রতি আরো আস্থা রাখতে, তাহলে হয়তো সে কখনও অন্যের কথায় কান দিত না কিংবা তার প্রশংসা শুনতে তৈরি থাকতো না। আমি প্রায়ই এ ব্যাপারে তোমার সাথে কথা বলতে চেয়েছি, কিন্তু তোমাকে যতটকু জানি তাতে ভয় হত যে, এতে হয়তো ভালো না হয়ে বরং আরো ক্ষতি হতে পারে। তাই বিষয়টা আমি নিজের মধ্যে চেপে রাখি। এখন নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে কেন, আরো কঠিনভাবে চেষ্টা করলাম না।'

'এতে খুব একটা ক্ষতি-বৃদ্ধি হত না। প্রশংসার পরিবর্তে নিন্দাই বেশিরভাগ সময় আকবরের প্রাপ্য ছিল। আমি কেবল চেষ্টা করেছিলাম তাকে সঠিক পথে আনতে—তবে মনে হয় সফল হতে পারি নি।'

'তাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হত, সেক্ষেত্রে তুমি যদি এত কঠোর না হতে তাহলে হয়তো সে রাজপুতদের চাটুবাক্যে এত সহজে প্রভাবিত হত না। তোমার ছেলেদের মধ্যে একমাত্র কমবক্সের প্রতি তুমি যা কিছু আদর-ভালোবাসা দেখাও।'

'তার কারণ সে একটা শিশু মাত্র। যখন কমবক্স বড় হবে তখন আমি আশা করবো সেও আমাকে মান্য করবে আর আমার মতামতের প্রতি সম্মান দেখাবে।'
'তোমার চেহারা দেখে আমি বুঝতে পারছি এত কথা বলে আমি তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছি। আর এও জানি এবার যা বলতে যাচ্ছি তা তোমাকে আরো বিরক্ত করে তুলবে। এটা আমি আগেও বলেছি আর অবশ্যই আবারও বলবো। এই বিদ্রোহর জন্য হিন্দুদের প্রতি তোমার আচরণও কিছুটা দায়ী। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, যদি তুমি আরো সহিষ্ণুতা দেখাতে, তাহলে সাম্রাজ্য শাসন করাটা আরো স্বচ্ছন্দ হত, আর তুমি আর রাজপুতদের মতো তোমার প্রজারা, উভয়েই আরো সন্তুষ্ট থাকতে?'
'শাসনের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য আর সন্তুষ্টির কী সম্পর্ক? ন্যায় আর কর্তব্য হচ্ছে এখানে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।'
'আমি তো কর্তব্যের কথাই বলতে চাচ্ছি—ভালোভাবে শাসন করার কর্তব্য, তোমার অধীনস্থ সমস্ত মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা, শুধু কিছু মানুষকে শাস্তি দেওয়া কিংবা কেউ কেউ যেমন বলে নির্যাতন করা নয়।'
'যারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য নয় তাদেরকে আমি কখনও শাস্তি দেই না।'
'পৃথিবী সম্পর্কে তোমার ধারণা কখন এত শীতল হল? একজন সম্রাট হিসেবে তোমার অনেক ভালো কিছু করার ক্ষমতা আছে। তারপরও তুমি কেবল ছায়া ছড়াতে পছন্দ করছো। আমার কথায় তুমি কষ্ট পেলে আমি দুঃখিত, তবে এখানে তোমার মা থাকলে তিনিও একথা বলতেন। তুমি অতি সহজে নিন্দা করতে পার, তবে প্রশংসা করার বেলায় বেশ ধীর...এমন রূঢ় আর ক্ষমাহীন আচরণ কর যে, তোমার ছেলেরাসহ লোকজন সবাই তোমাকে ভয় পায়। সেজন্যই তারা মন খুলে কথা বলে না কিংবা সুপরামর্শও দেয় না। আজ্ঞাবহ মানুষের মতো কেবল তোমার কথায় সায় দেয়।'
আওরঙ্গজেব কিছু বললেন না। এতে সাহস পেয়ে জাহানারা আবার বলতে শুরু করলেন, 'দয়া কর আওরঙ্গজেব—যদি তুমি দেখ যে আকবরকে ক্ষমা করা কঠিন, তাহলে এই বিদ্রোহ দমন করতে যাতে রক্তপাত না হয় সেজন্য যা কিছু তুমি করতে পার কর। আমাদের পরিবার আবার ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হোক আমি আর তা সহ্য করতে পারবো না।' যত চেষ্টাই করুন তাঁর গলা ভেঙ্গে গেল, 'একটু দয়া কর, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি...'
'জাহানারা আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝি। আপনি সারা জীবন আমাদের পরিবারকে এক করে রাখার চেষ্টা করে কাটিয়েছেন। আমি সেটা জানি, যদিও

অনেক সময় তা প্রকাশ করি নি। তবে, যাইহোক,' এতটুকু বলার পর আওরঙ্গজেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারপর বললেন, 'যা ঘটছে তার জন্য আমার দোষ খুঁজতে গিয়ে আপনি একজন পুরুষের জগৎ সম্পর্কে একজন নারীর অজ্ঞতার সাথে প্রতারণা করছেন। আমি সম্রাট আর আমাকে একাই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তা যতই বেদনাদায়ক হোক। আকবর আর তার বিধর্মী মিত্রদেরকে কোনো ধরনের দয়ামায়া দেখানো হবে না, তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।' একটু থামলেন, তারপর চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে গলার স্বর নরম করে বললেন, 'এই বিষয় নিয়ে আর তর্ক-বিতর্ক করা অনর্থক বরং আমরা উভয়েই কষ্ট পাব। তার চেয়ে ভালো হয় যদি আপনি দয়া করে আপনার ঘরে ফিরে যান।'

জাহানারা উঠে ধীরে ধীরে কামরা থেকে বের হয়ে গেলেন। নিজের ঘরে ফিরে মনে সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য একটি সুফিবাদের বই তুলে নিলেন। তবে তাঁর দুই-চোখ ভরে পানি চলে আসায় বইয়ের শব্দগুলো ঠিকমত দেখতে পারছিলেন না। সারাটি জীবন তিনি তাঁর পরিবারকে এক করে রাখার চেষ্টা করে এসেছেন আর বার বার ব্যর্থ হয়েছেন। শাহজাহান আর মমতাজ সারাজীবন পরস্পরকে ভালোবেসে আর একসাথে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে কাটিয়েছিলেন, অথচ তাঁদের সন্তানদের একদিন এই পরিণতি হবে কে তা ভেবেছিল?

অধ্যায় বার

সম্রাট দ্বিতীয় আকবর

'জাঁহাপনা, সভাসদরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।'

চকচকে রত্নখচিত রাজদরবারের আলখাল্লা পরা আমবারের রাজার কথাগুলো ২৩ বছরের আকবরের কানে মধুবর্ষণ করলো। রাজা আর তাহাব্বুর খানকে সাথে নিয়ে তিনি বালুময় মাটির উপর দিয়ে তার তাঁবুর দিকে হেঁটে চললেন। একজন পরিচারক মাথার উপর বিরাট একটি সাদা ছাতা ধরে রয়েছে। তাঁবুর কাছে পৌঁছে দেখলেন তার রাজপুত মিত্ররা তাঁবুটিকে ঐতিহ্যবাহী মোগল সর্বাধিনায়কের লাল টকটকে রঙে রাঙিয়েছে। তাঁবুর ছাউনির নিচে স্থাপন করা মখমলে ঢাকা নিচু সোনার সিংহাসনটির দিকে এগোতেই দুইপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান রাজপুত রাজারা একযোগে তাকে কুর্নিশ করলো। এই সদিচ্ছাজ্ঞাপক ভঙ্গি দিয়ে ওরা তার প্রতি যে আস্থা আর শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে তা তিনি উপভোগ করলেও, রাজপুতদের গর্ব আর সামাজিক অবস্থান ও পদমর্যাদা সম্পর্কেও তিনি সচেতন। তিনি জানেন তার এই নতুন অবস্থানের অহংকারে তাকে ডুবে থাকলে চলবে না। তিনি দ্রুত রাজাদেরকে উঠতে ইশারা করে বললেন, 'যদিও আমি আপনাদের নেতা, তবে আমার এই অবস্থানে পৌঁছাবার জন্য আপনারা যে সমর্থন আর উৎসাহ যুগিয়েছেন তার জন্য আমি আপনাদের কাছে ঋণী। আপনারা আমার সহযোদ্ধা-ভাই। আমরা একসাথে মিলে মোগল সাম্রাজ্যকে এর বর্তমান খণ্ডিত অবস্থা থেকে নতুনভাবে আবার এর ঐক্যবদ্ধ গৌরবময় অবস্থায় ফিরিয়ে আনবো। তবে তা করার আগে আমার বাবা আর তাঁর গোঁড়ামিপূর্ণ হামসাচ্চা সমর্থকদের মধ্যে বিভাজন করার যে শক্তি মূর্ত রয়েছে তা আমাদেরকে দমন করতে হবে। তাদের সর্বশেষ সামরিক তৎপরতা সম্পর্কে আমরা কী জানি?'

মেবারের রানা বললেন, 'আমাদের চরদের কাছ থেকে আমরা যে খবর পেয়েছি তাতে বুঝা যাচ্ছে যে, আওরঙ্গজেব আজমিরেই রয়েছেন এবং আমরা সেখানে

পৌঁছার আগে তাঁর বাইরে থেকে সেনাবাহিনীর সহায়তা পাওয়ার খুব একটা সম্ভাবনা নেই। আর এখান থেকে আজমির যেতে তিন থেকে চারদিন লাগবে।'

'সে যাইহোক, আজমির দুর্গ খুবই সুরক্ষিত।'

'তবে শহরের অনেক বাসিন্দা রাজপুত বংশীয় আর আমরা বিশ্বাস করি ওরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ওদের সাহায্য নিয়ে আমরা প্রতিরক্ষা ভেদ করে ভেতরে ঢুকে আপনার বাবাকে কব্জা করতে পারি।'

রানার দুই সারি পেছন থেকে মোটামতো একজন সেনা কর্মকর্তা বলে উঠলো, 'আর আমাদের লোকজনদের সাথে তিনি যা ব্যবহার করেছেন, তাতে তাকে মেরে ফেলাই ঠিক হবে।'

রানা ঘুরে লোকটির দিকে ইস্পাতকঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'থাম রবি! এসব বিষয়ে তোমার বিচার করার অধিকার নেই। আর তা তোমার ভালর জন্যই বলছি।'

আকবর বললেন, 'একটা ব্যাপার আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই। আমি কখনও আমার বাবার মৃত্যুদণ্ড দিতে রাজি হব না। তাকে আরামদায়ক অবস্থায় আটক করে রাখতে হবে।'

'আমার পেছনে এই রবির মতো মাথা-গরম দু-একজন লোকেরা রাজদরবারের সভায় যোগ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত নয়, এদের স্থান কেবল যুদ্ধের ময়দান। আপনার কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসার আগে থেকেই আমরা জানতাম যে, আপনি তাঁর মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে রাজি হবেন না। তাঁকে কারাগারে বন্দী করে রাখার বিষয়ে আমরা একমত।'

'শুনে আমি খুশি হলাম।'

'তবে আপনাকে অনুরোধ করবো, যত আরামেই তাঁকে বন্দী রাখুন, জায়গাটি অবশ্যই ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে কোথাও হতে হবে। আগ্রা কিংবা দিল্লিতে রাখলে তিনি তাঁর অতিসূক্ষ্ম বুদ্ধি আর কূটচাল দিয়ে কোনো একটা ফন্দি বের করে মতবিরোধ জাগিয়ে তুলবেন। সবচেয়ে ভাল হয় তাকে কয়েকশো মাইল দূরে কোথাও নির্বাসন দিলে।'

'কোথায় সেটা হতে পারে তেমন কোনো জায়গার কথা ভেবেছেন?'

'রাজস্থানের মরুভূমির মাঝে কোনো দুর্গ কিংবা জয়সলমির দুর্গ-নগরী সম্ভবত ঠিক হবে। সেখানে যে কঠিন পরিশ্রমী আর ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা থাকে, তাদের মধ্যে তিনি খুব একটা সমর্থক পাবেন না।'

মাঝখান থেকে তাহাব্বুর খান বললেন, 'জাঁহাপনা, আমরা সবাই এই বিষয়ে মোটামুটি একমত যে, আপনার বাবাকে বন্দী করা হবে। কোথায় তাকে রাখা

হবে সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। প্রথমে তাকে আমাদের পাকড়াও করতে হবে। আর রানা যাই বলুন আমার মনে হয় না ব্যাপারটা এত সহজ হবে। আমাদেরকে দ্রুত কাজে লেগে পড়তে হবে।'

'তুমি ঠিক বলেছ তাহাব্বুর খান। রানা, আজমির দুর্গকে বাইরের সাহায্য থেকে বিচ্ছিন্ন করতে আর আমার বাবাকে বন্দী করার জন্য আপনার সেনাবাহিনী কখন রওয়ানা দেবে?'

'আগামীকাল ভোরের আলো ফোঁটার সাথে সাথে।'

'আমার সেনারাও তাই করবে। তাহাব্বুর খান, তুমি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দাও। কাল ভোরে আমরা মোগল সাম্রাজ্যের একটি নতুন প্রভাত সৃষ্টি করার জন্য রওয়ানা দেব।' এই প্রথম সম্রাটের ক্ষমতার স্বাদ আর সেই সাথে সঠিক শব্দ চয়ন করতে পেরে আকবর বেশ খুশি হলেন। তার ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা দিল।

আজমির দুর্গের মূল আঙিনায় একটি ছড়ানো নিম গাছের ছায়ার নিচে বসে আওরঙ্গজেব চাপরাশিকে হুকুম করলেন, 'ওয়াজিম খানকে আমার কাছে পাঠাও।' ওয়াজিম খান ছিলেন তাঁর পুরোনো একজন উজিরের ছেলে। আওরঙ্গজেবের গুপ্তচর চক্রের কেন্দ্রে সে দিন দিন একজন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হয়ে উঠেছিল। তিনি খুব আশা করতেন তাঁর বাদবাকি উপদেষ্টা আর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারাও তার মতো কর্মঠ, উদ্ভাবনপটু আর বিচক্ষণ হোক।

কয়েক মিনিট পর কালো পোশাক পরা বলিষ্ঠ ওয়াজিম খান হাজির হল। প্রভুর কাছে ছুটে আসার কারণে সে তখনও একটু একটু হাঁপাচ্ছিল। আওরঙ্গজেব হাতের ইশারায় তাকে তাঁর পাশে বসতে বললেন, 'এখানে আমার কাছে এসে বস।'

ওয়াজিম খান ভ্রু থেকে ঘাম মুছে আসন গেড়ে তাঁর পাশে বসতেই সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, 'আকবর আর তার রাজপুত মিত্রদের খবর কী?'

'ওরা প্রচুর সৈন্য নিয়ে আজমিরের পথে রয়েছে।'

'তাই আশা করেছিলাম। আচ্ছা, দুদিন আগে তুমি যখন আমার সাথে দেখা করেছিলে, তখন আমার ছেলের শিবিরের একজন গণকের কথা বলেছিলে। তুমি বলেছিলে তাকে ঘুষ দিলে সে পঞ্জিকা থেকে গণনা করে ওদেরকে জানাবে যে, বারো দিন পর নতুন চাঁদ উঠার আগে আজমির আক্রমণ করা শুভ নয়। আর এতে আমরা মূল্যবান কিছু সময় হাতে পাব।'

'হ্যাঁ, আমি লোক পাঠিয়েছি। ওরা ইতোমধ্যেই কিছু সফলতার খবর জানিয়েছে।'

'যুক্তিসম্পন্ন কোনো মানুষ কি করে যে এইসব আজেবাজে বিষয়ে বিশ্বাস করে তা আমি বুঝি না। যাই হোক, তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে, ওরা এটা বিশ্বাস করে সামনে এগোন আপাতত স্থগিত করেছে। আর তাই যদি হয় তাহলে বাইরে থেকে আমাদের সেনারা হয়তো তাদের আক্রমণের আগেই এখানে পৌঁছতে পারবে। ওরা কতদূর এগোল, জেনেছ কিছু?'

'কাসিদরা নিশ্চিত করেছে, বিভিন্ন দিক থেকে আপনার বিশ্বস্ত সেনারা দ্রুত এদিকেই ছুটে আসছে। তবে ওরা এখনও বেশ দূরে রয়েছে আর নতুন চাঁদ উঠার আগে অনেকেই এখানে পৌঁছতে পারবে না।'

'ঐ বিশ্বস্ত সেনাবাহিনীর মধ্যে কী মুয়াজ্জম আছে?'

'হ্যাঁ, আপনার ছেলে সবার আগে ঘোড়ায় চড়ে এদিকেই আসছেন। আরো কয়েকজনের সাথে তিনি হয়তো বেশ আগেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবেন। আমার গুপ্তচরেরা জানিয়েছে তার সদর দফতরের কয়েকজন তরুণ সেনানায়ক তাকে তার ভাইয়ের সাথে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করেছিল, তবে তিনি তাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি প্রথমে তার বাবা আর নিজ ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন।'

আওরঙ্গজেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর ছেলেরা তাঁর বিরুদ্ধে এক হচ্ছে না। তারপর বললেন, 'ভালো কথা বলেছ। আমি তাকে নতুন দায়িত্ব দিয়ে পুরস্কৃত করবো আর তার ভাইয়ের অধীনে যেসব জায়গাজমি আছে সেগুলো তাকে দেব। তবে মুয়াজ্জমের শিবিরে যারা আমার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য তাকে উস্কে দিতে চেয়েছিল তাদের একটা তালিকা আমাকে দাও। সময় এলে আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেব।'

'অবশ্যই জাঁহাপনা। শাহজাদা আকবরের এগিয়ে আসা থামাতে আর কিছু কি আমি করতে পারি? আমি ইতোমধ্যেই আপনার সেনা কর্মকর্তাদের বলেছি মুসাফিরের ছদ্মবেশে কিছু চর পাঠাতে, যাতে ওরা তার শিবিরে ঢোকার চেষ্টা করে ওদের পরিকল্পনা জানার চেষ্টা করে। সেনা কর্মকর্তারা জানিয়েছে, আপনার হুকুমে কোষাগার থেকে সৈন্যদের মাঝে অর্থপুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে, আর তা পেয়ে ওরা খুব খুশি হয়েছে। এতে ওদের মনোবল চাঙ্গা হয়েছে আর ওরা নতুন উদ্যমে অনুশীলন করছে, যদিও সংখ্যায় বেশ কম। রসদের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানিয়েছে অস্ত্রভাণ্ডারে বারুদ, গাদা বন্দুক আর কামানের গোলা যথেষ্ট পরিমাণে মজুদ রয়েছে। শস্যভাণ্ডার আর পানির আধারগুলোও ভর্তি রয়েছে। কাজেই ওরা যদি দুর্গ অবরোধ করে তাহলে আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো।'

'তোমার কথা শুনে আমি খুশি হলাম। এই মুহূর্তে তোমার জন্য আর কোনো কাজ নেই। আরো দু-একটা বিষয় নিয়ে আমি ভাবছি, তবে তা তোমাকেও বলার আগে আমাকে আরো ভাবতে হবে কিভাবে আকবরের এগিয়ে আসা ব্যাহত করা যায়।'

বর্শার ডগায় কমলা রঙের লম্বা সরু পতাকা উড়িয়ে অশ্বারোহী দলের প্রথম সারিটি সামনে এগোতেই আকবর মন্তব্য করে উঠলেন, 'কি সুন্দর লাগছে দেখতে।' দুই পাশে তাহাব্বুর খান আর মেবারের রানাকে নিয়ে তিনি তার যুদ্ধহস্তির খোলা হাওদার উপর দাঁড়িয়েছিলেন। ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সেনার বেশিরভাগই ছিল আম্বার ও বিকানিরের রাজপুত আর মারওয়াড় এবং মেবারের অশ্বারোহী সেনা। ক্রমাগত আরো সেনা আসছিল। ওরা সবই চকচকে কমলা, হলুদ আর লাল রঙের রণবেশ আর পাগড়িপরা ছিল। সূর্য আর চন্দ্রের প্রতীকের নিচে অগ্নিশিখা সম্বলিত পতাকা ওরা বহন করছিল। ঘোড়ার পিঠে বাদকদল ঢাক আর শিঙায় রক্ত গরম করা রণসঙ্গীত বাজিয়ে চলছিল। আকবরের হাতির সামনে দিয়ে কুচকাওয়াজ করে যাওয়ার সময় সৈন্যরা একযোগে খাপ থেকে তরোয়াল বের করে ঠোঁটে লাগাতেই সকালের রোদ পড়ে তরোয়ালের পাতে ঝিলিক দিয়ে উঠছিল। এক এক সারিতে পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ার থাকলেও প্রায় এক ঘণ্টা লাগলো সবাইকে হাতির সামনে দিয়ে পার হয়ে যেতে।

এরপর এল গোলন্দাজ বাহিনী। প্রথমে এল পানি নিরোধক কাপড়ে ঢাকা বারুদ আর কামানের গোলা বহনকারী শকটগুলো। তারপর এল আট কিংবা দশ চাকার গরুর গাড়িতে টেনে আনা লম্বা নলের কামান। কামান টেনে আনা ষাঁড়গুলোর শিংয়ে লাল নীল রঙের ফিতা বাঁধা ছিল। গোলন্দাজদের মধ্যে অনেক তুর্কি ভাড়াটে সেনা ছিল। কাঁধে লোহার দণ্ড নিয়ে ওরা কামানের পাশে পাশে হাঁটছিল। দুই তিনজন ইউরোপিয়কে দেখে আকবর বেশ মজা পেলেন। তার কাছে আসতেই কামানের নলের উপর চড়ে বসে ওরা তাদের টুপি নাড়ছিল। রোদে পুড়ে ওদের মুখ লাল হয়ে রয়েছে।

কামানের সারি চলে যাওয়ার পর আকবর তাহব্বুর খানকে বললেন, আজমির দুর্গের অবরোধ যদি শুরু করতে হয় তবে এগুলোই তার জন্য যথেষ্ট। এমন সময় ধূলিধূসরিত পথে পদাতিক সেনারা আসতে শুরু করলো। পুরো সেনাবাহিনীর মধ্যে এরা ছিল সবচেয়ে সাধারণ। অনেকে খালি পায়ে পুরোনো ধরনের

অস্ত্রশস্ত্র, বল্লম আর তীর-ধনুক নিয়ে এসেছে। তাসত্ত্বেও এদেরকেও যথেষ্ট সুশৃঙ্খল মনে হল আর তার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ওরা তার জয়ধ্বনি করতে করতে গেল।

পরিদর্শন শেষ হওয়ার পর আকবর হাতির পিঠ থেকে নামলেন। রানা আর তাহাব্বুর খানকে সাথে নিয়ে তিনি একটি অস্থায়ী কাঠের মঞ্চের দিকে হেঁটে চললেন। সেখানে অন্যান্য রাজপুত রাজা আর তার নিজের মোগল জ্যেষ্ঠ সেনানায়করা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। নিম্নপদস্থ সেনা কর্মকর্তারা মঞ্চের চারপাশে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড গরমে ঘামছিল। সকালবেলা যে কালো মেঘ দিগন্তে দেখা গিয়েছিল, তা এখন মাথার উপর অর্ধেক আকাশ ঢেকে ফেলেছে। ঝড় আসতে আর বেশি দেরি নেই। আকবর ক্ষীপ্রগতিতে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠে রাজপুত রাজা আর তার সেনাপতিদের তার পেছনে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়াতে বললেন। তারপর কয়েক পা হেঁটে মঞ্চের সামনে গিয়ে একহাত তুলে সবাইকে চুপ হতে বলে উপরের দিকে মুখ করে নিচে দাঁড়ান নিম্নপদস্থ সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে শুরু করলেন।

দুই হাত তুলে নিচের সবাইকে আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'আজ আপনাদের শৃঙ্খলা আর বিভিন্ন শাখার অস্ত্রভাণ্ডার দেখে আমি আর আমার সহযোদ্ধা ভাইয়েরা সত্যি অভিভূত হয়েছি। শুধু তাই নয়, আপনারা সবাই আমাকে যে দিলখোলা সালাম জানিয়েছেন তাও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। আজমির দুর্গ থেকে এই দেওয়ারাই মাত্র দশ মাইল দূরে। আগামীকাল আমরা সামনে এগিয়ে দুর্গ ঘিরে ফেলে আমার বাবা আর তার মুষ্টিমেয় সমর্থকদের আত্মসমর্পণ করতে শক্তি প্রয়োগ করবো। হিন্দু, মুসলিম আর শিখ, সবার কাছ থেকে সমর্থনের বার্তা এসেছে। কাজেই একবার আমার বাবা আমাদের কব্জায় এলে সমস্ত বিরাধিতা অদৃশ্য হয়ে যাবে। বিজয় আমাদের হবে আর এই সাম্রাজ্য আবার একতাবদ্ধ হবে।'

আকবরের বক্তৃতার সাথে সাথে আকাশ থেকে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়া শুরু হল।

অধ্যায়   তের

মিষ্টভাষী চালবাজ/কপট উপদেষ্টা

ঘুমের ঘোরে আকবর এপাশ-ওপাশ করছিলেন। রাতে তাঁবুর ছাদে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ার শব্দে আর ঝড়ো হাওয়ার গর্জনে দু-একবার তার ঘুম ভেঙ্গেছিল। একটি হাত তার কাঁধ ধরে আস্তে আস্তে ঝাঁকি দিতে দিতে তাকে বললো, 'জাঁহাপনা, রাজপুতরা চলে গেছে।'

এটা হয়তো একটা স্বপ্নের অংশ—যে স্বপ্নে চরম ভীতি আর উদ্বেগ একেবারে সামনে চলে আসে। তাকে এখুনি জেগে উঠে দেখতে হবে যে এটা সত্যি নয়। তিনি চোখ খুলে, চোখে আঙুল ঘষে ঘুম কাটাতে চেষ্টা করলেন। তবে হতাশ হলেন বাস্তবে ফিরে এসে। তার তরুণ কোরচি তার রেশমি আলখাল্লা এক হাতে বাড়িয়ে ধরে কথা বলছিল। রাতপোশাকের উপর এটা পরে তাকে অনুসরণ করে তাঁবুর দরজার কাছে এলেন। ছাউনির নিচ থেকে সামনে উঁকি দিয়ে ছোট ছোট খানাখন্দের উপর দিয়ে সামনে তাকালেন। সেখানে রাজপুতদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সাহসী আর উদ্যমী সেই যোদ্ধাদের সেরকম কোনো হাঁকডাক, শোরগোল কিছুই শোনা যাচ্ছে না। কোনো চুলার আগুন নেই আর স্তূপ করা অস্ত্রশস্ত্রও দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া মনে হল রাজপুতদের বেশির ভাগ তাবুই নেই।

এটা কেমন করে হতে পারে? তাবুর ভেতরে একটি টেবিলের উপর পানির জগ রাখা ছিল। সেখান থেকে কিছু পানি নিয়ে মাথায় ছিটিয়ে এই ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করলেন। ভোরের ঠাণ্ডা পানিতে মাথা ভিজে গেলেও তার চোখের সামনের দৃশ্যটির কোনো পরিবর্তন হল না। এটা বাস্তবতা। আকবর থরথর করে কেঁপে উঠলেন। রাজপুতরা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ধুলায় মিশে গেছে; তার বাবা তাকে ধরতে পারলে তার জীবন অর্থহীন হয়ে যাবে। নির্বাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি বুঝার চেষ্টা করলেন কী হয়েছে, এমন সময় যে কয়েকটি তাঁবু তখনও ছিল সেখান থেকে

কমলা রঙের পোশাকপরা একজন রাজপুত তার দিকে এগিয়ে এল। আকবর সাথে সাথে লোকটিকে চিনতে পারলেন—আম্বারের রাজার ছোট ছেলে জাগিন্দর। একে তিনি তার প্রায় সারা জীবন ধরে চিনতেন। জাগিন্দর কাছে এসে প্রণামের ভঙ্গিতে ভেজা মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই আকবর তাকে উঠে দাঁড়াতে ইশারা করে বললেন, 'এসবের দরকার নেই। কি হয়েছে বল?'

'আমার বেশিরভাগ রাজপুত বন্ধুরা চলে গেছে। শুধু আমি আমাদের কয়েকজন অশ্বারোহীসহ রয়ে গেছি আপনাকে বিষয়টা জানাবার জন্য। কেননা আমি যতটুকু আপনাকে জানি, তাতে আমি বুঝি, যে কারণ দেখিয়ে ওরা চলে গেছে তা আমার বিশ্বাস হয় নি।'

'তুমি কী বলতে চাচ্ছ?'

মাটির দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে জাগিন্দর বলতে শুরু করলো, 'গতকাল আপনি যখন সেনাবাহিনী পরিদর্শন করছিলেন, তখন বিকানিরের রাজা শিবির সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রহরীদলকে চারপাশ টহল দিতে পাঠিয়েছিলেন। ওরা তখন দেখতে পেল দুজন নিরস্ত্র লোক নিঃশব্দে চোরের মতো শিবিরের দিকে আসছে। টহলদলটি সামনে এগোতেই ওরা দ্রুত তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। লোকদুটি শিবিরের দিকে চুপি চুপি আসছিল। ওদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল এখানে ওরা কি করছে, তখন ওরা প্রায় সাথে সাথে স্বীকার করলো যে, ওরা আপনার চাকর, আপনি যে চিঠি আপনার বাবাকে লিখেছিলেন তার উত্তর নিয়ে ওরা আপনার বাবার কাছ থেকে আসছিল। তারপর ওরা আওরঙ্গজেবের সিলমোহরসহ চিঠিটা টহলদলের হাতে দিল। ওরা চিঠিটা নিয়ে বিকানিরের রাজার কাছে দিল। তিনি সিলমোহর ভেঙ্গে চিঠিটা পড়লেন, তারপর সাথে সাথে অন্য রাজাদেরকে একটি সভায় ডাকলেন। সেখানে আমিও আমার বাবার সাথে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে দেখলাম বিকানিরের রাজা রেগে ফেটে পড়ে বললেন, 'আমি অনেক আগে থেকে উদ্বিগ্ন ছিলাম যে, মোগলদেরকে বন্ধু হিসেবে বিশ্বাস করা যায় কি-না। তারপরও আমি সভায় যোগ দিয়েছি আর আমাদের জনগণের একতার স্বার্থে আপনারা আকবরকে যে সমর্থন দিয়েছেন তাতে বিনা আপত্তিতে সায় দিয়েছি। আর এখন বাবার কাছ থেকে ছেলেকে লেখা এই চিঠিতে আমার সন্দেহই সঠিক প্রমাণিত হল। এটা অবশ্যই সম্রাটের নিজের হাতের লেখা—আমাকে লেখা তার চিঠি থেকে এ লেখা আমি খুব ভাল করে চিনি। এটা এভাবে শুরু হয়েছে শুনুন, "খুব চমৎকার কাজ করেছ, আমার সাহসী ছেলে। অসভ্য আর বর্বর রাজপুতদেরকে ফাঁদে ফেলার জন্য তুমি যে দক্ষতা আর চাতুরি

দেখিয়েছ, তার জন্য আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।" আওরঙ্গজেব বিশদভাবে চিঠিটিতে বর্ণনা করেছেন, কিভাবে আপনারা দুজনে মিলে আজ আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য কী পরিকল্পনা করেছিলেন... কিভাবে আপনি আমাদের সেনাদেরকে পথ দেখিয়ে এখান থেকে আজমির দুর্গে যাওয়ার মাঝপথে জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকানো আপনার বাবার সবচেয়ে বড় কয়েকটি কামানের সামনে নিয়ে যাবেন।'

আকবরের মাথা ঘুরতে শুরু করলো, জগিন্দর কি বলছে তা বুঝার চেষ্টা করতে লাগলেন, তখনও নিজেকে বুঝাচ্ছিলেন যে এটা বাস্তবতা কি-না। তারপর ফেটে পড়ে বললেন, 'এটা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা।' উত্তেজনায় তার গলা কাঁপছিল। 'আমি কখনও আমার বাবার সাথে চিঠি আদান-প্রদান করি নি। আমার একটা সম্মান আছে, যখন কোনো কথা দেই তা অবশ্যই রাখি। এটা তার আরেকটি জঘন্য চাল...বুঝতে পারছো না?'

'হ্যাঁ, জাঁহাপনা। আমি তা বিশ্বাস করেছি বলেই এখানে রয়ে গেছি। প্রথমে সভার সবাই চিঠিটার বিষয়বস্তু বিশ্বাস করে নি, তবে সভার সবার সামনে জিজ্ঞাসাবাদের সময় পরবর্তীতে বন্দী লোক দুটো আরো কিছু তথ্য জানাল। যেমন, সারির একেবারে প্রথমে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার সময় আপনি হঠাৎ ঘুরে যাবেন আর তার ঠিক আগেই আপনার পাশে পাশে চলা কোরচি তার হাতের পতাকাটি মাটিতে ফেলে দিয়ে আপনার বাবার গোলন্দাজদের সংকেত দেবে। তখন কামানের গোলা বর্ষণ শুরু হবে। ততক্ষণে প্রায় সবাই এটা বিশ্বাস করলেন। আমার বাবা অবশ্য প্রস্তাব করলেন আপনার মুখোমুখি হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য আপনাকে একটা সুযোগ দিতে। আপনার সাথে কথা বলার জন্য তিনি একজন সেনা কর্মকর্তাকে পাঠালেন। তবে আপনার দেহরক্ষী দলের একজন সেনানায়ক বললো, আপনি ঘুমাচ্ছেন আর তার কঠোর নির্দেশ আছে, ঘুমন্ত অবস্থায় আপনাকে যেন বিরক্ত না করা হয়। বিশেষত রাজপুতরা যেন কোনো মতেই আপনার শিবিরের কাছে আসতে না পারে। সেনা কর্মকর্তা ফিরে যখন জানাল আপনার দেহরক্ষী দলের নেতা কি বলেছে তখন তা সভাসদদের সন্দেহ আরো উসকে দিল। পরিশেষে ওরা একমত হল যে, সবাই মিলে আপনার সাথে আজমির যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে এই মুহূর্তে এখান থেকে সরে পড়াটাই বরং নিরাপদ হবে। আমার বাবার মতো আরো কয়েকজন কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিলেন, তবে অন্যান্যে যার যার রাজ্যে ফিরে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন। রাতে ঝড়ের আড়ালে বেশিরভাগই শিবির উঠিয়ে চলে গেলেন। আমার বাবা এখান থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছেন। তবে অন্যদের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।'

'কিন্তু আমার নিজের অন্যান্য মোগল সেনা কোথায়?'

'আমাদের চলে যাওয়ার প্রস্তুতি আর পুরো বিষয়টি শুনে ওদের মধ্যে কিছু লোক আতঙ্কিত হয়ে ভাবলো যে, আপনি আপনার বাবার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য ওদেরকে ফাঁদে ফেলেছেন, আর ধরা পড়লে ওদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। তখন ওরা তাদের সেনাপতি, আপনার বন্ধু তাহাব্বুর খানের তাঁবুতে গিয়ে দেখলো উনিও সেখানে নেই। তখন এই চক্রান্তে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে অনেকেই ইতোমধ্যে চলে গেল আর বাদবাকি যারা এখনও রয়েছে ওরাও চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে—তবে আমার মনে হয় অনেকেই আপনার বাবার কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য যাবে। আর বিদেশিসহ অন্যান্যে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে রসদবহর থেকে যা পারছে লুট করে নিয়ে পালাচ্ছে।'

আকবরের তরুণ কোরচিটি সারাক্ষণ তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তিনি তার দিকে ফিরে বললেন, 'দেহরক্ষী দলের সেনানায়ককে ডেকে আন।' ছেলেটি চলে গেল তারপর একটুপরই ফিরে এসে বললো, 'তিনিও চলে গেছেন, জাঁহাপনা।'

আকবর মাথা নাড়লেন। অবাক হলেন না। এটা পরিষ্কার যে, তার বাবা তাকে ঘুষ দিয়ে বশ করেছেন। কাউকে তার সাথে দেখা করতে না দেওয়াটা ছিল চক্রান্তেরই পরিকল্পনার একটি অংশ, যাতে রাজপুতদের সন্দেহই এতে বেড়ে যায়—আর তা-ই আসলে হয়েছিল। তখনও স্তম্ভিত অবস্থায় তিনি জগিন্দর আর তার কোরচিকে তার পিছু পিছু আসতে ইশারা করলেন। কর্দমাক্ত মাঠে পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র আর সমরসম্ভারের পাশ দিয়ে তাহাব্বুর খানের তাঁবুর দিকে হেঁটে চললেন। যে কজন সৈন্য তখনও রয়ে গিয়েছিল, তারা তাকে দেখে সালাম দিল, তবে বেশিরভাগই দুদ্দাড় করে ছুটে পালাল, বুঝাই যাচ্ছে কেটে পড়ার তালে রয়েছে।

তাহাব্বুর খানের তাঁবুতে ঢুকে আকবর দেখলেন, তার দুধ-ভাইয়ের ব্যবহারের বেশিরভাগ জিনিসপত্র নেই, তবে একটা নিচু টেবিলের উপর সিলমোহর মারা ভাঁজ করা একটা কাগজ খাড়া করে রাখা আছে। উপরে তার নাম লেখা। কাঁপা কাঁপা হাতে কাগজটা তুলে নিয়ে তিনি ভাঁজ খুললেন।

প্রিয় দুধ-ভাই,

আপনাকে ছেড়ে যেতে হল বলে ক্ষমা চাচ্ছি। জানি এটা করে আমি আমার সম্মান হারিয়েছি। তবে আর কোনো উপায় ছিল না। গতরাতে আপনার বাবার

উপদেষ্টা মিষ্টভাষী চালবাজ ওয়াজিম খান ছদ্মবেশে আমার কাছে এসেছিল। যখন আমরা একা হলাম, তখন সে আজমির দুর্গ ছেড়ে দেবার শর্ত নিয়ে আলোচনা না করে বললো, আপনার বাবা আমার জন্য একটা বার্তা পাঠিয়েছেন। সম্রাট তাকে বলেছেন আমাকে জানাতে যে, আমার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আমার আসন্নপ্রসবা স্ত্রী, ছোট দুই ছেলে আর বাবা-মাকে বন্দী করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না। তাদেরকে বন্দী করার প্রমাণ হিসেবে ওয়াজিম খান তাদের আংটি দেখাল। যদি আমি তাঁর আনুগত্যে ফিরে না যাই, তাহলে সম্রাট পরিবারসহ আমার একমাত্র ভাই আর সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দেবেন। অর্থাৎ এই পৃথিবীর বুক থেকে আমাদেরকে নির্বংশ করা হবে। আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন আমি ওয়াজিম খানকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু জানি তা করতে পারবো না। আমি অনেক অনুনয়-বিনয় করলাম, কিন্তু সে তাতে মোটেই কান দিল না, বরং বলা শুরু করলো হত্যা করার আগে তাদের উপর কি ধরনের অত্যাচার করা হবে। আর বললো, যদি আমি তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে আওরঙ্গজেবের কাছে ফিরে গিয়ে সঠিক দায়িত্ব পালনের পথে যাই তবে আমাকে পুরস্কৃত করা হবে। সে আরো জানাল যে, শুধু আমার কাছেই এই ধরনের প্রস্তাব দেওয়া হয়নি... তাছাড়া সে শুনেছে যে, রাজপুতরাও আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে। সে আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বললো যে, আপনার বাবা কথা দিয়েছেন যে আপনাকে বন্দী করা হলে তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন। সে বললো আপনাকে ত্যাগ করলে খারাপের চেয়ে বরং আপনার ভালো হবে। আমি দুর্বল হয়ে শেষ পর্যন্ত তার কথায় রাজি হলাম। অনুভব করলাম পরিবারের স্বার্থে এছাড়া আর কিছু আমার করার ছিল না। কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের সময় সারাদিন আমি আপনাকে কিছু বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারি নি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন।

আকবর চিঠিটা একপাশে ছুঁড়ে ফেললেন। তাহাব্বুর খান আর রাজপুতদের তিনি কোনো দোষ দিতে পারলেন না। তার বাবা কৌশল করতে গিয়ে এমন নিচে নেমেছেন যা, তিনি নিজে কখনও করতে পারতেন না। তবে তিনি আকবরকে ঠিকই বোকা বানিয়েছেন। হিন্দু আর মুসলিম, রাজপুত আর মোগলদের সম্পর্কের মধ্যে যে ফাটল ধরেছিল, তা এত গভীর ছিল যে, তিনি এত অল্প সময়ে তা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আওরঙ্গজেব বেশ সহজেই

পুরোনো ক্ষতটি আবার খুঁচিয়ে তুলেছেন। তবে আকবর এত সহজে হাল ছেড়ে দেবেন না। কারণ একটি বিষয় হল, তিনি বিশ্বাস করেন না যে তার বাবা তাকে ক্ষমা করবেন। এটা ছিল তাহাব্বুর খানকে বশ করার আরেকটি চাল। তার বাবা সব সময় তাঁর কাছের মানুষদের প্রতি ক্ষমাহীন ছিলেন। গৃহযুদ্ধের সময় আওরঙ্গজেব প্রতারণা করে তাঁর ভাই মুরাদকে বন্দী করেছিলেন, তারপর তাকে হত্যা করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় ছেলেকে আওরঙ্গজেব নিজে কারাগারে আটক করেছিলেন, যেখানে শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়। যদি আকবর তার সেনাদলকে হারিয়েও ফেলেন, তারপরও তিনি নিজেকে এ ধরনের পরিণতির কাছে সঁপে দেবেন না।

তাছাড়া তিনি যদি হাল ছেড়ে দেন, তাহলে এই আত্মসমর্পণ হবে চিরদিনের জন্য নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দেওয়া আর সেই সাথে সমগ্র সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন বিভক্তি, সন্দেহ, ধর্মীয় আর তার বাবার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মাঝে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেওয়া। তিনি বরং তার প্রচেষ্টা আরো তীব্রতর করবেন। তার পূর্বপুরুষ বাবর এবং হুমায়ুন তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গিয়ে এর চেয়েও খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তার পিতামহ শাহজাহানেরও একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাঁদের অভিজ্ঞতা আর নিজের সঞ্চিত সাহস থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন সাম্রাজ্যকে নতুন করে ঐক্যবদ্ধ করতে যা, তার নিজের নামের মহান সম্রাট আকবর প্রথম করেছিলেন। তরুণ কোরচির দিকে ঘুরে তিনি বললেন, 'যারা এখনও আমার অনুগত আছে তাদেরকে ডেকে আন। আমরা এখুনি আমবারের রাজার কাছে যাব যদি,' এতটুকু বলে জগিন্দরের দিকে ফিরে তারপর বললেন,—'তিনি আমাদের নিরাপত্তা দেন।'

'তিনি তা অবশ্যই দেবেন, আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, জাঁহাপনা।'

'তাহলে এখনই রওয়ানা দেওয়া যাক। কয়েক মিনিটের মধ্যে যা যা জিনিসপত্র নেওয়া যায়, নিয়ে বাকি সব কিছু ফেলে যেতে হবে।'

'কোনো খবর পাওয়া গেল?'

বোনের গলার আওয়াজ পেয়ে আওরঙ্গজেব ঘুরে দেখলেন একটি খিলানযুক্ত দরজার মধ্য দিয়ে জাহানারা আজমির দুর্গের প্রাচীর ঘেরা ছাদের একটি নির্জন অংশের দিকে এগিয়ে আসছেন। এখান থেকেই আওরঙ্গজেব নিচে সমতল ভূমির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, যেখান দিয়ে আকবরের শিবিরের অশ্বারোহী

দল আসার কথা। তিনি এখনও খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারলেও তার ৬৭ বছর বয়সী বোন একটু কুঁজো হয়ে হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সকাল বেলার ঠাণ্ডা এড়াতে তার গায়ে একটি শাল জড়ান ছিল। 'না কিছুই না।'

জাহানারার চোয়াল ঝুলে পড়লো। আকবরের বিদ্রোহের কারণে তাঁর দেহ-মন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তিনি আওরঙ্গজেবের কাছে স্বীকার করেছেন যে, তার জন্য চিন্তা আর সেই সাথে সাম্রাজ্যের ঐক্যের সাথে তাঁর ভাইয়ের ছেলের প্রতি তাঁর ভালোবাসার দ্বন্দ্ব, এসব মিলে দুশ্চিন্তায় তিনি ঘুমাতে পারছেন না। দুই-এক মুহূর্ত পর নিজের অস্থিরতা দমন করতে না পেরে আওরঙ্গজেব ছাদের উপর পায়চারি করতে লাগলেন। একটু পর পর দিগন্তের দিকে তাকাচ্ছেন, তবে বৃষ্টির কারণে সে জায়গাটি ঝাপসা দেখাচ্ছে। তারপর বৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেখা গেল দুজন অশ্বারোহী এদিকে আসছে। মাঠ থেকে ঢালু পথ বেয়ে উপরের দিকে দুর্গের প্রধান ফটকের কাছে আসতে লাগলো। নিশ্চয়ই বার্তাবাহক।

দীর্ঘ দশ মিনিটের অনিশ্চয়তার পর দুই অশ্বারোহী হাজির হল। আপাদমস্তক বৃষ্টিতে ভেজা আর কাদা ছিটা। পরিষ্কার ধোপদুরস্ত কালো পোশাকপরা ওয়াজিম খান ওদেরকে সাথে নিয়ে এল। চওড়া মুখে হাসি নিয়ে সে বললো, 'আপনার পরিকল্পনায় কাজ হয়েছে, জাঁহাপনা। রাজপুতরা প্রায় সবাই পালিয়ে গেছে, সেই সাথে আকবরের অধিকাংশ সৈন্য। তাহাব্বুর খান আর অন্যান্য দলছুট সৈন্যরা আপনার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার অনুমতি পেলে ওরা এসে আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করবে।

নিরুদ্বেগ হয়ে আওরঙ্গজেব শরীর মন শিথিল করে হাঁটু গেড়ে মুনাজাতে বসে পড়লেন। 'এই ধারণাটি আমাকে দেওয়ার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। একটি ন্যায্য কারণ আর শক্তিশালী মন প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কিন্তু দুর্বলচিত্ত এবং বিশ্বাসঘাতক একটি দলকে পরাস্ত করেছে।'

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জাহানারা জিজ্ঞেস করলেন, 'আর আকবরের খবর কী?'

আওরঙ্গজেব ওয়াজিম খানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার মনে হয় সে রাজপুতদের সাথে চলে গেছে, তাই না?' ওয়াজিম খান মাথা নেড়ে সায় দিল। 'ঠিক আছে। দুই-তিন দিনের মধ্যে মুয়াজ্জম চলে আসবে। কারণ সে মূল সেনাবাহিনীর আগেই রওয়ানা দিয়েছে। সে এলেই তাকে আমি তার ভাইয়ের খোঁজে পাঠাব। সেখান থেকে সে আকবরকে ধরে শিকলে বেঁধে দিল্লি নিয়ে আসবে।'

তার ভাই যখন বার্তাবহদের ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন আর ওয়াজিম খানকে আরো কিছু নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, জাহানারা তখন চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। তার মনে পড়ে গেল সেই কাহিনীর কথা যা তিনি শুনেছিলেন যে, আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা দারাশিকোকে ধরার পর বন্দী করে ছালার পোশাক পরিয়ে একটি হাতির পিঠে চড়িয়ে সারা দিল্লি ঘুরিয়ে তারপর তাকে হত্যা করেছিল। হায় আল্লাহ আকবরের যেন এই অবস্থা না হয়। লোক তিনটি চলে যাওয়ার পর তিনি আস্তে আস্তে আওরঙ্গজেবকে বললেন, 'আওরঙ্গজেব, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ যে তোমার কৌশলের কারণে রক্তপাত এড়ানো গেছে। আমি সত্যি আমার পরিবার আর রাজপুতদের মাঝে আমাদের বন্ধু আর সেই সাথে আমাদের সৈন্যদের জন্য ভয় পাচ্ছিলাম...।

আওরঙ্গজেব তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি খুব বেশি দয়ালু। কতজন রাজপুত মারা যেত সেটা কোনো বিবেচনার বিষয় নয় আর সেই জঘন্য নীচ অপরাধী আকবর আমার ছেলে নয়। তবে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, যারা আল্লাহর প্রতি আর সাম্রাজ্যের প্রতি বিশ্বস্ত, তারা কেউ আজ মারা যায় নি আর সেজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।'

আওরঙ্গজেবের কণ্ঠস্বরে ঘৃণার আভাস পেয়ে জাহানারা যে যুক্তিগুলো মনে মনে সাজাচ্ছিলেন তা আর প্রকাশ করলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি আওরঙ্গজেবকে যুক্তি দিয়ে বুঝাবেন যে, সাম্রাজ্যের মাঝে নতুন করে ঐক্য আনার প্রতীকি চিহ্ন হিসেবে আকবর আর রাজপুতদের ক্ষমা করে দেওয়া যায়। তবে এখন এসব কথা বলা বৃথা। তার চেয়ে বরং সময় আর সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। প্রয়াজন হলে গওহরা, জানি, জেবুন্নিসা আর সম্ভব হলে উদিপুরী মহলের সমর্থন নিয়ে এক ধরনের মেয়েলি দরখাস্তের মতো ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি শুধু বললেন, 'আকবরকে খোঁজার জন্য মুয়াজ্জমকে পাঠানো এছাড়া এরপর আর কী ব্যবস্থা নেবে?'

'আকবরকে ছেড়ে যারা চলে এসেছে, তাদের আত্মসমর্পণ আমি গ্রহণ করবো, তবে সময় মতো ওদের মধ্যেকার সেনা কর্মকর্তাদেরকে এমন জায়গায় বদলি করবো যাতে ওরা আর কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে না পারে। আর যে কথা দিয়েছিলাম সে অনুযায়ী তাহাব্বুর খানকে সবার সামনে খোলাখুলিভাবে পুরস্কৃত করবো, যাতে সবাই দেখতে পারে যে, আমি আমার কথা রাখি। আর এতে ভবিষ্যতে যদি কাউকে কোনো কথা দেই তা লোকে বিশ্বাস করে। তবে তার উপর নজর রাখা হবে। তার মন আকবরের কাছে পড়ে থাকবে আর তার বিশ্বাসঘাতকতা তার মনকে বিষাক্ত করে তুলবে। কে জানে সে কী করবে? তাকে আমি আর কখনও বিশ্বাস করতে পারবো না।'

‘তার পরিবারের সবাইকে নিশ্চয় কোতল করা হবে না, তাই না?’

‘মেয়েদেরকে হয়তো করা হবে না—তবে তাদের এমন দুরবস্থা করা যাবে যাতে ওরা চাকরের মতো ছোট কাজ করতে বাধ্য হয়। পুরুষগুলোকে কোতল করে আমি কোনো আনন্দ পাবো না, তবে দুর্বল চিত্ত মানুষদের উচিত নয় কখনও কাউকে ভয় দেখান, যদি তা ওরা পালন করতে পারবে না।’

একঘণ্টা পর ভাইবোন আবার একসাথে সকালের নাস্তা খেতে বসেছেন। আওরঙ্গজেব বেশ তৃপ্তির সাথে রুটি আর সব্জির তরকারি খাচ্ছিলেন, তবে জাহানারা পারছিলেন না। তিনি কেবল খাবারগুলো আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করে প্লেটের উপর চারপাশে ঘুরাচ্ছিলেন আর আঙুল দিয়ে রুটির টুকরাগুলো ছিঁড়ছিলেন। আওরঙ্গজেবের বিজয় পরিকল্পনা আকবর আর সাম্রাজ্যকে কোথায় নিয়ে ফেলেছে সেকথা ভেবে তার মনে যে দারুণ দুশ্চিন্তা চলছে, সে এ অবস্থায় কেমন করে মুখে খাবার তুলবেন। এমন সময় ওয়াজিম খান কামরায় ঢুকতেই তিনি মুখ তুলে তাকালেন। এই মিষ্টভাষী চক্রান্তকারী লোকটিকে তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন। সে তার ষড়যন্ত্রমূলক পরামর্শগুলো দিয়ে তাঁর ভাইয়ের সন্দেপ্রবণ মনে একটি আস্থার আসন গড়ে তুলেছে। এখন সে অর্ধেক পোড়া কতগুলো কাগজ হাতে নিয়ে গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

‘জাঁহাপনা এগুলো আপনার দেখা দরকার। আমার লোকেরা আপনার ছেলের পরিত্যক্ত তাঁবুতে এগুলো খুঁজে পেয়েছে। আমার মনে হয় শাহজাদা খুব তাড়াহুড়া করে চলে যাওয়ার সময় এগুলো পুরোপুরি পুড়াতে পারেন নি।’

‘কি এগুলো?’

‘তার কাছে লেখা তার বোন জেবুন্নিসার চিঠি।’

জাহানারার শীর্ণ শরীরের মধ্য দিয়ে একটি শীতল স্রোত বয়ে গেল।

নিচু যে খাওয়ার টেবিলে বসে ভাই-বোন নাস্তা খাচিছলেন, আওরঙ্গজেব সেখান থেকে উঠে হাত বাড়িয়ে বললেন, ‘দেখি চিঠিগুলো।’ ইদানীং তিনি গলায় একটা সবুজ ফিতায় চশমা ঝুলিয়ে রাখেন। কম আলোয় কোনো কিছু পড়তে হলে এই চশমাটি ব্যবহার করতেন, আজও সে প্রয়োজন হওয়ায় চশমাটি উঠিয়ে চোখে লাগালেন। কয়েকমুহূর্ত পর চিঠিগুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে বললেন, ‘আরো বিশ্বাসঘাতকতা। আর এমন এক জায়গা থেকে যা কখনও আশা করি নি!’

ব্যাপারটা অনুমান করতে পারলেও জাহানারা যন্ত্রের মতো জিজ্ঞেস করলেন, ‘জেবুন্নিসা চিঠিতে কি লিখেছে?’

‘সে আকবরকে তার বিদ্রোহে সমর্থন আর উৎসাহ দিয়ে তার বিজয় কামনা করেছে।’

জেবুন্নিসা যে এরকম ধারণা পোষণ করছে তা জেনে জাহানারা অবাক হলেন না। তাঁর ভাইঝি আকবরের অনেক সহিষ্ণু মতবাদের অংশীদার ছিল, যা তাঁর নিজের মতবাদগুলোরও বেশ কাছাকাছি। তবে বোকার মতো তার বিদ্রোহে উৎসাহিত করা ঠিক হয় নি, আবার কাগজে-কলমে লিখে তা জানান দিয়েও আরো বোকামি করেছে। আওরঙ্গজেবের চোখে এখন যে আগুন জ্বলছে, কি বলে তা উপশম করবেন? তারপরও বললেন, 'ভাই, জেবুন্নিসা খুবই বোকা একটি মেয়ে—না, তার চেয়েও বেশি, নিজের ভাইকে উৎসাহ দিয়ে সে আপনার অবাধ্য হয়েছে—তবে দয়া করে তার প্রতি বেশি কঠোর হইও না। তুমি জান আর আমিও জানি, আমাদের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকলেও ভাই-বোনের ভালোবাসার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। যে কারণে রওশনআরা বাবার বিরুদ্ধে তোমার সাথে হাত মিলিয়েছিল। এখন যদি তুমি মনে কর রওশনআরা ঠিক কাজই করেছিল, তাহলে হয়তো এখন তুমি বুঝতে পারছো তিনি তখন কি অনুভব করছিলেন।'

ভাই-বোনের ভালোবাসার সম্পর্কেও কথা শুনে তার ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু জেবুন্নিসার সাথে রওশনআরার তুলনা করায় তাঁর ভ্রু কুঁচকে উঠলো। এই তুলনাটি করা হয়তো তার ঠিক হয় নি, তবে না করেও পারেন নি। এখন যদি তিনি তার উদ্দেশ্যে সফল হতে চান, তাহলে তাকে অন্য রাস্তা ধরতে হবে। কাজেই আবার বললেন, 'আমরা হয়তো ঘটনার পুরোপুরি বিবরণ না জেনেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছি যে, সে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাদের বাবা একবার ভুল করে নিকোলাস ব্যালেন্টাইন নামে একজন ইংরেজের সাথে আমার সম্পর্ক নিয়ে দোষারূপ করে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়ে আমাকে গৃহবন্দী করেছিলেন। তুমি অন্তত জেবুন্নিসাকে ডেকে তার কথাটাও শোন।'

'না, এই চিঠিগুলোতেই তার অপরাধ পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে।' তারপর এক মুহূর্ত পর বললেন, 'বোন, তাকে দেখলে হয়তো আমার মন নরম হয়ে যাবে আর তাতে আমি সঠিক এবং ন্যায় বিচার করে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবো না। কারণ সঠিক শাস্তি হলে তা ভবিষ্যতে কাছের বা দূরের কোনো নারী কিংবা পুরুষ আত্মীয় যদি বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভাবে তাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'

জাহানারা আর কিছু বললেন না। আর বলেই বা কি লাভ? তাঁকে এখন মেনে নিতে হবে, জেবুন্নিসা আর রাজপরিবারের অন্যান্য মহিলা নিয়ে তিনি আকবরের পক্ষে ওকালতি করার যে আশা করেছিলেন তা এখন ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

দুই দিন পর আবার জাহানারা আর আওরঙ্গজেব এক টেবিলে খেতে বসলেন। তিনি জাহানারা আর মুয়াজ্জমকে তাঁর সাথে খাবার খেতে ডেকেছিলেন। মুয়াজ্জম সেদিন সকালেই পাঁচশো অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে দুর্গে পৌঁছেছিল। আকবরের বেশির ভাগ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে শোনার পর তিনি আকবরকে ধরার জন্য নতুন করে একটি সৈন্যদল গঠন করছিলেন। আর আকবরকে লেখা জেবুন্নিসার চিঠিটা পড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে হাতির পিঠে একটি চারদিক বন্ধ হাওদায় চড়িয়ে আজমির থেকে গোয়ালিয়রে কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। ক্রন্দনরত ভাতিজিকে বিদায় দেওয়ার সময় জাহানারা তাকে চুমু খেয়ে ফিসফিস করে বললেন যে, তার বাবা যাতে তাকে ক্ষমা করেন সেজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। সেই সাথে তার হাতে একটি সুফি কিতাবও গুঁজে দিলেন এই আশায় যে হয়তো এটা পড়ে সে মনে সান্ত্বনা পাবে। তারপর শীঘ্র তিনি আওরঙ্গজেবকে অনুরোধ করবেন জেবুন্নিসার পছন্দের ব্যক্তিগত কিছু জিনিসপত্র তার কাছে পাঠিয়ে দিতে যাতে তার কারাবাস একটু সহনীয় হয়।

তাঁর নিজের খাওয়ার রুচি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে জেবুন্নিসার ব্যাপারটি জানার পর থেকেই তিনি মুখে প্রায় কিছুই দেন নি আর সামান্য যা কিছু খেয়েছিলেন, সাথে সাথে তা বমি করে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি শুনেছিলেন সেনা কর্মকর্তারা বলাবলি করতো যে, তাদের দুর্বল চিত্তের সৈন্যরা যুদ্ধের কথা শুনলেই আক্ষরিক অর্থেই অসুস্থ হয়ে পড়তো। তিনিও নিশ্চয়ই আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—তবে সেটা যুদ্ধের ভয়ে নয়, তিনি অসুস্থ হয়েছেন তাঁর পরিবারের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তাঁর এই আতঙ্ক যাতে সত্যি সত্যি বাস্তবরূপ লাভ না করে, সেজন্য তাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে তা থামাতে। প্রকৃতপক্ষে একটু হলেও সে চেষ্টা করবেন।

প্লেটে যে সামান্য ডাল আর খাসির মাংসের কাবাব ছিল, তা ছুঁয়েও দেখেন নি। মুখ তুলে দেখলেন আওরঙ্গজেব খাওয়া শেষ করে একটি সুতির কাপড় দিয়ে মুখ মুছে পাশের প্লেটে রাখছেন। তারপর তিনি মুয়াজ্জমের দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি যে এত তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে পৌঁছতে পেরেছ সেজন্য আমি তোমাকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর সেই সাথে মারওয়াড়ে যে সফল অভিযান করেছ সেই জন্যও।'

মুয়াজ্জম মৃদু হেসে বললেন, 'ধন্যবাদ, বাবা।' তবে আগে আওরঙ্গজেবের সাথে থাকলে তিনি যেরকম নরম হাসি দিতেন আজকের হাসিটি সেরকম মনে হল না।

'এখন আমি চাই তুমি তোমার রাজভক্তি আরেকবার প্রমাণ কর। তুমি সেই বিশ্বাসঘাতক আকবরের খোঁজে গিয়ে তাকে ধরে দিল্লি নিয়ে আসবে। যদি তাকে ধরার জন্য মেরেও ফেলতে হয় তবে, সমস্ত মর্মযন্ত্রণা ঝেড়ে ফেলে তাই করবে। সে জীবিত থাকলে যে রকম তাকে সারা দিল্লি ঘুরিয়ে দেখাতাম সেরকম তার লাশও তাই করতে পারবো।'

আতঙ্কে জাহানারা জমে গেলেন। মুয়াজ্জমের চেহারাও বদলে গেল আর তার কপালে একটি শিরা দপ দপ করতে লাগলো। সে বললো, 'ঠিক আছে। তবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো যাতে সে আত্মসমর্পণ করে। তাকে আমি মারতে চাই না...সে আমার ভাই।'

'তুমি ভুল বলছো। সে আর তোমার ভাই নয়। জেবুন্নিসার মতো তার কার্যকলাপ তাকেও পরিবারের বাইরে নিয়ে গেছে।'

মুয়াজ্জম মাথা নিচু করে টেবিলের উপর থরে থরে সাজান নানারাকম সুস্বাদু খাবারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি আপনার নির্দেশ পালন করবো, যেরকম মারওয়াড় আর অন্যান্য জায়গায় করার চেষ্টা করেছি।'

'ভালো। এবার যাও প্রস্তুতি নিতে শুরু কর, যাতে আকবরের খোঁজে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেতে পার।'

মুয়াজ্জম উঠে দাঁড়াল, একটু ইতস্তত করে তার বাবার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে তারপর বের হয়ে গেল।

জাহানারাও উঠলেন। লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুসরণ করে দরজা পর্যন্ত গিয়ে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। গালে চুমু খাওয়ার সময় ফিস ফিস করে কানে কানে বললেন, '*আমার জ্যোতিরে, তোমার নিজের জন্য আর সেই সাথে তোমার ভবিতব্যের জন্য বলছি অতি-উৎসাহী হইও না। সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে প্রস্তুতি নিতে থাক আর সেভাবে ভাইয়ের খোঁজেও যাও।*'

চলে যাওয়ার সময় মুয়াজ্জমের চেহারায় স্বস্তি ফিরে এল। উভয়সঙ্কটে পড়ে সে মনে যে কষ্ট পাচ্ছিল, তার ফুফুর কথায় তার একটা সমাধান খুঁজে পেল।

হাতের পিঠে ভ্রু থেকে ঘাম মুছে আকবর ঘোড়ার পাদানিতে দাঁড়িয়ে জঙ্গলঘেরা নদীর তীরের ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের উপর দিয়ে ওপারে তাকিয়ে বললো, 'আমার মনে হয় দিনের আলো এখনও যথেষ্ট আছে, কাজেই আমরা সহজেই নদী পার হয়ে তারপর রাতের জন্য তাঁবু খাটাতে পারি, কি বল জগিন্দর?'

জগিন্দর সায় দিয়ে বললো, 'আমাদের চরেরা বলেছে নদীর পার খুব বেশি খাড়া নয় আর এসময়ে নদী প্রায় শুকনো থাকায় সহজেই পার হওয়া যায়।'

আকবর মৃদু হেসে বললেন, 'ঠিক আছে চল এগিয়ে যাই।' দ্রুত দক্ষিণ দিকে যাওয়ার সময় সে আর জগিন্দর বেশ কাছাকাছি হয়েছে। আকবরের সেনাবাহিনীর যে কজন সৈন্য তার সাথে রয়ে গিয়েছিল আর জগিন্দরের বাবা, আম্বারের রাজা তাদের সাথে যে ৫০০ রাজপুত অশ্বারোহী সেনা তাদের সাথে দিয়েছিলেন সবাই মিলে ওরা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। আকবরের সেনাদলটি এখন বেশ ছোট হলেও সে নিঃসন্দেহ হয়েছে যে, এরা তার প্রতি বিশ্বস্ত। কেননা মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার অনেক সুযোগ পেলেও ওরা চলে যায় নি। গৃহীত দায়িত্বের প্রতি তাদের অঙ্গীকার আর একতার কারণে ওর বাবা ওদের পেছনে যে সেনাদলকে পাঠিয়েছিলেন ওরা তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। কয়েকদিন আগে আকবর সম্ভাজির কাছে একজন দূত পাঠিয়েছিলেন, সে ফিরে এসে খবর দিয়েছিল যে, মারাঠা রাজা দাক্ষিণাত্যে এসে ওদের সাথে যোগ দিয়ে আওঙ্গজেবের বিরুদ্ধে সবার সাথে লড়বেন। এই খবরে আকবরের সৈন্যদের মনোবল আরো বেড়ে যায়।

সম্ভাজি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, *সবাই মিলে আমরা তাকে দেখিয়ে দেব যে, হিন্দুস্তানের বৃহত্তর স্বার্থে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে একসাথে কাজ করতে পারে।* এ ধরনের একজন শাসক, যিনি তারই মতো মনোভাব পোষণ করছেন তাকে তার মিশনের অংশীদার করাটা কত চমৎকার হবে। যখন সময় হবে, তখন সম্ভাজি আর সেই সাথে জগিন্দরের বাবার সমর্থন তিনি আবার অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলোকেও তার সমর্থনে বিদ্রোহে জেগে উঠতে রাজি করাতে পারবেন। এরপর ওরা সবাই মিলে সাম্রাজ্যের অন্যান্য করদ রাজ্যগুলোর মধ্য থেকেও আরো মিত্র আকর্ষণ করতে পারবেন। আর তার গোঁড়ামিপূর্ণ বাবার সাথে যেসব রাজ কর্মকর্তা আর সেনাপতির নামকাওয়াস্তে সমর্থন রয়েছে তাদেরকেও প্রলুব্ধ করে দলে টানা যেতে পারে। তবে এখনই পরে কি হবে সে চিন্তা করার দরকার নেই। তার প্রথম কাজ হবে সম্ভাজির সাথে এক জায়গায় মিলিত হয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কটি সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

'জগিন্দর তুমি পঞ্চাশজন রাজপুত যোদ্ধা নিয়ে নদী পার হয়ে তীরের একটু দূরে খুঁটি পুতে ফেল। তারপর আমরা নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটি রশি টেনে নেব। এতে আমাদের লোকজন আর দুর্বল ঘোড়াগুলোর নদী পাড় হওয়া সহজ হবে।'

জগিন্দর সাথে সাথে পেছন ফিরে একজন কনিষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাকে ডেকে তার লোকজনসহ তাকে অনুসরণ করতে বললো। তারপর সে ঘোড়া ছুটিয়ে

ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে নদীর তীরের দিকে চললো। পনেরো মিনিটের মধ্যে একজন রাজপুত জগিন্দরের কাছ থেকে বার্তা নিয়ে এল প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, এখন মূল সেনাদল নদী পাড় হওয়া শুরু করতে পারে। আকবর সাথে সাথে তার লোকদের নির্দেশ দিলেন পাঁচজন পাঁচজন করে পাশাপাশি হয়ে নদী পাড় হওয়া শুরু করতে।

চারপাশে দেহরক্ষী দল নিয়ে তিনি সারির আগে অবস্থান নিলেন। নদীর তীরের গাছের জঙ্গলে ঢুকতেই রাতের জন্য বাসায় ফেরা পাখিগুলো বিরক্ত হয়ে কিচিরমিচির করতে করতে শূন্যে ভাসলো। চর যেরকম জানিয়েছিল নদীর সেরকম পাড় বেশ মসৃণ আর নিচে নদীর বুকে ঘোড়ার খুরের নিচে শক্ত মাটি ছিল। নদীতে তিনফুট গভীর পানির স্রোত বেশ ধীর গতিতে বয়ে চলছিল। তিনি ঘোড়া নিয়ে নদীতে নামতেই একজোড়া সারস ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। একটু পরই তিনি নদীর ওপারে পৌঁছবেন আর তারপর ক্লান্ত শরীরকে বিশ্রাম দিয়ে কিছু খাবার মুখে দিতে পারবেন। একটানা সারাদিন ঘোড়ার পিঠে কাটিয়ে তার হাত-পায়ে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। তার ঘোড়াটি একটু হোঁচট খেয়ে মাথা ঝাঁকাতে শুরু করলো। সম্ভবত নদীর স্রোত পায়ে লাগতেই ঘাবড়ে গিয়ে একটু অসতর্ক হয়ে উঠেছিল। তিনি ঘোড়ার রাশ শক্ত করে ধরে সামনে ঝুঁকে ঘোড়াটির কানে সান্ত্বনাসূচক কথা বলতে শুরু করলেন। ঠিক তখনই কড়াৎ করে একটি আওয়াজের সাথে সাথে তার উরুতে হুল ফোটানোর মত যন্ত্রণা হল। তিনি হাত দিয়ে দেখলেন রক্ত বের হচ্ছে। কি ব্যাপার কী হচ্ছে? তার লোকদের বিশ্বস্ততা নিয়ে তিনি কি ভুল ধারণা করেছিলেন? তার বাবার নির্দেশে এক বা একাধিক লোক কি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল, সুযোগ পেলেই তাকে শেষ করে ফেলার?

না। আরো গুলির শব্দ হতেই তিনি খাপ থেকে তরোয়ালটি বের করলেন। তারপর হঠাৎ চিৎকার করতে করতে একদল অশ্বারোহী নদীর অপর তীরের জঙ্গল থেকে বের হয়ে ঘোড়াসহ ছুটতে ছুটতে নদীতে নেমে পড়লো এবং চারদিকে পানি ছিটিয়ে এসে তার লোকদের উপর আক্রমণ করলো। হামলাকারীদের সবার আগে একটি বাদামি ঘোড়ায় চড়ে মুখভরা দাড়ি নিয়ে একজন লোক তার হাতে ধরা পিস্তল দিয়ে একজন তরুণ রাজপুত অশ্বারোহীকে গুলি করলো। গুলির আঘাতে আহত হয়ে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে মুখ থুবড়ে নদীর অগভীর পানিতে পড়ে গেল। আকবরের একজন দেহরক্ষী তার দিকে ঘোড়া ছুটাতেই সে পিস্তলে আবার গুলি না ভরে, উল্টো করে ধরে কয়েকফুট দূরে থাকতেই দেহরক্ষীটির দিকে ছুঁড়ে মারলো। পিস্তলের ভারী

ইস্পাতের বাট দেহরক্ষীর ঘোড়াটির চোখের মাঝখানে আঘাত করলো। যন্ত্রণায় চিঁহিহি চিৎকার করে ঘোড়াটি সামনের দুই পা তুলে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হতেই তার আরোহী সমেত পাশের দেহরক্ষীকেও পানিতে ফেলে দিল। তারপর কোনোমতে চার পায়ে খাড়া হয়ে গা ঝাড়া দিয়ে যন্ত্রণায় তখনও চিঁহিহি করতে করতে নদী থেকে উঠে ছুটে পালাল।

দাড়িওয়ালা হামলাকারীটি এবার তার তরোয়াল কোষমুক্ত করে আকবরের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছিল। 'আওরঙ্গজেব জিন্দাবাদ—সকল বেঈমান নিপাত যাক' চিৎকার করতে করতে সে উন্মত্তের মতো আকবরের দিকে তরোয়াল চালাল। আকবর দ্রুত তার তরোয়াল তুলে তার হামলা ঠেকালেন আর তারপর লোকটি আবার তাল সামলিয়ে আবার আক্রমণ করার আগেই আকবর তার তরোয়ালের ডগা লোকটির বগলের কাছে সেঁধিয়ে দিলেন। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরা সত্ত্বেও হামলাকারী আবার আক্রমণ করার চেষ্টা করলো। তবে রক্তক্ষরণের কারণে সে দুর্বল হয়ে পড়ছিল আর এবার আকবর বেশ সহজেই তার তরোয়াল তার পেটে ঢুকিয়ে দিতেই সে ঘোড়ার পিঠ থেকে উল্টে নদীতে পড়ে গেল।

আকবর চতুর্দিকে চিৎকার, ইস্পাতের পাতের ঠোকাঠুকি আর মাঝে মাঝে পিস্তল আর গাদা বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। তারপর হঠাৎ তার ঘোড়াটি সামনের দুই পা শূন্যে তুলে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হতেই তিনি ঘোড়ার জিন থেকে পেছনের দিকে হড়কে পড়লেন। দুই হাত শূন্যে তুলে পানিতে পড়লেও তরোয়ালের বাট হাতেই ধরে রাখলেন। ঘোড়ার খুরের আঘাত এড়াতে তিনি নদীর কাদাভরা তলদেশে পা রেখে দাঁড়াতে চেষ্টা করতে লাগলেন। হঠাৎ তার চোখে পড়লো প্রায় দশ ফুট দূরে পানির উপরে বড় বড় দুটো হলুদ চোখ তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পানিতে মানুষ আর পশুর রক্তের গন্ধ পেয়ে একটি কুমির ত্রিমুখী ধারালো চোয়াল হা করে তার ঘোড়ার পা কামড়ে ধরতে ব্যর্থ হল। এটা দেখেই হয়তো তার ঘোড়াটি ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিল। এবার কুমিরটি আবার চোয়াল হা করে তার দিকে ভেসে এল। সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আকবর দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে তার তরোয়ালের ডগা কুমিরের দাঁতের মাঝে গলায় বিঁধিয়ে দিলেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করলো। কাটাওয়ালা লেজটি পানিতে কয়েকবার ঝাপটিয়ে কুমিরের দেহ স্থির হল। তবে আরেকটি কুমির ভেসে আসতেই তিনি আবার তরোয়াল দিয়ে কোপ মারতেই কুমিরটি ঘুরে চলে গেল।

তারপর পেছনে চিৎকার চেচামেচির সাথে অনুভব করলেন দুটো বলিষ্ঠ বাহু তাকে জাপটে ধরে পেছনের দিকে টেনে নিচ্ছে। জগিন্দর তার একজন

দেহরক্ষীকে সাথে নিয়ে আবার ঘোড়সহ নদীতে নেমে তাকে টেনে তীরের দিকে নিতে চেষ্টা করলো। তীরে পৌঁছে কোনোমতে নিজেকে সামলে খাড়া হলেন, সারা শরীর থেকে পানি ঝরছিল। হাতে তখনও তরোয়ালটি ধরা ছিল, চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন আর কোনো ঘোড়া পাওয়া যায় কি-না যাতে লড়াইটি চালিয়ে যেতে পারেন। তবে হামলাকারীরা তখন ঘোড়া ছুটিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে পালাতে শুরু করেছে আর আকবরের কিছু সেনা তাদের পিছু পিছু ছুটছে। নদীর পানি রক্তে লাল হয়ে রয়েছে আর কয়েকটি দেহ পানিতে ভাসছিল। তিনি লক্ষ করলেন একটি কুমির ধীরে একটি মানুষের দেহের দিকে এগিয়ে মুখ হা করে উরু কামড়ে ধরলো। সাথে সাথে প্রচণ্ড আর্তচিৎকার শোনা গেল। লোকটি তখনও জীবিত ছিল। কুমির তাকে পানির নিচে টেনে নিতেই সে ব্যর্থভাবে পানিতে হাত ছুঁড়তে লাগলো। তবে আল্লাহকে ধন্যবাদ, লোকটি শীঘ্রই মারা যাবে। তার জন্য করার কিছুই নেই, তবে অন্য কেউ বেঁচে থাকলে তাদেরকে সাহায্য করতে হবে।

'কারও কাছে শুকনো পিস্তল কিংবা গাদা বন্দুক থাকলে এই বিভৎস পশুগুলোকে গুলি করে মার। আর অন্যরা কেউ জীবিত থাকলে তাদেরকে উদ্ধার কর।' তিনি নিজে দৌড়ে নদীতে নেমে রশি ধরে সাঁতার কেটে একটি লোকের কাছে গেলেন। লোকটি দুর্বলভাবে হেঁটে তীরের দিকে আসার চেষ্টা করছিল। তখনও সে বারো ফুট দূরে ছিল। লোকটির বাড়িয়ে ধরা এক হাত জাপটে ধরে তিনি তাকে পাড়ের দিকে টেনে নিয়ে চললেন, এমন সময় একটা গুলির শব্দ শোনা গেল আর এক মানুষ দূরত্বে নদীর পানি ঘুরতে শুরু করলো। একটা বড় কুমির সবার অজান্তে এগিয়ে আসছিল, তবে পাড় থেকে একজন রাজপুত সেনার নজর এড়াতে পারে নি। সে সবার আগে তীরে উঠায় তার গাদা বন্দুক আর বারুদ শুকনো ছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আকবর যে লোকটিকে বাঁচিয়েছিলেন তাকে টেনে নিয়ে তীরে উঠলেন। লোকটাকে তিনি চিনতে পারলেন না, তার পরনে ছিল মোগল সৈন্যদের সবুজ পোশাক। তার মানে সে নিশ্চয় হামলাকারীদের একজন। তার বাহুর উপরের অংশে একটি গভীর ক্ষত হয়েছে, চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে লাল মাংসপেশির নিচে সাদা চর্বি দেখা যাচ্ছিল। কয়েকবার নোংরা পানি বমি করে ফেলার পর সে ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগলো। আকবর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন আমাদের উপর আক্রমণ করেছ?'

'এখান থেকে দশ মাইল দূরে একটি মোগল ঘাঁটিতে আমরা ছিলাম। আমাদের অধিনায়ক সম্রাটের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। আপনার এদিকে আসার খবর

পেয়ে পুরস্কার পাওয়ার আশায় তিনি আমাদেরকে অতর্কিতে আপনাদের উপর আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন।' এখন লোকটি পানি থেকে উঠে আসার পর তার ক্ষত থেকে রক্ত উপচে উঠছিল, সারা শরীর কাঁপতে শুরু করলো। সে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন আপনি আমাকে কি করবেন?'

'আমার হেকিমকে ডেকে তোমার ক্ষতস্থানে সেলাই করে পট্টি বেঁধে দিতে বলবো, তারপর তোমাকে মুক্ত করে দেব যাতে তুমি সম্রাটের কাছে ফিরে গিয়ে বলতে পার—যে ছেলেকে তিনি অধঃপতিত আর জঘন্য নীচ ব্যক্তি বলেছেন, সে তোমার জীবন বাঁচিয়েছে। আর এও জানাতে পার এর আগে আমার জীবন বাঁচিয়েছিল একজন হিন্দু রাজপুত আর একজন মুসলিম দেহরক্ষী। তাকে জানাবে এতে বুঝা যায়, যারা হিন্দুস্তানে বসবাস করে, তারা কেমনভাবে একসাথে মিলেমিশে কাজ করতে পারে আর আবার করবে যখন আমি তার বদলে সিংহাসনে বসবো।'

এবার আকবর ঘুরতেই টের পেলেন তার উরুর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচে পায়ের জুতা পর্যন্ত পড়ছে। তাকেও হেকিমের কাছে যেতে হবে। তিনি জানেন এভাবে একজন সৈন্যকে মুক্ত করে দিয়ে তার কাছে সাম্রাজ্যের ঐক্যের বিষয়ে একটি বার্তা দেওয়া সহজ এবং জনপ্রিয় হলেও তার লক্ষ অর্জন থেকে তিনি এখনও অনেক, অনেক দূরে। যতদিন তার বাবা বেঁচে আছেন তাকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। তিনি কেবল যা সঠিক বিশ্বাস করেন তার জন্য চেষ্টা করে যাবেন। কতদূর সফল হবেন তা অনেকাংশে নির্ভর করছে সম্ভাজির সাথে মৈত্রির উপর। তাকে এটা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

অধ্যায় চৌদ্দ

বিদায় ভাই

'আমার কাছে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। আমার সবচেয়ে প্রশিক্ষিত এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সেনাদলের অধিনায়কত্ব তোমাকে দিয়েছিলাম। অনেক আগেই তোমার বিশ্বাসঘাতক ভাইয়ের বিরুদ্ধে তোমার বিজয় এবং তার মৃত্যু কিংবা তাকে বন্দী অবস্থায় দেখে আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতে চেয়েছিলাম। তবে আমি আশা করি নি যে, তুমি তাকে তার সৈন্যসহ ময়দানে মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিয়ে আজমির ফিরে আসবে। কেন এটা করলে? দিওয়ান-এ-আমে যারা উপস্থিত হয়েছেন, তাদের মনের ভাবনা মুয়াজ্জম অনুভব করতে পারলো। সন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও তার বাবা সকল উপদেষ্টা আর সেনাপতিদের এখানে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেন তার বাবা এভাবে তাকে হেনস্থা করছেন? তাকে অন্তত কাদামাখা পোশাক বদলে আসার সুযোগ দিতে পারতেন। আর এভাবে সমস্ত সভাসদদের সামনে তাকে হাজির করারই বা কি দরকার ছিল? যেন তিনি তাঁর ছেলে নন, লজ্জাজনক কাজ করা কোনো কর্মকর্তা। পাঁচমাস হল তিনি বাইরে কাটিয়েছেন। এমন অবস্থায় যেকোনো বাবা প্রথমে একান্তেই দেখা করার কথা।

সোনার পাতে মোড়া একটা নিচু সিংহাসনে আওরঙ্গজেব পিঠ খাড়া করে গ্র্যানাইট পাথরের মতো মুখ নিয়ে তার সামনে বসেছিলেন। চিবুক উঁচু করে মুয়াজ্জম তার বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাবা আমি আপনাকে আমার বার্তাবহের মাধ্যমে জানিয়েছিলাম যে, আমি খুব দ্রুত অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আকবর তার বাদবাকি সেনা আর রাজপুত মিত্রদের নিয়ে বেশ আগেই রওয়ানা দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। সেজন্য আমি গোলন্দাজ আর রসদবহর ছেড়ে দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ার নিয়ে আলাদা দলে ছুটেছিলাম। তবে অনেক দ্রুত ছুটেও তাদের নাগাল পাই নি। আমার অগ্রবর্তী চরেরা তাদের পদক্ষেপ অনুসরণ করছিল, তবে ওরাও আমাদের সব সময়

আমাদের দুই-তিনদিন দূরত্বে এগিয়েছিল। আমি ধারণা করেছিলাম, যেহেতু তার গুপ্তচরেরাও আমাদের গতিবিধি লক্ষ করছে, কাজেই যখন আমি আমার সেনাদলকে দুইভাগে বিভক্ত করলাম, তখন এ খবর পেয়ে আমার ভাই হয়তো পেছন ফিরে আমাদের উপর আক্রমণ করবে। কিন্তু সে হুঁশিয়ার হয়ে আমার টোপে পা দিল না।

'তারপরও আমি চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। মূল বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করে, তারপর তাদেরক নিয়ে সবাই মিলে তার পেছনে মারাঠা পাহাড়ি অঞ্চলের দিকে এগোলাম। কিন্তু আবহাওয়া বাদ সাধলো। দিনের পর দিন গরম বেড়েই চললো। স্থানীয়রা খুব বিরূপ আর অসন্তুষ্ট ছিল, আমাদেরকে আসতে দেখেই সমস্ত গবাদিপশু আর খাবার-দাবার নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগলো। সুপেয় পরিষ্কার পানি পাওয়া খুব কষ্টকর হয়ে পড়লো। আমার ভাইয়ের সৈন্যরা আর সম্ভবত স্থানীয় লোকজন অনেক কূপের পানিতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল কিংবা পানির ডোবায় মরা গবাদিপশু ফেলে রেখেছিল। এই দূষিত পানি পান করে আমার দেহরক্ষী দলের অধিনায়ক সাঈদ আজিজ বমি করতে করতে আর কাপড় ময়লা করে মারা যায়। আপনিতো জানেন সে কিরকম বলিষ্ঠ লোক ছিল।

'বৃষ্টি শুরু হতেই স্বস্তির বদলে আরো সমস্যা নিয়ে এল। জমিন কর্দমাক্ত হয়ে যাওয়ায় আমাদের চলার গতি ধীর হয়ে গেল। আমার শিবিরে আহ্নিক জ্বর আর অন্যান্য রোগ ছড়িয়ে পড়লো—হেকিম কিছুই করতে পারলো না। এরপর থেকে আমরা দৈনিক দুই তিন মাইলের বেশি চলতে পারলাম না। এরপর যখন দেখলাম আমার প্রায় অর্ধেক লোক অসুস্থ হয়ে পড়েছে আর অনেকে মারা গেছে, তখন সিদ্ধান্ত নিলাম এরপর আর অনুসরণ চালিয়ে যাওয়াটা অপরিণামদর্শী হবে। প্রাণহানির কথা ছেড়েই দিলাম। এ অবস্থায় আকবর আর মারাঠারা একত্রিত হয়ে উপরি আক্রমণ করলে আমার লোকেরা তা সামলাতে পারবে কি-না সে ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত হতে পারলাম না। কারণ ইতোমধ্যে আমি খবর পেয়েছিলাম যে, মারাঠারাও তার সাথে যোগ দিয়েছে। কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি উত্তরমুখি পিছু ফেরার নির্দেশ দিলাম। জানতাম আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট আর হতাশ হবেন, সেজন্য আমি আগেই রওয়ানা দিলাম যাতে যতদ্রুত সম্ভব ব্যক্তিগতভাবে সমস্তকিছু আপনাকে জানাতে পারি। আমার মূল বাহিনী আগামী মাসের মধ্যেই চলে আসবে। তখন আপনি নিজেই তাদের দুরবস্থা আর কতজন সংখ্যায় কমে গেছে দেখতে পারবেন। আপনার আদেশ পালন করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, তবে আমি দেখতে পেলাম কাজটা অসম্ভব আর বিনা কারণে আমার লোকেরা প্রাণ হারাচ্ছে।'

আওরঙ্গজেব স্থির হয়ে বসে রইলেন, তার চেহারা দেখে কিছুই বুঝা যাচ্ছে না কি ভাবছেন। মুয়াজ্জমের হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। তার বাবা কি কিছু অনুমান করতে পেরেছেন? আওরঙ্গজেব মানুষের মনের গভীরে ঢুকে তাদের মনের গূঢ়তম চিন্তাও খুঁড়ে বের করতে পারতেন। তবে সে অত্যন্ত সতর্ক ছিল...কাউকেই তার আসল উদ্দেশ্য বলে নি। তার ফুফুকে একটি শব্দও চিঠি লিখে জানায় নি যাতে আওরঙ্গজেবের সন্দেহ হতে পারে। দক্ষিণে এই দীর্ঘ যাত্রায় হেঁটে চলার সময় প্রত্যেকবার যখন তার রণ হস্তী এপাশ-ওপাশ দুলতো, তখন প্রতি দুলুনির সাথে তার ফুফুর ফিস ফিস করে বলা কথাগুলো তার মাথায় প্রতিধ্বনিত্ব হত। *আমার খাতিরে, তোমার নিজের জন্য আর সেই সাথে তোমার নিয়তির কথা ভেবে, বলছি অতি-উৎসাহী হইও না। সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে প্রস্তুতি নিতে থাক আর সেভাবে ভাইয়ের খোঁজেও যাও।'* আর সে তার কথা পালন করেছিল, কারণ তার নিজের মনেও সে তাই করতে চাইছিল। আকবর বোকা আর নিজের সম্পর্কে তার অত্যধিক উচ্চ ধারণা ছিল। কেন সে ভাবতে পারলো যে, তাই ভাইদের চেয়ে মোগল সিংহাসনে বসার অধিকার তার বেশি?—তবে আকবর রক্তপিপাসু কিংবা কঠিন মনের মানুষ ছিল না। আসলে সে ঠিক উল্টো ছিল, যদি সে সিংহাসন দখল করতেও চাইতো। তার বিশ্বাসই হয়না যে আকবরের পরিকল্পনা সফল হলে সে তাকে হত্যা করতো আর তিনি নিজেও তার ভাইয়ের হত্যাকারী হতে পারতেন না। তারপর সেই শুষ্ক, শ্বাসরুদ্ধকর গরম, তারপর মৌসুমি বৃষ্টির কারণে সারাক্ষণ ভিজে থাকা—এগুলোই তার অগ্রযাত্রা ধীর হওয়া আর তারপর ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যথেষ্ট অজুহাত ছিল। এছাড়া তার লোকজন আসলেও ক্লান্ত আর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

মুয়াজ্জমের পেছন থেকে বিচলিত হয়ে কেউ কেশে উঠলো আর তিনি অন্যদের পা ঘষারও শব্দ পেলেন, তবে আওরঙ্গজেব কিছুই বললেন না। অনেকক্ষণ চুপ থাকাটা তার বাবার একটি কৌশল। তিনি অসংখ্যবার তার বাবাকে এই কৌশল ব্যবহার করতে দেখেছেন...আর এতে লোকজন এত বিচলিত হয়ে পড়ে যে, তারা নিজেরাই নীরবতা ভেঙ্গে উল্টোপাল্টা কিংবা অর্থহীন কোনো কথা মুখ ফস্কে বের করে ফেলে। যার ফলে নিজেকে দোষারোপ করে কিংবা এমন কোনো দুর্বলতা প্রকাশ করে যার সুযোগটি নেন আওরঙ্গজেব। তবে তার বাবা তাকে ভয় দেখাতে পারবেন না। আর যদি তাকে সন্দেহও করেন, কোনো প্রমাণ পাবেন না।

অবশেষে আওরঙ্গজেব সিংহাসনে একটু নড়েচড়ে বসে সামনে ঝুঁকে বললেন, 'তুমি বলেছ, তোমার ক্ষমতানুযায়ী যথাসাধ্য চেষ্টা করেছ, কিন্তু তা আসলে কর

নি। যদি তাই করতে তাহলে, যে বিশ্বাসঘাতক নিজেকে আমার ছেলে বলে দাবি করতো, তাকে জীবিত অথবা মৃত আমার হাতে তুলে দিতে। বরং তুমি আমার মতো দাক্ষিণাত্য ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও তাকে আর রাজপুত বিশ্বাসঘাতকদেরকে তোমার হাত এড়িয়ে মারাঠিদের সাথে যোগ দেবার সুযোগ করে দিয়েছ। অভিযান সফল করতে তুমি যথেষ্ট নিশ্চিত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলে না। আরো খারাপ কি করেছ, আমার অনুমতি না নিয়ে অভিযান ছেড়ে চলে এসেছ। তুমি ছোট একটি যে বার্তা কাসিদের মারফত পাঠিয়েছিলে, তাতেই প্রথম আমি জানতে পারি যে, তোমার বাহিনী নর্মদা নদী পাড় হয়ে উত্তর তীরের দিকে আসছে।'

মুয়াজ্জম আবার বলতে শুরু করলেন, 'বাবা...' কিন্তু আওরঙ্গজেব একটি আঙুল তুললেন। এই আঙুলে এখন সব সময় তিনি তৈমুরের বাঘমুখের ভারী আংটিটি পরতেন। আর এটাই একমাত্র রত্ন যা তিনি ব্যবহার করতেন। মোমবাতির আলোয় সোনা চকচক করে উঠলো, তবে তার বাবার কালো চোখের দৃষ্টিতে কোনো ধরনের আবেগ অনুভূতির চিহ্ন নেই। তিনি সরাসরি তার ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। প্রতিরোধ করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হলেও, সেই চোখের প্রবল চাউনি এড়াতে না পেরে মুয়াজ্জম চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাতেই, আওরঙ্গজেব বললেন,

'আমি আবার বলছি, তুমি অতি সতর্ক ছিলে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য আমার কোন সেনাপতির মধ্যে আমি সহ্য করতে পারি না, ছেলে হলে তো কোনো কথাই নেই। আমার মনে একটা অনুকূল ধারণা সৃষ্টি করার এটা তোমার জন্য একটা সুযোগ ছিল, কিন্তু তুমি প্রমাণ করেছ যে, একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেবার মতো মেধা কিংবা সাহস তোমার মধ্যে নেই। সাম্রাজ্য শাসন করাতো দূরের কথা।'

এই কথাটার মানে কি? তার বাবা কি এতদিন তাকেই তাঁর উত্তরাধিকার মনে করতেন আর এখন মত বদলেছেন? এনিয়ে মুয়াজ্জম আর কিছু চিন্তা করার আগেই আওরঙ্গজেব আবার বলে চললেন, 'আমি তোমাকে তোমার বর্তমান অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দিচ্ছি আর তোমার সাধারণ মানের যোগ্যতানুযায়ী কম গুরুত্বপূর্ণ পদ দেব। এখন আমি দেখছি একমাত্র উপায় হল আমার অপরাধী ছেলের পেছনে অভিযানের নেতৃত্ব একমাত্র আমাকেই দিতে হবে। এখন তুমি যাও। তোমার ব্যাপারে কিছু একটা সিদ্ধান্ত নেবার পর তোমাকে জানাব।'

যাওয়ার জন্য ঘুরতেই মুয়াজ্জমের মনে হল দেয়ালের গায়ে স্থাপন করা জাফরির পেছনে তিনি এক নজর কারও চোখ কিংবা একটি মুক্তার মৃদু ঝলক

দেখতে পেলেন। এখানে বসেই জাফরির ফাঁক দিয়ে রাজপরিবারের মহিলারা দরবারের কার্যকলাপ দেখে থাকেন। তার ফুফু জাহানারা কি তাকে লক্ষ করছিলেন? যদি দেখে থাকেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন যে, মুয়াজ্জম ফিসফিস করে বলা তাঁর অনুরোধকে সম্মান দিয়েছে। আকবরকে খুঁজে বের করার অভিযানে তিনি আসলে ধীরগতি ছিলেন।

আওরঙ্গজেবের গালের কিনারায় আলতো করে হাত বুলিয়ে উদিপুরী মহল মৃদু হেসে বললেন, 'আপনার সাথে যেতে পেরে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আপনি জানেন যখন আপনি আমাকে ফেলে কোথাও যান তখন আমার খুব খারাপ লাগে।' এতবছর পার হওয়ার পরও তিনি এখনও যথেষ্ট সুন্দরী। মাঝে মাঝে আওরঙ্গজেব ভাবতেন সাটিনের মত তার নমনীয় দেহ ধরে তিনি যে আনন্দ পান সেটা কি কোনো পাপ আর তার হয়তো ঘন ঘন উদিপুরী মহলের সাথে দেহমিলন করাও ঠিক না। প্রথম যখন তিনি তাকে তার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তখন উদিপুরী মহল যেরকম ভালোবাসতেন, এখনও আওরঙ্গজেবের প্রতি তার ভালোবাসা তেমনি উজ্জ্বল আর সেরকমই আন্তরিক। সেজন্যই তিনি তাকে আজমিরে ফেলে রেখে যেতে পারছেন না...এক আল্লাহই জানেন, সামনে যুদ্ধ মোকাবেলা করার সময় তার নিঃশর্ত আর প্রশ্নাতীত ভালোবাসার প্রয়োজন তিনি কতটা অনুভব করেন।
উদিপুরী তাঁর গায়ের সাথে আরো চেপে বসতেই তিনি তার নরম স্তনের স্ফিতি অনুভব করলেন, তবে এখন দেহমিলনের সময় নয়। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে মুয়াজ্জমের অসমাপ্ত অভিযানে বের হতে হবে। তার ছেলেকে ধরে আনতে হবে আর মারাঠিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লাভ করতে হবে। তিনি নিচু হয়ে তার রক্তিম মুখে চুমু খেয়ে বললেন, 'আমাকে এখন যেতেই হবে। যাওয়ার আগে অনেক কিছু করা বাকি আছে। তবে আমার খুব ভাল লাগে যখন মনে হয় প্রতিদিন বেলাশেষে ফিরে এসে দেখবো হেরেম তাঁবুতে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করছো।'
কামরা থেকে বের হয়ে হেরেম মহলের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে তার মাথায় চওড়া ব্যাসের নলের নতুন কামানের কথাটা ঘুরপাক খেতে থাকলো। তাকে নিশ্চিত করতে হবে যে, এগুলো ঠিকমত গাড়িতে তোলা হয়েছে কি-না, নয়তো এগুলোর সামনের নমনীয় অংশ ভেঙ্গে যেতে পারে। জাহানারার কামরার কাছে পৌঁছতেই দেখলেন দরজা খোলা আর একজন পরিচারিকা বাইরে দাঁড়িয়ে

রয়েছে। তাঁকে দেখে সে বললো, ‘জাঁহাপনা, আপনার বোন জিজ্ঞেস করেছেন হেরেম থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগে তিনি কি আপনার সাথে একবার দেখা করতে পারবেন?’

‘অবশ্যই’, একথা বলে আওরঙ্গজেব চন্দনকাঠের দরজার মধ্য দিয়ে জাহানারার ঘরের দিকে এগোলেন। সত্যি বলতে কি গত কয়েক সপ্তাহ তিনি তাঁর সাথে একা সাক্ষাৎ করা এড়িয়ে চলছিলেন। আকবরের বিদ্রোহ নিয়ে তিনি আর কোনো কথা বলেন নি, তবে যখনই তাঁর সাথে দেখা হত তিনি লক্ষ করতেন তাঁর মুখ দেখে মনে হত তিনি খুব কষ্টে আছেন, কেমন যেন ভূতুড়ে চেহারা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিরক্তবোধ করতেন। আওরঙ্গজেব যা করতে যাচ্ছেন কেন তিনি তার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে চেষ্টা করছেন না, শুধু নিজের যুক্তি নিয়ে বসে আছেন?

জাহানারা একটি বিবর্ণ রঙের শাল গায়ে দিয়ে জানালার ধারে বসেছিলেন। আওরঙ্গজেব ঘরে ঢুকতেই তিনি তার হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা লাঠিতে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন।

‘না, না, আমার জন্য ওঠার দরকার নেই।’

জাহানারা আবার বসে পড়লেন, তারপর বললেন, ‘এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও যে আমার সাথে দেখা করতে এসেছ সেজন্য বেশ ভালো লাগছে। কখন রওয়ানা দিচ্ছ?’

‘সবকিছু ঠিকঠাক করার পর তিন-চার ঘণ্টার মধ্যেই রওয়ানা দেব।’

‘দূরে যাচ্ছ, সেজন্য আমি তোমার জন্য দোয়া করবো, তবে একটা ব্যাপার তোমাকে আমার বলা দরকার। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি অনুভব করছি যে, আমি কমজোর হয়ে যাচ্ছি।’

‘এর মানে কি? আপনি কী অসুস্থ? কেন আমাকে জানান নি? হেকিমকে ডেকে আনাবো?’

জাহানারা মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বললেন, ‘আমার তেমন অসুখ হয়নি যা হেকিম ভাল করতে পারে...আমি অসুস্থ নই তবে খুব ক্লান্ত। আওরঙ্গজেব... জীবন নিয়ে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অনেকসময় সকালে ঘুম থেকে ওঠারও শক্তি থাকে না।’

‘আপনি যাই বলেন, আমি হেকিমকে পাঠাচ্ছি। তাদের কাছে নিশ্চয়ই এমন দাওয়াই আছে, যা আপনাকে শান্ত করে দেহে শক্তি দিতে পারে। আল্লাহর ইচ্ছায় আমার অভিযান বেশি সময় নেবে না। আর আমি আজমিরে ফিরে এলেই আপনি ভালো হয়ে যাবেন।’

'হয়তো তাই, তবে আমার মন বলছে আর হয়তো আমাদের এ পৃথিবীতে দেখা হবে না।'

আওরঙ্গজেব অনুভব করলেন তার তলপেট খামচে ধরেছে। তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তিনি তাঁর একহাত ধরলেন। শুষ্ক পাতলা চামড়ার নিচে হাড় মনে হচ্ছে পাখির মতো ভঙ্গুর। তিনি বললেন, 'বোন, কে কতদিন বাঁচবে আল্লাহ তা কাউকে জানার অনুমতি দেন নি।'

'আমি সেটা জানি। তবুও আমার কথা যদি ঠিক হয় সেজন্য বলছি, যদি আর কখনও সুযোগ না পাই, সেজন্য কিছু কথা তোমাকে বলতে চাই। না, আমার কথা থামিয়ে দিও না। তোমাকে শুনতেই হবে, আমার জন্য না হলেও আমাদের মায়ের জন্য, যিনি আমাদের দুজনকেই ভালোবাসতেন। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, আকবর আর জেবুন্নিসাকে মাফ করে দাও। তোমার মনে খুঁজে দেখ তাদেরকে ক্ষমা করা যায় কি না।'

'আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, তা আমি পারি না। আকবর অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। আর জেবুন্নিসার বিশ্বাসঘাতকতাও উপেক্ষা করতে পারি না।'

'তাহলে সেই চক্র আবার ঘুরতে শুরু করছে, যা আর থামান যাবে না। তখত ইয়া তক্তা—সিংহাসন কিংবা কফিন—সেটাই তুমি সবসময় ভেবে এসেছ তাই না? বোকার মতো আমি ভেবেছিলাম যে, হয়তো তোমাকে বাধা দিতে পারবো, তবে এটা ছিল আমার দায়িত্ব—সত্যি বলতে কি পবিত্র দায়িত্ব। সবসময় চেষ্টা করে যাব, ঠিক যেরকম আবার আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছি যে, মুসলমানদের মত তোমার হিন্দু প্রজাদেরও তোমার উপর দাবি আছে যে, তুমি তাদের প্রতি খেয়াল রাখবে, তাদের নিরাপত্তা দেবে। যদিও আমি জানি তুমি তা শুনবে না। তবে আমি আরেকটি কথা তোমাকে বলতে চাই...আমাদের মধ্যে যতই মতপার্থক্য থাকুক আমি তোমাকে ভালোবাসি। সেই যখন তুমি একটি ছোট্ট ছেলে ছিলে তখন থেকে। তখন তুমি ভাবতে যে প্রতিটা সমস্যার একটাই সমাধান আছে আর তুমি তা জান। আর কেউ যদি তা না শুনতে চাইতো তখন তুমি তোমার মুঠি দিয়ে তার উপর তা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করতে। আমি দোয়া করি যেন, তুমি এই জীবনে আর পরবর্তী জীবনেও শান্তি পাও।'

জাহানারা একটু সামনে ঝুঁকলেন আর আওরঙ্গজেব অনুভব করলেন তাঁর ঠোঁট তার কপাল একবার স্পর্শ করলো। তাঁর চোখে পানি এসে যাচ্ছিল, অতি কষ্টে কণ্ঠস্বর সামলিয়ে তিনি ফিস ফিস করে বললেন, 'দয়া করে আমার কথা বুঝার

চেষ্টা করুন। আপনি যে পথের কথা বলতে চাচ্ছেন তা আমি অনুসরণ করতে পারি না—সেটা এজন্য নয় যে, আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার ঘাটতি আছে। শুধু আমার ধর্মীয় বিশ্বাস আর পুরুষ মানুষের জগতের কঠিন বাস্তবতার কারণে আমি এসব করতে বাধ্য হয়েছি।'

'আমি জানি তুমি কি অনুভব করছো, আর কেন। আর কেবল সেই নির্মম অনিবার্যতাই আমাকে দুঃখী করেছে।'

'জাহানারা, আমি...' কুচকাওয়াজের ময়দান থেকে শিঙার আওয়াজ ভেসে এল। তীক্ষ্ণ কানফাটা আওয়াজটি তাঁকে বাঁচিয়ে দিল। তিনি বললেন, 'আমি আর থাকতে পারছি না। তবে আমি আমার শ্রেষ্ঠ হেকিমদের পাঠাব আর যতদিন দূরে থাকবো রোজ তোমার জন্য প্রার্থনা করবো যেন তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ।'

'আর আমি তোমার নিরাপত্তা আর সুখের জন্য প্রার্থনা করবো, যেরকম পরিবারের আর সবার সুখশান্তি আর নিরাপত্তা কামনা করে দোয়া চাইবো। আওরঙ্গজেব, ভাই আমার, আল্লাহ্ তোমার সহায় হোন।'

আওরঙ্গজেব তাঁর বোনের বলিরেখাঙ্কিত কপালে চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এক মুহূর্ত ইস্ততত করলেন, তারপর ফিরে তাকাবার ইচ্ছেটা দমিত করে দ্রুত কামরা থেকে বের হয়ে হেরেমের মধ্য দিয়ে শেষ মাথায় পৌঁছে সিঁড়ি বেয়ে নেমে উঠানে চলে এলেন। তাঁর প্রিয় হাতিটি একটি নিম গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর শুঁড়ে যুদ্ধের লাল রঙ করা হয়েছে আর ছাদওয়ালা হাওদা পিঠে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সহিসরা ঘোড়ায় জিন পরাচ্ছিল আর তাঁর দেহরক্ষী দলের বরকন্দাজরা তাদের গাদা বন্দুকে গোলা ভরে সবকিছু পরীক্ষা করছিল। আওরঙ্গজেবের নাকে যুদ্ধের পরিচিত গন্ধ ভেসে এল—গা-গরম ঘোড়ার গায়ের গন্ধ, তেল দেওয়া নতুন জিন আর লাগাম, বারুদ আর মানুষের ঘামের গন্ধ। লম্বা একটি দম নিয়ে তিনি স্বস্তির সাথে বিশ্বাস করলেন যে, তিনি তাঁর জগতে ফিরে এসেছেন, যেখানে সিদ্ধান্ত আর কর্মই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতর—নির্দিষ্ট আকারহীন, দ্ব্যর্থক আবেগপ্রবণতা নয়।

তিন ঘণ্টা পর যখন প্রধান ফটকের দালানের দোতলা থেকে বুম বুম শব্দে নাকাড়া বেজে উঠলো, তখন আজমিরের উঁচু দেওয়ালের উপরে জালি দেওয়া বেলকনিতে একসাথে দাঁড়িয়ে জাহানারা আর গওহরা তাদের ভাইয়ের হাতির পিঠে করে বাইরে চলে যাওয়া দেখছিলেন। দুর্গের বাইরে অশ্বারোহী আর পদাতিক সেনারা দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জাহানারা গওহারার এক হাত ধরলেন। যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন কতবার তাদের যুদ্ধে যেতে দেখেছেন?

কতবার তিনি এর অন্তঃসার শূন্যতা আর অনাবশ্যকতার কথা ভেবেছেন? আওরঙ্গজেবের চলে যাওয়ার শেষ মুহূর্তটি পার হওয়ার সময় তিনি ভাবছিলেন, তিনি কি শেষবারের মতো তাঁর সাথে আরেকবার দেখা করতে আসবেন কিংবা তিনি নিজে তাঁর সাথে দেখা করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তিনি জানেন তাদের দুজনেরই যা যা বলার ছিল বলেছেন। কোনোকিছুতেই ধর্ম, সাম্রাজ্য আর পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে তার আর মিল হবে না।

আওরঙ্গজেবের নেতৃত্বে অগ্রবর্তী দল যখন দক্ষিণ দিকে চলতে শুরু করলো, তখন অসময়ের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়া শুরু হতেই মাটি ভিজে গেল। জাহানারা লাঠিতে ভর দিয়ে একটু ঝুঁকে দেখতে লাগলেন আওরঙ্গজেবের হাতি তাঁকে পিঠে নিয়ে একটি নিচু পাহাড়ের কিনারা ঘুরতেই অবশেষে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। অদৃশ্য হাত উঠিয়ে তিনি ফিস ফিস করে বললেন, 'বিদায়, ভাই... তুমিসহ তোমার লোকজনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।'

পেছনে শক্তভাবে হাত বাঁধা আটজন মারাঠি আওরঙ্গজেবের সামনে নতজানু হয়ে বসেছিল। তিনি বললেন, 'এরা আমার রসদবাহী গাড়িবহরের লোকজনদের হত্যা করেছে। এদের জন্য একমাত্র শাস্তি হচ্ছে—হাতির পায়ের নিচে পিষে মারা। আর আমি চাই এটা এখুনি করা হোক।' আওরঙ্গজেবের কথার সাথে সাথে আটজনের মধ্যে ছয়জন প্রাণভিক্ষা করে কাতরভাবে মিনতি করতে লাগলো। আরেকজন—যাকে দেখে মনে হচ্ছে বয়সে সবার ছোট, সে চোখ বন্ধ করে ওয়াক ওয়াক করে বমি করার চেষ্টা করতে করতে সামনে পেছনে দুলতে লাগলো। সবশেষের মারাঠি লোকটি চিৎকার করে অবাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই দুজন সৈন্য লাথি মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপরও লম্বাচুলের, মুখে কাটাদাগসহ বলিষ্ঠ গড়নের লোকটি আওরঙ্গজেবের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল। তারপর সে হঠাৎ একদলা হলদে রঙের চটচটে শ্লেষা মুখ থেকে বের করে থুথু করে ফেলতেই কফের দলাটি আওরঙ্গজেবের সবুজ আলখাল্লার একটু উপরে পড়ে ধীরে ধীরে পোশাক বেয়ে নিচে নামতে লাগলো। থুথুর দলাটি আলখাল্লার কাপড়ের গায়ে লম্বা, সরু একটি দাগ রেখে গেল। একজন সৈনিক তার গাদা বন্দুকের কুঁদো তুলতেই আওরঙ্গজেব মাথা নেড়ে বললেন, 'পরজীবী এই কীটাণুকীটের জন্য তোমার শক্তিক্ষয় করো না, যে কি-না মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসেও আল্লাহ আর মানুষের সামনে অপরাধ করছে।'

ঝাকড়া চুলের লোকটি চিৎকার করে উঠলো, 'আপনি আমাদেরকে পরজীবী কীট বলছেন, আপনি নিজে কী?' তখনও তার ঠোঁটে থুথু লেগে রয়েছে। 'একজন ভিনদেশি হামলাকারী ছাড়া আপনি কিছুই না, যে জোর করে আমাদের দেশের উপর নিজের ইচ্ছে চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। যে দেশ আপনার নয়—যে দেশ কখনও আপনার লোকদেরও ছিল না। আপনারা মোগলরা কারা? উত্তরের পর্বতের জংলি এলাকা থেকে আসা একদল দস্যু। চোর যেমন সুযোগ পেলেই চুরি করে, তেমনি আপনারাও চোরের মতো একটি সুযোগ পেয়ে হামলা করেছেন—যাদেরকে সম্ভাজির নেতৃত্বে আমরা এদেশ থেকে উচ্ছেদ করবো।'

আওরঙ্গজেব নিচে লোকটির দিকে তাকালেন। তার ঘাড়ের শক্ত পেশি আর ঘামে ভেজা কপালের ফুলে উঠা শিরাগুলো লক্ষ করলেন। বেদনাদায়কভাবে যখন তার প্রাণ চলে যাচ্ছে, ঠিক তার আগে এমন আবেগ, এমন বিরোধিতা, আর বিশেষ একটি উদ্দেশ্যের প্রতি তার এমন বিশ্বাস—দেখার মতো বিষয় বটে। কি কারণে লোকটি বিশ্বাস করছে যে, সম্ভাজির মতো নেতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়া যায়? তাঁর গুপ্তচরেরা বলেছে, সে তার বাবার চেয়েও অনেক ভোগবিলাসী আর খুব একটা উদ্যমী নয়? তবে তাঁর গুপ্তচরেরা কি সম্পূর্ণ সত্য কথাটি বলে নি, না-কি তিনি যা শুনতে পছন্দ করেন শুধু সে কথাই বলেছে? সম্ভাজির নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো গুণ আছে, আর সেজন্যই সে এমন সাহস যোগচ্ছে আর আত্মবিসর্জন করতে লোককে অনুপ্রাণিত করছে। আর তাই যদি হয়ে থাকে, তবে তাকে ছোট করে দেখা ভুল হবে। তাকে ভালোভাবে জানার জন্য একটা উপায় বের করতে হবে। তিনি ওয়াজিম খানের সাথে কথা বলে তাকে জানাবেন মারাঠি শিবিরে ঢুকে সম্ভাজির সম্পর্কে সবকিছু জানার জন্য আরো চেষ্টা করতে।

চোখের এককোণ দিয়ে তিনি সেই বিশাল হাতিটিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন, এই হাতি দিয়েই অপরাধীদের পিষে মারা হয়। একটি মাত্র মাহুত হাতিটির কাঁধে চড়ে এটাকে চালিয়ে নিয়ে আসছে। মাথা তুলে দেখলেন কয়েক ফুট দূরে তাঁর কয়েকজন লোক একটা গরুর গাড়ি থেকে একটি পাথরের চওড়া টুকরা ধরাধরি করে নামাচ্ছে। এই পাথরের উপর ফেলেই অপরাধীকে হাতির পা দিয়ে পিষে ফেলা হবে। রক্ত শুকিয়ে পাথরটির রঙ বাদামি হয়ে রয়েছে আর এর চার কোণায় একটি করে লোহার আংটা লাগান রয়েছে। পাথরটি ঠিকজায়গা মতো স্থাপন করার পর আওরঙ্গজেব তার দেহরক্ষী দলের অধিনায়ককে ইঙ্গিত করে বললেন, 'ঐ লোকটি!' যে লোকটি তাঁর গায়ে থুথু ফেলেছিল তাকে দেখালেন। মারাঠি লোকটি হয়তো ভাবছে সে থুথু ফেলেছিল

বলে তিনি তার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছেন। আসলে তা নয়। লোকটিকে প্রথমে মরার সুযোগ দিয়ে তিনি তার সাহসের প্রশংসা করছিলেন।

সৈন্যরা দ্রুত লোকটির জামা-কাপড় খুলে ফেললো, সে এখন চুপ করে রয়েছে। তারপর তাকে চিৎ করে পাথরটির উপর শুইয়ে দিয়ে চারটি আংটার সাথে দুই হাতের কব্জি আর পায়ের গোড়ালি বেঁধে দিল। হাতিটি একটি পা তুলতেই এর ছায়া লোকটির উপর পড়লো, তারপর মাহুতের ইশারায় হাতিটি পা ধীরে ধীরে লোকটির শরীরের উপর নামিয়ে আনলো। পেটের নাড়িভূড়ি বের হয়ে যেতেই মারাঠি লোকটি একটি বন্য পশুর মতো আর্তনাদ করে উঠলো। বদ বায়ু আর মানুষের মলের বমি উদ্রেক করা দুর্গন্ধ এড়াতে আওরঙ্গজেব তাঁর পাশে দাঁড়ান তরুণ কোরচির কাছ থেকে একটি কাপড়ের টুকরা নিয়ে নাকে চেপে ধরলেন। কোরচি ছেলেটি হঠাৎ উবু হয়ে মাটিতে বসে পড়লো, তারপর আওরঙ্গজেব শুনতে পেলেন সে বমি করছে, তবে কিছু বললেন না। ছেলেটার বয়স খুব কম। সময় হলে সে জানতে পারবে এই ধরনের কাজ যত খারাপই হোক না কেন, একজন শাসকের প্রজাদের মনে ভয় জাগাবার জন্য এটা প্রয়োজনীয় আর এভাবেই তাঁর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হবে।

সাতজন মানুষের দেহাবশেষ পাথরের টুকরা থেকে একে একে সরিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে রাখা পানি নিরোধক কাপড়ে এনে মুড়ে রাখা হল। তারপর দেহগুলো শিবির থেকে বেশ দূরে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সেখানে মাটি চাপা দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে বাতাসে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। সবশেষ বন্দীটি ছিল কমবয়সী একটি তরুণ, সৈন্যরা তাকে টেনে দাঁড় করাতেই সে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত বুড়ো মানুষের মতো ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো। একজন সৈন্য অসতর্কভাবে ইস্পাতের ছুরি দিয়ে তরুণটির হাতের বাঁধন কাটতে গিয়ে তার হাতের চামড়াও একটুখানি কেটে গিয়ে তার ডান হাত বেয়ে দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগলো। সৈন্যরা তার পোশাক খোলা শুরু করতেই আওরঙ্গজেব এক হাত তুললেন।

তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'থাম। এর সাথে আমার কিছু কথা আছে। তোমার বয়স কম বলে তোমার মৃত্যু হবে না তা নয়। তবে আমি তোমাকে বাঁচার জন্য একটি সুযোগ দিতে পারি।'

তরুণ মারাঠি ছেলেটি তখনও থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর দিকে তাকাল।

'সম্ভাজি সম্পর্কে খবরের বিনিময়ে আমি তোমার প্রতি ক্ষমা দেখাতে পারি। আমি সবকিছু জানতে চাই, সে কী খেতে আর পান করতে পছন্দ করে, সেখান থেকে শুরু করে কী দেখলে সে হাসে আর কেমনভাবে তার লোকদের সাথে কথা বলে সবকিছু। এমনভাবে বলবে যেন, আমি মনে করতে পারি যেন তাকে

আমি চিনি। যেন আমি তার সাথে তার শিবিরেই আছি। পারবে এটা করতে?'
'হ্যাঁ. হ্যাঁ, পারবো আমি।'
'তোমার নাম কী?'
'সন্তাজি।'
'ঠিক আছে সন্তাজি। আমাকে দেখাও। তবে আমি হয়তো এটা জানতে পারি যে, তুমি কখনও সম্ভাজির সাথে দেখা কর নি।'
'প্রায় দুই বছর আমি তার দেহরক্ষী দলের সদস্য ছিলাম। তারপর বর্ষার ঠিক আগে আমার বড়ভাই বসন্তরোগে মারা যাবার পর আমার বাবার অনুরোধে সম্ভাজি আমাকে বাড়ি ফেরার অনুমতি দেন।'
'তোমার বাবা এখন কোথায়?'
'তিনি...তিনি...এখানে মারা যাওয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি।'
কথাটা আওরঙ্গজেব বিবেচনা করলেন। সন্তাজি এই মাত্র তার বাবার হত্যাকাণ্ড দেখেছে, এরজন্য সে হয়তো এর প্রতিশোধ নিতে চাইবে। কাজেই তাকে ভুল পথে চালিত করতে হবে। অন্যদিকে তার মনে এখন যে আতঙ্ক চলছে, তার বিপরীতে যে আশার আলো তার চোখে দেখা দিয়েছে তাতে সে মনে করছে হয়তো সে হয়তো মরবে না, এতে বুঝ যাচ্ছে সে বাঁচতেই চাইছে।
'ঠিক আছে আমরা দেখবো। প্রত্যেকদিন সেনা কর্মকর্তারা তোমাকে প্রশ্ন করে সবকিছু আমাকে জানাবে। তোমার কথায় যদি আমি সন্তুষ্ট হই তাহলে তোমার বন্দীজীবন সহজ হবে। আর তা নাহলে. মনে রেখ আজ কি দেখেছ।'
আওরঙ্গজেব দ্রুত হেঁটে তাঁর ঘোড়ার কাছে গেলেন, সহিসকে ইশারা করতেই সে ছুটে সামনে এগিয়ে তাঁকে ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করলো। যুবক বয়সে যেরকম একলাফে জিনে চেপে বসতেন এখন আর সেরকম পারেন না। তবে এখনও যথেষ্ট চটপটে আছেন। শিবিরের চৌহদ্দীর চারপাশে পাহারা দেখার জন্য ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলেন।
সন্ধ্যায় সর্বাধিনায়কের তাঁবুতে নামাজ শেষ করে উঠে অবাক হয়ে দেখলেন তার কোরচি তাঁবুর পর্দার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। সে নিশ্চয়ই নিঃশব্দে ঢুকেছিল, তাই তিনি তার আসা শুনতে পান নি। ছেলেটি বললো, 'জাঁহাপনা, আপনার বোন গওহারা বেগম সাহেবার সচিব ইকবাল করিম এই মাত্র আজমির থেকে একটি জরুরি চিঠি নিয়ে এসেছেন। তিনি চিঠিটা এখুনি আপনার হাতে দিতে চাচ্ছেন।'
তিনি বললেন, 'ঠিক আছে।' কথাটা বলার সাথে সাথে ইকবাল করিম তাঁবুর দরজায় এসে চিঠিটা এক হাতে ধরে মাথা নুইয়ে দাঁড়াল। সে নিশ্চয়ই তাঁবুর

বাইরেই অপেক্ষা করছিল। সিল মোহরে গওহারার ব্যক্তিগত সিলমোহর—লাফিয়ে উঠা একটি মাছের প্রতিকৃতি দেখা যাচ্ছে। আওরঙ্গজেব সিলমোহর ভেঙ্গে চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন। *'প্রিয় ভাই, আমাদের শ্রদ্ধেয় বোন জাহানারা মারা গেছেন...*

কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি শান্তভাবে বললেন, 'ধন্যবাদ, ইকবাল করিম। তুমি এখন যাও, পরে তোমাকে খবর দেব।'

একা হতেই আওরঙ্গজেবের হাত থেকে চিঠিটা খসে পড়লো তাঁর হাঁটুর উপর। জাহানারার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া শুরু করতেই তার দুই চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় পানি পড়তে লাগলো। দোয়া পড়তে গিয়ে কি কি উচ্চারণ করছেন তার কিছুই কানে ঢুকছিল না। তাঁর সমস্ত চিন্তা ছিল তাঁর এই বোনের জন্য যাঁকে তিনি সকল ভাই-বোনের মধ্যে সবেচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। মায়ের মৃত্যুর পর তিনিই তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। একমাত্র তাঁর মতামতকেই তিনি মূল্য দিতেন। ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর মনে খুব ভয় ছিল, তাঁকে নিয়ে, পরিবারকে নিয়ে আর সাম্রাজ্যকে নিয়েও তাঁর মনে আতঙ্ক ছিল। মনে হচ্ছিল তিনি বেঁচে থাকার ইচ্ছে হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি এটা তাঁর চোখে দেখেছিলেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে শুনেছিলেন। যদি তিনি তাঁকে একটু সান্ত্বনা, একটু আশা দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা পারেন নি। তাঁর উদ্বেগ দূর করতে হলে তাঁকে নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে যেতে হত আর তাঁর বিশ্বাসের সাথে প্রতারণা করা হত। আর সেটা করা কখনও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এসব কথা ভেবে তিনি একটু শান্ত হলেন, তারপর এক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর গওহারার চিঠিটা তুলে পড়তে শুরু করলেন।

আপনি চলে যাওয়ার পর আমাদের বোন দিন দিন আরো দুর্বল হয়ে পড়লেন, ঘর থেকে খুব কম বের হতেন, সারাদিন সেখানে ঝিমুতেন। যখন জেগে থাকতেন তখন সুফিতত্ত্ব, কোরানের বিভিন্ন সূরা আর অনেক সময় তাঁর প্রিয় ফার্সি কবিতা পড়ে সময় কাটাতেন। ক্ষিধে একেবারে কমে গিয়েছিল। আমরা কোনোমতেই তাঁকে ছোট এক বাটি সুরুয়া কিংবা সামান্য ভাতও খাওয়াতে পারতাম না। হেকিম যা বলতেন মনোযোগ দিয়ে সব শুনতেন, মৃদু হেসে সায় দিতেন তারপর হেকিমরা চলে গেলে আবার ঠিক আগের মতোই চলতেন। দশ দিন আগে তিনি খাওয়া-দাওয়া একেবারেই ছেড়ে দেন। আমার চোখের সামনে তিনি শুকিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি আপনাকে লিখে জানাতে চেয়েছিলাম,

কিন্তু তিনি কঠোরভাবে আমাকে চিঠি লিখতে নিষেধ করলেন। আপনিতো জানেন, শান্ত হলেও তিনি কিরকম জেদি হতে পারেন।

শেষদিন তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস আসে যায় এমন হচ্ছিল আর নিশ্বাস এত ভাসাভাসা হচ্ছিল যে, তার পরিচারিকা ভোরের আগে আমাকে ডেকে পাঠাল। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অবশ্য জাহানারার জ্ঞান ছিল। খুব ধীরে ধীরে তবে পরিষ্কারভাবে কথা বলে তিনি আমাকে বললেন, আমি যেন অবশ্যই আপনাকে জানাই, আপনার প্রতি তাঁর ভালোবাসা সবসময় অটুট আর নিঃশর্ত ছিল, যদিও আপনার কোন কোনো কাজে তিনি মনে ব্যথা পেয়েছেন। তারপর তাঁকে একটু উত্তেজিত মনে হল। বালিশ থেকে মাথা সামান্য তুলে তিনি আমাদেরকে অনুরোধ করলেন, আমরা যেন আপনাকে অনুরোধ করি—পরিবারের সব সদস্যকে একইরকম ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখতে—আকবর আর জেবুন্নিসার প্রতি, যাদের জন্য তিনি শেষ আরেক বারের জন্য ক্ষমাভিক্ষা চাচ্ছেন। আর তাদের প্রতিও যাদেরকে তিনি আপনার বৃহত্তর পরিবার মনে করেন—জাতপাত ও সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সেই প্রজাদের প্রতিও। কথাগুলো বলা শেষ করার পর তাঁর অসুস্থ মাথা আবার বালিশে পড়ে গেল আর তারপর পশ্চিমদিকে মুখ করে চেহারায় প্রশান্তি নিয়ে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

আমাদের বোন একটি চিঠি লিখে অনুরোধ করে যান, তাঁকে যেন দিল্লিতে খোলা আকাশের নিচে ছোট একটি সমাধিতে দাফন করা হয়। ঠিক যেরকম প্রাচীন মুসলিম অনুশাসনে বলা হয়েছে আর আমাদের পূর্বপুরুষ বাবর যেমন কাবুলে একটি পাহাড়ের ধারে সমাহিত আছেন। তিনি কিছু উইল দ্বারা অর্পিত সম্পত্তি রেখে গেছেন, তবে জানিয়েছেন তাঁর বাকি সব ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রি করে সেই অর্থ দিল্লি আর আগ্রার গরিব হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে। আমি তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি।

কামনা করি আল্লাহ আপনাকে এই শোক সহ্য করার শক্তি দিক আর আমিও আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি আমার দুঃখে শান্তি দিতে। তিনি সব সময় আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

আওরঙ্গজেব খুব যত্ন করে চিঠিটা ভাঁজ করলেন। নীরব শোকে কাতর অবস্থায় হাঁটুগেড়ে বসে জাহানারার একটি কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। একবার তিনি বলেছিলেন, ভালো এবং মহৎ চরিত্রের মানুষকে হিন্দুরা 'একটি মহৎ আত্মা,' নাম দিয়েছিল। সেই শব্দগুলো জাহানারার জন্য একেবারে সঠিক।

অধ্যায় : পনেরো

রাজকীয় মোরগ শাবকের লড়াই

বোরহানপুরের দুর্গ-প্রাসাদের প্রধান তোরণের নিচে দিয়ে যাওয়ার সময় আওরঙ্গজেব উপরে তাকিয়ে ফটকের বেলেপাথরের চৌকাঠের উপর যুদ্ধরত হস্তির প্রতিকৃতি খোদাই করা দেখতে পেলেন। তিনি এই স্থানটিকে ঘৃণা করতেন, ঠিক যেরকম তাঁর বাবাও করতেন। এই একটি বিষয়ে তাঁরা দুজনেই একমত ছিলেন। তাঁর কানে বাজলো, পত্নীশোকে কাতর সম্রাট শাহজাহানের সেই কথাগুলো। সম্রাট আকবরের সময়কার কালক্রমিক ঘটনাপঞ্জিতে লিপিবদ্ধ করা একটি অংশের কয়েকটি লাইন তিনি বার বার বলে যাচ্ছিলেন:

তারা মহান সম্রাটকে জানাল, বোরহানপুর একটি নিকৃষ্ট, অলক্ষুণে এবং অন্ধকার জায়গা। এখানে কোনো মানুষ উন্নতি করতে পারে না...

সূর্য তখনও দিগন্তে ডুবে যায় নি। আর সারাদিন অবিরত প্রচণ্ড গুমোট গরম ছিল, তা সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব কেঁপে উঠেছিলেন। সেই সময়ে তিনি একটি বারো বছর বয়সের সহজসরল বালক ছিলেন। তিনি তাঁর বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার পাশাপাশি নিজেকেও সান্ত্বনা দেওয়ার আশা করছিলেন। তবে শাহজাহান এমন আচরণ করছিলেন, যেন প্রিয়জন হারানোর যে ব্যথাবেদনা পুরো পরিবারকে শোকাহত করেছিল সেটি যেন তার একারই দুঃখ ছিল।

অবশ্য তাঁর মা মমতাজের মৃত্যুর পর তিনি অরো বেশ কয়েকবার বোরহানপুর এসেছিলেন, তবে এবারকার আসাটা একটু অন্যরকম। যতই এর কাছাকাছি হতে লাগলেন ততই তাঁর মনে একটা আতঙ্ক জেগে উঠতে লাগলো। আতঙ্কের এই অনুভূতি এত প্রবল ছিল যে, তিনি তাঁর সাথে উদিপুরী মহলকেও আসতে অনুমতি দেন নি। তিনি তাকে তাঁর সফরসঙ্গীর অধিকাংশ, সদস্যদের সাথে বিশ মাইল দূরে একটি পাহাড়ের উপর আসিরগড় দুর্গে রেখে এসেছিলেন।

এখন তাঁর মনে যে অমঙ্গলাশঙ্কা জেগেছে তার সাথে কি জাহানারার মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক আছে? হতে পারে। এটা অনুভবের পর থেকে গত ছয় সপ্তাহ

ধরে অতীতের অনেক ছবি তাঁর মনে ভিড় করেছে। সেইসব স্মৃতির মধ্যে সবচেয়ে প্রবল ছিল এখানে এই বোরহানপুরে এক গ্রীষ্মের সেই রাতের স্মৃতিটি, যখন তাঁর মায়ের নিদারুণ যন্ত্রণা-চিৎকারে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। তখন তাঁর মায়ের কামরার অর্ধেক খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে তিনি দেখেছিলেন, জাহানারা তাঁর মায়ের পাশে বসে কপালে হাত বুলিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। তখন জাহানারার দু'গাল বেয়ে দরদর করে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছিল আর লম্বা চুল ঝুলে রয়েছিল। জাহানারা যখন ঘুরে দেখতে পেলেন আতঙ্কিত হয়ে আওরঙ্গজেব চোখ বড় বড় করে দৃশ্যটি দেখছেন, তখন ছুটে গেলেন দরজা বন্ধ করতে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, আওরঙ্গজেব দেখে ফেললেন মমতাজ পাগলের মতো আর্তচিৎকার করছিলেন আর এমনভাবে বিছানায় আছড়াচ্ছিলেন যে, তাঁর সবচেয়ে কাছের সেবিকা সত্তি আল-নিসাও তাঁকে ধরে রাখতে পারছিলেন না। তারপর তাঁর মনে পড়লো তাঁর বাবা যুদ্ধের ময়দানে খবর পেয়ে ফিরে এসে সেই পোশাকেই তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কামরায় ঢুকার সাথে আবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি উঠানের একটি থামের গায়ে হেলান দিয়ে বসে রইলেন যতক্ষণ না তাঁর মায়ের আর্তচিৎকার থেমেছিল। তিনি তখন ভেবেছিলেন এটা ভাল হয়েছে—হয়তো সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে, এই নীরবতার অর্থ, অবশেষে তিনি একটি নতুন শিশুর জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু তার শোকের বিলাপ শুনে তিনি বুঝতে পারলেন যে, সবকিছু ঠিক নয়...

তিনি আর কখনও মায়ের কামরায় ঢুকেন নি। তাঁর মৃতদেহ তপতি নদীর অপর তীরে অস্থায়ী সমাধিতে নিয়ে যাবার পর, শাহজাহান সেই বাড়িতে ঢোকার মূল দরজা বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন থেকে এত বছর তপতি নদীর দিকে মুখ করা দুর্গ-প্রাসাদের স্মৃতি বিজড়িত তিনতলার সেই ঘরগুলো ভূতুড়ে পরিবেশ নিয়ে নীরব হয়ে রয়েছে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই স্থানটি কেউ দেখতেও আসেনি।

আজ প্রথম মনে হল সেটা ঠিক হয় নি। তিনি প্রায়ই তাজমহলের একফোঁটা নয়নাশ্রুর প্রতিকৃতির মতো গম্বুজের নিচে তাঁর মায়ের জন্য মোনাজাত করতেন। তবে কখনও এখানে প্রার্থনা করেন নি, যে জায়গায় তাঁর মায়ের আত্মা দেহ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তিনি এখুনি কামরাগুলো খোলার ব্যবস্থা করবেন। ঘোড়া থেকে নেমে তিনি বোরহানপুরের নায়েবকে খবর দিলেন।

দুই ঘণ্টা পর শোকের ধবধবে সাদা পোশাকে হাওয়ায় উড়তে থাকা লাল ধুলা আর ঝুলকালি মেখে আওরঙ্গজেব তাঁর মায়ের সেই ঘরটিতে হাঁটুগেড়ে বসে

মোনাজাত করতে লাগলেন। প্রায় পঁচিশ বছরে পর্দাগুলো রোদে জ্বলে ন্যাকড়ার মতো রংচটা হয়ে পত পত করে জানালায় উড়ছিল। গালিচা আর আসবাবগুলো অনেক আগেই ইঁদুরে আর ঘুণপোকায় কেটে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর বাদুড়ের মলের ছাতা পড়া দুর্গন্ধে ভেতরের বাতাস দূষিত হয়ে রয়েছে। তাসত্ত্বেও তিনি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে চারপাশে তাকালেন—এখন কামরাগুলো যে অবস্থায় আছে সেটা নয়, তিনি দেখছিলেন একসময় কীরকম ছিল, সুন্দর রুচিশীল আসবাব আর সুগন্ধি মোমবাতি দিয়ে সাজান ছিল। মেঝেতে পড়ে থাকা কিছু একটা তাঁর চোখে পড়তেই নিচু হয়ে তিনি জিনিসটা তুলে ধুলো ঝেড়ে দেখলেন, জিনিসটা একটি হাঁতির দাঁতের চিরুনি। জিনিসটা তাঁর মায়ের? তিনি অনেক সময় দেখেছেন তাঁর মায়ের পরিচারিকা সাতি আল-নিসা তাঁর গোলাপ আতরের সুগন্ধিমাখা লম্বা রেশমের মতো চুল আঁচড়াচ্ছেন। এই সুগন্ধিটি তাঁর মায়ের খুব প্রিয় ছিল।

হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে। হাঁটু ভেঙ্গে সামনে নিচু হয়ে স্যাঁতলাপড়া বেলেপাথরের মেঝেতে কপাল ঠেকিয়ে তিনি দোয়া করতে শুরু করলেন—প্রথমে তাঁর মায়ের আত্মার জন্য, তারপর জাহানারা আর রওশনআরার জন্য...তারপর নিজের অজান্তেই কখন যে শুধু তাঁর বাবার জন্যই নয়, এতগুলো বছরে তিনি যা কখনও করেন নি—তাঁর ভাই মুরাদ, শাহ সুজা আর দারা শিকোর জন্যও দোয়া করছেন, তা টেরও পেলেন না। এতগুলো বছরে যা তিনি কখনও করেননি। কি কারণে এটা করলেন? বুঝতে পারলেন না। কেবল আল্লাহই জানেন, যিনি মানুষের মনের ভেতরটা দেখতে পারেন।

হলুদ রেশমি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আকবর আরেক ঢোক সরাব খেলেন। এটা পেটে পড়তেই তাঁর শরীর মন চাঙ্গা হয়ে উঠলো। সম্ভাজির কাছ থেকে তিনি তাঁর লোকজনসহ আর জগিন্দরের রাজপুতরা উষ্ণ আতিথ্য পেয়েছিলেন। সম্ভাজি এখন তাঁর পাশেই আধশোয়া হয়ে রয়েছেন। মারাঠা রাজ্যে ঢুকতেই তার মন উদ্দীপ্ত হল আর তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি অটল হয়ে উঠলেন। এই মুহূর্তে অন্তত তিনি তাঁর বাবার হাতের বাইরে রয়েছেন। বেচারা মুয়াজ্জম...তিনি কখনও তার কাছাকাছিও আসতে পারেন নি, ধরা তো দূরের কথা। অনুমান করতে পারছেন এতে তার বাবার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। আওরঙ্গজেব সব সময় ভাবতেন মুয়াজ্জম অতিমাত্রায় সতর্ক আর তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে। সবার সামনে তাকে সমালোচনা করতেন, যেরকম অন্য সব ছেলেদের

সমালোচনা করেন, কমবক্স ছাড়া। তবে তিনি কখনও ভাবেন নি যে, তার বাবা নিজের মেয়ের প্রতিও এরকম প্রতিহিংসা পরায়ণ হবেন। জেবুন্নিসার কারারুদ্ধ হবার খবর শুনে তিনি মনে বড় ধরনের চোট পেয়েছিলেন। তিনি নিজেকে দোষী মনে করেছিলেন। কেননা তাকে সমর্থন করাতেই তার বাবা এর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। বিজয়ী হওয়ার পর—অবশ্যই হবেন—তার প্রথম কাজ হবে নিজে ঘোড়ায় চড়ে গোয়ালিয়র গিয়ে তাকে মুক্ত করা। তিনি হবেন সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী—পাদিশাহ বেগম, ঠিক যেরকম তার ফুফু জাহানারা বেগম হয়েছিলেন।

নেংটিপরা দুজন কসরতবাজ কামরায় ঢুকে আকবর আর সম্ভাজির সামনে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলো। লোক দুটির নমনীয়, মসৃণ পেশিবহুল সারা গায়ে তেল মাখায় চকচক করছিল। তারপর ওরা লাফিয়ে, মোচড় দিয়ে আর এমনভাবে ছুটাছুটি করে উল্টে পড়ে কসরত করছিল যেন, ওদের দেহে কোনো হাড় নেই। একজন শূন্যে লাফ দিয়ে তিনবার ডিগবাজি খেতেই সম্ভাজি তার পাশে রাখা একটি চামড়ার থলে থেকে স্বর্ণমদ্রা বের করে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর এল মাথাকামানো আর পিপার মতো বুকের একজন লোক, তাকে অনুসরণ করে দুজন লোক ভারী একটি জ্বলন্ত কাঠ-কয়লার চুল্লি কাঁধে বয়ে নিয়ে এসে সাবধানে মেঝেতে রাখলো। মাথা-কামানো লোকটি খাপ থেকে একটি ছুরি বের করলো। ছুরিটি একটি লাল রঙের কাপড়ে কয়েক ভাঁজে মোড়ানো ছিল। ভালোভাবে দেখার জন্য আকবর সামনে একটু ঝুঁকতেই লোকটি ছুরিটি চুল্লির আগুনে ঢুকিয়ে কাপড়টিতে আগুনে লেগে দপ করে জ্বলে ওঠা পর্যন্ত ধরে রাখলো। তারপর ছুরিটা মাথার উপর দিয়ে দুই তিনবার ঘুরাল, যতক্ষণ না অগ্নিশিখা লক লক করে জ্বলে উঠতে শুরু করে। তারপর মাথা পেছনের দিকে হেলে, ধীরে ধীরে জ্বলন্ত ছুরির ফলাটি মুখের ভেতরে ঢুকাল। সম্ভাজি আর তার সেনানায়করা করতালি দিয়ে উঠলো। সে ছুরির ফলাটি ঢুকাতে ঢুকাতে শেষপর্যন্ত শুধু হাতলটা বাইরে রইল। তারপর সে জ্বলন্ত ছুরিটি মুখ থেকে বের করে তার সহকারীর হাতে দিল। এরপর আরো দুটি ছুরি খাপ থেকে বের করে একই প্রক্রিয়ায় মুখে ঢুকাল, তবে এবার দুটি ছুরিই তার হা করা মুখের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আকবর সম্ভাজির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। মোগল দরবারে এরকম হৈচৈ করে আনন্দোপভোগ করা আওরঙ্গজেব অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছেন। আগুন খেকো আর তার সহকারীরা তাদের সামনে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করতেই আকবর হাততালি দিয়ে তাদেরকে অভিনন্দন জানালেন। তবে মনে হল অনুষ্ঠান এখনও শেষ হয় নি।

সম্ভাজি তাকে বললেন, ‘আমার মন্ত্রী আপনার জন্য বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন...এটা আপনার পছন্দ হবে।’ তার শশ্রুহীন তরুণ মুখে দুষ্টুমির হাসি খেলে গেল। কথাটা বলতেই পরিচারকরা দেয়ালের চারদিকের জ্বলন্ত মশালগুলো নিভিয়ে দিতেই আলোকিত কামরাটি নিকষ কালো অন্ধকারে ছেয়ে গেল। তার মনে হচ্ছিল যে কোনো মুহূর্তে তিনি অনুভব করবেন একটি ধারালো ছুরির ফলা তার গলা কেটে ফেলবে কিংবা বুকে বিঁধবে। এখানে বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে না তো? কিংবা তার বাবার কোনো গুপ্তঘাতক? সম্রাটের চর তো সর্বত্র রয়েছে। তিনি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই অন্ধকারে সম্ভাজির সাথে তার ধাক্কা লাগলো। মারাঠারাজ বললেন, ‘একটু ধৈর্য ধরুন!’ তারপর দুইবার হাততালি দিয়ে চিৎকার করলেন, ‘এবার শুরু কর!’

ধীরে ধীরে একটি দরজা খুলতেই একটি ছায়ামূর্তি ভেতরে হাজির হল। তার পেছনে আরো দুটি ছায়ামূর্তি পাঁচটি ডাঁটিসহ একটি বাতিদানে পাঁচটি মোমবাতি নিয়ে ঢুকলো। ওরা কাছে এগিয়ে আসতেই মোমবাতির আলো আরো জোরালো হতেই আকবর দেখেলন, সবার আগে ছায়ামূর্তিটি একজন নারী। তার চুল কাঁধে লুটিয়ে পড়েছে, পরনের পোশাকটি শরীরের সাথে সেঁটে থাকায় দেহের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পোশাকটি এমন একটি উপাদানে তৈরি যে এর উপর আলো পড়তেই ঝিকমিক করে উঠছে। এবার দেখা গেল দুটি বালক বাতিদানগুলো বয়ে নিয়ে আসছে। আকবরের বুকের ধুকপুকানি এবার স্বাভাবিক হয়ে এল।

যে মঞ্চে আকবর আর সম্ভাজি দাঁড়িয়েছিলেন, তার কাছে এসে নারীটি মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলো। সম্ভাজি বললেন, ‘স্বাগতম লায়লা।’ রুপালি সুতা দিয়ে তৈরি লায়লার পোশাকটি এতই স্বচ্ছ ছিল যে, এর মধ্য দিয়ে তার সুডৌল স্তন, ক্রমাগত সরু হয়ে যাওয়া কোমর আর নিতম্ব পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। সম্ভাজি ইশারা করতেই সে মোমবাতির আলোয় কোনো বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই নাচতে শুরু করলো।

দুপায়ের উপর দাঁড়িয়ে সে এমনভাবে পুরো দেহ বাঁকাচ্ছিল যেন, হাওয়ায় কোনো গাছ দুলছে। তারপর সে ঘুরতে শুরু করলো। মোমবাতির মৃদু আলোয় আকবর দেখলেন সে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় তার হাত পুরো দেহের উপর বুলাচ্ছে। মেয়েটি জানে তার কি ক্ষমতা আর এতে সে আনন্দ উপভোগ করছে। আকবরের হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হল। কামরায় গভীর নীরবতা...এমন কোনো মানুষ হতে পারে না যে তাকে পেতে না চাইবে। আকবর বুঝলেন, এবার লায়লা তার কাছে এগিয়ে আসছে। তার কাছে এসে সে হাঁটু গেড়ে বসলো,

মাথা পেছনে হেলিয়ে দুই হাত তুলে মেহেদি লাগানো চুলে বুলালো। সে এখন তার এত কাছে যে, তিনি তার বুকের উঠানামা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন।
সম্ভাজি ফিস ফিস করে বললেন, 'একে আপনার পছন্দ হয়েছে, তাই না?' আকবর মাথা নেড়ে সায় দিলেন। 'তাহলে এর সাথে যান, আর দুজনে মিলে আমাদের মৈত্রিবন্ধন আর সামনে যে সুমধুর দিনগুলো আমাদের সবার জন্য রয়েছে তা উদযাপন করুন। আপনি দেখবেন সে মোটেই আপত্তি করবে না।'
লায়লা দাঁড়িয়ে আকবরের দিকে একহাত বাড়িয়ে বললো, 'জাঁহাপনা।' তারপর পুরুষ্টু লাল ঠোঁট সামান্য ফাঁক করে মৃদু হাসলো। সম্ভাজির লোকেরা চিৎকার করে তাকে উৎসাহিত করতেই তিনি তার হাত ধরে কাছেই সম্ভাজি তার থাকার জন্য যে ঘরের ব্যবস্থা করেছেন সেদিকে এগিয়ে চললেন। চাঁপাফুলের সুগন্ধের সাথে তার ঘাম মিশ্রিত মাতাল করা সৌরভ নাকে নিয়ে তিনি তার সাথে চললেন। দরজা বন্ধ হতে না হতেই তিনি তাকে দুই হাতে কাছে টেনে নিলেন। লায়লা ফিস ফিষ করে বললো, 'ধৈর্য ধরুন জাঁহাপনা।' তারপর এক পা পিছিয়ে এক টানে ঝিকমিক করা পোশাকটি মাথার উপর দিয়ে নিয়ে খুলে মাটিতে ফেলে দিল।
এমন নিখুঁত আর সুন্দর দেহ আকবর কখনও দেখেন নি। তিনি সব ভুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হাসি শুনে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি একটি বাচ্চা ছেলের মত হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি আবার তাকে কাছে টেনে নিয়ে তার সারা দেহে হাত বুলাতে লাগলেন। লায়লাও তার ঠোঁটে গভীর চুম্বন করলো।
লায়লা তাকে ধৈর্য ধরতে বলেছিল, কিন্তু তা অসম্ভব ছিল। তিনি তাকে কোলে উঠিয়ে কাছেই নিচু বিছানায় নিয়ে গিয়ে শোয়ালেন। লায়লা তাকে কাছে টেনে নিল। এরপর পরিপূর্ণ মিলনের যে আনন্দ তিনি পেলেন তাতে খুশিতে হেসে উঠলেন। এখান থেকেই নতুন জীবনের শুরু—তার বাবার ছায়ার বাইরে একটি জীবন, যেখানে তিনি যা ইচ্ছা করেন তা অর্জন করতে পারবেন।

আকবর সম্ভাজির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কী মনে হয়? এখন আমরা আক্রমণ করতে পারি?'
'কেন নয়? আমার বাবা হলে মোটেই ইতস্তত করতেন না...'
আকবর বিড়বিড় করে বললেন, 'আমার বাবাও করতেন না।' চক্রান্ত করার সময় তার বাবা সাপের মতো সর্পিল আর পিচ্ছিল হলেও যুদ্ধক্ষেত্রে

আওরঙ্গজেবের সাহস কিংবা সামরিক কোনো সুযোগ খুঁজে বের করার ধীশক্তি নিয়ে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতে পারবে না। সম্ভাজির সাথে যোগ দেওয়ার পর আকবর গত কয়েক মাসে এ ধরনের একটা সুযোগ খুঁজছিলেন। বোরহানপুরে আওরঙ্গজেবের ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে অগ্রবর্তী সেনাদলটি সামনে এগিয়ে এসেছে, তার উপর একটি অতর্কিত হামলা করা যায়। শীঘ্র তিনি তার বাবাকে তার শক্তি দেখিয়ে দেবেন।

আকবর পেটের উপর শুয়ে মোচড়ানোর ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে উঁচু পাহাড়টির চূড়ার কিনারা থেকে একহাজার ফুট নিচে কাদা-মাটির ইটের তৈরি দুর্গটির দিকে তাকালেন। আরেকটু ভালোভাবে দেখার জন্য বুকে হেঁটে সামনে আরেকটু এগোলেন। তিনি আর সম্ভাজি একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে এক মাইল দূরে তপতি নদীর মাঝখানে একটি নিচু দ্বীপে অবস্থিত দুর্গটির উপর নজর রাখছিলেন। দেখতে পুরোনো মনে হলেও এখনও বেশ শক্তিশালী। তবে সম্ভাজির দুইজন চর ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে দুর্গে ঢুকে জায়গাটিতে ঘুরেফিরে দেখে এসে জানিয়েছে, দুর্গ রক্ষার জন্য একটি সেনাদল একমাস আগে থেকে এখানে অবস্থান করছে আর মূল যে সেনাবাহিনীটি আরো দক্ষিণ দিকে অনুসন্ধান করতে এগিয়েছে সেটিও খুব বেশি বড় নয়—বড় জোর একপঞ্চাশ জন সৈন্য হবে। নদীটি চওড়া হলেও, পানি খুব কম, সহজেই পার হওয়া যাবে। আর গোলন্দাজ বাহিনী থেকেও আক্রমণের ভয় নেই। দুর্গের পুরোনো দেয়ালে যে সরু ছিদ্রগুলো রয়েছে সেগুলো তীর ধনুকের উপযোগী করে করা হয়েছিল, কামানের গোলার জন্য নয়। একমাত্র প্রধান ফটকের চেপ্টা ছাদে কামান স্থাপন করা যেত, কিন্তু সেরকম কোনো চিহ্ন সেখানে দেখা যাচ্ছে না।

আকবর জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কখন আক্রমণ করবো?'

'এখন হলে ক্ষতি কি? আমরা ওদের একজনের জায়গায় দুইজন রয়েছি। আর নতুন চাঁদের আলোও খুব কম, কাজেই অতর্কিতে আক্রমণ করে আমরা ওদেরকে চমকে দিতে পারি।'

অবশেষে আক্রমণ শুরু হল। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আকবর ভাবতেন সম্ভাজি এত অতিথিপরায়ণ আর তাকে স্বাগত জানালেও, যত দ্রুত সম্ভব মোগলদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে তিনি নিজে যেরকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, তার সাথে তিনিও অংশীদার হবেন কি-না। তবে সেটা ঠিক নয়...সম্ভাজি কেবল সঠিক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কাজেই যখন তার গুপ্তচরেরা খবর দিল মোগলরা এই দুর্গ দখল করে এখানে প্রচুর রসদ জমা করেছে, তখন তিনি

আর ইতস্তত করলেন না। তার বাবার সেনাদলের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করলে কি চমৎকার অনুভূতি হবে। আওরঙ্গজেব কখনও ভাবতে পারতেন না যে, তার ছেলের এমন সাহস হবে আর কল্পনা করতে পারবে যে, অগ্রবর্তী মূল মোগল বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে এমন একটি দুর্গ আক্রমণ করবেন, যা তার সেনাপতিরা পেছনে সুরক্ষিত করে রেখে এসেছে...

তারপরও পাহাড়ের কাছে পৌছতে পৌছতে দুপুর হয়ে গেল। তারপর পাহাড়ের নিচে গাছের আড়ালে আকবরের নিজের সেনাদল আর মারাঠিরা অস্থায়ী শিবির গেড়ে সেখানে প্রস্তুতি নিতে যে সময় নিচ্ছিল, আকবরের তখন মনে হচ্ছিল সময় যেন কাটছেই না। যখনই আকবর আকাশের দিকে তাকাতেন তখনই তার মনে হত সূর্য যেন একই জায়গায় রয়েছে। নিজের মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাতে তিনি সম্ভাজি আর তার সেনানায়কদের সাথে আক্রমণের ছকটি নিয়ে বারবার আলোচনা করতে লাগলেন। ওরা সবাই এতে একমত হয়েছিল। পরিকল্পনাটি বেশ সহজ ছিল। অন্ধকার নামলেই ওরা প্রস্তুতি নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠবে। তারপর একটু পরই যখন দুর্গের অধিকাংশ লোক খওয়া-দাওয়া আর ঘুমাবার কথা চিন্তা করবে তখন ওরা ছোট ছোট দলে হেঁটে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করবে। ঘোড়া নিলে বেশি শব্দ হবে—হেঁটে নদী পার হয়ে যে দ্বীপে দুর্গটি অবস্থিত সেখানে যাবে। সেখানে পৌছে দুর্গের প্রধান ফটকের দুইশো গজ দূরে একটি আমগাছের জঙ্গলের আড়ালে সবাই একত্রিত হবে। তারপর যখন মোটামুটি নিশ্চিত হবে যে, ওদেরকে কেউ দেখছে না তখন দুজন লোক চুপি চুপি ফটকের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি গিয়ে একটি বড় বস্তা ভর্তি বারুদ রেখে আসবে। একইসাথে অন্যরা দশজন করে দলে বিভক্ত হয়ে দুর্গের সীমানার চতুর্দিকে দেয়াল ঘেঁষে অবস্থান নেবে, যাতে সময় মতো দেয়াল বেয়ে উঠতে পারে। প্রয়োজন বোধে গুলিবর্ষণ করে ওদেরকে সহায়তা করার জন্য প্রতি দলে দুজন বরকন্দাজ থাকবে। তারপর সিদ্ধান্ত মোতাবেক একবার শিঙ্গা বেজে উঠলেই বারুদের বস্তা নিয়ে যে দুজন ফটকের কাছে থাকার কথা ওরা দ্রুত বারুদের বস্তার পলিতায় আগুন লাগিয়ে দেবে। এর বিস্ফোরণের ফলে ফটকের পাল্লাগুলো কব্জা খুলে উড়ে যাবে আশা করা যায়। কয়েকজন কুশলী যোদ্ধা নিয়ে আকবর কোনো বাধা এলে তা সামলাবে আর সম্ভাজির নির্দেশে অন্যরা দেয়াল দিয়ে আক্রমণ করবে।

পশ্চিম আকাশে কমলা রঙ মুছে যেতেই আকবর পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে চূড়ায় আরোহণ করতে শুরু করলেন। তার কোরচি তার লম্বা তরোয়ালটি নিয়ে তার পাশাপাশি উঠছিল আর পেছন পেছন আসছিল তার দেহরক্ষী দল।

সামান্য যে আলো ছিল তাতে সে দেখছিল জগিন্দরের রাজপুত সৈন্যরা লম্বা লম্বা পা ফেলে আসছে। ওরা পিঠে অস্ত্রশস্ত্র বেঁধে নিয়েছিল। সম্ভাজির মারাঠিদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁধে কুণ্ডলী করা দড়ি নিয়ে উঠছিল, অন্যরা মই, বারুদের বস্তা আর গাদা বন্দুকের গুলি বহন করছিল।

পাহাড়ের চূড়া থেকে সরু এক ফালি চাঁদের ম্লান আলোয় তপতি নদীর পানি হালকা চিকচিক করে উঠলো। আর দুর্গের অন্ধকার আকৃতিটি প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না, শুধু ফটকের দালান আর সৈনিকদের আবাসস্থল থেকে মাঝে মাঝে কমলা রঙের আলোর ফোঁটা দেখা যাচ্ছে। কেবল দূর থেকে রাখাল গরুর পাল নিয়ে রাতের জন্য গোয়ালে ফিরতেই গরুর গলার ঘণ্টার টুংটাং আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। আকবর একটি লম্বা শ্বাস নিলেন। একটু পরই সম্ভাজি হাজির হলেন। একটি রুপার পানের বাক্স ধরে মারাঠি নেতা বললেন, 'পান চলবে?' আকবর মাথা নাড়লেন, তার চোখ তখন নিচের দিকে।

তারপর আকবর বললেন, 'নিচে বেশ চুপচাপ মনে হচ্ছে। তবে আমার বাবার চোখ কান সবদিকে আছে, তাই আমি আমার নিরস্ত্র দুজন চর পাঠিয়েছি গ্রামবাসীর পোশাকে। ওরা দেখে নিশ্চিত হবে যে, আমরা কোনো ফাঁদে পা দিচ্ছি কি-না।'

সম্ভাজি বললেন, 'আপনি কী তাকে ভয় পান?'

আকবর এতক্ষণ পেটের উপর উপুড় হয়ে শুয়েছিলেন, প্রশ্নটি শুনে উঠে বসে বললেন, 'কী?'

'মাঝে মাঝে যখন আপনি আপনার বাবার কথা বলেন, তখন আপনাকে বেশ আতঙ্কিত মনে হয়।'

'আমি তাকে ভয় পাই না, তবে আমি জানি তিনি কী করতে সক্ষম। তাঁর ক্ষমতাকে আমাদের ছোট করে দেখা ঠিক হবে না।'

'তা করি না। তবে আমি কখনও সে কথা ভুলিনি যে, আমার বাবা কিভাবে তাঁকে বোকা বানিয়ে মিষ্টির ঝুড়িতে লুকিয়ে আগ্রা দুর্গ থেকে আমাকে নিয়ে পালিয়েছিলেন!' কথাটা বলে সম্ভাজি জিহ্বা দিয়ে চুক চুক শব্দ করলেও আকবর তাতে সুর মেলালেন না। তিনি কি করে বুঝবেন—তিনি তার বাবার সম্পর্কে কি অনুভব করেন, যেখানে সম্ভাজি তার নিজের বাবার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এক মুহূর্ত তিনি কী একটু ঈর্ষা অনুভব করলেন? না তা খুব বেশি হয়ে যায়, এটাকে অনুতাপ বলা চলে। আওরঙ্গজেব যদি অন্য ধরনের বাবা হতেন, তবে আজ তিনি এই পাহাড়ের চূড়ায় থাকতেন না। পরিবার আর তাহাব্বুর খানের মতো বন্ধুদের থেকে অনেক দূরে এমন লোকদের উপর নির্ভর

করে থাকতেন না, ভিন্ন পরিস্থিতে যারা তার শত্রু বলে গণ্য হতেন। তবে এখন এ ধরনের চিন্তার অবকাশ নেই। আকবর আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার সময়টা বুঝার চেষ্টা করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তার পেছনে একটু শব্দ শোনা গেল। পেছন ফিরে দেখলেন অশোক এসেছে। যে কয়েকজন চরকে দুর্গে পাঠান হয়েছিল অশোক তাদের একজন।

'নিচে কি আবিষ্কার করলে অশোক?'

'সবকিছু চুপচাপ আর শান্ত মনে হচ্ছে, জাঁহাপনা। ওরা রাতের জন্য প্রধান ফটক বন্ধ করে দিয়েছে, তবে বাইরে কোনো প্রহরী রাখেনি। মনে হয় ওরা কিছু সন্দেহ করেনি। নদীতে গিয়ে আবার দেখলাম খুব বেশি হলে কোমর পর্যন্ত পানি হবে।'

আকবর সম্ভাজির সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে বললেন, 'তাহলে চলুন, আমরা যাই!'

ফিস ফিস করে নির্দেশ চলে গেল অপেক্ষমাণ লোকের সারির শেষ পর্যন্ত। প্রথম দলটি পাহাড়ের কিনারা দিয়ে ঢাল বেয়ে নিচে দুর্গের দিকে নামতে শুরু করলো। আকবর তার লোকজনসহ প্রথমে গেলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন দ্রুত দৌড়ে নামেন, কিন্তু তিনি বেশ সাবধানে নামতে লাগলেন যেন কোনো আলগা পাথর গড়িয়ে না পড়ে। হঠাৎ রাতের নৈঃশব্দ ভেদ করে পেঁচার ডাক আর পরপরই এর শিকারের তীব্র আর্তচিৎকার শুনে তিনি চমকে গেলেন। অন্ধকারে শব্দগুলো খুব জোড়ালো শোনাল।

আধঘণ্টা পর আকবর নদীর তীরে পৌঁছলেন। লোকজন তার চারপাশে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। আশঙ্কা করছিলেন, যে কোনো মুহূর্তে হয়তো কেউ সতর্ক করে চিৎকার করবে আর দুর্গের ছাদ থেকে মশালের আলো দেখা যাবে, এমনকি যখন দুজন লোকের হাত থেকে লোহার আঁকশিভরা একটি ধাতুর টিন পড়ে গেল, তারপরও কিছু হল না। এরপর অশোককে অনুসরণ করে আকবর তার লোকজনসহ তপতি নদীর উষ্ণ পানিতে নেমে পড়লেন। অশোক ঠিকই বলেছিল। নদী পারাপারের স্থানটিতে পানি বেশ কম ছিল। পানির উপর গাদা বন্দুক আর বারুদের শিং হাতে নিয়ে যেতে খুব একটা কষ্টকর ছিল না। তাছাড়া নদীর তলদেশে বালুময় আর কোনো স্রোত না থাকায় পা পিছলে পড়ে যাবার কিংবা পানি ছলকে উঠে শত্রুপক্ষকে সতর্ক করে দেওয়ারও ভয় নেই।

দ্বীপে পৌঁছে আকবর তার লোকজন নিয়ে আমগাছের ছড়ানো ডালপালার ঘন পাতার ছাউনির নিচে গেলেন, সেখানেই সবার মিলিত হওয়ার কথা। একটুপরই মারাঠি আর রাজপুত সৈন্যরা এসে ওদের সাথে মিলিত হল।

তারপর সম্ভাজির দুই লোক বারুদের বস্তা, লম্বা পলিতা আর চকমকির বাক্সের ওজনের ভারে নিচু হয়ে মূল ফটকের দিকে নিঃশব্দে এগোল। আর একই ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে আরো দুজন অপেক্ষা করছিল, যদি কোনো কারণে আগের দুই লোকের কোনো ধরনের অঘটন ঘটে। তারপরও সবদিক নিশ্চুপ।

ইতোমধ্যে দড়ি আর মই নিয়ে দশজন করে এক একটি দল দুর্গের দেয়ালের নিচে অবস্থান নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ওরাও নিঃশব্দে এগিয়ে দেয়ালের নিচে পৌঁছল। এবার ফটকে বারুদ বসাবার লোক দুজনের কাছ থেকে একটি সাংকেতিক নিচু ডাক শোনা গেল, অর্থাৎ ওদের কাজ হয়েছে, বারুদের বস্তাগুলো জায়গামত বসান হয়েছে। আকবরের দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নেড়ে সম্ভাজি ফিস ফিস করে 'শুভকামনা' জানিয়ে দুর্গের দেয়ালের নিচে একটি আক্রমণকারী দলের কাছে চলে গেলেন। এবার আকবর সঙ্কেত করতেই একবার শিঙ্গা ফুঁকা হল। প্রায় সাথে সাথে দুর্গের ভেতর থেকে চিৎকার চেচামেচি শোনা গেল। কয়েক মুহূর্তপর দুর্গের ছাদে মশাল জ্বলে উঠলো। তারপর একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। আকবরের কানে ঘণ্টার মতো বাজতে লাগলো আর প্রচণ্ড ধুলায় তিনি কাশতে শুরু করলেন। বারুদ নিয়ে যারা গিয়েছিল ওরা ওদের কাজ সফলভাবে করেছে।

তরোয়াল হাতে নিয়ে আকবর ধুলা আর ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে প্রধান ফটকের দিতে ছুটে চলতে চলতে চিৎকার করে উঠলেন, 'এসো আমার সাথে!' বিস্ফোরণের ধাক্কায় ফটক দালানের একপাশের মাটির দেয়াল ভেঙ্গে পড়েছে আর লোহার ফটকের একটি পাল্লা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। ছুটতে ছুটতে তিনি তার অন্যদলের লোকজনের চিৎকার শুনতে পেলেন। ওরা দেয়ালের উপর দিয়ে দড়ি আর আকশি ছুঁড়ে দ্রুত মই বেয়ে দেয়ালে উঠতে শুরু করেছে। তারপর একজায়গায় জমাকরা আবর্জনার উপর পা লেগে হোঁচট খেয়ে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই তার মাথার উপর দিয়ে একটি গোলা শিষ দিয়ে উড়ে চলে গেল।

নিজেকে সামলে নিয়ে আকবর দেখলেন আধো-অন্ধকারে কয়েক ফুট সামনে সবুজ পোশাকপরা একজন বরকন্দাজ একটি ভাঙ্গা ইটের দেয়ালের আড়ালে অর্ধেক লুকিয়ে রয়েছে। দ্বিতীয়বার গোলার জন্য লোকটি মনোযোগ দিয়ে তার গাদা বন্দুকের লম্বা নলে বারুদ আর গোলা ভরছিল। আকবর ছুরি বের করে সামনে ছোঁড়ার জন্য হাত পেছনে নিতেই লোকটি মুখ তুলে তাকাল। পাকা চুলের লোকটিকে দেখে চিনতে পেরে আকবরের দম বন্ধ হয়ে এল। যুবক বয়সে করিম খান আওরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত দেহরক্ষীদলের একজন সদস্য ছিল।

আকবর একটু ইতস্তত করলেন, প্রায় হাত নামিয়ে ফেলতে যাচ্ছিলেন। তারপর দেখলেন করিম তাকে দেখেই পরিষ্কার চিনতে পেরে গম্ভীর মুখে দ্রুতহাতে বন্দুকে গোলা ভরার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আকবর আর দেরি না করে ছুরিটা ছুঁড়ে মারলেন। ছুরির ডগাটি করিম খানের গলায় বিঁধলো, সে তখন বন্দুক খাড়া করে আকবরের দিকে তাক করছিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতেই প্রবীণ লোকটি সামনে পড়ে গেল, আর তার হাত থেকে গাদা বন্দুকটি ছিটকে আকবরের পায়ের কাছে পড়ে গেল।

যন্ত্রণায় ছটফট করা করিম খানের দেহের উপর দিয়ে লাফ দিয়ে আকবর কয়েকগজ সামনে তার লোকজনের দিকে ছুটলেন। ওরা তখন দুর্গের আরো ভেতরে ঢোকার জন্য লড়াই করে যাচ্ছিল। একজন তরুণ সেনা কর্মকর্তা তরোয়াল হাতে নিয়ে ওদের আগে আগে ছুটে ভেতরের একটি ফটকের দিকে যাচ্ছিল। তারপর সে হঠাৎ চিৎকার করে ঘুরে পড়ে গেল। তরোয়াল ফেলে দিয়ে একহাতে নিজের গলা চেপে ধরলো। শত্রুপক্ষের বরকন্দাজদের গাদা বন্দুকের গোলা লক্ষভ্রষ্ট করার জন্য আকবর তার লোকদের সাথে মিলে এলোপাতাড়ি মোগল সেনাদের দিকে তরোয়াল চালাতে শুরু করলেন। ওরা ওদের আবাস থেকে বের হয়ে অস্ত্র হাতে নিয়ে তৈরি হওয়ার জন্য চেষ্টা করছিল। রক্তে পিচ্ছিল পাথরের মেঝেতে কয়েকবার তার পা পিছলে গেল। তাসত্ত্বেও আকবর তার লোকদের সাহায্যে এগিয়ে গেলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় ওরা তখন দৃঢ়সংকল্প অল্প সংখ্যক মোগলদেরকে ধীরে ধীরে পিছু হটতে বাধ্য করছিল। তারপর ওরা একটি খিলানে ঢাকা চওড়া তোরণের মধ্য দিয়ে দুর্গের অভ্যন্তরস্থ উঠানের দিকে ছুটে গেল। দেহ শক্ত করে তিনি আরো শত্রুর খোঁজে চারপাশে তাকালেন, তবে অধিকাংশই দুর্গের দালানের ভেতরে পালিয়ে গেছে, আর কয়েকজন অস্ত্র মাটিতে ফেলে আত্মসমর্পণ করলো।

দুর্গের ছাদে তখনও প্রচণ্ড লড়াই চলছিল। আকবর মুখ তুলতেই দেখলেন একজন লোক উপর থেকে মাথা নিচের দিকে করে কঠিন পাথরের মেঝেতে পড়তেই তার মগজ বের হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। চাঁদের আলোয় শত্রু না মিত্র তিনি বুঝতে পারলো না। তার নিজের সৈন্য আর সম্ভাজির সৈন্যরা মনে হল ভালোই লড়াই করছে। শিরস্ত্রাণের সাদা পালক দেখে সম্ভাজিকে সহজেই চেনা যাচ্ছিল। তিনি সবার সমনে দাঁড়িয়ে তার চেয়ে আকারে দ্বিগুণ ভালুকের মতো একজন লোকের সাথে লড়ে যাচ্ছিলেন। ক্ষিপ্রগতিতে লোকটির তরোয়ালের কোপ এড়িয়ে তিনি হঠাৎ সামনে লাফ দিয়ে লোকটির উপরে উঠান হাতের নিচে দিয়ে এগিয়ে তার চওড়া বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিলেন। তার শত্রু

কয়েকমুহূর্ত টলমল করতে করতে দুই হাত শূন্যে তুলে নিচে উঠানে পড়ে গেল।

আকবর দেখতে পেলেন তার একজন সেনা কর্মকর্তা ছাদের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে তার দিকে ছুটে আসছে। সে এসে বললো, 'জাঁহাপনা, দুর্গের সুবেদার কয়েকজন সেনাসহ উপরের একটি কামরায় নিজেকে আবদ্ধ করেছে। তবে সে সেখান থেকে চিৎকার করে বলেছে, আপনি যদি তার সৈন্যদেরসহ তার প্রাণ বাঁচাবার অঙ্গীকার করেন, তবে সে দুর্গ খুলে দিয়ে সমস্ত রসদ আপনার হাতে তুলে দেবে। তবে সে বলেছে সম্ভাজি নয় আপনাকে কথা দিতে হবে।'

'তাকে বল আমি আর সম্ভাজি এক, তবে আমি তার কথায় রাজি হতে পারি একটি শর্তে। সে দুর্গে যত মোগল পতাকা আছে সেগুলো আমার হাতে তুলে দেবে। আমি সম্রাট। এটা আমার জন্য উপযুক্ত।'

আমি আপনার দুর্গ আর এই পতাকাগুলো দখল করেছি। ঠিক সেভাবে আপনার সিংহাসন দখল করবো। আমার মিত্রদের সাথে আপনি অন্যায় আচরণ করেছেন, যেমন করেছেন আমার সাথে। আমি লড়াই চালিয়েই যাব যতদিন না নিজের জন্য আর আমার অত্যাচারিত জনগণের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারবো।—আকবর।

আওরঙ্গজেবের হাসি পেল। তিনি বললেন, 'আকবর যে একটা বোকা আর সাদাসিধা তা এই চিঠিতেই প্রমাণিত হচ্ছে। সে কি আসলেই ভেবেছে যে, এরকম একটা ছোট্র গুরুত্বহীন, অরক্ষিত দুর্গ দখল করলেই আমার হাঁটু কাঁপতে থাকবে?'

শরবতের গ্লাসে একটু চুমুক দিয়ে উদিপুরী বললেন, 'কী এটা? কী লেখা আছে এতে?' আওরঙ্গজেব জানেন উদিপুরী শরবত নামে যা পান করছেন, তাতে সম্ভবত শরাব মেশানো আছে। কঠোর ধর্মীয় বিশ্বাস পালন করলেও তিনি এবিষয়ে এখনও আপত্তি করতে পারেন নি। একবার তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন যে, তার দেশ জর্জিয়ায়, যেখানে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন সেখানেই মদ আবিষ্কৃত হয়েছে। আর এর স্বাদ তাকে তার নিজের দেশের কথা মনে করিয়ে দেয় আর তার পেটের শূল বেদনার যে প্রবণতা

আছে তার বিরুদ্ধে কাজ করে। বোরহানপুরে তাঁর সাথে আসার জন্য তিনি আবদার শুরু করলে তিনি তাকে আসতে নিষেধ করেন নি। যে রাতে তিনি তাঁর মায়ের ঘরগুলো উন্মুক্ত করেছিলেন, তখন থেকে অনুভব করছিলেন যে, এই স্থানটিতে যে বিষণ্ন স্মৃতি আর অশুভসূচক লক্ষণ ছিল তার কিছুটা তিনি ছড়িয়ে দিয়ে অদৃশ্য করেছেন। এর ফলে জাহানারার মৃত্যুর পর বিষণ্নতার কারণে তাঁর মনে যে অসাড়ভাব হয়েছিল তা ঝেড়ে ফেলতে পেরেছিলেন।

তিনি বললেন, 'একটা ছোট্ট জয়ের পর আকবর একটা মুরগির বাচ্চার মতো খুশিতে চেঁচাচ্ছে। আর বিজয়স্মারক হিসেবে কয়েকটা পতাকা দখল করে সেগুলো আমার কাছে পাঠাবার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। সে যেরকম বোকা সেরকম উদ্ধত আর নিজের সম্পর্কে অতিমাত্রায় উচ্চ ধারণা পোষণ করে।'

'আমি জানি সে সীমালঙ্ঘন করেছে আর আমি কখনও তার স্বপক্ষে কিছু বলবো না। তবে নিজের রক্তমাংসের সন্তান সম্পর্কে এভাবে আপনার কথা বলাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। এতে আমার ভয় হচ্ছে যদি আমাদের ছেলে কমবক্স কখনও আপনাকে অসন্তুষ্ট করে, তাহলে তার কী হবে।'

'তুমি জান আমি কমবক্সকে ভালোবাসি। তবে বড় হলে তাকে শিক্ষা নিতে হবে, যা আকবর নেয় নি; আর সেটা হল আমাকে মান্য করা আর কর্তব্যপরায়ণ হওয়া। আশা করি বড় হওয়ার পর কমবক্স আমাকে নিরাশ করবে না। তবে তার ভাগ্য তার হাতেই রয়েছে, সে কি করতে চাইবে তার উপর। তাকে এটা বুঝিয়ে আর এটা করে মা হিসেবে তুমি একজন সন্তানের জন্য সবচেয়ে ভালো কাজই করবে—বিশেষত যে ছেলে একজন শাহজাদা।'

উদিপুরী গ্লাস থেকে আরেক চুমুক শরবত খেলেন। আওরঙ্গজেব তার সুন্দর চেহারা এরকম বিষণ্ন হতে খুব একটা দেখেন নি, তবে তাকে বাস্তবতা বুঝতে হবে—তিনি একজন সম্রাট। লক্ষ লক্ষ মানুষের নিয়তি তাঁর হাতে। দয়া এবং সমবেদনা—এসব হচ্ছে দুর্বলতা এবং নারীসুলভ ভাবাবেগ—যা জাহানারা কখনও স্বীকার করেন নি। এমনকি নিজ পরিবারের প্রতিও দেখানো যাবে না।

উদিপুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন আপনি কী করবেন? মানে আকবরের কথা বলছি।'

'এখানে যা করতে এসেছি তাই করবো। মূল সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রবর্তী বাহিনীর সাথে মিলিত হব। তারপর তাদের নেতৃত্ব দিয়ে তাকে পরাজিত করে চিরদিনের জন্য তার ঔদ্ধত্য সেখানেই শেষ করে দেব। তিনদিনের মধ্যে বোরহানপুর ছেড়ে চলে যাব।'

অধ্যায় ষোল

ইসলামের মাঝে শত্রু

আওরঙ্গজেব মৃদু হেসে তাঁর বিশ্বস্ত গুপ্তচরবাহিনী প্রধান ওয়াজিম খানকে বললেন, 'ওয়াজিম খান, ওদের সেনাবাহিনী ছেড়ে যে লোকটি পালিয়ে এসেছে, তাকে এখানে নিয়ে এস। আর তাকে আশ্বস্ত কর তার কোনো ভয় নেই। তুমি তাকে যে কথা দিয়েছ তা আমি অবশ্যই রাখবো।' সে যত দ্রুত সম্ভব সর্বাধিনায়কের লাল তাঁবু থেকে বের হয়ে গেল। ওয়াজিম খান তাঁকে ইতোমধ্যে তার বিশ্বাসঘাতক ছেলের সাথে সম্ভাজির সুবিধাজনক মিত্রতার কথা জানিয়েছে। এখন সে কথা তিনি এবং তাঁর সেনাপতিরাও আবার শুনবেন।

ছয়মাস আগে বোরহানপুর থেকে বের হয়ে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে কোনো বাধা ছাড়াই দাক্ষিণাত্যের ভেতরে গোদাবরি নদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছেছেন। এখন সেখানেই সেনাবাহিনীসহ তাঁবু গেড়েছেন। কিন্তু আসলে কি অর্জন করেছেন? কেবল তার লোকজনের চরম পরিশ্রান্তি আর কোষাগার খালি হয়েছে। আকবর, সম্ভাজি আর তার সৈন্যরা রুক্ষ পাহাড়ি এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে আর সরাসরি যুদ্ধ না করে মাঝে মাঝে চোরাগোপ্তা হামলা করে পালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি তাঁর গুপ্তচরেরাও কোনো কিছু খুঁজে আনতে পারে নি। তবে এবার মনে হচ্ছে ওয়াজিম খান ভয় দেখিয়ে আর প্রতিশ্রুতি মিলিয়ে যে ধরনের কাজ করে থাকে, তা কাজে লেগেছে। ঠিক এরকম করা হয়েছিল তাহাব্বুর খানের সাথে। সে এখন উত্তর কাশ্মিরে একটি অখ্যাত চৌকিতে অপরাধবোধে পীড়িত বিবেক নিয়ে ক্রমশ নির্জীব আর ক্ষীণ হয়ে দিন কাটাচ্ছে।

একটু পরই সুন্দর করে দাড়ি ছাঁটা হালকা-পাতলা গড়নের একজন যুবককে নিয়ে ওয়াজিম খান হাজির হল। সে আওরঙ্গজেবকে কুর্নিশ করতেই ওয়াজিম খান বললো, 'জাঁহাপনা, এ হচ্ছে ফিরোজ বেগ। কয়েকদিন আগেই সে আপনার ছেলের সাথে ছিল।'

'ওঠ ফিরোজ বেগ। এখানে সবাই তোমার পরিচয় জানে না। সবাইকে জানাও তুমি কে আর বিশ্বাসঘাতক আর নীচ আকবরের কাছে তোমার কী অবস্থান ছিল।'

'আমি আপনার পুরোনো সহকারী কোষাধক্ষ্য মোহাম্মদ বেগের একমাত্র পুত্র। আমাদের পরিবার আপনার পূর্বপুরুষ বাবরের সাথে ফারগানা থেকে এদেশে এসেছে।'

আওরঙ্গজেব মাথা নাড়লেন। মোহাম্মদ বেগের জীবনের শেষ বছরগুলো নিশ্চয়ই খুবই কষ্টকর হত, যদি তার ছেলে সহযোগিতা না করতো। এব্যাপারে ওয়াজিম খানের চালাকির চাবিকাঠি এখানেই ছিল। তারপর তিনি বললেন, 'বিদ্রোহী শিবিরে তোমার কী ভূমিকা ছিল।'

'আমি একজন উপদেষ্টা ছিলাম। সম্ভাব্য মিত্র খোঁজার জন্য আকবর মাঝে মাঝে আমাকে তার দূত হিসেবে বিদেশিদের কাছে পাঠাতেন।' কথাটা বলার সময় ফিরোজ বেগের গলার স্বর একটু ইতস্তত করছিল, তার কথা ঠিকমতো শোনা যাচ্ছিল না।

'বল, আর কোন দায়িত্ব ছিল তোমার?' আওরঙ্গজেব জানতেন, ফিরোজ বেগের ব্যাপারে ওয়াজিম খান প্রথমে তখনই খোঁজখবর নিতে শুরু করে, যখন জানা গিয়েছিল যে, সে আওরঙ্গজেবের একজন সেনাপতিকে ঘুষ দিয়ে হাত করার চেষ্টা করছিল। কারও আনুগত্য দোদুল্যমান হয়ে যেতে পারে ভেবে, তিনি তাদেরকে বুঝতে দিয়েছিলেন যে, আকবর যে কারও সাথে যোগোযোগ করার চেষ্টা করছে এ সম্পর্কে তিনি সজাগ। ফিরোজ বেগ বললো, 'অনেক সময় আমি আপনার রাজদরবারের কারও কারও সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পরবর্তীতে ওয়াজিম খানকে সাহায্য করেছিলাম তাদের নাম প্রকাশ করতে, যারা আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে। এটা আমি শপথ করে বলতে পারি, জাঁহাপনা।'

'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি।' কথাটি বলে আওরঙ্গজেব তাঁর চারপাশে বসা সেনাপতিদের দিকে তাকালেন, কিন্তু মাত্র কয়েকজন তার চোখে চোখে তাকাতে পারলো। তারপর তিনি আবার ফিরোজ বেগের দিকে ঘুরে বললেন, 'এখন আকবরের শিবিরের খবর কী বল?'

'আপনি অগ্রসর হতেই ওরা দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ি এলাকার আরো ভেতরে ঢুকে যেতে বাধ্য হচ্ছে, আর এতে গত কয়েক মাসে আকবর আর সম্ভাজি, একে অপরের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছেন। বিশেষত সম্ভাজির অতিসর্তকতা দেখে আকবর ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলেন...'

'তুমি কী করে তা জানলে?'

এবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে ফিরোজ বেগ বেশ জোরালো গলায় বললো, 'মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে আমি একটি গোপন সমরসভায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আকবর আর সম্ভাজিসহ মোট বারোজন উপস্থিত ছিল। সেখানে আকবর প্রস্তাব করলেন, দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ি এলাকা থেকে বের হয়ে আপনার এলাকায় গিয়ে আপনার সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হতে। এছাড়া তিনি আরো মিত্র খোঁজার জন্য ওদেরকে আহ্বান করলেন। এমনকি তিনি আমার নাম উল্লেখ করে বললেন, রাজপুতদেরকে আবার তার সাথে যোগ দেবার জন্য উৎসাহিত করতে আমাকে সেখানে পাঠানো যেতে পারে। তিনি প্রবল উৎসাহ দেখিয়ে ওদের সামনে একটি চিত্র তুলে ধরলেন, দ্রুত এগিয়ে ওদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে আপনার বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে আর এভাবে সহজ জয় পাওয়া যাবে। তবে এ প্রস্তাবে সম্ভাজি একটু সন্দিহান ছিলেন। তিনি আকবরকে প্রশ্ন করলেন যে, কতজন মিত্র তিনি নিশ্চিত করতে পেরেছেন, আর তিনি যুদ্ধ বিজয়ের ব্যাপারেও নিশ্চয়তা চাইলেন, কারণ তার সৈন্যদেরকে যদি অতিপরিচিত পাহাড়ি এলাকার আশ্রয় ছেড়ে উষ্ণ সমতলভূমি আর মরু এলাকায় যেতে হয়, সেক্ষেত্রে যুদ্ধে জয়লাভের নিশ্চয়তা কতটুকু আছে। তাছাড়া সেখানে তারা শক্তিশালী আর ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত মোগল সেনাবাহিনীর সামনে অরক্ষিত হয়ে পড়বে। আকবর তাকে উত্তরে বললেন, হিন্দুস্তানের সকল মানুষের স্বার্থে আপনার কাছ থেকে মোগল সিংহাসন কেড়ে নেওয়ার মিশনের প্রতি তার বিশ্বাস থাকতে হবে।

'সম্ভাজি হেসে বললেন, "আপনার এই মহান ব্রতের কারণে আপনি সামনে এগোতে চাচ্ছেন কিন্তু এতে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না, আমি কেন যাব। কেন আমি একটি মাত্র ঝুঁকির কারণে আমার বাবার সকল অর্জন নষ্ট করবো? তিনি বাস্তবতার কথা চিন্তা করে সবকিছু পরিকল্পনা করেছিলেন। আমার হয়তো আমার বাবার মতো সামরিক কুশলতা নেই, তবে আমি জানি তিনি কখনও আপনার এধরনের প্রস্তাবে রাজি হতেন না, আর আমিও হবো না। আমাদেরকে ছোট ছোট নিশ্চিত পদক্ষেপ নিতে হবে।"

আকবর প্রতিবাদ করলেন, 'কিন্তু এতে তো অনেক সময় লেগে যাবে।'

সম্বাজি উত্তরে বললেন, 'সময় আমাদের অনুকূলে আছে। আমরা আপনার বাবার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। যতই দিন যাবে ততই তিনি জনগণের কাছ থেকে দূরেও সরে যাবেন আর এতে আমাদের কাজও সহজ হয়ে আসবে। আমরা যদি তার সেনাবাহিনীকে বেশিদিন এখানে আটকে রাখতে পারি,

তাহলে তাদের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়বে আর এর খরচ চালাতে গিয়ে তাঁকে খাজনার বোঝা বাড়িয়ে দিতে হবে।'

এভাবে তর্কাতর্কি করতে করতে এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে সম্ভাজি আকবরকে তার বোকামি আর অপরিণামদর্শী আশাবাদের জন্য দোষারোপ করলেন। তখন আপনার শান্তস্বভাবের ছেলে গর্জে উঠলেন, 'আমি তো লড়াই না করবার স্বপক্ষে যুক্তি না দেখিয়ে অন্তত লড়াই করতে তো চাচ্ছি।' এতে রেগে গিয়ে সম্ভাজি আকবরের দিকে ছুটে গিয়ে তাকে একটা ঘুষি মারলেন। আকবর একপাশে সরে গিয়ে তার ঘুষি এড়িয়ে তাকে জাপটে ধরে মাটিতে ফেলে মল্লযুদ্ধ শুরু করলেন। তারপর ওরা সেখানে ছোট ছেলেদের মতো মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে লড়ে যেতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই মিলে তাদেরকে আলাদা করলাম। পরে ওরা নিজেদের মধ্যে মিটমাট করলেন। তবে সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে করলেন, কেননা ওরা বুঝতে পেরেছিলেন, ওদের পরস্পরের সহায়তার প্রয়োজন আছে। তবে সম্ভাজি শক্তিক্ষয়ের যুদ্ধ এড়িয়ে চলার নীতি অনুসরণ করে চললেন আর দাক্ষিণাত্য থেকে বের হয়ে মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত হামলা ছাড়া অন্যকোনো কিছু করার ব্যাপারে অনীহা দেখালেন। আকবর এতে আরো হতোদ্যম আর নিরাশ হয়ে পড়লেন। প্রকৃতপক্ষে তার মন এত খারাপ হয়ে গেল যে, তিনি পারস্যে গিয়ে শাহের সহায়তা কামনা করার কথা বলতে শুরু করলেন, যেরকম আপনার পর্বপুরুষ হুমায়ুন করেছিলেন। এমনকি তিনি প্রস্তাব করলেন, আমাকেই দূত হিসেবে পাঠাবেন।'

আওরঙ্গজেব উত্তরে বললেন, 'যদি আমার ছেলে পারস্যে যায় তবে সে নিজেকে আরো বিশ্বাসঘাতক হিসেবে প্রমাণ করবে।' তবে একথাটা শুনে ভেতরে ভেতরে একটু আশ্বস্ত হলেন যে, আকবর হয়তো হিন্দুস্তান থেকে পালিয়ে যাবে। এতে তিনি একটা উভয়-সঙ্কটে পড়ে গিয়েছিলেন যে, ধরা পড়লে তাকে কোতল করা হবে কি-না। তবে সে যদি দাক্ষিণাত্যে রয়ে যায় তবে অবশ্যই করবেন। তবে আরেকদিকে হিসেব করছিলেন, শাহ আর আকবরের মৃত মায়ের শক্তিশালী পারসিক সম্পর্ক কতটা কাজ দেবে আর ওরা একসাথে মিলে তার সদা অশান্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অসন্তোষ সৃষ্টিতে কতটুকু ইন্ধন জোগাতে পারবে। যাইহোক এসব চিন্তা একপাশে সরিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার সেনাবাহিনী এড়িয়ে আকবর আর সম্ভাজি কিভাবে অর্থ আর সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র আর রসদ জোগাড় করছে?'

'ওরা বিজাপুর আর গোলকুন্ডার সাহায্য পাচ্ছে, জাঁহাপনা। বিজাপুরিরা মারাঠি সৈন্যদেরকে তাদের এলাকা দিয়ে আসা-যাওয়ার নিরাপদ পথ দিচ্ছে আর

আপনার সেনাবাহিনী ওদের পিছু নিলে ওদেরকে আশ্রয় দিচ্ছে। এর বিনিময়ে ওরা আপনার এলাকা থেকে লুটপাট করে যা পায়, তার একটি অংশ বিজাপুরিরা পেয়ে থাকে। আর গোলকুন্ডিরা তাদের কয়েকটি হীরার খনি থেকে হীরা পাঠিয়ে স্থানীয় াবে ঘোড়া কেনার অর্থ জোগাড় করছে। আর উপকূলের নতুন একটি বন্দর স্থাপনা—বোম্বে (মুম্বাই) হতে ইংরেজদের কাছ থেকে সর্বাধুনিক কামান আর গাদা বন্দুক কিনছে। গোলকুন্ডিরা মারাঠিদেরকে আপনার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার প্রথম ব্যূহ মনে করে।'

আওরঙ্গজেব তাঁর চেয়ারের হাতলে একটা ঘুষি মেরে বললেন, 'ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে কী কোনো সংহতি নেই?'

'দুই শাসকই মনে করেন সম্ভাজির চেয়ে আপনি ওদের বড় ভীতি। এছাড়া ওরা ওদের নিজেদের জীবন কিংবা প্রতিবেশীদের প্রতি .তাদের রাজ্যের নীতি আমাদের ধর্মের রীতি অনুযায়ী পরিচালিত করে না। ওরা অন্য বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।'

'তার মানে কী বলতে চাচ্ছ তুমি?'

'তার পূর্ববর্তী অনেক শাসকের মতো গোলকুন্ডার শাসক আদিল হাসান ধর্মীয় অনুশাসন মানার বিষয়ে অত্যন্ত শিথিল। তিনি লাম্পট্য ব্যবহারের সুযোগ দেন আর নিজের প্রতিটি কামনা-বাসনা মেটাতে গিয়ে তার সম্পদ উড়িয়ে হৈচৈ করে আনন্দোপভোগ করে দেশকে উচ্ছন্নের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। দূতিয়ালির কাজে হায়দারাবাদে একবার গিয়ে আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তার একটা উদাহরণ দিতে পারি। শুক্রবার পবিত্র দিন হলেও আদিল হোসেন তার বেলকনি থেকে একটি অনুষ্ঠান উপভোগ করছিলেন। সংক্ষিপ্ত আর আঁটোসাটো স্বচ্ছ চোলি আর গায়ে সেঁটে থাকা পায়জামা পরা প্রায় এক হাজার নর্তকী উঠানে ঢুকলো। গোলকুন্ডি ঢোলকের তালে তালে ওরা যখন নিতম্ব ঠেলে চক্রাকারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচতে শুরু করলো, তখন আদিল হাসানের নির্দেশে বড় বড় পিপায় তাড়ি এনে মাঠের প্রত্যেক কোণে রাখা হল। সেখান থেকে তাড়ি জগে ঢেলে মাঠের চতুর্দিকে বসা তার কিছু প্রিয় সেনাপতি আর সভাসদদের পরিবেশন করা হল। ওরা সাথে সাথে সেই কড়া তাড়ি খেতে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

'অন্ধকার হতেই পরিচারকরা লম্বা লম্বা মোমবাতি জ্বেলে দিল আর ঢোলকের বাজনা আরো উত্তাল হয়ে উঠলো। আর এদিকে মেয়েরা গান অন্যান্যরাও গাইতে শুরু করলো, আর কিছু কিছু মেয়ে বুকে হাত রেখে উচ্ছৃঙ্খল ভঙ্গি করতে লাগলো। কামনায় উত্তেজিত হয়ে কিছু পুরুষ মাঠে নেমে পড়তেই

মেয়েরা চোলি পুরোপুরি খুলে ঘামে ভিজে চকচক করা বুক উন্মুক্ত করে দিল। একটু পরই কিছু নারী-পুরুষ নির্লজ্জভাবে সবার সামনে দেহমিলন করতে লাগলো। আর অন্যরা উঠানের মাঝখানে যে ফোয়ারা ছিল সেখানে লাফাতে শুরু করলো। ফোয়ারাতেও তাড়ির বন্যা ফেলে সয়লাব করা হয়েছিল। এরকম লালসাপূর্ণ দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি, জাঁহাপনা। এমনকি আদিল হাসানও ওদের সাথে যোগ দিলেন। তিনি আর তার এক পত্নী বেলকনিতে দাঁড়িয়ে জড়াজড়ি করা শুরু করলেন—'

'যথেষ্ট হয়েছে গোলকুন্ডার কেচ্ছা! এ ধরনের অধার্মিক অনৈতিক ঘটনার বিশদ বর্ণনা দেওয়ার আর দরকার নেই। এখন বল বিজাপুরিরা কেন সম্ভাজি আর আকবরকে সাহায্য করছে?'

'ওদের রাজা সিকান্দার একজন দুর্বলচিত্তের যুবক আর ওদের কোষাগার প্রায় শূন্য হয়ে যাওয়ায় শাসক পরিবারের নিজেদের মধ্যে বিভেদ দিন দিন গুরুতর হতে শুরু করেছে। বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দলের বেশিরভাগই তাদের অভ্যন্তরীণ বিবাদে মারাঠিদেরকে সম্ভাব্য মিত্র এবং সেই সাথে আপনার বিরুদ্ধে একটি প্রতিরক্ষা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করে। আপনার বিরুদ্ধে আকবর আর মারাঠিদের লড়াইয়ে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য ওরা নিজেদের মধ্যে প্রতযোগিতা করছে, যাতে এর বিনিময়ে তাদের সমর্থন লাভ করে। সিকান্দার নিজে বিশ্বাস করেন তার ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য মারাঠিদের সহায়তাই তার জন্য শ্রেষ্ঠ উপায়।'

আওরঙ্গজেব এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই শাসকরা এখন শিখবে হঠাৎ গজিয়ে উঠা এক বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গী হওয়াটা ঠিক নয়। আমি ঠিক করেছি আমরা বিজাপুর আর গোলকুন্ডা বিজয় করবো। এর ফলে বিধর্মী পাহাড়ি ইঁদুর সম্ভাজি আর আমার বিশ্বাসঘাতক ছেলে তাদের সহায়তা হারাবে আর সেই সাথে আমাদের সাম্রাজ্যের পরিধিও বেড়ে যাবে।'

সাথে সাথে আওরঙ্গজেবের কয়েকজন সেনাপতি সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো, 'আল্লাহু আকবর। আওরঙ্গজেব জিন্দাবাদ। সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন!' অন্যরাও তাদের সাথে সুর মিলিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচু করে তাঁর সিদ্ধান্তকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাল।

পুরো আলোচনার সময় মুয়াজ্জম তার বাবার চেয়ারের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শোরগোল থেমে যাবার পর তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'বাবা, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে দক্ষিণে আমার অভিযানের অগ্রগতি কিরকম ধীরগতির ছিল। যদিও আপনি মনে করেন এর বেশিরভাগ আমার দোষে হয়েছে, তবে

আমি তা সত্যিকার বিশ্বাস করি না। ঐ এলাকাটি অত্যন্ত রুক্ষ। আর সম্ভাজির প্রতি বিশ্বস্ততার ব্যাপারে মারাঠিরা সবাই প্রচণ্ডভাবে ঐক্যবদ্ধ। আর ওরা বেশ কয়েকবার প্রমাণ করেছে যে, ওরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। আর সে হিসেবে ওরা বিজাপুর এবং বিশেষত গোলকুন্ডারও যোদ্ধা। আমার মনে হয় বিজয় নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে একটি বড় ধরনের সেনাবাহিনীর ব্যবস্থা করতে হবে—এমনকি সম্ভাজির বিরুদ্ধে অভিযানে যে সেনাদল এখন রয়েছে তার চেয়েও বড়। এ ধরনের একটি সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে বেশ সময়ের প্রয়োজন আর হয়তো খাজনার পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিতে হবে। আর এতে প্রজাদের কষ্ট বেড়ে যাবে আর ওদের মধ্যে আরো অসন্তুষ্টি দেখা দিতে পারে।'

'মুয়াজ্জম, তুমি সবসময় কেন এরকম ভয়ে ভয়ে থাক? তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ভাল করেই জান, সুতরাং বুঝতেই পেরেছ, বিজাপুর আর গোলকুন্ডার শাসকদের বিরুদ্ধে আমার এই ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ আর ওদেরকে হটিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়ানোর সিদ্ধান্তটি যেরকম হঠাৎ করে নেওয়া মনে হচ্ছে, আসলেই তা নয়। বেশ কিছুদিন থেকেই আমি ওয়াজিম খানের গুপ্তচরদের কাছ থেকে যেসব খবর পাচ্ছিলাম, তার সাহায্যে ওদের বিরুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনীর তুলনামূলক শক্তি যাচাই করেছি। কাজেই আমি তোমাকে আশ্বস্ত করছি বর্তমানে আমাদের যে সেনা আছে তা এরজন্য যথেষ্ট।'

তারপর ছেলের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বললেন, 'প্রথমে বিজাপুরের বিরুদ্ধে আক্রমণ করবে যে মূল সেনাবাহিনী, তার নেতৃত্ব থাকবে কেবল আমার হাতে। তবে আমি তোমাকে একটা সুযোগ দেব, যাতে তুমি নিজেকে আবার যোগ্য প্রমাণ করতে পার। তুমি একটি প্রাথমিক অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে গোলকুন্ডা দুর্গ, তাদের সেনাবাহিনীর শক্তি আর তাদের মনোবল পরীক্ষা করে দেখবে।'

কামান টেনে আনার সময় তার ধাতব তীক্ষ্ণ শব্দ আওরঙ্গজেবের মাথার চারপাশে প্রতিধ্বনি করতে লাগলো। মাটির যে প্রতিরক্ষা বাঁধ গড়ে তোলা হয়েছিল, সেখান থেকে কেবল কামানের নলগুলো বের হয়ে রয়েছে। তারপর ওরা বিজাপুর দুর্গের পাথরের বুরুজের দিকে কামান দাগার জন্য প্রস্তুত হল। একবার গোলা ছোঁড়ার পর কামানের পেছন দিকের যে ধাক্কা হয়, তা সামাল দিতে গোলন্দাজ সেপাইরা মোটা রশি দিয়ে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করলো। ঘামে ভেজা শরীরের কোমর পর্যন্ত জামা খুলে ওরা কঠোর পরিশ্রম করছিল। তারপর

বারুদ আর গোলা লম্বা নলের ভেতরে ভরলো। এরপর ওরা ধরাধরি করে কামানটি তুলে নিয়ে এর ভারী সামনের অংশটি গোলা ছোঁড়ার অবস্থানে রাখলো।

বিজাপুর দুর্গ অবরোধ করা শুরু করার পর গত ছয় সপ্তাহে বেশি গরম হয়ে যাওয়ার কারণে কিংবা এর ঢালাইয়ের কোনো সমস্যা থাকায় কয়েকবার কামানের নল ফেঁটে গিয়েছিল। গোলন্দাজ সৈনিক আর ঢালাই কারখানার কারিগরদেরকে তাদের কাজ সঠিকভাবে জানতে হবে। তারপরও কামানের সামনের অংশ নতুন করে তৈরি করে, অতিরিক্ত লোকজনদের প্রশিক্ষণ দিয়ে, তারপর বর্ষার পর ভারী ভারী কামান আর অন্যান্য জিনিসপত্র দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ি এলাকা দিয়ে টেনে আনা মানে বিজাপুর আর গোলকুন্ডা বিজয় করে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে করতে প্রায় একবছর লেগে যাবে। এরপরই তিনি আকবর আর সম্ভাজির দিকে মনোযোগ ফেরাতে পারবেন।

একবার কামানের গোলা ছোঁড়ার পর হাওয়ায় ধোঁয়ার কুণ্ডলি সরে যেতেই তিনি কামান ছোঁড়ার ছিদ্রসহ বিজাপুরের দেয়াল আর তার উপরে উঁচু প্রাসাদের বিখ্যাত সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি গম্বুজগুলো দেখতে পেলেন। শহরের দেয়ালের বিভিণ্ন জায়গায় কামানের গোলার আঘাতে গর্তের মতো দাগ দেখা গেলেও দেয়ালটি প্রায় অক্ষতই রয়ে গেছে। মূল ফটকের দালান যেস্থানে রয়েছে সেই জায়গার দেয়ালটিতে অনেক গোলা ছোঁড়লেও কোনো হেরফের হয় নি। এখান থেকেই এঁকেবেঁকে একটি ঢালু পথ শহরের দিকে চলে গেছে। শক্তিশালী দেয়াল ছাড়াও বিজাপুরের চারপাশ ঘিরে একটি দুর্গপরিখা রয়েছে। পরিখাটি অর্ধেক গভীরতা পর্যন্ত পানি ভরা। এছাড়া মোগলদের হামলার কথা শুনে পরিখার সামনে বেশকিছু জায়গার ঘাস আর ঝোপঝাড় পুড়িয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। এর ফলে কোনো হামলাকারী এগোলে দেয়াল থেকে কামানের গোলা আর গাদা বন্দুকের গুলিও সহজে ছোঁড়া যাবে। অগত্যা গাদা বন্দুকের পাল্লা এড়াতে তাঁকে তাঁর কামানগুলো আরো পেছনে বেশ দূরে স্থাপন করতে হয়েছিল। এর ফলে সবচেয়ে বড় কামান থেকে গোলা ছোঁড়লেও দূরত্বের কারণে পাথরের দেয়ালে আঘাত করার আগে এর শক্তি কমে যাচ্ছিল। বিজাপুরিরা শহরে খাদ্য আর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে মজুদ করার যথেষ্ট সময় পেয়েছিল। আর বৃষ্টির পানি থেকেও যথেষ্ট পরিমাণে পানি ধরে রাখতে পেরেছিল। ওরা কেবল মাঝে মাঝে আওরঙ্গজেবের সৈন্যদের দিকে গোলা ছোঁড়তো,যখন নিশ্চিত হত যে লক্ষভেদ করতে পারবে। আর এতে ওদের গোলাবারুদেরও অপচয় হচ্ছিল না। গোলকুন্ডা কিংবা মারাঠিরা

সাহায্য পাঠাবার আগে তাকে বিজয় লাভ করতে হলে একমাত্র সামনাসামনি আক্রমণ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

তিনি ঘুরে ওয়াজিম খানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কোনো ধারণা আছে ফটকের সামনে যে পরিখাটি আছে সেটা কিভাবে ভরাট করে আমরা একবার ফটকের দিকে আক্রমণ চালাতে পারি?'

'আমার প্রথম ভাবনা হল জাঁহাপনা, এ ধরনের কোনো প্রচেষ্টা করতে হলে আমাদেরকে অন্ধকার কিংবা ধোঁয়ার আড়ালে কাজ করতে হবে।'

ধোঁয়া যথেষ্ট নয়, আর এটা বাতাসের মর্জির উপর নির্ভর করে। তবে অন্ধকার তো হবেই।'

'কয়েকদিন পরই পূর্ণিমা। আমাদের মনে রাখতে হবে পূর্ণিমার আলো আমাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে।'

'আমিও তাই ভাবছি। আশা করি এর আগেই কাজ শুরু করতে পারবো।'

ওয়াজিম খান কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললো, 'জাঁহাপনা, পরিখাটি একটা কঠিন বাধা, তবে আমার কাছে একটা ফন্দি আছে। একসাথে কাজ করে আমরা অনেকবার পুরস্কারের শক্তির প্রমাণ পেয়েছি। ধনী-গরিব সকলেই অর্থের জন্য লালায়িত। শিবির স্থাপন আর মাটির কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমাদের সাথে অনেক বেকার মজুর রয়ে গেছে। ওরা গরিব আর প্রায় অনাহারেই রয়েছে। আমরা ওদেরকে আর কোনো কাজই দিতে পারছি না। ওদেরকে যদি বলি এক ঝুড়ি মাটি পরিখার পানিতে ফেললে কয়েকটি মুদ্রা পাবে তাহলে কেমন হয়?'

'চমৎকার বলেছ! তুমি যেরকম বলেছ, ওদেরকে দেওয়ার মতো কোনো কাজ আমাদের হাতে নেই সেক্ষেত্রে এ প্রস্তাবটি দিতে ক্ষতি কী? আর আমার মনে হয় তোমার কথাই ঠিক, ওদেরকে আমাদের শিবির থেকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার দরকার নেই। তার চেয়ে বরং অর্থপুরস্কার দিলে ওরা খুশি মনেই জীবন বাজি রেখে কাজটা করবে। তবে একাজে সফলতা পেতে গেলে একসাথে অনেক জনকে অন্ধকারে এগিয়ে যেতে হবে।'

'অবশ্যই। আর ওদেরকে দেয়াল থেকে কেউ দেখে ফেললে, সেক্ষত্রে তাদেরকে গোলন্দাজ আর বরকন্দাজদের সহায়তা দিতে হবে। অবশ্য দেখা তো যাবেই।'

'একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক। আগামীকাল মধ্যরাতের পরপরই এই অভিযান শুরু করবো। এই সময়ের মধ্যে ওরা যথেষ্ট পরিমাণে মাটি কেটে জোগাড় করে রাখতে পারবে।'

ছত্রিশ ঘণ্টা পর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আওরঙ্গজেব ভাবলেন, ওয়াজিম খান ঠিকই বলেছে। টাকার লোভে কয়েক হাজার শ্রমিক ঝুড়িভর্তি মাটি নিয়ে সমবেত হয়েছে। এদের সাথে কিছু স্থানীয় বাসিন্দাও যোগ দিয়েছে। অনেকেই কেবল নেংটি পরে খালি পায়ে এসেছে। আর সবার মুখ শুকনো। কয়েকজন লোক একটু সামনেই রাখা সিন্দুকভর্তি মুদ্রাগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল। সফল হলে যে ওরা পুরস্কার পাবে তার প্রমাণ হিসেবে কড়া পাহারায় খোলা সিন্দুকগুলো সমবেত শ্রমিকদের একটু সামনেই সাজিয়ে রাখা হয়েছিল।

তাঁর পরিকল্পনাটি ঘোষণা করার পর তিনি সেনা-নায়কদের সাথে বিষয়টি একটু ভালো করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। প্রথম সারির মজুররা পরিখা থেকে অর্ধেক দূরত্বে খোলা মাঠে মাটি ফেললে অর্থ পাবে। এতে বরকন্দাজরা আত্মরক্ষার জন্য মাটির নিচু দেয়াল পেয়ে ছুটে গিয়ে সেখান থেকে শত্রুর উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়ে ওদেরকে সহায়তা দেবে। সেই সাথে কামান থেকেও গোলা ছোঁড়া হবে। পরবর্তী সারির মজুররা পরিখা পর্যন্ত তিন-চতুর্থাংশ দূরত্ব পার হয়ে মাটি ফেলবে, যাতে বরকন্দাজরা আরো সামনে এগোতে পারে। এরপর তৃতীয় এবং এর পরের সারির মজুরেরা সরাসরি পরিখাতে মাটি ফেলবে। এর পর প্রতি সারিতে দুইশোজন করে মোট বারোটি সারির মজুর বাকি থাকছে, যারা সবাই পরিখাতেই মাটি ফেলতে পারবে।

আওরঙ্গজেব তাঁর এক সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাজ শুরু করার নির্দেশ দাও।' কয়েকমিনিট পর লম্বা সরু পায়ে প্রথম সারির মজুররা মোগল শিবির এলাকা থেকে ছুটে বের হল। বেশিরভাগই মাথায় মাটিভর্তি ঝুড়ি নিয়ে ছুটছিল আবার অনেকেই দুজন করে বড় একটা বেতের ঝুড়িতে মাটি নিয়ে ধরাধরি করে ছুটছিল। অন্ধকারে যতদূর দেখা যায়, তিনি দেখতে পেলেন প্রথম সারির লোকগুলো পরিখার প্রায় একচতুর্থাংশ দূরত্ব পার হয়েছে। এমন সময় বিজাপুরের দেয়ালে মশাল জ্বলে উঠলো। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই গাদা বন্দুকের ফট ফট শব্দের সাথে বিজাপুরি কামানেরও গোলা বর্ষণ শুরু হল। সাথে সাথে তাঁর নিজের গাদা বন্দুকধারী আর কামান থেকেও প্রত্যুত্তর দেওয়া শুরু হল।

ঘন ঘন কামানের গোলার আলোয় তিনি দেখলেন কিছু শ্রমিক মাটিসুদ্ধ ঝুড়ি মাটিতে ছুড়ে ফেলে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেছে। দু-একজন আবার উঠে মোগল শিবিরের দিকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফেরার চেষ্টা করলো। বাকিরা মাটিতে স্থির হয়ে পড়েছিল কিংবা মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছিল। যারা অক্ষত ছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন মাথার ঝুড়ি ফেলেই ঘুরে ছুটে পালাল। তারপরও

অনেকে পুরস্কারের লোভে মাটির ঝুড়ি নিয়ে ধোঁয়া আর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটছিল। ওরা ঠিকই অর্ধেক পথ পর্যন্ত গিয়ে মাটি ফেলে পেছন দিকে ঘুরলো। অন্ধকারে ছোট ছোট দলে মোগল বরকন্দাজরা কালো পোশাক পরে নিচু হয়ে মজুররা ঝুড়ির মাটি ফেলে যে, ছোট ছোট মাটির স্তূপ তৈরি করেছিল তার পেছনে অবস্থান নেবার জন্য ছুটতে শুরু করলো। কালো পোশাকের দরুন অন্ধকারে ওদেরকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। মাটিবহনকারী দ্বিতীয় দলটি দ্রুত ছুটলো। কয়েকজন শ্রমিক মাটিতে পড়ে থাকা প্রথম সারির শ্রমিকদের শরীরের সাথে ধাক্কা খেয়ে হোঁচট খেয়ে পড়লো। তবে বেশিরভাগই কামানের গোলা কিংবা গাদা বন্দুকের গুলির আঘাতে পড়ে গেল। তৃতীয় আর চতুর্থ সারিটি প্রচণ্ডবেগে ছুটতে শুরু করলো। আরো অনেকে পড়ে গেল, তারপরও বেশ কয়েকজন সামনের দিকে ছুটে গেল। মাত্র কয়েকজন সামনে যেতে রাজি হল না। পরিখার কিছুদূর পর্যন্ত ওরা এগোতে পারলো, অন্ধকার আর ধোঁয়ার কারণে আওরঙ্গজেবের দেখতে কষ্ট হচ্ছিল, তবে ভালই অগ্রগতি হচ্ছিল।

চারদিন পর আওরঙ্গজেব একা তাঁর লাল তাবুতে বসে প্রাতরাশ করছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা আংশিক সফল হয়েছে। সেই প্রথম রাতে প্রায় একশো শ্রমিক পরিখায় মাটি ফেলতে পেরেছিল। কথামতো তিনি তাদের সকলকে পুরস্কারের মুদ্রা দিয়েছিলেন আর সেই সাথে প্রথম দুই সারির শ্রমিকেরাও মাটি ফেলার জন্য পুরস্কার পেল। ওদের প্রচেষ্টায় পরিখার গেঁজলা উঠা পানিতে একটি ছোট ঢিবির মতো দ্বীপ তৈরি হল। পরবর্তী রাতে তিনি পুরস্কার দ্বিগুণ করে আবার মাটি নিয়ে শ্রমিক পাঠিয়েছিলেন। এদের সাথে কয়েকটি হাতি কাঠের গুড়ি টেনে নিয়ে গিয়েছিল পরিখায় ফেলার জন্য। তবে এবার বিজাপুরিরা তৈরি ছিল। এবার খুব কম শ্রমিক পরিখা পর্যন্ত পৌছতে পেরেছিল। আর একটি ছাড়া আর সমস্ত হাতি কামানের গোলার আঘাতে মরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। এই হাতিগুলোর মৃতদেহ এখন পরিখার কিনারায় মাটিতে পড়ে রয়েছে। যে হাতিটি পরিখা পর্যন্ত পৌছতে পেরেছিল, সেটা পেটে কামানের গোলার আঘাতে আহত হয়ে উল্টে পরিখার পানিতে পড়ে গিয়েছিল। সর্বত্র মানুষ আর হাতির লাশের দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে এসেছে। তবে আহতদের গোঙানিও কমে এসেছিল। তিনি কাউকে উদ্ধার করতেও নিষেধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কেননা উদ্ধার প্রচেষ্টায় আরো প্রাণহানি হতে পারে।

খাওয়ার টেবিল থেকে উঠে তিনি তাঁবুর ভেতরে পায়চারি শুরু করলেন। সূর্য মাথার উপরে উঠে যাওয়ায় তাবুর ভেতরে একেবারে হাওয়া নেই। পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে? এই মুহূর্তে ধৈর্য ধরে ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় প্রতিপক্ষদের দেহ

আর মন দুর্বল হয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষা করে দেখতে হবে আর পথে গুপ্তচর বসাতে হবে যাতে সাহায্যকারী সেনা এগিয়ে আসার সাথে সাথে শিবিরে খবর দিতে পারে। এছাড়া আর কিছুই করার নেই।

একজন কোরচি ঢুকে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, 'ওয়াজিম খান আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন, জাঁহাপনা।'

প্রায় সাথে সাথেই ওয়াজিম খান ঢুকলো। এক টুকরা সাদা কাপড় দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে সে বললো, 'জাঁহাপনা, বিজাপুরের প্রধান ফটকের চারপাশে একটু উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে।'

'কি ধরনের উত্তেজনা?'

'দুই-তিনজন বিজাপুরি পরিখার পাশে তাদের তীরে বের হয়ে এসেছে। আর মনে হচ্ছে পরিখা পার হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওরা একটা ভেলা বয়ে এনেছে।'

আওরঙ্গজেব ওয়াজিম খানকে পাশ কাটিয়ে তাঁবুর বাইরে বের হতে হতে বললেন, 'আমাদের লোকদের গোলাগুলি করতে নিষেধ কর।'

দুজন লোক ভেলায় চড়ে পরিখা পার হয়ে আসছে। এত দূর থেকে দেখেও তাদেরকে দূত মনে হচ্ছে। এর একমাত্র অর্থ বিজাপুরিরা কোনো শর্ত নিয়ে আলোচনা করতে আসছে। দূত পাঠানো মানেই তাদের মনোবলের উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত আর বিজাপুরবাসীরা দেখছে যে তাদের শাসকের চরম বিজয়ের প্রতি কত কম আস্থা রয়েছে। আওরঙ্গজেব বললেন, 'যদি ওরা সত্যিই দূত হয়ে থাকে তবে ওদেরকে জানাও আমি কোনো শর্ত নিয়ে আলোচনা করবো না, তবে বিজাপুর আত্মসমর্পণ করলে ওদের প্রতি দয়াশীল হব। কোনো হত্যাযজ্ঞ হবে না, কোনো ভাল মেয়েকে ধর্ষণ করা হবে না, কোনো ঘরবাড়ি লুট করা হবে না।' ওয়াজিম খান তাঁর নির্দেশ জানাতে মোগল শিবিরের সামনের দিকে চলে গেল। আওরঙ্গজেব ঘুরে তাঁবুর দিকে চললেন, তিনি তাঁর মনের খুশি চেপে রাখতে পারছিলেন না। তবে অতি কষ্টে চেপে রাখলেন, কেননা বিজাপুরিদের আসল উদ্দেশ্য না জানা পর্যন্ত তাকে বাইরে উল্লাস প্রকাশ করা চলবে না। এতে তাঁর লোকজন তাঁকে বোকা আর অপরিপক্ক মনে করবে।

দুপুরের দিকে তাঁবুর ছাউনির ভেতর থেকে আওরঙ্গজেব দেখলেন দুই জন লোক বিজাপুরের প্রতিরক্ষা বেষ্টনীর ভেতর থেকে বের হল। ওদেরকে অনুসরণ করে দশজন লোক একটি নৌকা বয়ে নিয়ে এল। নৌকাটি ওরা দুর্গন্ধময়, জঞ্জাল আর রক্ত ভরা পরিখার পানিতে নামাল। তারপর সাদা-পোশাকপরা একজন হালকা-পাতলা লোক বের হয়ে নৌকার মাঝখানে একটি নিচু টুলে বসলেন। এরপর দশজন লোক লগি ঠেলে নৌকাটি মোগলদের দিকে ঠেলে নিয়ে চললো। তীরে পৌঁছে পাতলা লোকটি মরা হাতির ফুলে ওঠা

দেহের কাছে এসে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছি, তবে সাথে সাথে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এ নিশ্চয়ই সিকান্দার। সবুজ পাগড়িপরা দুইজন মোগল সেনা তার দুই পাশে অবস্থান নিল। তারপর তাকে পথ দেখিয়ে গলেপচে যাওয়া লাশের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে নিয়ে এল। শকুনের দল বাঁকা ঠোঁট দিয়ে লাশের মাংস ছিঁড়ে ভোজে ব্যস্ত ছিল। দশ মিনিট পর সিকান্দার আওরঙ্গজেবের তাঁবুর কাছে এলেন। আওরঙ্গজেব যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, তার পাঁচগজ দূরত্বে এসে তিনি থামলেন, তারপর দুহাতে একটি রত্নখচিত সোনার লাঠি ধরে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে মিহি তবে পরিষ্কার কণ্ঠে বললেন, 'বিজাপুর এবং এর সমস্ত এলাকা আপনার হাতে সমর্পণ করে দেবার প্রমাণ হিসেবে আমি এই লাঠিটি, যা আমার পূর্বপুরুষের শাসকদণ্ড ছিল তা আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি।' কথাগুলো বলার সময় তিনি মাথা নিচু করলেন।

আওরঙ্গজেব লক্ষ করলেন, সিকান্দারের ডান হাতে ভারী পট্টি লাগানো রয়েছে, আর সেখান থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ে পট্টির কাপড় লাল হয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, 'আমাদের গাদা বন্দুকের গুলি কি আপনাকে আত্মসমর্পণ করার জন্য শিক্ষা দিয়েছে?'

'না, গতরাতে আমার একজন চাচা, ইকবাল খান আমাকে ছুরি মেরে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। আমার দেহরক্ষীদের সাহায্যে আমি তার সাথে লড়াই করে তাকে থামাই। তিনি এখন মৃত। তবে আমার হেকিম যখন ক্ষতটি পরিষ্কার করে পট্টি লাগাচ্ছিলেন তখন আমি বুঝলাম তিনিই শেষ লোক নন যে এই ধরনের চেষ্টা করবে। ঈর্ষা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে যে বিভক্তি করার প্রচেষ্টা চলছে, তাতে বিজাপুরের পতন হবেই। আপনার শুনতে খারাপ লাগতে পারে, তবে আমি আমার জীবনকে নিজের কাছে অনেক প্রিয় মনে করি—সিংহাসনের চেয়েও মধুর—আমি অনেকদিন এই জীবন উপভোগ করতে চাই। সেজন্য আমি বুঝতে পেরেছি যে, প্রকৃতির নিয়মবিরোধী আর নিকট আত্মীয়দের হাত থেকে আমার জীবন নিরাপদ হবে, যদি আমি নিজেকে আর আমার রাজ্য এখুনি আপনার হাতে তুলে দেই। যদিও আপনি একজন আগন্তুক এবং আমার দেশের মানুষের শত্রু, তারপরও আমি আমার অবিশ্বস্ত পরিবার আর যুদ্ধরত আত্মীয়দের চেয়ে এখানে নিরাপদ থাকবো।'

আওরঙ্গজেব তাঁর পেছনে দাঁড়ান ওয়াজিম খানের দিকে তাঁকালেন। বিজাপুরি রাজপরিবারের যেসব সদস্যদের কাছে বার্তা পাঠান হয়েছিল ইকবাল খান তাদের একজন। ওদের কাছে প্রস্তাব করা হয়েছিল, যারা মোগলদের সহায়তা করবে তাদেরকে যথেষ্ট পুরস্কারসহ ভাল পদ দেওয়া হবে। কেউ উত্তর দেয় নি, তবে ইকবাল খান মনে হয় তার কথা শুনেছিল। তার কার্যকলাপ আর এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে তার মৃত্যুর কারণে মোগলরা তাদের বিজয় নিশ্চিত করতে পারলো, প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কোনো পারিতোষিক দিতে হল না।

অধ্যায় সতের

বাই-দওলত

হায়দ্রাবাদে আদিল হাসানের মার্বেল-প্রাসাদের একটি শীতল কামরায় পাশাপাশি বসে আওরঙ্গজেব আর মুয়াজ্জম কথা বলছিলেন। তিনি তাকে বললেন, 'এই শহর থেকে আদিল হাসান আর গোলকুন্ডা বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে তুমি খুব ভাল কাজ করেছ মুয়াজ্জম।' সিকান্দারকে পরাজিত করে বিজাপুরকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার পর আওরঙ্গজেব সেদিন সকালেই তার অগ্রবর্তী সেনাদল নিয়ে মুয়াজ্জমের সাথে যোগ দিয়েছিলেন।
মুয়াজ্জম মৃদু হেসে বললেন, 'ধন্যবাদ, বাবা। হায়দ্রাবাদের তেমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় আমার কাজ সহজ হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে আমার সেনাবাহিনীর শক্তি আর দৃঢ়তা বুঝতে পেরে আদিল হাসান তার সেনাবাহিনীসহ তাদের অস্ত্রশস্ত্র আর কোষাগারের সমস্ত সম্পদ নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে পিছু হটে যান। শহরের অনেক বাসিন্দা তাদের সম্পদ নিয়ে তাকে অনুসরণ করেছে। তিন সপ্তাহ আগে যখন আমি এখানে ঢুকি তখন দেখি প্রায় নির্জন একটি শহরে কেবল কিছু গরিব মানুষ রয়ে গেছে। তারপর শহরের চারমিনার মসজিদে শহরের নতুন শাসক হিসেবে মোল্লাকে দিয়ে আপনার নামে খোতবা পড়াই।'
'তোমার অর্জন সম্পর্কে তুমি যে বিনয় দেখিয়েছ তা তোমাকে মহৎ করে তুলেছে। তাছাড়া তুমি শহরটিও নিজের আয়ত্তে আনতে সফল হয়েছ। আমি লক্ষ করেছি তুমি প্রত্যাঘাত প্রতিরোধ করতে মুসি নদীর তীরে আর অন্যান্য জায়গায় মাটির বাঁধ নির্মাণ করছো।' বাবার এই ধরনের বিরল প্রশংসায় মুয়াজ্জমের মন চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর আওরঙ্গজেব বললেন, 'তবে এখানে বেশিদিন থাকা যাবে না। আমার মূল সেনাবাহিনী এখানে পৌছার পর তুমি যে সফলতা পেয়েছ তার ফায়দা উঠাতে হবে। আদিল হাসান তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে কোথায় গেছে?'
'তিনি তার অধিকাংশ সেনা, পত্নী আর উপ-পত্নীদের নিয়ে এখান থেকে পাঁচমাইল দূরে গোলকুন্ডা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন। এটাই আমি শুনেছি। আর কিছু সৈন্য পাঠিয়েছেন হীরার খনিগুলো পাহারা দিতে।'

হীরার খনির দিকে আমাদের মনোযোগ দিলে চলবে না। গোলাকুন্ডা দুর্গ দখল করা আর আদিল হাসানকে পাকড়াও করার কাজটিকে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। দুর্গটি সম্পর্কে কী জানতে পেরেছ?'

'এটি একটি চারশো ফুট উঁচু কৌণিক আকৃতির দুর্গ যা পাহাড়ের চারধার ঘিরে নির্মাণ করা হয়েছে। এর চতুর্দিক ঘিরে দুটি চক্রাকার শক্তিশালী পাথরের বাঁধ রয়েছে। আর এই বাঁধে ছয়ফুট উঁচু কয়েকটি মজবুত বুরুজ রয়েছে। এগুলো এমন অবস্থানে নির্মাণ করা হয়েছে যে, বাইরে থেকে দেয়ালের উপর কোনো আক্রমণ এলে দুপাশ থেকে গোলাবর্ষণ করা যাবে। একমাত্র প্রবেশ পথটি একটি আঁকাবাঁকা পেঁচানো ঢালু পথ যা একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত এক সারি ফটকের ভেতর দিয়ে চলে গেছে।'

'পানি আর খাবার সরবরাহ কেমন করে হয়?'

'দুর্গে যথেষ্ট পানি মজুত আছে। তবে এখন মানুষের ভিড় বেড়ে যাওয়ায় পানি আর যথেষ্ট বলা যাবে না। ওরা কয়েক মাসের জন্য খাদ্য মজুত করার সময় পেয়েছে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে চললে এতে কয়েক মাস চলার কথা।'

'আমাদেরকে যত শীঘ্র সম্ভব দুর্গটি চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলতে হবে। তারপর আমার মনে হয় প্রাথমিকভাবে কিছু আক্রমণ চালিয়ে প্রতিপক্ষের মনোবল যাচাই করে দেখতে হবে দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধ এড়ানো যায় কিনা। আদিল হাসানের লাম্পট্য চরিত্রের যে খবর আমি পেয়েছি, তাতে আমার বিশ্বাস হয় না যে, সে একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতা হবে কিংবা তার লোকজনও একান্তভাবে তাকে অনুসরণ করবে না। এ যাবৎ তোমার দৃঢ়সংকল্প দেখিয়ে তুমি আমাকে অবাক করেছ মুয়াজ্জম। তাই আমি তোমাকেই এই অভিযানের প্রথম অংশের নেতৃত্ব দিতে চাই। যাতে তুমি তোমার যোগ্যতা আরো প্রমাণ করতে পার।'

ছয় সপ্তাহ পর আওরঙ্গজেব ওয়াজিম খানকে পাশে নিয়ে লক্ষ করছিলেন সীসার মতো রঙের আকাশের নিচে ঘোড়ায় চড়ে মুয়াজ্জম এগিয়ে গিয়ে গোলকুন্ডার দেয়ালে গোলাবর্ষণ করার জন্য মোগল গোলন্দাজ সৈনিকদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তাঁর ছেলে অত্যন্ত কুশলতার সাথে আক্রমণ পরিচালনা করছিলেন। তিনি বাইরের সাথে দুর্গটির যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। তারপর এমন ভান করতে লাগলেন যেন এখুনি মুখোমুখি আক্রমণ করবেন। এরপর গোলকুন্ডিরা কার্যকর কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই শক্তিশালী ও দ্রুতগামী দুই দল সৈন্য পাঠিয়ে বলদের মাথার শিংয়ের

মতো দুদিক থেকে দুর্গটি ঘিরে ফেললেন। তার লোকেরা মাটির তলে একটি মাটির নল আবিষ্কার করে নলটি কেটে ফেললো। এই নলটির মাধ্যমে পাহাড়ের পানির জলাধারের সাথে দুর্গের সংযোগ ছিল। গ্রীষ্মের তাপমাত্রা চরমে উঠলে দুর্গের ভেতরে গাদাগাদি করে থাকা লোকদের জীবন কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আর খাবার পানির পরিমাণ কমে যেতেই কিভাবে তা ভাগাভাগি করা হবে তা নিয়ে নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক লেগে যাবে।

আওরঙ্গজেব ওয়াজিম খানের দিকে ঘুরে বললেন, 'দিনের পর দিন অভিজ্ঞতা লাভ করে মনে হচ্ছে মুয়াজ্জম একজন পরিপক্ক সেনাপতি হয়ে উঠছে, সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে কিরকম শান্তভাব আর কর্তৃত্ব দেখাচ্ছে। বিশেষত কঠিন পরিস্থিতিতে তাই না, কি বল?'

ওয়াজিম খান মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো, 'সম্প্রতি আপনি তাকে যে ধরনের সমর্থন দিয়েছেন, তাতে উনি বিকশিত হয়ে উঠছেন, জাঁহাপনা। প্রশংসা করলে মানুষের মনোবল বেড়ে যায়। এটা সবার ক্ষেত্রে ভাল কাজ দেয় কেবল যারা অতিমাত্রায় আত্মগর্ব করে আর অপরিণামদর্শী ছাড়া।'

গুম গুম করে মোগল কামানের গুরুগম্ভীর গর্জনে আর আলোচনা করা গেল না। প্রায় একইসাথে সত্তরটি কামান গর্জে উঠেছে। সাদা ধোঁয়ার বিরাট ঢেউ পুরো যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়লো, গোলকুন্ডার দুটি দেয়াল আর মোগল শিবিরের অবস্থানও ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল। প্রত্যুত্তরে গোলকুন্ডার কামানের প্রচণ্ড গর্জনও আওরঙ্গজেবের কানে এল। ধোঁয়া সরে যেতেই ধীরে ধীরে একটা ফাঁক বের হয়ে এল, আওরঙ্গজেব দেখলেন, গোলকুন্ডার দেয়াল প্রায় অক্ষত দেখা যাচ্ছে, কেবল প্রধান ফটক-দালানের কছে বুরুজের উপর থেকে কয়েকটা পাথরের টুকরা নিচে মাটিতে খসে পড়েছে। গোলকুন্ডিরাও কিছু সফলতা লাভ করেছে। গোলকুন্ডার গোলার আঘাতে মোগলদের সবচেয়ে বড় কামানগুলোর একটি ব্রোঞ্জের নল এর বারো-চাকার কাঠের কাঠামো থেকে খুলে পড়ে গেছে। মাটিতে পড়ার সময় ভারী নলটির নিচে দুজন গোলন্দাজ সৈনিক চাপা পড়েছে। তাদের একদল সহযোদ্ধা কামানের ভারী নলটি তাদের পায়ের উপর থেকে টেনে সরাতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো, তবে আবার ধোঁয়ার চাদরে ঢাকা পড়ার আগে তিনি দেখতে পেলেন ওরা সফল হতে পারে নি।

'ওয়াজিম খান, আমার যুদ্ধ হস্তী আনতে বল। এ অবস্থায় আমি আর লড়াইয়ের ময়দান থেকে দূরে থাকতে পারি না। যদিও আমি আমার ছেলেকে কথা দিয়েছিলাম নেতৃত্ব তার হাতেই থাকবে।'

কয়েকমিনিট পর আওরঙ্গজেবের হাতি মোগল সৈন্যবূহ্যের কাছাকাছি পৌঁছল। ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে সামনে লড়াই দেখার জন্য তিনি তাকিয়ে দেখলেন, আহত

সেনারা সেখান থেকে বের হয়ে তাঁকে পাশ কাটিয়ে পেছনের দিকে যাচ্ছে। কেউ কেউ আরেকজনের কাঁধে হাতে ভর দিয়ে চলছিল। অন্যরা হাতে বানানো ক্রাচে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে যাচ্ছে। যারা বেশি আহত হয়েছে তাদেরকে গাছের ডাল কেটে বানানো খাটিয়ায় শুইয়ে বেহারারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটি দাড়িওয়ালা লোক তার পেটের বড় একটি ক্ষত থেকে বের হয়ে আসা লাল-নীল নাড়িভূড়ি চেপে ধরে যন্ত্রণায় তারস্বরে চিৎকার করতে করতে যাচ্ছিল।

আওরঙ্গজেব বিড়বিড় করলেন, 'আল্লাহ যেন তাকে শীঘ্রই পরকালে নিয়ে যান। এ অবস্থায় কোনো হেকিমই কিছু করতে পারবে না।'

কয়েকমিনিটের মধ্যে আওরঙ্গজেব তাঁর কামানের সারির কাছে পৌঁছতেই চিৎকার করে গোলন্দাজ সেনাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'যত দ্রুত পার গোলা ভর। সেনাবাহিনীর বাকি সবার জীবন তোমাদের উপর নির্ভর করছে!' খালি গায়ে বারুদের ছিটা নিয়ে ওরা নিচু হয়ে গোলা ভরার কাজ করতে করতে না থেমে তার কথার জবাবে বলে উঠলো, 'সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন!' আওরঙ্গজেব দেখলেন গোলন্দাজ সারি পেরিয়ে একটু সামনে একটি উঁচু ঢিবির উপর একজন তরুণ মোগল সেনা কর্মকর্তা পিঠ খাড়া করে একটি ধূসর ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছে। তার পাশে তার চেয়েও বয়সে ছোট তরুণ কোরচিও নিজের চঞ্চল হয়ে ওঠা ঘোড়াকে বশ করতে হিমশিম খাচ্ছিল। আওরঙ্গজেব তাঁর মাহুতকে সেনা কর্মকর্তারটি পাশে হাতি থামাতে বললেন। তারপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কী হচ্ছে?'

'জাঁহাপনা, আপনার ছেলে আমাকে এখানে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি গোলকুন্ডার মূল ফটকের উপর একটি আক্রমণে নেতৃত্ব দিতে গেছেন। হামলা সফল হলে তিনি আমাকে খবর পাঠাবেন। সবকিছু ঠিকঠাক মতো চললে, আশা করি তাই হবে, আমি বরকন্দাজ আর আপনার বাঙ্গালি পল্টন থেকে আরো পদাতিক সেনা নিয়ে এগোব, যাতে উনি—'

কথা শেষ না হতেই প্রচণ্ড একটি শব্দে তার কথা থেমে গেল। আওরঙ্গজেবের হাওদা কেঁপে উঠলো আর তার হাতিটি মাথা পেছনে হেলিয়ে শূঁড় তুলে বৃংহণ করে উঠলো। আওরঙ্গজেব নিজের অজান্তে চোখ বুজতেই উষ্ণ তরল কিছু একটা তার মুখে থপ করে এসে পড়লো আর এর সাথে নরম স্পঞ্জের মতো কিছু ঝুলে রইল। চোখ খুলে তিনি হাতের পিঠে মুখ মুছলেন। তরলটি ছিল রক্ত আর নরম পদার্থটি ছিল তাঁর সেনা কর্মকর্তা কিংবা তার ঘোড়ার মাংস। উভয়ের দেহই মাটিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। আওরঙ্গজেবের

হাতির দুজন মাহুতের মধ্যে একজন হাতির পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে রয়েছে। তবে তার শরীরে কোনো যখম দেখা যাচ্ছে না। তরুণ কোরচির ঘোড়াটি আরোহীসহ ভেগে গেছে। কামানের অন্তত কয়েকটা গোলার আঘাতে এটা হয়েছে। তার নিজের সেনাদের মতো গোলকুন্ডি গোলন্দাজ সেনারাও দক্ষ হাতে কামান চালিয়েছে।

দ্বিতীয় মাহুতটি দ্রুত আওরঙ্গজেবের হাতিটিকে শান্ত করলো। আওরঙ্গজেব ভাবলেন, তিনি কি তাঁর দেহরক্ষী দলসহ মৃত সেনা কর্মকর্তার কাছে অপেক্ষা করবেন, নাকি আরো সামনে এগিয়ে যাবেন। তারপর ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ পেছনে আসতেই দেখলেন আরো দুজন সেনা কর্মকর্তা ছুটে এসেছে। প্রথম লোকটি একটু বয়স্ক আর তার এক চোখে পট্টি বাঁধা। সে বললো, 'জাঁহাপনা, আমরা দেখেছি আমাদের সহযোদ্ধা পড়ে গেছেন, তার বদলি হিসেবে আমরা এসেছি।'

'তোমরা তোমাদের নির্দেশ জান?'

'জ্বী, জানি জাঁহাপনা।'

আওরঙ্গজেব মাথা নাড়লেন। যে মাহুতটি নিচে পড়েছিল, তার জ্ঞান ফিরে এসেছে, শুধু ধাক্কার কারণে সে জ্ঞান হারিয়েছিল। এবার সে টলমলে পায়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর এক হাত বাড়িয়ে অপর মাহুতের বাড়িয়ে ধরা হাত ধরে আবার হাতির কানের কাছে তার জায়গায় উঠে বসলো। আওরঙ্গজেব আবার সামনে এগোবার নির্দেশ দিতেই হঠাৎ দমকা হাওয়া বয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর তার মাথার উপর আবার কানফাটা গর্জন শোনা গেল, আর তার মুখে তরল পড়লো। তবে রক্ত নয় বৃষ্টির ফোঁটা পড়লো আর গর্জনটি ছিল বজ্রপাতের। বৃষ্টি আর বাতাসে ধোঁয়া অনেকটা কমে এলে আওরঙ্গজেব সামনের দৃশ্য দেখতে পেলেন।

প্রথমে তার মনে হল তার ছেলের সৈন্যরা মূল ফটক-ভবনের দিকে চলে যাওয়া ঢালু পথের দিকে না এগিয়ে থেমে পড়েছে। আসলে ওরা ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়ে রুক্ষ জমির উপর যে কোনো ধরনের আড়াল খুঁজে তার পেছনে লুকিয়ে দুর্গের দিকে এগোতে চেষ্টা করছিল। তারপর তিনি দেখলেন তাদের একটু পেছনে একসারি ছোট ছোট পাহাড়ের পেছনে সবুজ মোগল পতাকা ছুটছে। হঠাৎ মুয়াজ্জম আর বড় একটি অশ্বারোহী দল উদয় হল। ওরা চড়াই বেয়ে ঢালু পথটির দিকে ছুটছিল। পতাকাগুলো হাওয়ায় পেছন দিকে উড়ছে। ওরা সামনে ছুটতেই বাকি সৈন্যরাও রণহুঙ্কার দিয়ে তাদেরকে অনুসরণ করলো। কেবল বরকন্দাজরা কয়েকটি উল্টানো গরুর গাড়ির পেছনে

তাদের অবস্থান নিল। ধোঁয়ার আড়ালে গরুর গাড়িগুলো এনে উল্টো করে ফেলা হয়েছিল। ওরা একনাগাড়ে গুলি করে বুরুজের উপরে গোলকুন্ডি প্রতিরক্ষা সেনাদের মাথা তুলতে দিচ্ছিল না।

তাদের এত চেষ্টা সত্ত্বেও গোলকুন্ডি কামান আর গাদা বন্দুক গুলি ছুড়েই চললো। একটা গোলা এসে একটি গরুর গাড়ির উপর আঘাত হানলো। এর পেছনে দশজন গাদা বন্দুকধারী গুড়ি মেরে বসে অবস্থান নিয়েছিল। গোলার আঘাতে কাঠের টুকরার সাথে একজন সৈন্যের দেহ উড়ে গেল। ইতোমধ্যে গোলকুন্ডি বরকন্দাজরা তাদের নিকটস্থ লক্ষ্যবস্তু—ছুটে যাওয়া অশ্বারোহীদলের উপর গাদা বন্দুকের গুলি ছুড়তে শুরু করেছে। কয়েকটি ঘোড়া আরোহীসহ হুমড়ি খেয়ে পড়তেই আরোহীরা ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে ছিটকে পড়লো। বৃষ্টি আর ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে আওরঙ্গজেব দেখলেন একজন পতাকাবাহী মাটিতে পড়ার সময় তার হাতে ধরা বড় সবুজ পতাকার ডাণ্ডা তার হাতছাড়া হয়ে গেল। ডাণ্ডাটি তার পাশের ঘোড়ার সামনের পায়ে ছিটকে পড়তেই ঘোড়াটিও মাটিতে পড়ে গেল। পেছনে যারা অনুসরণ করছিল তারা পাশ কেটে মাটিতে পড়া দেহগুলো এড়াতে চেষ্টা করলো। তারপরও আরোহীসহ অনেক ঘোড়া পড়ে গেল। কেবল ছোট একটি দল ফটক-ভবনের দিকে পাক খেয়ে উঠে যাওয়া ঢালু পথের গোড়ায় পৌছে মাথা নিচু করে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে লাগলো। আওরঙ্গজেব আর মুয়াজ্জমকে দেখতে পাচ্ছেন না। তার ছেলে কি পড়ে গেছে? না, ঐ যে তাকে দেখা যাচ্ছে। আক্রমণকারী সেনাদের প্রথম সারির সাথে উদ্যত তরোয়াল হাতে সে ছুটছে। চতুর্দিক থেকে কয়েকজন দেহরক্ষী তাকে ঘিরে রয়েছে।

কয়েকমুহূর্ত পর মুয়াজ্জমের পাশের একজন শিঙ্গাবাদক তার ঠোঁটে শিঙ্গাটা তুললো। এত দূর থেকে আওরঙ্গজেব শিঙ্গার আওয়াজ শুনতে পেলেন না। তবে তার অর্থ বুঝা গেল যখন সাথে সাথে সমস্ত জীবিত অশ্বারোহী সেনা পেছন ফিরে ঘোড়া ছুটিয়ে নিজেদের শিবিরের দিকে রওয়ানা দিল। শিঙ্গাবাদকের হাত থেকে শিঙা পড়ে গেল, সে দুই হাত শূন্যে তুলে ঘোড়ার পিঠ থেকে পেছনে পড়ে গেল। আরোহীহীন একটি ঘোড়া ছুটে যাওয়ার সময় একজন পতাকাবাহীর ঘোড়াকে ধাক্কা মারতেই সে মাটিতে পড়ে গেল। পেছনে মোগল শিবিরে পৌছতে হলে তার ছেলে আর অন্যান্য সৈন্যকে খোলা ময়দানটি পার হতে হবে। বৃষ্টির ছাঁট কমে যেতেই ধোঁয়া আবার তাঁর দৃষ্টি পথ ঢেকে দিল। তিনি প্রার্থনা করলেন মুয়াজ্জম যেন বেঁচে থাকে। আক্রমণ সফল না হলেও সে একজন সত্যিকার মোগল শাহজাদার মতো যুদ্ধ করেছে।

দুই ঘণ্টা পর নিরাপদে নিজেদের শিবিরে ফিরে এসে, মুয়াজ্জম তার হাঁটু আর বাহুতে সামান্য যে চোট লেগেছিল, তাতে পট্টি লাগিয়ে তার বাবার লাল তাঁবুতে এসে সম্রাটের সামনে দাঁড়ালেন।
আওরঙ্গজেব তাকে বললেন, 'তুমি সত্যি আজ সাহস দেখিয়েছ মুয়াজ্জম। আক্রমণ সফল না হওয়ার জন্য তোমাকে কেউ দোষারোপ করতে পারবে না।'
বাবার কথার উত্তরে তিনি বললেন, 'ধন্যবাদ, বাবা।' তারপর তার ডান হাতে ধরা শরবতের গ্লাসে একটি চুমুক দিয়ে আবার বললেন, 'আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, আর সৈন্যরাও জানপ্রাণ দিয়ে লড়েছে। ওদের অনেককে হারিয়ে আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি, বিশেষত আমার দুধ-ভাই উমরখানকে। ঢাল বেয়ে উপরে উঠার সময় বুরুজের কিনারা থেকে গোলকুণ্ডিরা তার উপর গরম তেল ঢেলে দেয়। তার সারা গা পুড়ে যায়, ফিরে আসার সময় সে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মারা যায়। কি ভয়ঙ্কর—তার গায়ের সমস্ত চামড়া আর চুল পুড়ে গিয়েছিল।'
'তার আত্মা আজ রাতে বেহেশতে শান্তিলাভ করবে। আর যে বিশ্বাসীরা আজ আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছে তারাও। আমি তার স্ত্রী আর পরিবার পরিজনদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবো।' তারপর এক মুহূর্ত থেমে আওরঙ্গজেব আবার বলা শুরু করলেন, 'আবার তোমার অভিযানের কথায় আসছি, দ্রুত সফলতা পেতে হলে মুখোমুখি হামলার বদলে আমাদেরকে অন্য কোনো উপায় বের করতে হবে। আমি ওয়াজিম খানকে আমাদের সাথে যোগ দিতে ডাকছি। অনেক সময় সে খুব ভাল পরামর্শ দিতে পারে।'
'এটা করার আগে ব্যক্তিগতভাবে আমি কি আপনার সাথে কিছু কথা বলতে পারি?'
'অবশ্যই।'
'গোলকুণ্ডিদের সাথে কোনো ধরনের আলাপ-আলোচনা চালালে কেমন হয়?'
'তারা যদি তাদের দুর্গ আর জমি আমার কাছে ছেড়ে দিতে চায় তবে আমি তাদের কথা শুনবো। তবে সেরকম কোনো আলামত তো দেখছি না।'
মুয়াজ্জম একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে গলা নামিয়ে প্রায় ফিস ফিস করে বললেন, 'না, আমি বলছি সমানে সমানে কোনো আলোচনা। আপনি জানেন আদিল হাসানের উজিরের স্ত্রী আমার স্ত্রীর আত্মীয়? ঐ দুই মহিলার মাধ্যমে তিনি আমার সাথে যোগাযোগ করে জিজ্ঞেস করেছেন, "কেন বিশ্বাসীরা অন্য বিশ্বাসীদের হত্যা করবে? কেন এত বিশ্বাসী আত্মা বেহেশতে যাবে? কেন এত বিধবা আর ছেলেমেয়ে কাঁদবে? আমরা কী কোনো আপস মীমাংসায় আসার

জন্য আলোচনা করতে পারি না?" আমি উত্তরে জানিয়েছিলাম বিনা প্রয়োজনে এত প্রাণ বিসর্জন দেওয়া হোক তা আমিও চাই না। যদি আমরা রাজি হই তখন আপস মীমাংসায় আসার জন্য শর্তের বিষয়গুলো আমি আপনাকে জানাতাম। এমনকি শর্তগুলোর কিছু ধারণাও তাকে দিয়েছিলাম। তবে আলোচনা আরো কিছুদূর এগোবার আগে আপনাকে জানাতে চাইনি। তবে উমর খানের মৃত্যু আর আজ আপনি আমার সাহসের প্রশংসা করায় আমি কথাটা বলার সাহস পেয়েছি।'

প্রচণ্ড রাগে আওরঙ্গজেবের মুখ কুঁচকে গেল, তিনি হাত মুঠো করে তাঁর ছেলের মুখে একটা ঘুষি মেরে তাকে মেঝেতে ফেলে দিলেন। তার বাবার আঙুলে পরা তৈমুরের আংটিতে তার চিবুক কেটে গিয়ে ইরানি গালিচায় ফোটায় ফোটায় লাল টকটকে রক্ত পড়তে লাগলো। আওরঙ্গজেব গর্জে উঠলেন, 'প্রহরী! এখুনি এখানে এস! এখান থেকে এই বিশ্বাসঘাতককে সরিয়ে নিয়ে যাও।'

দুই ঘণ্টা পর অন্ধকার হতেই আওরঙ্গজেব দুই সারি প্রহরীর মধ্য দিয়ে হেঁটে তার তাঁবুর সামনে স্থাপন করা একটি মঞ্চের দিকে দ্রুত এগিয়ে চললেন। সেখানে তার ত্রিশজন উচ্চপদস্থ সেনাপতিকে ডেকে আনা হয়েছিল। কঠিন চেহারা নিয়ে তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে ডেকেছি দেখার জন্য, এখানে একজন বিশ্বাসঘাতকের বিচার করা হবে। নিয়ে এস তাকে!'

দুজন বলিষ্ঠ প্রহরী মুয়াজ্জমের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় টেনে টানতে নিয়ে এল, তাকে দেখেই সমবেত সেনাপতিরা আঁতকে উঠলো। মঞ্চের কাছে পৌছে প্রহরীর তাকে মাটিতে ফেলে দিল। সারাদিনের বৃষ্টিতে মাটিতে কাদাভরা ছিল। মুয়াজ্জম উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না। তার চোয়ালে রক্ত জমে কালো হয়ে রয়েছে।

আওরঙ্গজেব তাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই বাই-দওলত, এই জঘন্য নীচ—আমার কাছে প্রায় গর্ব করে স্বীকার করেছে যে, সে গোলকুণ্ডি শত্রুদের সাথে গোপনে যোগাযোগ করেছে। ঠিক কি-না বল?'

তার ছেলে বিড় বিড় করে বললেন, 'হ্যাঁ করেছি।' তারপর সাহস সঞ্চয় করে মাথা তুলে বললেন, 'কিন্তু যখন আমি ভাবলাম এটা আমাদের সাম্রাজ্য আর আমাদের বংশের জন্য মঙ্গলজনক হবে।'

'এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিসে আমাদের সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা হবে, তা তুমি কি করে ভাবতে পারলে! এই সিদ্ধান্ত একমাত্র আমি নিতে পারি—তুমি কিংবা আমার সভাসদ আর সেনাপতিদের কেউ নয়...'

'আমি সত্যি দুঃখিত বাবা। আমার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল।'

'তোমার দুঃখ আর তোমার উদ্দেশ্য কোনোটারই আমার কাছে মূল্য নেই। আর সেই সাথে আমার সাথে তোমার সম্পর্কও—যা আমি এই মুহূর্তে অস্বীকার করছি। তোমার সাজা ঘোষণা করার আগে তোমার আর কিছু বলার আছে? তুমি জান যে, একজন বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।'

মুয়াজ্জম শান্তকণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ জানি। আর তাই যদি আমার কপালে লেখা থাকে তবে আমি তা মেনে নেব। আমি আপনার প্রতি আর সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত থেকে মৃত্যুবরণ করবো।'

আওরঙ্গজব একটু ইতস্তত করলেন। প্রথমে রাগের বশে তিনি তার মৃত্যুদণ্ড দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন জনসমক্ষে রায় দিতে গিয়ে তিনি ততটা নিশ্চিত হতে পারছেন না। গৃহযুদ্ধের সময় তার ছেলে মোহাম্মদ সুলতান যখন তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর চাচা শাহ সুজার সাথে যোগ দিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, তখন তিনি তার মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে তাকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। আর সেই যুদ্ধের পরিণতিতে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করতে পেরেছিলেন। তাঁর ছেলে আকবর পালিয়ে প্রথমে সম্ভাজির কাছে তারপর, তার গুপ্তচরদের খবর অনুযায়ী পারস্যে চলে যাওয়ায় তার ভাগ্য নির্ধারণ করার সুযোগ তিনি পান নি। মোহাম্মদ সুলতান আর আকবর, উভয়ের অপরাধই ছিল সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা, অথচ মুয়াজ্জম কেবল তার বাবার স্বার্থে এই দুঃসাহস দেখিয়েছিল, তারপরও সে এ কাজটি করতে গিয়ে অযৌক্তিকভাবে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। অন্যদিকে মোহাম্মদ সুলতান আর আকবর যখন অপরাধ করে তখন তাদের বয়স কম ছিল। অথচ মুয়াজ্জমের বয়স বেশি—চল্লিশের উপরে, আর সে ওদের চেয়ে অনেক পরিপক্বতা দেখিয়েছে। পরস্পরবিরোধী এসব যুক্তিতর্ক তাকে কোথায় নিচ্ছে? হঠাৎ জাহানারার কথা তার মনে পড়লো, তিনি আকবরের পক্ষে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি জানেন, যদি এখন জাহানা জীবিত থাকতেন তবে তিনি মুয়াজ্জমের জন্যও করুণা ভিক্ষা করতেন।

'মুয়াজ্জম, মৃত্যুই তোমার জন্য উপযুক্ত শাস্তি, তবে আমি ক্ষমাশীল হব। তোমাকে গোয়ালিয়রে কারাগারে বন্দী করে রাখা হবে। প্রহরী তাকে আমার চোখের সামনে থেকে নিয়ে যাও।'

কথাটা বলতেই আবার এক পশলা বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো, চোখের পানির মতো বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে আওরঙ্গজেবের গাল ভিজিয়ে দিল।

অধ্যায় আঠার

এক থালা মিষ্টান্ন

‘ওয়াজিম খান, এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা তথ্য। যদি এটা নিশ্চিত করতে পার, তাহলে গত আটমাস ধরে আমরা যে অবরোধ করছি তার অবসান ঘটাবার একটা চমৎকার সুযোগ পাওয়া যাবে। এই আফগান লোকটির সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য বল...’

হঠাৎ একটা কান ফাটানো বিস্ফোরণের শব্দ আওরঙ্গজেবের তাবুর বাইরে শোনা গেল। তাবুর ছাউনিতে কতগুলো জিনিস পড়তেই তার পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠতেই তিনি তাঁবুর একটা খুঁটি ধরে নিজেকে সামলালেন। এটা আবার কি? ভূমিকম্প তো এরকম বস্তু ছুড়ে ফেলে না। কাঁপুনিটি কমে যেতেই কি হয়েছে দেখার জন্য আওরঙ্গজেব তাবুর বাইরে ছুটে গেলেন। হাতিগুলো যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে হাতির ডাক শোনা গেল। কয়েকজন সেনাপতি তাদের তাবু থেকে বের হয়ে হতভম্ব হয়ে চারদিকে তাকাল। সর্বত্র বড় বড় পাথরের টুকরা আর মাটি ছড়িয়ে রয়েছে। তারপর তিনি এর কারণটি দেখলেন।

তার চারশো গজ সামনে মাটিতে একটি বিরাট ফাটল দেখা গেল। গোলকুন্ডা দুর্গের সবচেয়ে বুরুজের দিকে যাওয়ার জন্য তার অর্ধেক দূরত্বে একদল মোগল প্রকৌশলী মাটিতে একটি সুরঙ্গ খুঁড়ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সুরঙ্গ দিয়ে এর নিচে পৌঁছে যতবেশি সম্ভব বারুদ চেপে এটাকে ভেঙ্গে ফেলা, যাতে গোলকুন্ডিদের প্রতিরক্ষায় একটা ফাটল ধরান যায়, যা মোগলদের সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। এখন সেই সুরঙ্গের সরু আর নিচু মুখ থেকে রক্তাক্ত আর কাদামাখা দেহে কয়েকজন প্রকৌশলী কোনোমতে বের হয়ে এল। নিশ্চয়ই কোথাও কোনো একটা গোলমাল হয়েছে, কিন্তু কী সেটা?

আওরঙ্গজেব তার পুরোনো দেহরক্ষীদলের প্রধান উমর আলিকে বললেন, ‘একজন প্রকৌশলীকে ডেকে আন, যে কথা বলার অবস্থায় আছে।’ কয়েক

মিনিট পর মুখ, মাথায় আর পোশাকে কাদামাখা একজন লোককে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হল।

'সুরঙ্গে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় কী তোমাদের বারুদ ফেটে গিয়েছিল?

'না, জাঁহাপনা, এটা গোলকুন্ডিদের বারুদের বিস্ফোরণ।'

'কী বলতে চাও? কী ভাবে হল?'

'ওরা হয়তো কোনোভাবে আমাদের সুরঙ্গ খুঁড়া টের পেয়েছিল। আমাদের শ্রমিকরা সুরঙ্গ দিয়ে আসা যাওয়ার শব্দ কিংবা নড়াচড়ার কারণে হয়তো ওরা টের পেয়েছিল। তাছাড়া সুরঙ্গের উপরের মাটিও একটু দেবে গিয়েছিল। বুরুজর নিচে আমরা বারুদ পেতে ফাটাবার প্রস্তুতি নেবার আগেই ওরাও একটা সুরঙ্গ কেটে আমাদের সুরঙ্গ বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেয়।'

আওরঙ্গজেব মাথা নেড়ে বললেন, 'আচ্ছা তাই বল।' গোলকুন্ডিরা নিশ্চয়ই এখনও অনেক সুসংগঠিত আর সুশৃঙ্খল। আর একই সাথে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর সতর্ক। আমাদের সুরঙ্গ খুঁড়া টের পাওয়ার জন্য ওরা চর বসিয়েছিল। যে আফগান লোকটির কথা ওয়াজিম খান বলেছিল, এখন তার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল। তার সম্পর্কে আরো কিছু জানতে হবে। তবে তাঁকে আগে সুরঙ্গ খুঁড়ার কাজে নিযুক্ত লোকজনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আর সমর্থন জানাতে হবে। তিনি কল্পনাও করতে পারলেন না মাটিতে পেট লাগিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে একটি সরু সুরঙ্গের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া কি কষ্টকর হতে পারে। ছাদ ঠেকো দেবার উপযুক্ত কোনো জিনিসপত্র নেই। আর বারুদের থলে টেনে নিয়ে যাওয়া কি বিপজ্জনক, সর্বক্ষণ আতঙ্কের মধ্যে থাকা, যেকোনো মুহূর্তে একটি স্ফুলিঙ্গ বারুদে আগুন ধরিয়ে দেবে কিংবা উপর থেকে মাটি পড়ে ফিরে যাওয়ার একমাত্র পথ বন্ধ হয়ে ধীরে ধীরে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে করুণ মৃত্যু।

'তোমরা সবাই বীরের মতো কাজ করেছ। আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি একান্ত আনুগত্য দেখিয়েছ। আমি কথা দিলাম যারা বেঁচে রয়েছে তাদের সবাইকে যথোপযুক্ত পুরস্কৃত করা হবে আর যারা হতাহত তাদের পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হবে।'

লোকটি মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, 'ধন্যবাদ জাহাপনা।'

আওরঙ্গজেব পেছনে ঘুরে ওয়াজিম খানকে সাথে নিয়ে দ্রুত তাবুর দিকে ফিরে চললেন। সেখানে পৌঁছে বসার আগেই তিনি ওয়াজিম খানকে বললেন, 'তুমি বললে, এই আফগান লোকটি গোলকুন্ডি সেনাবাহিনীর সহকারী প্রধান সেনাপতি। তারপরও সে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের জন্য দুর্গে ঢোকার পথ করে দেবে?'

'হ্যাঁ, জাঁহাপনা। এই লোকটির নাম রশিদ খান। আপনার মনে আছে এক বার্তাবাহককে আমরা ধরেছিলাম যখন সে গোপনে রাতে দুর্গ থেকে বের হয়ে এল? তার কাছ থেকে বার্তাগুলো কেড়ে না নিয়ে, তাকে মেরে না ফেলে কিংবা বন্দী না করে আমরা তাকে ঘুষ দিয়ে বললাম সে তার কাজ চালিয়ে যেতে পারবে, তবে সমস্ত বার্তা আমাদেরকে দেখাতে হবে। এই বার্তাগুলোর মধ্যে একটা বার্তা রশিদ খান তার চাচাত ভাইকে লিখেছিল। সে একটি হীরার খনিতে সৈন্যদের নেতৃত্বে রয়েছে। আফগান লোকটি তার বার্তায় আদিল খানের চাকরিতে ঢোকার জন্য এখন আফসোস করছিল। যদিও সে অনেক উঁচু পদে উঠতে পেরেছে আর তার অনেক সম্পদ লাভ হয়েছে। তবে তার আশঙ্কা বাইরে থেকে দুর্গে কোনো সাহায্য আসবে না। গোলকুন্ডার কোনো সেনাদল তেমন শক্তিশালী নয়। কাজেই কোনো সেনাপতি এই ঝুঁকি নেবে না। যদিও দীর্ঘদিন তারা প্রতিরোধ করতে পারবে তবে পরিশেষে ঠিকই এর পতন হবে। সে নিজেও মারা যেতে পারে, আর যে সম্পদ এতদিন জমিয়েছিল তা সমস্ত হারাবে। আমি তার চাচাত ভাইয়ের হয়ে তাকে একটা উত্তর লিখলাম, তাতে তাকে সমবেদনা জানালাম আর বললাম যে, এখানে বন্দীরা বলাবলি করছে, যদি কেউ মোগলদের দুর্গে ঢোকার পথের খোঁজ দিতে পারে তবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। আর সে যদি এতে আগ্রহী হয় তবে যেন একই বার্তাবাহকের মাধ্যমে তার উত্তর পাঠায়। তারপর তার ভাই আমাদের কাছে প্রস্তাব পাঠাবে। এই বার্তাটি সেই বার্তাবাহকের হাতে দিয়ে তার কাছে পাঠালাম। সে সাথে সাথে উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিল, সেটা পাওয়ার সাথে সাথেই আমি আপনার কাছে এলাম যাতে আপনি নিজে তাকে একটা ক্ষমা আর পুরস্কারের প্রস্তাব দিয়ে চিঠি লিখতে পারেন।'

'আমি চিঠি লিখতে রাজি আছি, কিন্তু এখানে কী নিশ্চয়তা আছে যে, সে আমাদেরকে একটা ফাঁদে ফেলবে না? তার সম্পর্কে আর তার চরিত্র সম্পর্কে আমরা কতদূর জানি?'

'সে সারাজীবন একজন ভাড়াটে সেনা হিসেবে কাটিয়েছে। কোনো অস্থায়ী প্রভুর চেয়ে ভাড়াটে সেনাদের নিজের আর নিজেদের সম্পদের প্রতি যথেষ্ট মায়া আছে। আমার বিশ্বাস সে এর আগে অন্তত একবার হলেও তার আনুগত্য বদল করেছে। দুর্গের ভেতরে তার কোনো পরিবার নেই। নিজেকে ছাড়া আর কারও জন্য ভাবার মতো তার কেউ নেই। আর তার প্রথম চিঠি থেকে আমরা জানতে পেরেছি চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের পরাজয় অবধারিত।'

'সে সব ঠিক আছে। তবে সে যদি আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে, সেজন্য দুর্গটা তাকে আমাদের হাতে তুলে দেবার জন্য, আমাদেরকে এমন একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে, যাতে আমাদের খুব বেশি লোকবল প্রয়োজন না পড়ে। এটা বলার পর আমি একটা চিঠি লিখে তাকে ক্ষমার প্রস্তাব দেব আর সেই সাথে উত্তরে পাঞ্জাবের বিদ্রোহী শিখদের কাছ থেকে আমরা যে জায়গা দখল করেছি, সেখান থেকে তাকে বড় একটা জায়গির দেব।'

ভোরের একটু আগে যখন বাদুড়েরা নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন আওরঙ্গজেবের দেহরক্ষী দলের ত্রিশজন সদস্য, তাদের দলপতি উমর আলির নেতৃত্বে কালো পোশাক পরে আর মুখে কালি মেখে মোগল সীমানা থেকে বের হয়ে গোলকুন্ডা দুর্গের দিকে চুপিসারে রওয়ানা দিল। কেউ কোনো ধাতব বর্ম কিংবা শিকলের বর্মও পরলো না এই ভয়ে যে, এর টুংটাং আওয়াজে ওদের অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে যেতে পারে, বিশেষত কেউ যদি মাটিতে পড়ে যায়। ছোট ছোট বারুদের পিপার ওজনে পাঁচজন নিচু হয়ে হাঁটছিল। গোলকুন্ডা দুর্গের মূল ফটকের দিকে না গিয়ে ওরা পূর্বদিকের একটি বুরুজের দিকে চলছিল। আফগান সেনাপতি সেখানে মাটির কাছে গোড়ায় লোহার শিকের ছোট দরজা দিয়ে ওদেরকে ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা করার কথা বলেছিলেন। সবকিছু প্রস্তুত হওয়ার পর সে দরজাটি সামান্য খুলে একটি লণ্ঠন দিয়ে ওদেরকে পথ দেখাবে।
ত্রিশজন লোক এক সারিতে নিঃশব্দে হেঁটে চললো। কেবল মাঝে মাঝে অন্ধকারে একটা পাথর কিংবা মরা গাছের গুঁড়িতে হোঁচট খাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা পূর্বদিকের বুরুজের কাছাকাছি পৌঁছল। এখানে পাঁচ-ছয়জন মোগল শ্রমিকের মৃতদেহ পচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। গত সপ্তাহে বুরুজের প্রাকার থেকে গোলকুন্ডি বরকন্দাজরা গুলি ছুড়ে এদেরকে মেরেছিল। ওরা মাটি খুঁড়ে একটি সুরঙ্গ খুঁজে বের করার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। গুজব ছিল যে এখান দিয়েই গোলকুন্ডা দুর্গে রসদ সরবরাহ করা হত। অন্ধকারে শবদেহ থেকে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছিল একটি নেড়ি কুকুর। ওদেরকে দেখে হঠাৎ কুকুরটি দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এসে একজন সৈনিকের উরুতে দাঁত বসিয়ে দিল। অতিকষ্টে চিৎকার দমন করে সে একটা ছুরি বের করে কুকুরটির ঘাড়ে দুইবার আঘাত করতেই কুকুরটি সাথে সাথে মারা গেল। তারপর অন্যান্য প্রহরীর মতো সেও মাটিতে শুয়ে পড়লো। যদি কেউ দুর্গের দেয়াল থেকে কুকুরটার গর্জন কিংবা মরণ আর্তনাদ শুনে থাকে সে ভয়ে। তবে ওরা এখনও দুর্গ থেকে বেশ দূরে রয়েছে।

উমর আলি সাবধানে উঠে দাঁড়াল, তারপর তার লোকদেরকে অনুসরণ করতে ইশারা করে আবার চুপিসারে সামনে এগোতে লাগলো। দিগন্তে ভোরের বেগুনি আলোর ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে। ওরা এবার রুক্ষ আর কঠিন গ্র্যানাইট পাথরের উপর উঠে এসেছে, যার উপর দুর্গটি নির্মাণ করা হয়েছিল। উমর আলি দুর্গের দিকে তাকাল যদি কোনো লণ্ঠনের ম্লান আলো দেখা যায়, যা ওদেরকে দুর্গে ঢোকার পথ দেখাবে। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। হয়তো সম্রাট ঠিকই বলেছিলেন যে, ওদেরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে একটা ফাঁদে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে ওদের উপর আক্রমণ করার আগে গোলকুন্ডিরা কি ওদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না?

তারপর প্রায় একশো গজ দূরে সবচেয়ে উঁচু বুরুজের নিচে একটা আলো দেখা গেল। বাকি লোকদেরকে সাবধান হতে বলে উমর আলি বেশ দ্রুত পাথরের উপর দিয়ে আলোটার দিকে ছুটলো। দেয়ালের ছায়ার কাছে পৌঁছতেই তার নাকে একটা প্রচণ্ড দুর্গন্ধ এল, আর পা ডুবে গেল নরম আঠাল পদার্থে— সম্ভবত এর উপরে একটি পায়খানা রয়েছে। পা উঠিয়ে সে আবার দ্রুত আলোর কাছে অর্ধেক খোলা দরজাটির কাছে গেল, চার ফুটের বেশি উঁচু হবে না। সে কাছে পৌঁছতেই দরজাটা পুরোপুরি খুলে গেল। তরোয়ালের বাটে হাত রেখে সে মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকে দেখলো ছোট একটি ভূগর্ভস্থ কামরার মতো জায়গায় একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাজপাখির মতো বাকা নাকের লোকটির হাতে একটি বড় লণ্ঠন।

লোকটি বললো, 'আমি রশিদ খান।'

'আর আমি উমর আলি, সম্রাট আওরঙ্গজেবের দেহরক্ষী দলের প্রধান। আপনি একা?'

'হ্যাঁ। আর আপনিও তাই। আপনার বাকি লোক কোথায়?'

'ওরা কাছেই আছে। আমি দেখতে এসেছি যে এটা একটা ফাঁদ কি-না।'

'আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি সেরকম কিছু নেই। তবে আমার কথা না শুনে আপনি নিজে লণ্ঠন নিয়ে ভালোমতো দেখে আসুন।'

একহাতে লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে অন্য হাত তরোয়ালের বাটে রেখে, উমর আলি দ্রুত জানালাহীন গোলাকার কামরাটির চতুর্দিক অন্ধকারে উঁকি দিয়ে ঘুরে দেখলো। একবার একটা ইঁদুর তার সামনে দিয়ে ছুটে যেতেই সে চমকে উঠলো, তবে কামরাটি খালি, কিছুই নেই, এমনকি একটা আসবাবও নেই যার পেছন থেকে কোনো হামলাকারী লুকিয়ে থাকতে পারে। সে কামরার ভেতর থেকে বের হবার সময় পাথরের সিড়ির কয়েকটি ধাপ বেয়ে উঠে দেখলো

উপরে একটি শক্ত দরজা ভেতরের দিক থেকে খিল আটকে রাখা আছে, তার মানে বাইরে থেকে কেউ ভেতরে আসতে পারবে না। পেছন ফিরে রশিদ খানের দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'আমি সন্তুষ্ট। আমি আমার লোকদেরকে এখানে আসার জন্য সংকেত দেব। ওদের সাথে আমার কথা হয়েছে, আমি দ্রুত তিনবার দরজাটা খুলবো আর বন্ধ করবো যাতে আলোটা তিনবার সংকেত দেয়।'

একটু পরই উমর আলির সঙ্গীরা চলে এল। উমর আলি জিজ্ঞেস করলো, 'বারুদের পিপাগুলো কোথায় স্থাপন করলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যাবে?'

'বাইরের দেয়াল ঘেঁসে দরজার কাছে।'

উমর আলির লোকজন যথারীতি ভারী পিপাগুলো টেনে নিয়ে যথাস্থানে রেখে বারুদ বিস্ফোরিত করার জন্য স্ফুলিঙ্গবহ দড়ি লাগাতে লাগলো। জায়গামতো বারুদ স্থাপন করার পর উমর আলি বললো, 'বারুদ বিস্ফোরিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের কয়েকটি পল্টনের চৌকশ সৈন্যরা ফাটলের দিকে ছুটে আসবে।'

আফগান সেনাপতি জিজ্ঞেস করলো, 'খুব ভাল। তবে পলিতার রশিটি কি যথেষ্ট লম্বা, যাতে বিস্ফোরণের সাথে সাথে আমরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পারি?'

'হ্যাঁ, তা আছে। তবে এখান থেকে আমরা কোনদিকে যাব সেটা আপনাকে দেখাতে হবে।'

রশিদ খান মাথা নাড়তেই উমর আলি তার লোকদেরকে পলিতায় আগুন লাগাতে ইশারা করলো। চকমকি পাথরের বাক্স থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হতেই চারটা পলিতায় হিস হিস করে উঠলো, তবে পঞ্চম চকমকি পাথরের বাক্সটি যে লোকটি জ্বালাচ্ছিল সেটা তার হাত ফস্কে অন্ধকারে মেঝেতে পড়ে গেল। সে বাক্সটা খোঁজার জন্য অন্ধকার মেঝেতে হাতড়াতে লাগলো।

উমর আলি বললো, 'তোমরা সবাই রশিদ খানকে অনুসরণ কর। আমি কাজটা শেষ করে আসছি।' সাথে সাথে সেনাপতি অন্যদেরকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে নিয়ে চললো। উমর আলি নিচু হয়ে চকমকি পাথরের বাক্সটি খুঁজতে শুরু করতেই শুনতে পেল উপরের সিঁড়ির দরজার খিল টেনে খোলা হচ্ছে। সে চকমকির বাক্সটি খুঁজে পেয়েই পঞ্চম পলিতায় আগুন জ্বালিয়ে দিল। অন্য পলিতাগুলো পুড়তে পুড়তে বারুদের পিপাগুলোর কাছাকাছি পৌছে গেছে, পঞ্চমটি ঠিকমত জ্বলছে নিশ্চিত হয়ে সে সিঁড়ির দুটো করে ধাপ পার হয়ে উপরের দরজার দিকে ছুটলো। উপরে উঠে খোলা দরজার কাছে

পৌঁছতেই তাজা বাতাস তার দিকে ভেসে এল। দরজা থেকে বের হয়ে সে দ্রুত দুই সারি গোলাকার পাথরের বাঁধের মাঝখানে সমতল জায়গায় এল। তারপর দেখলো কয়েকটি পাথরের আড়াল থেকে রশিদ খান লণ্ঠন দিয়ে তাকে ইশারা করছে, সে সেদিকে ছুটে গেল। সেখানে পৌঁছে ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়তেই বারুদের পিপায় বিস্ফোরণ ঘটলো। বুরুজটি প্রথমে একটা মাতালের মতো এদিক সেদিক টলতে টলতে তারপর প্রচণ্ড শব্দে ভেঙ্গে পড়লো। বালু আর পাথরের টুকরার একটা জঞ্জালে পরিণত হল। একটা বড় পাথরের টুকরা উমর আলির কাছেই ধপ করে মাটিতে পড়লো, তবে রশিদ খান ইতোমধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে মোগলদেরকে তার সাথে ভেতরের দেয়ালের বেষ্টনির দিকে যাওয়ার জন্য হাত নেড়ে ইশারা করলো।

উমর আলি আর তার লোকজন ছুটতে শুরু করতেই দুর্গের বাইরের আর ভেতরের দুইদিকের বুরুজের ছাদ থেকে গাদা বন্দুক আর কামানের গোলা বর্ষণ শুরু হল। তবে মনে হয় গোলাগুলি ওদের দিকে হচ্ছে না, বাইরে থেকে মোগল সৈন্যরা বুরুজের ফাটলের দিকে ছুটে আসছে দেখে ওরা সেদিকে গুলি বর্ষণ করছিল। উমর আলি তার দলনিয়ে নিরাপদে ভেতরের দেয়ালের কাছে পৌঁছে দেয়ালের সাথে গা ঘেসে দাঁড়াল। রশিদ খান ফিস ফিস করে উমর আলিকে বললো, 'দেয়ালে ঘুরলেই এখান থেকে বাম দিকে তিনশো ফুট সামনে একটা বুরুজের মধ্যে একটা প্রহরা কক্ষ আছে। আমি সেখানে একা যাব, তারপর যে রক্ষীরা সেখানে আছে তাদেরকে বলবো সেখান থেকে বের হয়ে বাইরের দেয়ালের প্রতিরক্ষার জন্য ছুটে যেতে। কেউ যদি যেতে অমান্য করে কিংবা বাইরে ঘোরাফেরা করে তাকে মেরে ফেলতে হবে। প্রহরীকক্ষে ঢোকার পর ভেতর থেকে ভালোভাবে সবদিক বন্ধ করে আপনাদের মূল বাহিনী আসা পর্যন্ত আপনাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।'

উমর আলি মাথা নেড়ে বললো, 'ঠিক আছে বুঝেছি।' রশিদ খান চলে যেতেই সে ভাবলো এই আফগান লোকটি কিভাবে পুরোপুরি তার আনুগত্য পাল্টে ফেললো। যে সেনাদের সে নেতৃত্ব দিয়েছে আর নিঃসন্দেহে যারা তাকে বিশ্বাস করে কিভাবে এত সহজভাবে তাকে মেরে ফেলার কথা বলতে পারলো। সে নিজে কখনও এটা করতে পারতো না...আফগান লোকটির কোনো বিবেক নেই আর সে অত্যন্ত স্বার্থপর। যাইহোক সে তার নতুন প্রভু—সম্রাটের জন্য যা যা করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা সবই করছে, কাজেই সে আর তার লোকজন অবশ্যই তার নির্দেশ অনুযায়ীই কাজ করবে। কয়েকমিনিট পর উমর আলি দেখলো আফগান সেনাপতি আরেকটি লণ্ঠন হাতে নিয়ে ওদেরকে সেদিকে

এগোতে ইশারা করছে। তখনও দেয়াল ঘেঁসে ওরা অস্ত্র হাতে নিয়ে বুরুজের বাঁক ঘুরে চুপিসারে এগোল। কেউ প্রতিরোধ করলো না আর দ্রুত ছোট পাহারা কক্ষে ঢুকে ওরা দেখলো রশিদ খান একা সেখানে রয়েছে। এখানে আগে যারা ছিল তাদের ব্যবহৃত কয়েকটি গুটিয়ে রাখা বিছানা, মোটা কম্বল আর একটা লম্বা লোহার টেবিলের উপর আধখাওয়া রুটির টুকরা পড়ে রয়েছে। রশিদ খানের নির্দেশে প্রহরীরা নিশ্চয়ই লড়াই করার জন্য সাথে সাথে ছুটে চলে গেছে।

উমর আলি তার লোকদেরকে বুরুজের কামরায় ঢোকার সমস্ত পথ বন্ধ করতে নির্দেশ দিল। ওরা সাথে সাথে কাজে লেগে পড়লো। টেবিল উল্টে বাইরের দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে খিল আটকে দিল। তারপর সে উপরে ছাদে উঠে দেয়ালের গায়ে গাদা বন্দুক ছোড়ার জন্য বড় একটা ছিদ্রের ফাঁক দিয়ে বাইরের দেয়ালের ফাটলের দিকে তাকাল। ভোরের ফুটি ফুটি আলোয় সে দেখতে পেল মোগল পদাতিক সেনারা পতাকা উড়িয়ে জঞ্জালের উপর দিয়ে এদিকে আসছে। গোলকুন্ডিরা তখনও প্রাণপণে লড়ে চলেছে। তবে ধীরে ধীরে ওরা পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে।

তারপর মোগল অশ্বারোহীর একটি বড় দল দেয়ালের ফাটলের কাছে ছুটে এল। জঞ্জাল টপকে পার হতে গিয়ে একটা ঘোড়া আরোহীসহ ঘুরে পড়লো। আরেকটি ঘোড়া লাফ দিতে গিয়ে তার আরোহীকে পিঠ থেকে ফেলে দিল। তবে বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হলেও শীঘ্রই অনেক মোগল অশ্বারোহী জঞ্জাল পার হয়ে ভেতরে ঢুকলো। ভেতরে ঢুকে ওরা ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পেছন দিক থেকে গোলকুন্ডিদের উপর হামলা করলো। ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচু হয়ে ওরা তরোয়াল দিয়ে ওদের পেছন দিকে কোপাতে শুরু করলো। দুই দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে গোলকুন্ডিরা কোনোরকমে পেছন দিকে ভেতরের বুরুজের দিকে ছুটতে শুরু করলো, যেখানে উমর আলি দাঁড়িয়ে ছিল। মোগল অশ্বারোহীরাও তাদেরকে অনুসরণ করলো। কয়েকজন অবশ্য গোলকুন্ডিদের বুরুজের ছাদ থেকে ছোঁড়া গাদা বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল।

উমর আলি উপর থেকে নিচে তার লোকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললো, 'দরজাগুলো খুলে দাও! যে গোলকন্ডিরা ফিরে আসছে তাদের উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়। যেভাবে হোক আমাদের অশ্বারোহী সেনাদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ কর। বুরুজের মধ্য দিয়ে ওদেরকে ভেতরের উঠানে ঢোকার সুযোগ করে দাও। আর আমাদের পতাকাটা এনে দাও আমাকে।' একজন সৈনিক তার

কালো পোশাকের নিচে একটা পতাকা পেঁচিয়ে নিয়েছিল। সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে ছুটে গেল তারপর সে আর উমর আলি মিলে দেয়ালের গাদা বন্দুক ছোঁড়ার ছিদ্র দিয়ে পতাকাটা দোলাতে লাগলো।

শীঘ্রই মোগল সেনারা ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে বুরুজের দিকে ছুটলো। পেছন ফিরে বাইরের দেয়ালের ফাটলের দিকে তাকিয়ে উমর আলি দেখতে পেল লড়াই প্রায় থেমে গেছে। পদাতিক আর অশ্বারাহী মোগল সেনারা দলে দলে আসছিল। বেশিরভাগই ভেতরের বুরুজের দিকে চেপে এল। কেউ কেউ মাটিতে পড়ে থাকা তাদের সহযোদ্ধাদের দিকে তাকাল, কেউ বেঁচে আছে কি-না দেখে তার ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে তাদেরকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো। তারপর আরেকদল অশ্বারোহী দেয়ালের ফাটলের কাছে এল। এতদূর থেকেও সে তাদের কয়েকজনকে চিনতে পারলো, ওরা তার অধীনস্থ সম্রাটের দেহরক্ষীদল। তাদের মাঝখানে স্বয়ং সম্রাটও রয়েছেন। তিনি একটি কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসেছেন, তার বুকের বর্ম চকচক করছিল। প্রায় সত্তর বছর বয়স হলেও তিনি যুদ্ধের এই মুহূর্তে—তাঁর বিজয়ের মুহূর্তে তাঁর সৈন্যদের মাঝে আসতে অধীর ছিলেন। সম্রাটকে স্বাগত জানিয়ে দুর্গের ভেতরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উমর আলি দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে ছুটে এগোল।

আধঘণ্টা পর উমর আলি আর তার চারপাশে বাদবাকি দেহরক্ষীদলের সদস্যদের নিয়ে আওরঙ্গজেব একটি বড় পাথরের দালানে ঢুকলেন। সদ্য ধৃত বন্দীরা বলেছে এটা আদিল হাসানের ব্যক্তিগত আবাসস্থল আর লড়াই যখন তার সেনাদলের বিরুদ্ধে যেতে শুরু করেছে তখন তিনি সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে গোলকুন্ডি সেনারা প্রায় সবাই অস্ত্র ফেলে দিয়ে মোগলদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মোগল সৈন্যরা তাদের হাত পিছমোরা করে বেঁধে দলে দলে ভাগ করে মাটিতে উবু করে বসিয়ে রাখছিল।

আওরঙ্গজেবের দেহরক্ষীদলের প্রথম সারিটি যখন একটি মার্বেল পাথরের স্তম্ভশোভিত উঠান পার হচ্ছিল তখন দুটি গাদা বন্দুকের গুলির আওয়াজ শোনা গেল। একজন দেহরক্ষী মাটিতে পড়ে গিয়ে তার পায়ের ডিম চেপে ধরলো, সেখানে একটি ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো। তার সঙ্গীরা থামগুলোর পিছনে ছুটে গেল যেখান থেকে বন্দুকের গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। থামের আড়াল থেকে ভালুকের মতো আকৃতির একজন গোলকুন্ডি হাতের গাদা বন্দুকটির নল ধরে একটি লাঠির মতো মাথার উপর ঘুরাতে ঘুরাতে ছুটে এল। তার প্রথম আঘাতে সামনের মোগল সেনাটির মাথা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যেত, যদি সে সময়মতো মাথা না সরাত। লোকটি আবার আঘাত করার আগেই আরেকজন

দেহরক্ষী তার তরোয়ালের এক কোপে লোকটির মাথা কেটে ধর থেকে প্রায় আলাদা করে ফেললো।

ইতোমধ্যে দ্বিতীয় গোলকুন্ডি সেনাটি তার বন্দুক ছুড়ে ফেলে দিয়ে পেছনের দিকে একটি পর্দায় ঢাকা দরজার ভেতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পর্দার পেছন থেকে গানবাজনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ঐ লোকটিকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকতেই আওরঙ্গজেব আর তার দেহরক্ষীরা একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন। এমব্রয়ডারি করা দুধসাদা রঙের আলখাল্লা আর মাথায় ঝলমলে হীরকখচিত লাল পাগড়িপরা একজন লোক কামরার মাঝখানে একটি সোনার সিংহাসনে বসে একটি রূপার ট্রে থেকে মিষ্টি তুলে আয়েস করে খাচ্ছিলেন। তার চারপাশে ঘিরে বিশজন নর্তকি পেছনে দাঁড়ান পাঁচজনের একটি বাদকদলের সাথে তাল মিলিয়ে ঘুরে ঘুরে গান গাইছিল। ওদের চুলে জুঁইফুল আর পরনে পাতলা মসলিনের পোশাক। সিংহাসনে বসা লোকটি আদিল হাসান ছাড়া আর কেউ নয়। আওরঙ্গজেব তার দেহরক্ষীদের মাঝ দিয়ে তার দিকে এগোলেন।

তিনি কিছু বলার আগেই আদিল হাসান মুখে বাঁকা হাসি নিয়ে বললেন, 'আমার ধারণা আপনি নিশ্চয়ই সম্রাট আওরঙ্গজেব। আসুন আমার সাথে একটু আমোদ ফূর্তিতে যোগ দিন। শেষ সময়টুকু পর্যন্ত আমি উপভোগ করে নিতে চাই আর তারপর সেই আনন্দময় স্মৃতি আমার মনে সংরক্ষণ করে রাখবো। তারপর আমার ভাগ্যে আপনি যা রেখেছেন তা সহ্য করার সময় যাতে তা আমার মনে সান্ত্বনা হিসেবে কাজ করে।' একথা বলে তিনি তার আংটিপরা হাত দিয়ে ইশারা করতেই যন্ত্রীরা তাদের বাজনা দ্রুত লয়ে বাজাতে শুরু করলো। আর নতর্কীরা সেই তালে আরো জোরে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলো, তাদের খাটো জামা দেহের চারদিকে উড়তে লাগলো।

আওরঙ্গজেব গর্জে উঠলেন, 'গ্রেপ্তার কর এই অধঃপতিতদের। মাটির নিচে সবচেয়ে গভীর কারাগারে এদের বন্দী করে রাখ।'

সেদিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর নামাজ শেষে আওরঙ্গজেব হেঁটে বেলকনিতে এসে ওয়াজিম খানের পাশে এসে দাঁড়িয়ে দেখলেন, সে নিচে মোগলদের বিজয় উৎসব দেখছে। তিনি বললেন, 'আমরা এখন গর্ব করতে পারি ওয়াজিম খান, মোগল সাম্রাজ্য এখন সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়েছে। আর সামান্য কিছু গোলকুন্ডি সেনা আর মারাঠিদের দমন করতে হবে। তারপর আমি সেনাবাহিনী নিয়ে উত্তরে ফিরে যেতে পারি। তারপর ভূমি সংক্রান্ত প্রশাসনের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। আমার অবর্তমানে সেখানে যে দুর্নীতি হচ্ছে আর অর্থের জন্য অসৎ কাজ করার প্রবণতার কারণে কোষাগার শূন্য হচ্ছে আর কর্তৃত্ব বিনষ্ট হচ্ছে, তা সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে।

ওয়াজিম খান বললো, 'আজকের দিনটি সত্যি আপনার জন্য এক বিশাল বিজয়ের দিন, জাঁহাপনা। আজ সন্ধ্যায় আমার জন্য কোনো কাজ আছে?'

'না, আজ রাতে তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। সারাদিনের পরিশ্রমে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার পরিচারকরা মূল তাবুতে আমার জন্য যে শোয়ার ব্যবস্থা করেছে সেখানে গিয়ে এখন বিশ্রাম নেব। তুমি বরং ঐ উৎসবে যোগ দাও।'

মাঝরাত পর্যন্ত ঘুম না আসায় আওরঙ্গজেব অবাক হলেন। তার দেহ ক্লান্ত হলেও মনের মধ্যে ভাবনা চলছিল কত দ্রুত সম্ভব আর জান-মালের তেমন ক্ষতি না করে কিভাবে গোলকুন্ডার বাকি এলাকা, বিশেষত হীরার খনিগুলো তার আয়ত্তে আনা যায়। আফগান সেনাপতির মতো বাকি গোলকুন্ডি সেনাপতিদের মধ্য থেকে কাউকে কি ঘুষ দিয়ে বশ করা যাবে? ওয়াজিম খান বলেছিল, রশিদ খানের একজন চাচাত ভাই হীরার খনির প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত গোলকুন্ডা বাহিনীর একজন সেনানায়ক। তাকে কি বাগে আনার জন্য প্রস্তাব পাঠাবেন? লোকটির কী অবস্থান এখানে? কতটুকু ক্ষমতা সে ধরে? ওয়াজিম খান নিশ্চয়ই এসব জানে আর হয়তো কিভাবে এগোন যায় সে ব্যাপারে ভালো কোনো পরামর্শও দিতে পারে। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার এখনই ভালো সময়।

বিছানা থেকে উঠে আওরঙ্গজেব তাঁবুর দরজার কাছে গিয়ে বাইরের যে দুজন দীর্ঘদেহী দেহরক্ষী পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাদের একজনকে ডেকে বললেন, 'ওয়াজিম খানকে এখানে আসতে বল।'

প্রায় আধঘন্টা পর ওয়াজিম খান হাজির হল। তার চুল আর মুখ ঘামে ভেজা আর তাঁবুর ভেতরে নিচু হয়ে ঢোকার সময় একবার হোঁচট খেল আর কুর্নিশ করার সময় আরেকবার—সম্ভবত সে এখনও ঘুমের ঘোরে রয়েছে।

আওরঙ্গজেব বললেন, 'আমি আমাদের পরবর্তী অভিযানের কথা ভাবছিলাম আর তোমার পরামর্শ দরকার।'

সে বললো, 'হ্যা, জাঁহাপনা...আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।' তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল আর একটু পর পর থেমে যাচ্ছিল। একহাত দিয়ে ভ্রু থেকে ঘাম মুছলো।

'গোলকুন্ডি সেনাবাহিনীর অন্যান্য সেনাপতিদের সম্পর্কে তুমি কতটুকু জান, বিশেষত রশিদ খানের চাচাত ভাইয়ের সম্পর্কে?'

'জাঁহাপনা...হ্যাঁ...জাঁহাপনা...ওদের সেনাপতি...' ওয়াজিম খানের মনে হল মাথা ঘুরাচ্ছিল আর সে টলছিল। হঠাৎ আওরঙ্গজেব বিষয়টা বুঝতে পারলেন, তারপর তার কাছে একটু এগিয়ে গেলেন। হ্যাঁ সারা গায়ে মদের গন্ধ ভুর ভুর করছে।

'ওয়াজিম খান, তুমি মদ খেয়েছ?'

ওয়াজিম খান প্রথমে বললো, 'না, জাঁহাপনা...' তারপর যখন তার মাথায় একথাটা ঢুকলো এটা সে অস্বীকার করতে পারবে না, তখন সে বললো, 'আমি দুঃখিত...জাঁহাপনা...হ্যাঁ, আমাদের এই মহান বিজয় উৎসবে মেতে উঠে... আমি জাঁহাপনা, ক্ষমা করুন।'

'সত্যি করে বল তুমি কি প্রায়ই মদ খাও কি-না? আর কেউ না হলেও তুমি নিশ্চয়ই জান তথ্য পাওয়ার আমার কত উৎস আছে, কাজেই সত্যি কথাটা বল।'

'মাঝে মাঝে জাঁহাপনা,...সপ্তাহে একবারের বেশি না, শপথ করে বলছি। যখন বেশি চিন্তা করি, তখন এটা মনের চাপ কমিয়ে দেয়। আমার কয়েকটা ভালো পরিকল্পনা...' ওয়াজিম খানের কথা থেমে গেল।

'কি করে তুমি এটা পারলে! মদ পান করার ব্যাপারে আমার কঠোর নিষেধ অমান্য করলে? তুমি কী সমস্ত ব্যাপারে আমার অনুগত নও?'

'আমি আপনার একান্ত অনুগত আর বিশ্বস্ত, জাঁহাপনা...আপনার মনে আছে ঐ আফগান লোকটিকে আমি খুঁজে বের করেছি...দয়া করে...'

আওরঙ্গজেব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পেছন দিকে ঘুরলেন। ওয়াজিম খান যদি ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে থাকে তাহলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কিভাবে তাকে বিশ্বাস করা যায়? দুষ্টক্ষতের মতো অবিশ্বস্ততা আর অবাধ্যতা একবার মানুষের মনে ঢুকলে এটা দ্রুত সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।

'তোমার এই অসদাচরণের শাস্তি হিসেবে পুরো দরবারের সামনে তোমাকে পাঁচবার চাবুকের ঘা খেতে হবে। তারপর তুমি তোমার জায়গিরে তোমার পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে আমি আর না বলা পর্যন্ত সেখানেই থাকবে।'

'না, জাঁহাপনা...আমি মিনতি করছি দয়া করুন, না...! আমার মান সম্মানের কি হবে...?

'আমার নিষেধ অমান্য করার আগে একথা তোমার ভাবা উচিত ছিল।'

তাবুর বাইরে পাহারারত যে দীর্ঘদেহী প্রহরীদেরকে তিনি ডেকে এনেছিলেন, মোটাসোটা টলমল করতে থাকা ওয়াজিম খানকে ওরা তাঁবু থেকে বের করে নিয়ে যেতেই আওরঙ্গজেব তার শোয়ার ঘরের দিকে ফিরলেন। কেন তিনি কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না? কেন তার অতি ঘনিষ্ঠরা কোনো প্রশ্ন না করে শুধু তার নির্দেশ মানছে না আর বুঝতে পারছে না যে, তাদেরসহ কোনটা তার সাম্রাজ্য, আর সমস্ত প্রজাদের জন্য ভাল তিনি তা ভাল করেই জানেন। এটা ওদের দায়িত্ব। কি পাপ তিনি করেছিলেন যে, মাঝে মাঝে এরকম খারাপ ব্যাপার তার সাথে হচ্ছে?

অধ্যায় : উনিশ

জল্লাদ

কামরান বেগ হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'জাঁহাপনা, ক্ষমা করবেন অসময়ে আপনাকে ঘুম থেকে উঠাবার জন্য কোরচিকে বলেছি বলে। তবে আমার কাছে যে খবরটি আছে তার জন্য আর দেরি করা যায় না। আমার দুজন চর সম্ভাজিকে খুঁজে পেয়েছে—সে সংঘামেশ্বরে আছে!' আওরঙ্গজেব তার গুপ্তচর প্রধানকে এরকম উত্তেজিত হতে কখনও দেখেন নি।

'সংঘামেশ্বর? এটা কী? কোনো দুর্গ?'

'না জাঁহাপনা। শাস্ত্রি আর সোনভি নদী যেখানে মিশেছে, সেখানে একটি প্রমোদ উদ্যানের মাঝে এটি একটি প্রাসাদ। জায়গাটা বেশ ছোট আর তেমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও নেই। আমার লোকেরা এটা ঘুরে দেখে এসেছে। জায়গাটির মালিক কবি-কুলেশ নামে সম্ভাজির একজন সেনাপতি। সে সম্ভাজিকে অতিথি হিসেবে সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমার লোকেরা চুড়িফিতার ফেরিওয়ালা হিসেবে সেখানে কয়েকদিন কাটিয়েছে। ওরা সেখান থেকে শুনে এসেছে, সম্ভাজি সেখানে কবি-কুলেশের সাথে আমোদ-স্ফূর্তি করছে। তার সাথে কয়েকজন মাত্র সেনা রয়েছে।'

'এত কম সৈন্য কেন সে সেখানে নিয়ে গেছে?'

'কারণ তার ইচ্ছে ছিল খুব কম সময় সেখানে কাটাবে। তার বেশির ভাগ সেনা সে সেখান থেকে একটু দূরে দেবরুখ নামে একটি স্থানে ছেড়ে এসেছে। ওরা সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র, রসদ নেবে আর প্রশিক্ষণের জন্য কিছুদিন অবস্থান করছে। তবে সংঘামেশ্বরের এমন প্রচণ্ড আর্কষণ যে, সে এক মাসেরও বেশি সময় সেখানে রয়েছে আর সেখান থেকে তার চলে আসারও কোনো নামগন্ধ দেখা যাচ্ছে না'।

আওরঙ্গজেব চোখ বুজে একটু ভাবলেন। সম্ভাজি সম্পর্কে তিনি যা যা শুনেছেন এটা তার সাথে খাপে খাপে মিলে যায়। বাবার মতো সাহসী যোদ্ধা হলেও সে যুদ্ধের প্রস্তুতি আর পরিকল্পনার কাজটি তার অধীনস্থ সেনা কর্মকর্তাদের উপর

খুশি মনে ছেড়ে দেয়, যা শিবাজি করতেন না। তাঁর মনে একটা প্রশ্ন জাগতেই তিনি বললেন, 'তোমার চরেরা সম্ভাজিকে সংঘামেশ্বরে কেমন করে খুঁজে পেল?'

কামরান বেগ একটু অপ্রস্তুত হয়ে একমুহূর্ত ইতস্তত করলো, তারপর বললো, 'এটা প্রথমে ওয়াজিম খান বলেছিলেন যে, সে ঐ জায়গায় থাকতে পারে। সন্তাজি নামে যে তরুণ মারাঠি বন্দীটিকে আপনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, প্রথমবার জিজ্ঞসাবাদের সময় ঐ তরুণটি বলেছিল যে সম্ভাজি সংঘামেশ্বর জায়গাটি পছন্দ করেন...এমনকি সে নিজেও তার সাথে সেখানে সময় কাটিয়েছে।'

তাহলে ওয়াজিম খান আসলেই খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন লোক ছিল ...তাঁর প্রধান গুপ্তচরকে বরখাস্ত করার পর থেকে আওরঙ্গজেব কয়েকবার আফসোস করেছিলেন যে, সে আর তাঁর পাশে নেই। তার মন ছিল খুব তীক্ষ্ণ আর পরামর্শগুলোও সবসময় খুবই বুদ্ধিদীপ্ত ছিল। আর এখন মনে হচ্ছে ওয়াজিম খান তাঁকে একটা সুযোগ উপহার দিল যে তাকে ভোলা যায় না। তিনি বললেন, 'কামরান বেগ, তুমি নিশ্চয়ই এখান থেকে সংঘামেশ্বর পর্যন্ত যে এলাকাটি আছে তা ভালো করেই জান। আমাদের সৈন্যদের সেখানে পৌছতে কত সময় লাগবে?'

'এই দুর্গ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সংঘামেশ্বর প্রায় একশো মাইল দূরে। ভালো ঘোড়া আর সুসজ্জিত একটি অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর সেখানে পৌছতে প্রায় দুই দিন লাগবে আর কোনো সাহায্য পৌছার আগেই সম্ভাজিকে ধরে আনা যাবে—আমি আমার জীবন বাজি রেখে একথা বলতে পারি!'

'একটি সেনাদল কী যথেষ্ট হবে?'

'স্থানটি খুব একটা সুরক্ষিত নয়। তাছাড়া একটি ছোট সেনাদল মারাঠি এলাকায় ঢুকলে খুব একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।'

'ঠিক বলেছ, কামরান বেগ। তুমি একজন ভালো যোদ্ধা আর সেনানায়ক আর আমার প্রধান গুপ্তচর। আমি তোমাকেই এই অভিযানের দায়িত্ব দিচ্ছি। মারাঠি বন্দীটিকে তোমার সাথে নাও। সংঘামেশ্বর সম্পর্কে তার জ্ঞান কাজে লাগতে পারে। আর তোমার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার যদি তুমি সফল হতে পার। আর যদি ব্যর্থ হও তবে একজন শহীদ হিসেবে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য আর ধর্মবিশ্বাসের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেবে। দুই দিকেই তোমার জন্য গৌরবজনক সম্মান অপেক্ষা করছে।' প্রস্তুতি নেবার জন্য কামরান বেগ দ্রুত চলে যেতেই আওরঙ্গজেব মুখ বিকৃত করে মৃদু হাসলেন। তাঁর গুপ্তচর প্রধানের বাঁচামরা নির্ভর করছে তাঁর চরদের পর্যবেক্ষণের নির্ভুলতা, গুণ আর তার নিজের নির্দেশনার উপর। আসলে এভাবেই এটা হওয়ার কথা।

কামরান বেগ তার লোকদেরকে নির্দেশ দিল, 'আমরা এই জঙ্গলের কিনারায় থামবো। ঐ গাছগুলোর গুড়িতে ঘোড়া বাঁধ। আর তুমি ইব্রাহিম আলি চারজন লোকসহ এখানে থেকে ঘোড়াগুলো পাহারা দেবে। আর অন্যরা হেঁটে যাওয়ার জন্য তৈরি হও।' দ্রুত আলো কমে আসছে, অশ্বারোহী সেনারা চটপট কাজে লেগে পড়লো। বড় চামড়ার মশক থেকে পেটপুরে পানি খেয়ে আবার ঘোড়ার জিনের সাথে বেঁধে রেখে অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা করে নিল। কামরান বেগ ওদের মাঝে ঘুরে ঘুরে দেখে নিল সবকিছু ঠিক আছে কি-না। যখন সবাই তৈরি হল তখন সে খুশি হয়ে একবার ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করলো। বুদ্ধি করে সে তার লোকজনদের মারাঠিদের মতো পোশাক পরিয়েছিল। এতে পথে আসার সময় যেমন ছদ্মবেশ হিসেবে কাজ করেছে তেমনি এখন প্রাসাদে ঢুকতেও সাহায্য করবে।

সে একজন সৈন্যকে বললো, 'সন্তাজিকে নিয়ে এস। তাকে আমার সাথে রাখবো।' কয়েকমুহূর্ত পর সন্তাজি তার সামনে হাজির হল। কামরান দৃঢ়হাতে তার কাঁধ জাপটে ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'শোন, এখন সামনে যা হবে তাতে তোমার ভাগ্য নির্ধারণ হবে। যদি আমি দেখি যে সংগ্রামেশ্বর সম্পর্কে তুমি কোনো কিছু মিথ্যা বলেছ, তাহলে আমি তোমার গলা কাটবো। বুঝতে পেরেছ?'

সন্তাজি মাথা নাড়লো।

'তবে যাওয়ার আগে আমি তোমাকে একটা শেষ সুযোগ দিতে চাই। তুমি যা বলেছ তা সব সত্যি?'

'হ্যাঁ, জনাব।'

'ঠিক আছে। আমরা যখন পথ খুঁজে প্রাসাদের দিকে যাব, তখন আমার চোখ আর কান হয়ে তুমি সারাক্ষণ আমার পাশে থাকবে। হাত বাড়াও।' ছুরি বের করে কামরান বেগ ছেলেটির হাতের বাঁধন কেটে দিল। 'এটা করলাম, যাতে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না হয়। কোনো কিছু করার চেষ্টা কর না। এখন চল।'

ষাটজন লোক নি:শব্দে জঙ্গলের পথ দিয়ে এগিয়ে চললো। মাঝে মাঝে কেবল মাটিতে পড়ে থাকা গাছের ডাল আর পাতা মাড়িয়ে চলার সময় মচ মচ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। চাঁদ উঠতেই কিছু আলো পাওয়া গেল তবে একটু পরই গাছ কমে আসতেই কামরান বেগ খুশি হয়ে দেখলো এখন ভালভাবে পথ দেখা যাচ্ছে। একটা খোলা জায়গার কাছে পৌছার পর তার মনে হল সামনে পানির আভা দেখা যাচ্ছে। সোনভি নাকি শাস্ত্রি নদী? সে

নিশ্চিত হতে পারলো না, তবে এতে কিছু যায় আসে না। সে নদীর তীরের দিক থেকে প্রাসাদে যেতে চাচ্ছে না। তার যে দুই চর সন্তাজিকে খুঁজে বের করেছিল, তারা বলেছিল দুই নদী যেখানে এক হয়ে সাগরের দিকে চলে গেছে, সেই কোণে কবি-কুলেশ একটি উঁচু মার্বেল চত্বর নির্মাণ করেছিল। আর সেই চত্বরের পেছনেই প্রথমে প্রাসাদ আর তারপর প্রমোদ উদ্যান। আর এই পথ দিয়ে অতিথিরা ভেতরে ঢুকে, এ ধরনের কথাও সন্তাজি বলেছিল।

ওরা এখন গম ক্ষেতের মধ্য দিয়ে দ্রুত ছুটছিল। শেষ মাথায় প্রায় ছয় ফুট উঁচু একটা পাথরের দেয়ালের কাছে পৌঁছল। ছয়জনকে পেছনে পাহারায় রেখে কামরান বেগ বাকি লোকদেরকে দেয়াল টপকাতে নির্দেশ দিল। দেয়াল টপকে লাফ দিয়ে ওরা নিচে নরম ঘাসের জমিনে পড়তেই নাকে ফুলের সুঘ্রাণ পেল। কামরান বেগের নেতৃত্বে ওরা সতর্কভাবে চুপিসারে সামনেই একটি গোলাপবাগানের দিকে এগোল। কামরান সন্তাজির কনুই ধরে সামনে হাঁটছিল। গায়ে কাঁটার খোঁচা খেতে খেতে ওরা গোলাপ বাগান পার হয়ে একটি খোলা জায়গায় পৌঁছল। এখানে একটি বড় আর চারটি ছোট আকারের মার্বেল পাথরের ফোয়ারার পানিতে চাঁদের আলোয় রূপালি রঙ ছড়াচ্ছিল। ঘন গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে কামরান বেগ উঠেছে দেখতে পেল— সামনে অন্ধকার ভেদ করে ছোট ছোট আলোর ফোঁটা ফুটে রয়েছে। এখানে সেখানে একটা দুটো—খুব বেশি নয়। আস্তে শিস দিয়ে সে ওদেরকে থামতে বলে সন্তাজিকে জিজ্ঞেস করলো, 'ঐ আলাগুলো কী? পাহারাদারদের বেড়ার আলো?'

'না, তা মনে হয় না। জনাব। এই বাগানে কয়েকটি ঘর আছে যেখানে কবি-কুলেশের লোকরা মাঝে মাঝে এসে নর্তকীদের নাচ-গান উপভোগ করে। রাতে চাকরেরা এখানে মশাল আর মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে যায়, যেরকম সমস্ত প্রাসাদে, মার্বেল চত্বরসহ সব জায়গায় ওরা জ্বালায়। এই আলোগুলো নদীর পানির উপর প্রতিফলিত হয়ে চিকচিক করে যেন, এর উপর হীরা ভাসছে।'

কামরান বেগ মুখে ভেংচি কাটলো। এই কবি-কুলেশ মনে হয় ভাবছে সে পৃথিবীতে একটি স্বর্গ বানিয়ে সেখানে থাকছে— যেরকম গোলকুন্ডার শাসকও ভেবেছিল। আর আল্লাহ চাহে তো তারও সে ভুল শীঘ্রই ভেঙ্গে যাবে। 'সন্তাজি তুমি আমাদেরকে বাগানের মধ্য দিয়ে দ্রুততম পথ দেখিয়ে প্রাসাদে নিয়ে চল, তবে ঐ প্রমোদ ঘরগুলো এড়িয়ে চল।'

তরুণটি মাথা নেড়ে ডান দিকে ইঙ্গিত করলো। এরপর কামরান বেগ দুবার শিস দিয়ে ইঙ্গিত দিতেই মোগল দলটি আবার সামনে এগোল। ঠিকই ওদের

বামদিকেই কোনো এক জায়গা থেকে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। মাথা ঘুরিয়ে কামরান বেগ এবার ঝোপের মাথার কিনারায় ছোট ছোট থামের মাথা দেখতে পেল। এর চারপাশে মাটিতে জ্বলন্ত মশাল পুঁতে রাখা হয়েছে। সে সেতারের টুং টাং আর তার সাথে তবলার ছন্দময় বোল শুনতে পেল। এই লোকগুলোর কোনো পরিকল্পনাই নেই। যদি এটা মোগল এলাকা হত, তাহলে কোনো অবাঞ্চিত প্রবেশকারী বিনাবাধায় কোনোভাবেই দেয়ালের কাছে পৌছতে পারতো না, আর দেয়াল টপকে প্রাসাদের আঙিনায় ঢোকা তো দূরের কথা।

তবে এত আত্মতুষ্টি লাভ করাটা একটা ভুল হবে। সম্ভাজি হয়তো ফূর্তি করতে ভালোবাসেন, তবে তিনি এত বোকা নন। আর কবি-কুলেশও নয়, একজন সেনাপতি হিসেবে চতুর্দিকে যার বেশ সুখ্যাতি রয়েছে। মোগলদের গোপন হামলার খবর ওদের কানেও পৌছতে পারে, কেননা শুধু আওরঙ্গজেবেরই যে গুপ্তচর আর খোঁজ-খবর নেওয়ার মতো লোক আছে তা নয়। এই নিস্তব্ধতা হয়তো একটা ফাঁদ হতে পারে, মোগলদেরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে এনে তাদেরকে ধ্বংস করার একটা ফন্দি। সন্তাজিকে কাছাকাছি রেখে কামরান বেগ তার লোকদেরকে দ্রুত চলতে বললো আর একটু পরই সেতারের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে শুরু করলো।

নিচু হয়ে চুপিসারে চলতে চলতে আরো কিছু সুগন্ধি ফুলগাছের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে ওরা ঠিক সামনেই একটি নিচু সাদা দালান দেখতে পেল। এটাই নিশ্চয়ই সংঘামেশ্বরের প্রাসাদ। এর ছাদে কয়েক ফুট পর পর পাত্রে আগুন জ্বেলে তার শিখায় রাতের আকাশ আলোকিত করে রাখা হয়েছে। এর দোতলার জানালাগুলো থেকে আরো আলো দেখা যাচ্ছে। এছাড়া মূল প্রবেশ পথের খোলা দরজার ভেতর থেকে আলো এসে দালানের বাইরের অর্ধবৃত্তকার উঠানেও কমলা রঙের আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। কামরান বেগ আবার তার লোকদেরকে থামতে ইশারা করলো তারপর মাটিতে বসে পড়তে ইঙ্গিত করলো। চাঁদের অবস্থান দেখে আন্দাজ করা যায়, রাত বেশি হয়নি—বড় জোর রাত নয়টা। বেশি তাড়াহুড়া করার দরকার নেই। শীঘ্রই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে মূল ফটকের পাশে দুজন মারাঠি প্রহরী দেখতে পেল। গাদা বন্দুক দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে ওরা মাটিতে আসনপেতে বসে কথা বলছিল। কয়েকমিনিট পর পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে দুজন লোক প্রাসাদের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে এসে একজন প্রহরীকে কিছু একটা বলতেই লোকটি জোরে হেসে উঠলো। লোকদুটো আবার ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ আর কিছুই ঘটলো

না। তারপর একজন প্রহরী উঠে তার সঙ্গীর দিকে পেছন ফিরে ছর ছর শব্দ করে প্রস্রাব করে আবার ফিরে গিয়ে আসনপিড়ি হয়ে বসে পড়লো।

তারপর অন্ধকারে কোথা থেকে প্রাসাদের পেছনের ডান দিক থেকে নুড়িপাথরের পথ দিয়ে লোহার চাকাওয়ালা গাড়ি আসার ঘর্ঘর শব্দ শোনা গেল। সেদিকে উঁকি দিয়ে কামরান বেগ দেখতে পেল, প্রাসাদের এক কোণ ঘুরে ছয়টি বলদ একটি বড় গরুর গাড়ি টেনে আনছে। দেখে মনে হচ্ছে গাড়িটি নদীর দিক থেকে এসেছে। গাড়োয়ান লম্বা চাবুক হাঁকাতেই, পিপা আর বস্তা বোঝাই গাড়িটি প্রহরীদের পাশ কাটিয়ে ফটক দিয়ে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে গেল। প্রহরীরা একবারও এর দিকে ফিরে তাকাল না। কয়েকমিনিট পর দ্বিতীয় আরেকটি মালবোঝাই গরুরগাড়ি অন্ধকার থেকে উদয় হল আর একইভাবে প্রথম গাড়িটিকে অনুসরণ করে ফটকের মধ্য দিয়ে প্রাসাদের ভেতরে চলে গেল।

কামরান বেগ সন্তাজিকে জিজ্ঞেস করলো, 'এই গাড়িগুলো কী নদী থেকে মালামাল আনছে?'

'হ্যা, জনাব। প্রাসাদের রসদ নদীপথে এনে এখান থেকে প্রায় আধামাইল দূরে নদীর একটি ঘাটে এনে রাখা হয়, তারপর গরুর গাড়িতে বয়ে প্রাসাদে নিয়ে আসা হয়। নদীর প্রবল স্রোত আর দুই নদীর সঙ্গমস্থলের তীব্র স্রোতের কারণে নৌকাগুলো আসতে অনেক সময় দেরি হয়।'

'গাড়ির মাল কোথায় খালাস করা হয়?'

'প্রাসাদের মূল উঠানে খালাস করা হয়, সেখান থেকে সিঁড়ি সোজা মাটির নিচে মদের ভাঁড়ারে নেমে গেছে।'

কয়েক মিনিট পর গরুরগাড়িগুলো আবার প্রাসাদ থেকে বের হয়ে নদীর দিকে চলে গেল। কামরান একমুহূর্ত চিন্তা করলো। তার পরিকল্পনা ছিল ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অন্ধকার আর ছদ্মবেশের উপর নির্ভর করে তার লোকেরা প্রাসাদে ঢোকার চেষ্টা করবে—তবে এখন একটা আরো ভালো পথ বের হয়ে এসেছে...। সে বললো, 'আচ্ছা গাছের আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বাগানের মধ্য দিয়ে আমরা খুব তাড়াতাড়ি নদীর ঘাটে পৌছতে পারি না?' সন্তাজি মাথা নেড়ে সায় দিতেই সে আবার বললো 'চমৎকার, তাহলে সেখানে আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।'

প্রায় আধাঘণ্টা পর কামরান বেগের লোকেরা অতর্কিত আক্রমণ করে দুই গারোয়ানকে ছুরি মেরে লাশগুলো ঝোপের আড়ালে টেনে নিয়ে গেল। সাথে সাথে কামরান বেগ দশজনকে এক একটা গাড়িতে চড়তে বললো। দুজন

বসবে গারোয়ানের আসনে আর বাদবাকিরা পিপা আর বস্তার আড়ালে লুকাবে। তার বাকি সৈন্যদেরকে ফটকের উল্টোদিকে আগের জায়গায় গিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে বললো, আর লড়াইয়ের শব্দ পাওয়ার সাথে সাথে ওরা প্রাসাদে ঢুকে পড়বে। তারপর সে সন্তাজিকে ঠেলা দিয়ে প্রথম গাড়িতে উঠে বসে একটা পানি নিরোধক কাপড় গায়ের উপর টেনে নিল।

গাড়োয়ানের আসনে বসা লোকটি চাবুক হাঁকাতেই গাড়ি চলতে শুরু করলো। নদীর পথ ধরে চলতে চলতে প্রাসাদের এক পাশ দিয়ে ঘুরে মূল ফটকের দিকে এগোল। ভাগ্যের কি পরিহাস, কামরান বেগ ভাবলো। যখন সে নিজে ছোট ছিল, তখন সম্ভাজি আর শিবাজি বেতের ঝুড়িতে লুকিয়ে আগ্রা দুর্গ থেকে পালিয়েছিল। আর এখন সম্ভাজিকে আবার ধরতে সে নিজে লুকিয়ে একটি প্রাসাদে ঢুকছে। আর এক মিনিট, তারপরই ওরা উঠানে ঢুকে পড়বে...ছুরির বাটে হাত রেখে শক্ত হয়ে বসলো, কেউ কিছু বললেই লাফ দিয়ে উঠবে। শুনতে পেল একজন প্রহরী কিছু একটা বলে উঠতেই তার এক লোক উত্তর দিল। সন্তাজি আগেই ওদেরকে শিখিয়ে রেখেছিল ওরা কিভাবে নমস্কার করে আর কি উত্তর দিতে হবে। গাড়িটা একটা বাঁক নিয়েই উঠানে ঢুকে থেমে দাঁড়াল।

কামরান বেগ ফিস ফিস করে সবাইকে বললো, 'যেখানে আছো সেখানেই বসে থাক! অন্য গাড়িটাকে আসতে দাও।' তবে প্রায় সাথে সাথে পেছন থেকে ষাড়ের মৃদু ডাকের সাথে সাথে গরুর গাড়ির ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে বুঝা গেল দ্বিতীয় গাড়িটাও এসে পড়েছে।

তারপর কামরান বেগ একটা চিৎকার আর সেই সাথে অর্তনাদ শুনতে পেল। গায়ের উপর থেকে কাপড়টা ফেলে দিয়ে সে লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। পেছনের দ্বিতীয় গাড়িটার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলো কি ঘটেছে। একজন মারাঠি মাটির উপর হাত-পা ছড়িয়ে গলা কাটা অবস্থায় চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে আর তার দুই লোক তার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে হয়তো গাড়ির ভেতরে উঁকি দিয়ে ওদেরকে দেখে ফেলে চিৎকার করতে যাচ্ছিল। কামরান বেগ চিৎকার করে বললো, 'সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়, এখুনি!'

ঠিকই মারাঠি লোকটির চিৎকার শোনা গিয়েছিল। প্রায় দশজন মারাঠি উঠানে ছুটে এল। কামরান বেগের লোকদের ছদ্মবেশ দেখে ওরা একটু থতমত খেতেই মোগলরা একটু সময় পেল। সাদা পাগড়িপরা লম্বা-চওড়া একজন মারাঠি একটু ইতস্তত করতেই কামরান বেগ লোকটির ডান চোখ লক্ষ্য করে ছুরি চালাল। লোকটি আর্তচিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

এমন সময় একজন তরুণ মোগল সেনা সাবধান করে চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'উপরে তাকান! সাবধান!' কামরান বেগ মাথা নিচু করে সরাতেই ছাদের উপর থেকে একজন মারাঠি তার দিকে লক্ষ্য করে গাদা বন্দুকের গুলি ছুড়লো। গুলিটা তার মাথর উপর দিয়ে সাঁৎ করে উড়ে গিয়ে একটা গরুর গাড়ির কাঠে লাগলো। মারাঠি লোকটি আবার গুলি করার প্রস্তুতি নিতেই মোগল সেনাটি তার পিস্তল বের করে তাকে একটা গুলি করলো। মারাঠি লোকটির হাতে গুলি লাগতেই সে তার বন্দুক ফেলে দিয়ে ছুটে পালাল।

কয়েকগজ দূরে ইব্রাহিম আলি দুজন মারাঠির সাথে লড়াই করছিল। ওদের তরোয়ালের আঘাত এড়িয়ে সে লাথি দিয়ে একজনকে ফেলে দিতেই সে তার সঙ্গীর গায়ের উপর পড়তেই দুজনেই মাটিতে পড়ে গেল। এবার ইব্রাহিম আলি প্রথম জনের পেটে তরোয়ালের ডগা ঢুকিয়ে দিল। তারপর দ্বিতীয়জন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই তরোয়ালের এক কোপে তার মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।

ইতোমধ্যে যে সৈন্যদেরকে কামরান বেগ প্রাসাদের উল্টোদিকে অপেক্ষা করতে বলেছিল ওরাও উদ্যত তরোয়াল হাতে ছুটে এল। ওদের কয়েকজনের তরোয়ালে রক্তের দাগ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে বাইরে যে দুজন প্রহরী ছিল ওরা তাদেরকেও শেষ করে এসেছে। সম্ভাজির হাত শক্ত করে ধরে কামরান বেগ সামনে কতগুলো ভারী থামের উপর একটা বেলকনির দিকে ছুটতে ছুটতে সবাইকে বললো, 'সবাই আমার পেছনে পেছন এস! জলদি কর!' এর নিচে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে দেখতে হবে কতজন মারাঠি প্রতিপক্ষ এখানে রয়েছে। তবে চওড়া থামের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে সে দেখলো উঠানটি এখন নির্জন মনে হচ্ছে, লাল টকটকে রক্তের মধ্যে পড়ে থাকা কেবল গোটা ছয়েক মানুষের মধ্যে চারজন স্থির হয়েছে আর দুজনের দেহে তখনও প্রাণ ছিল। এদের মধ্যে তার কোনো লোককে দেখা গেল না। উপরে তাকিয়ে কেবল জ্বলন্ত মশালের অগ্নিশিখার নাচন আর ছায়া ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না।

তরোয়াল হাতে ইব্রাহিম আলি কামরান বেগের মনের কথাটা উচ্চারণ করলো, 'বুঝলাম না। মারাঠিরা কোথায় গেল? আর ওরা কয়জন ছিল?'

কামরান বেগ বললো, 'জানি না। হয়তো কেউ কেউ পালিয়ে গেছে আর অন্যরা কবি-কুলেশ আর সম্ভাজিকে সাবধান করতে গেছে।' তারপর সে পেছন ফিরে একটা থামের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়ান সম্ভাজির দিকে তাকিয়ে বললো, 'কবি—কুলেশের ব্যক্তিগত আবাস কোথায়?'

তরুণটি একটু ইতস্তত করলো, তারপর উপরের দিকে দেখিয়ে বললো, 'উপরে।'

কামরান বেগ বললো, 'নিয়ে চল আমাদের।' দশজন লোক নিচে পাহারায়

রেখে বাদবাকি লোকজনদের নিয়ে তারপর সে সন্তাজিকে অনুসরণ করে বেলে পাথরের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে একটি মার্বেল পাথরের ঘরের দিকে উঠে চললো। উপরে উঠে ডান দিকে ঘুরে সন্তাজি ওদেরকে একটি দরজার কাছে নিয়ে এল। দরজার উপর মানুষের মূর্তি খোদাই করা ছিল। ওরা ভাবলো যোদ্ধা? না...আরো কাছে এসে কামরান বেগ দেখলো পেশিবহুল দেহের অধিকারী পুরুষ আর উন্নতবক্ষা নারীর মৈথুন দৃশ্য। চওড়া করিডোরের দুপাশের দেয়ালেও আরো অনেক রঙিন মৈথুন দৃশ্য আঁকা রয়েছে। তবে এই পথের শেষ মাথায় কবি-কুলেশের ঘরের দুই পাল্লার দরজার প্রতি কামরান বেগ আগ্রহ দেখাল।

সন্তাজি ফিস ফিস করলো, 'এখানেই কবি-কুলেশ থাকেন।'

'কিরকম দেখতে? কয়টা কামরা আছে?'

'বড় একটি ডিম্বাকৃতি ঘর, দুই পাশে পর্দাঘেরা দুটি চোরা কুঠরি আছে আর শেষ মাথায় একটা মার্বেল পাথরের স্নানাগার।'

'কোনো জানালা আছে?

'প্রত্যেক চোর কুঠরির উপর একটা জানালা আছে। স্নানাগারে কোনো জানালা নেই।'

কামরান বেগ একমুহূর্ত ভাবলো। দরজার পেছনে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ থাকলেও সে সাবধান হয়ে গেছে। লোকজনসহ সে একটা ফাঁদের মধ্যে ঢুকতে চায় না, বিশেষত যেখানে মনে হচ্ছে আসা-যাওয়ার একটাই মাত্র পথ। তবে দরজার ওপাশে কি আছে তা কেবল সন্তাজির কথাতে জানা যাচ্ছে। সে সন্তাজিকে বললো, 'আগে তুমি যাও, গিয়ে দরজাটা খোলার চেষ্টা কর। আর মনে রেখ যদি কাউকে সাবধান করার চেষ্টা কিংবা অন্য কিছু কর তবে আমার লোকেরা তোমাকে গুলি করবে।'

সন্তাজি বড় একটা ঢোক গিললো তবে কিছু বললো না, করিডোর দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে দরজার দিকে গেল। কামরান বেগ তার সৈন্যদের নিয়ে পেছনেই রইল। দরজার কাছে পৌঁছে ঠেলা দিতেই দরজাটি খুলে গেল। কামরান বেগ অবাক হয়ে দেখলো সন্তাজি যা বর্ণনা দিয়েছিল ওপাশে ঠিক সেরকম একটি বড় কামরা দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা নিচু টেবিল পড়ে রয়েছে, তার উপর থেকে খাবারের থালা আর শরবতের গ্লাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে এমব্রয়ডারি করা গালিচার উপর পাতা হলুদ আর লাল রঙের কুশণ আর কোলবালিশের উপর। তারপর সে চোখের এক কোণ দিয়ে দেখতে পেল বামদিকে চোরা কুঠরির হালকা রঙের রেশমি পর্দাটা একবার দুলে উঠলো।

সে এগিয়ে গিয়ে তরোয়ালের ডগা দিয়ে পর্দাটা ফাঁক করলো। দুইজন সুন্দরী মেয়ে, পরনে স্বল্পবসন দেখে মনে হচ্ছে সম্ভবত নর্তকী, আতঙ্কে বড় বড় চোখ করে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'সন্তাজি এদিকে এস! এদেরকে বল আমরা ওদের কোনো ক্ষতি করবো না, তবে আমি জানতে চাই সম্ভাজি আর কবি-কুলেশ কোথায় আছে।'

সন্তাজি দ্রুত কামরান বেগের কথাগুলো তর্জমা করে ওদেরকে শোনাল। তারপর একটি মেয়ের উত্তর শোনার পর কামরান বেগের দিকে ঘুরে বললো, 'এরা কবি-কুলেশের বাড়ির পরিবার পরিজন। সে বললো, কবি-কুলেশ আর সম্ভাজি এখানে ছিলেন, তবে ওদেরকে এখানে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে বলে ওরা চলে গেছে। কোথায় গেছে সে দেখেনি।'

কামরান বেগ মেয়েটির দিকে তাকাল। যে মেয়েটি কথা বলেছিল—বেশ লম্বা, কোঁকড়ানো চুলে মেহেদি রঙ করা আর লাল ঠোঁট—সে তার দিকে তাকাল। তার ভারী বুকের দ্রুত উঠানামা দেখে মনে হল সে সন্ত্রস্ত হয়েছে। সে কি সত্যিকথা বলছিল? হয়তো বলছিল।

তাই যদি হয় তবে সম্ভাজি কোথায় গেল? বহুবছর ধরে গুপ্তচরের কাজ করতে করতে সে শিখেছে যুক্তি ছাড়াও অন্তর্জ্ঞানেরও একটি মূল্য আছে। সমস্ত কিছু বিবেচনা করে বোঝা যাচ্ছে সম্ভাজি বেশি দূর যায় নি—যাওয়ার সে সময় পায়নি। দরজার তালা খোলা রেখে ওরা মোগলদেরকে বোকা বানাবার চেষ্টা করেছে, যাতে ওরা ধরে নেয় যে, শিকার এখান থেকে পালিয়ে গেছে। হয়তো সে পালিয়েছে কিংবা পালায়নি...কামরান বেগ দ্রুত চিন্তা করলো। তারপর বললো, 'ইব্রাহিম আলি, ঘরের বাইরে লোক রাখ নজর রাখার জন্য, যদি কাউকে আসতে দেখে তবে যেন আমাদেরকে সাবধান করে। আর বাকি যারা আছ, তোমরা তন্ন তন্ন করে এই কামরার সবকিছু খুঁজে দেখ। প্রত্যেকটা পর্দা আর আসবাবের পেছনে উল্টে দেখ যেখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। সবকিছু টেনে খুলে ফেল। দেয়ালে টোকা দাও। দেখো এমন কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় কি-না যেখানে ওরা লুকিয়ে থাকতে পারে।'

তবে আধঘণ্টা পর জমকালো কামরাটির সবকিছু তছনছ ওলটপালট করলেও কিছুই পাওয়া গেল না। লোকগুলোর মুখ দিয়ে দরদর করে ঘাম পড়ছিল। স্নানাগারে গিয়ে দেয়াল থেকে টাইল উপড়ে ফেললো, পাঁচফুট গভীর শূন্য পানির চৌবাচ্চার উপর লাফিয়ে দেখলো, তবে এটা বেশ শক্ত মনে হল। আর সবকিছু নীরব কেবল ওদের নিঃশ্বাস আর বিরক্তি প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। আর বাইরে যারা ছিল কিংবা নিচে উঠানে যারা ছিল তারাও

কিছু দেখেনি কিংবা কিছু শুনেনি। পুরো প্রাসাদটি মনে হচ্ছে নির্জন, এমনকি একজন চাকরও নেই, প্রহরীতো দূরের কথা...

সম্ভাজি ওদেরকে বোকা বানিয়েছে। আওরঙ্গজেবের মুখোমুখি হয়ে যখন সে বলবে দুজন নতর্কী ছাড়া আর কাউকেই পায় নি, তখন তার চেহারার কথা ভেবে কামরান বেগের বুক কেঁপে উঠলো। আওরঙ্গজেব ব্যর্থতা পছন্দ করেন না। তাকে আবার চেষ্টা চালাতে হবে। প্রয়োজন হলে পুরো প্রাসাদ ভেঙ্গে ফেলবে।

তবে এখুনি নয়। তার সমস্ত লোকজনের চুল, দাড়ি আর কাপড়চোপড় ঘামে ভিজে রয়েছে। দুই একজনের গায়ের চামড়ায় কেটে গেছে...আচ্ছা আবার পরিশ্রম শুরু করার আগে হাতমুখ ধুয়ে নিলে হয় না? কামরান বেগ সন্তাজির দিকে ফিরে আদেশ করলো, 'তুমি কোনো কাজ করনি। চৌবাচ্চায় পানি ভর।' তরুণ মারাঠিকে একটু ইতস্তত করতে দেখে সে অবাক হয়ে বললো, 'শুনতে পাও নি আমি কি বলেছি?'

সন্তাজি মাথা নাড়লো। স্নানাগারেরর দেয়ালের কাছে গিয়ে সে ব্রোঞ্জের একটা চাকা দুই হাত দিয়ে ঘুরাতে শুরু করতেই পাথরের একটা ঢালু পথ বেয়ে পানি এসে চৌবাচ্চায় পড়তে শুরু করলো। কামরান বেগ মূল কামরায় গিয়ে তার লোকদের সাথে কথা বলতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে অবাক হয়ে দেখলো চৌবাচ্চায় পানি ভরতে কেন এত সময় লাগছে। আর এর মেঝেটাও সমান নয়। একদিকে চার-পাচ ইঞ্চি গভীরতার পানি ভরেছে আর অন্য প্রান্তে টাইলও ঢাকা পড়ে নি। অগভীর অংশের কাছে গিয়ে কামরান বেগ লক্ষ করলো, নিচের একধারে চৌবাচ্চার দেয়াল আর মেঝে যেখানে মিশেছে সেখানে কোনো চুনকাম করা হয়নি। ফাটল দিয়ে পানি নিচে চুইয়ে পড়ছে। মিস্ত্রি কি ঠিক মতো কাজ করেনি...?

তারপর পানি পড়ার শব্দের উপর দিয়ে তার মনে হল যেন একটা আজব অন্য ধরনের চাপা শব্দ সে শুনতে পেয়েছে। চৌবাচ্চাটি খালি করার পর কোনো ইঁদুর হয়তো পানির নলের ভেতরে ঢুকে পড়েছে? সে আদেশ করলো, 'চুপ!' তারপর হাঁটু গেড়ে চৌবাচ্চার কিনারায় গিয়ে সামনে ঝুঁকে আবার শোনার চেষ্টা করলো। কোনো শব্দ নেই...যা হচ্ছিল তা থেমে গেছে। তারপর শুনতে পেল সন্তাজি চিৎকার করে বলছে, 'দয়া করে থামুন! আপনারা ওদেরকে পানিতে চুবিয়ে মারবেন!' তারপর মুখ তুলে দেখলে তরুণ মারাঠি দৌড়ে ব্রোঞ্জের চাকাটির কাছে গিয়ে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে এটা বন্ধ করলো। কামরান বেগ উঠে দাঁড়িয়ে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বুঝিয়ে বল। কি বলতে চাচ্ছ? কে ডুবে মরছে?' যদিও তার মনে হল উত্তরটা সে জানে।

‘চৌবাচ্চার নিচে এক কোণে একটি গর্ত করা হয়েছে। কবি-কুলেশ এটা একটা লুকোবার জায়গা হিসেবে তৈরি করেছিল। এর আগে আমি যখন এখানে আসি তখন দেখেছিলাম...জানিনা ওরা এখানে আছে কি-না, তবে এখুনি কিছু শব্দ পেয়ে কথাটা বললাম—পানিতে ভরা থাকলে লুকোনোর জায়গাটা ব্যবহার করার কথা নয়। কেননা পানি চুইয়ে নিচে চলে যাবে।’

‘দেখাও কেমন করে গর্তটা খোলা হয়।’

সন্তাজি চৌবাচ্চায় নেমে পড়লো, তারপর এর মেঝের এক কোণায় অন্যান্য টালি থেকে একটু বড় আকারের চারকোণা একটি সবুজ মণিখচিত ম্যালাকাইট পাথরের টালির দুই কিনারে আঙুল ঢুকিয়ে ধরে উপরের দিকে টেনে উঠাতে চেষ্টা করলো। প্রাণপণ চেষ্টার পর সে এটা খুলে আনলো। তারপর সেটা কামরান বেগের একটি লোকের হাতে দিয়ে আবার উবু হয়ে চৌবাচ্চায় বসে বেশ সহজেই দ্বিতীয় টালিটা খুলে আনলো। একটু ঝুঁকে ভেতরে উঁকি দিয়ে কামরান বেগ আঁতকে উঠলো। চৌবাচ্চার অগভীর অংশের নিচে একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। সেখানে গলা পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে তরোয়াল হাতে দুজন মানুষ উবু হয়ে বসে আছে।

কামারান বেগ আদেশ করলো, ‘ওদেরকে জীবিত টেনে বের করে আন!’

চুল ধরে টেনে আনতেই একটু বয়স্ক, প্রথমজন উপরে উঠে মাটিতে তরোয়াল ফেলে সহজেই উঠে দাঁড়াল। তবে দ্বিতীয় জনকে টেনে তুলার চেষ্টা করতেই সে তরোয়াল দিয়ে কামরান বেগের একজন সৈনিকের গালে তরোয়াল চালিয়ে কেটে দিল। তারপর তাকে ধরে কাবু করে তরোয়াল কেড়ে নেওয়া হল। তার ভেজা পোশাক থেকে ঝর ঝর করে পানি ঝরছিল, সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল। তবে কামরান বেগ কিংবা মোগল সেনাদের দিকে না তাকিয়ে সোজা সন্তাজির দিকে চোখ রাখলো। তারপর বললো, ‘আমি জানি তুমি একজন মারাঠি, তারপরও তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করলে!’

সন্তাজি তোতলাতে শুরু করলো, ‘সম্ভাজি...মহারাজ...আমি জানতাম গর্তটা পানিতে ভরে যাবে। ভাবলাম আপনি আর কবি-কুলেশ পানিতে ডুবে মরবেন, সেজন্য অমি কথা বলে উঠলাম!’

সম্ভাজি তার স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ‘মিথ্যা কথা বলো না। কি ঘুষ দিয়ে ওরা তোমাকে হাত করেছে?’

‘ওরা কথা দিয়েছে আমার প্রাণ রক্ষা করবে। তবে আমি কখনও একজন বিশ্বাসঘাতক হতে চাই নি...’

তার কথা শুনে সম্ভাজি তার দিকে তাকিয়ে অবজ্ঞা ভরে হাসতেই, সন্তাজি হঠাৎ সামনে এগিয়ে মারাঠি নেতাকে যে দুজন মোগল সেনা ধরে রেখেছিল, তাদের একজনের কোমরে গোঁজা ছুরি বের করে নিজের গলায় একটা পোঁচ দিল। তার কাটা গলা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগলো, তারপর সে হুমড়ি খেয়ে মার্বেল পাথরের মেঝেতে পড়ে গেল। এক মুহূর্ত দেহটি মুচড়ালো তারপর স্থির হয়ে গেল।

নিচে তাকিয়ে কামরান বেগ দেখলো তার জুতায় রক্তের ছিটা পড়েছে। সে বললো, 'এই দেহটা নিয়ে যাও আর প্রথামত শেষকৃত্য কর। তবে আগে দুজন সংবাদবাহককে দ্রুতগামী ঘোড়ায় সম্রাটের কাছে পাঠাও। আওরঙ্গজেবের জন্য তারা কেবল এই বার্তা নিয়ে যাবে—আল্লাহু আকবর। তার শত্রু সম্ভাজি শেষ পর্যন্ত আমাদের হাতে ধরা পড়েছে।'

ক্যাটক্যাটে উজ্জ্বল রঙের ডোরাকাটা পোশাক আর মাথায় ডগাচোখা টুপিপরা লোক দুটির চারপাশে মাছি ভনভন করছিল। একটা রোগা উটের পিঠে ওদেরকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, উটটি ধীরে ধীরে চলছিল। দূর দিগন্তে বাহাদুরগড় দুর্গের বুরুজ দেখা যাচ্ছে। আওরঙ্গজেব সেখানে বন্দীদের জন্য অপেক্ষা করছেন। একমুহূর্ত একজন বন্দী মাথা তুলে সামনে তাকাল, তারপর আবার তার মাথা বুকে ঝুলে পড়লো। বন্দীদের কি করা হবে সে সম্পর্কে আওরঙ্গজেবের পরিষ্কার নির্দেশ ছিল। যদি কেউ উদ্ধার অভিযান চালাবার চেষ্টা করে, সেজন্য প্রথম দুদিন যতক্ষণ না কামরান বেগ তার লোকজনসহ সংঘামেশ্বর আর মারাঠি এলাকা থেকে বের হয়ে না আসবে, ততদিন ওরা রাতে চলবে আর বন্দীদেরকে কাফেলার মাঝে লুকিয়ে রাখবে। তবে তৃতীয়দিন মোগল এলাকায় ঢোকার পর সাথে সাথে সরাসরি সম্রাটের কাছে না এনে সম্ভাজি আর কবি-কুলেশকে রাজদরবারের অবহেলা আর ঘৃণার পাত্র সাজিয়ে সঙের পোশাক পরিয়ে গ্রামের মধ্য দিয়ে নিয়ে আসবে। তারপর তার কাছে বাহাদুরগঁড়ে নিয়ে আসবে।

এছাড়া আওরঙ্গজেবের নির্দেশ বন্দীদেরকে কামরান বেগ কোনো খাবার দেয় নি, কেবল রোজ এক পেয়ালা পানি দিয়েছিল। এতক্ষণে তাদের ঠোঁট ফেটে গিয়ে শুকনো হয়ে রয়েছে আর অনেক সময় দেখে মনে হচ্ছিল ওরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিল। তবে যত অপমানই করা হোক না কেন ওরা নির্বিকার রইল।

দুই ঘণ্টার পর কাফেলাটি দুর্গের প্রধান তোরণের নিচ দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই নাকাড়া বেজে ওদেরকে অভিবাদন জানান হল। কামরান বেগ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তার অভিযান শেষ হয়েছে। সে সফল হয়েছে। লোকজনসহ চারকোণা উঠানে ঢুকতেই দেখলো শেষ মাথায় একটি বড় কাঠের মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে। বামপাশে একটি আগুন জ্বালাবার পাত্রে জ্বলন্ত কাঠকয়লা স্তূপ করা রয়েছে। মাঝখানে চামড়ার পাজামা আর হাতাকাটা জামাপরা একজন লোক একটি লম্বা ছুরির ফলা শান দিচ্ছে। সে একজন রাজকীয় জল্লাদ। কামরান বেগ আগেও তাকে তার কাজ করতে দেখেছে। তার পাশে একটা টেবিলের উপর আরো বেশ কয়েকটি ছোটবড় ছুরি রাখা হয়েছে, রোদে এর ফলাগুলো চকচক করছে। ডান পাশে প্রায় ছয়ফুট উঁচু দুটি শক্ত কাঠের কাঠামো পাশাপাশি খাড়া করে রাখা হয়েছে। মঞ্চের দুদিকে আওরঙ্গজেবের কয়েকজন সেনাপতি আর সভাসদ মুখোমুখি বসে রয়েছেন।

সবার চোখ তার উপর, এটা বুঝতে পেরে কামরান বেগ তার লোকদেরকে থামতে বলার পর সবাই ঘোড়া থেকে নামলো। সহিসরা ঘোড়াগুলোকে সরিয়ে নিতে শুরু করলো, এমন সময় উপর থেকে শিঙ্গা ফুঁকতেই পরিশ্রান্ত ঘোড়াগুলো চঞ্চল হয়ে উঠলো। মাথা ঘুরিয়ে কামরান বেগ দেখলো উঠানের প্রায় পনেরো ফুট উপরে মঞ্চের দিকে মুখ করা কারুকাজকরা বেলেপাথরের একটি বেলকনিতে আওরঙ্গজেব এসে দাঁড়ালেন। তার পরনে সাদাসিধা পোশাক। তিনি যে আসনে বসলেন তার দুপাশে বিশাল আকারের সবুজ রঙের মোগল পতাকা উড়ছিল। তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন পরিচারক সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরের পালকের একটি বিশাল পাখা নিয়ে তাকে বাতাস করতে শুরু করলো।

তিনি বললেন, 'স্বাগতম কামরান বেগ। তুমি আর তোমার সাহসী লোকেরা আমার সাম্রাজ্যের জন্য বিশাল একটি কাজ করেছ। তুমি সেই নারকি বিধর্মী শিবাজির বিধর্মী ছেলে আর তাকে যে আশ্রয় দিয়েছিল সেই অধঃপতিত লোকটিকেও ধরে এনেছ। ওদেরকে সামনে নিয়ে এস যাতে আমি ভাল করে দেখতে পারি।' সম্রাটের চারজন দেহরক্ষী যেখানে উটের উপর বন্দীদের বেঁধে রাখা হয়েছিল সেদিকে ছুটে গেল। উটের পিঠ থেকে নেমে নামিয়ে বন্দীদেরকে টানতে টানতে আওরঙ্গজেবের সামনে এনে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল।

'এখন তুমি যেখানে আছ সেটাই তোমার সঠিক স্থান—ধূলিমাটি, যারা সত্যিকার খোদাকে মানে না আর তাঁর বিশ্বাসী বান্দা, আমার বিরোধিতা করেছে। কেবল একটি কারণে তুমি বাঁচতে পারবে সম্ভাজি, আর তা হল তোমার ভুল স্বীকার করা আর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা।'

ফাটা ঠোঁট নিয়ে সম্ভাজি চিৎকার করে বললেন, 'হিন্দু দেবতারাই আসল ভগবান....। একজন সত্যিকার ঈশ্বর কি করে আপনাকে এসব অন্যায় করার অনুমতি দিল?'

'তাহলে আর কোনো কথা নেই। তোমরা দুজনেই মরবে। তবে এর আগে তুমি আমাকে বল, আমি যা জানতে চাই—তোমার লুকোনো সম্পদ কোথায় আছে, তোমার কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে যেসব মোগল কর্মকর্তা আর সেনাপতিরা তোমাকে তথ্য দিয়েছে তাদের নামসহ আর যা কিছু জান সব বল। আমি তোমার ন্যায়সঙ্গত শাসক তোমাকে জানাতে নির্দেশ দিচ্ছি।'

সম্ভাজি বেলকনিতে বসা আওরঙ্গজেবের দিকে অবাধ্যভাবে ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর তিনি বললেন, 'আমার যাই হোক, আমার দেশের লোকেরা হিন্দুস্তান থেকে আপনাকে আর আপনার সাম্রাজ্যকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে... আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি মৃদু হাসছেন। কেন হাসছেন? তার কারণ প্রতারণা আর বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে আপনি আমাকে আপনার ক্ষমতার মধ্যে এনেছেন। তার মানে আপনিই সত্যিকার ব্যর্থ। নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন আপনার এই ঘৃণিত রাজত্বকালে আপনি আসলে কী অর্জন করেছেন? কিছুই না! আপনার সাম্রাজ্য বিদ্রোহে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আমার বাবা, যাঁকে আপনি পরাভূত করতে পারেন নি তার নাম চিরদিন হিন্দুস্তানে বেঁচে থাকবে, কেননা তিনি ছিলেন একজন বীর এবং মানুষের জন্য অনুপ্রেরণা। আর আপনার নাম তখনই উচ্চারিত হবে যখন লোকে আপনার অন্যায় আর অত্যাচারের কথা স্মরণ করে আপনাকে অভিশাপ দেবে।'

'চুপ কর!'

'না, আমি চুপ করবো না! আপনি মনে করেন আমি আপনাকে ভয় পাই? যে মানুষ তার নিজের ভাইদের হত্যা করেছে আর তাঁর ছেলেদের কাছ থেকে সম্মান আদায় করতে পারে নি? আমি জানি আকবর আপানার সম্পর্কে কি ভাবেন—তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন। তিনি বলতেন কিভাবে আপনি আপনার ঈশ্বরের নামের দোহাই দিয়ে আমার স্বধর্মের লোকদের বিরুদ্ধে প্রতিটা বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের বিশ্বাসযোগ্যতা দেখিয়েছেন। আকবর জানেন আপনি কি—তিনি আপনাকে একজন "বক ধার্মিক" বলতেন, যা এখন আমিও বলছি! আর তার মতো আমিও আপনাকে আর আপনার সাথে আর যারা নোংরা কাজগুলো করে তাদের সকলকে ঘৃণা করি। পরবর্তী জীবনে আপনি এমনকি একটি কীট কিংবা ইঁদুর নন বরং একটি মাছি কিংবা একটি পরজীবী কীট...'

আওরঙ্গজেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে! আমি অনেকক্ষণ তোমার প্রলাপ শুনলাম। জল্লাদ তোমার কাজ শুরু করে দাও। সম্ভাজিকে দিয়ে শুরু কর, ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে কর। তবে তার শরীরের যে অঙ্গই প্রথমে কাটো, জিহ্বাটা শেষ পর্যন্ত রেখে দিও। এটা শেষ হওয়ার আগে সে আমাকে বলবে আমি যা জানতে চাই। তারপর আমি তোমাকে বলবো এটা কেটে ফেলতে, যাতে তার দয়াভিক্ষা আমাকে শুনতে না হয়!'

দুজন প্রহরী সম্ভাজির দুইবগলের নিচে হাত দিয়ে তাকে টানতে টানতে মঞ্চের দিকে নেওয়া শুরু করতেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'আমি কখনও আপনার কাছে ক্ষমাভিক্ষা করবো না—বরং তার আগে আমি আমার জিহ্বা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবো।' মঞ্চে তাকে ফেলে দেওয়ার পর সম্রাটের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে সবার সামনে দাঁড়ান একজন জ্যেষ্ঠ সেনাপতি এবার সামনে এগোলেন। তার হাতে একটি লম্বা কাগজের টুকরা ছিল। তিনি বেশ জোরে কাগজটি থেকে পড়তে শুরু করলেন, যাতে সবাই শুনতে পারে।

'সম্ভাজি, তুমি একজন খারেজি বিশ্বাসঘাতক। তুমি সম্রাট আওরঙ্গজেব আর তাঁর প্রজাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছ। তোমার অপরাধের কারণে নিষ্পাপ মানুষের রক্ত ঝরেছে। তোমার মৃত্যুর আগে তোমাকে তোমার অপরাধের জবাবদিহি করতে হবে আর আমি যা যা প্রশ্ন করবো তার উত্তর দিতে হবে। উত্তর দিতে তুমি যত দেরি করবে ততই তোমার কঠোর শাস্তির যন্ত্রণা বেড়ে যাবে।'

'আমি অপরাধি নই, আমি একজন দেশপ্রেমিক। আমি কোনো কথার উত্তর দেব না!'

সেনাপতি বললেন, 'ঠিক আছে।' তারপর তিনি মাথা নাড়তেই জল্লাদ সম্ভাজির ক্ষীণদেহের দিকে এগোল। তিনি ততক্ষণে কোনোমতে দুপায়ের উপর খাড়া হয়েছেন। সঙের জামার কলার বাম হাতে ধরে জল্লাদ তাকে টেনে তুলে ডান হাতে তার পেটে একটি ঘুষি চালাল। তাকে ধরে না রাখলে সম্ভাজি মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। জল্লাদের বজ্রমুষ্টিতে ধরে থাকা অবস্থায় তিনি একটা ভাঙ্গা পুতুলের মতো দুলতে লাগলেন। তারপর আবার ঘুষি মারতেই সম্ভাজি রক্তবমি করতে শুরু করলেন।

'প্রথম প্রশ্ন। মারাঠিদের মূল ধনাগার কোথায়? আমরা জানতে পেরেছি ছয়মাস আগে তুমি প্রচুর পরিমাণে সোনা আর রত্ন নতুন একটা জায়গায় স্থানান্তর করেছ।'

সম্ভাজি হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোমতে উত্তর দিলেন, 'আমি কখনও তোমাদেরকে তা জানাব না আর তোমরা কখনও তা খুঁজে পাবে না।'

'আবার প্রশ্নটা করছি। ধনরত্ন কোথায় রেখেছ?'
'তুমি নিশ্চয়ই কালা। শোননি আমি কি বলেছি?'
সেনাপতি এবার মাথা নাড়তেই জল্লাদ সম্ভাজিকে ছেড়ে দিতেই তিনি মঞ্চে টলে পড়ে গেলেন। তারপর তার উপর ঝুঁকে জল্লাদ ছুরির কয়েক পোচে তার দেহ থেকে নোংরা পোশাকটা কেটে ফেলে দিল। সম্ভাজির তারের মতো শক্তিশালী এবং পাকানো শরীরের কয়েক জায়গায় লড়াইয়ের কয়েকটি ক্ষত চিহ্ন ছিল। তার বুকের বাম পাশ থেকে পেটের উপর দিয়ে কুচকি পর্যন্ত একটি লম্বা কাটা দাগের চিহ্ন ছিল। বাম দিকের ঊরুর নিতম্ব থেকে হাটু পর্যন্ত আরেকটি দাগ ছিল। জল্লাদ তার চুল ধরে তাকে টেনে তুলে কাঠের কাঠামোর দিকে নিয়ে চললো। কাঠামোটির চার মাথায় তার দুই পা আর হাত দুই দিকে ছড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল।
সেনাপতি আবার প্রশ্নের তালিকা দেখে বললেন, 'আমরা জানতে পেরেছি তুমি রাজদরবারের কয়েকজন সভাসদকে ঘুষ দেবার চেষ্টা করেছিলে। কাদের সাথে তোমার যোগাযোগ হয়েছিল?' এবার তার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক শোনাল।
সম্ভাজি আবার হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আওরঙ্গজেবকে এক পয়সা দিয়ে হিন্দুস্তান ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম।'
তৃতীয়বার সেনাপতির ইঙ্গিত পেয়ে জল্লাদ কাঠের বেঞ্চের কাছে এগোল এবং ধীরে সুস্থে একটা পাতলা ধারাল ফলার ছুরি বেছে নিল। তারপর সম্ভাজির পেছনে গিয়ে একজন শল্য চিকিৎসকের দক্ষতা নিয়ে তার মেরুদণ্ড বরাবর ছুরিটা একবার লম্বালম্বিভাবে আরেকবার আড়াআড়িভাবে চালাল। রক্তের একটি ছোট নদী বইতে শুরু করতেই সম্ভাজির শরীর মুচড়ে উঠলো, তবে কোনো চিৎকার করলেন না। তারপর জল্লাদ এবার ছুরির কোনো বদলে পিঠের নিচে যে জায়গায় কাটা অংশগুলো মিলেছে সেখানে ছুরির ডগাটি ধীরে ধীরে ঢুকিয়ে দিল। তারপর সে কাস্তে চালাবার ভঙ্গিতে মাংসপেশি আর চর্বি থেকে তার শরীরের চামড়া ছিলতে শুরু করলো। অবশেষে সম্ভাজি প্রচণ্ডভাবে একবার আর্তচিৎকার করে উঠলেন।
প্রায় নয় ইঞ্চি লম্বা আর তিন ইঞ্চি চওড়া চামড়ার একটি ফালি তুলে নেবার পর জল্লাদ আবার সেনাপতির দিকে তাকাল। তিনি আবার মোগল দরবারের ষড়যন্ত্রকারীদের নাম জানতে চাইলেন। তবে যেভাবে তার শরীর ঝুলে পড়লো, তাতে পরিষ্কার বুঝা গেল সম্ভাজি জ্ঞান হারিয়েছেন। জল্লাদ তার গায়ে এক বালতি ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিতেই তিনি চমকে উঠে জ্ঞান ফিরে পেলেন। আবার প্রশ্নকর্তা তাকে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলেন, তবে সম্ভাজি কেবল মাথা নাড়লেন।

জল্লাদ আবার ছুরি তুলতেই কামরান বেগের পেট উগলে উঠলো, সে বমি করতে একপাশে ঘুরলো। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করতে গিয়ে সে লক্ষ করলো মঞ্চের এই ভয়ংকর কার্যকলাপ দেখে শুধু তার একারই বমি বমি ভাব হয় নি। সম্রাটের পেছনে তার দেহরক্ষী প্রধান উমর আলি ঠোঁট কামড়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

নির্বিকার চেহারা নিয়ে জল্লাদ নিয়মনিষ্ঠভাবে তার বিভীষিকাময় কাজটি করে যেতে লাগলো, আওরঙ্গজেব এবার কবি-কুলেশের দিকে তাকালেন। সে তখন তার শাস্তির জন্য অপেক্ষা করছিল। মানুষের চরিত্র বুঝার যে ক্ষমতা তাঁর আছে, তা থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, সম্ভাজি রাজি না হলেও এই সেনাপতি কথা বলতে হয়তো রাজি হবে। এটা এমন নয় যে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আসলে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর গুপ্তচরদের কাছ থেকে অবিশ্বস্ততার তথ্য পেয়ে তিনি যাদেরকে সন্দেহ করেছেন তাদের উপর নজর রাখা হচ্ছে। আর এখন গোলকুন্ডা আর বিজাপুর তাদেরকে আর অর্থসাহায্য দেবে না, কাজেই এই ধনাগার সম্পর্কে জেনেই বা কি লাভ? মোগল সম্পদের তুলনায় এটি সাগর সৈকতে এক কণা বালুর মতো। সবচেয়ে জরুরি বিষয়টি ছিল জনসমক্ষে সম্ভাজির অপমান—আওরঙ্গজেবের ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করা। এটা করতে যত দিন লাগুক তিনি সন্তুষ্ট হতে চাইছেন যে, সাম্রাজ্যের প্রতিটি মানুষ বুঝুক এত বছর পার করেও তাদের সম্রাট এখনও একটি বলবীর্য শক্তি হিসেবে রয়েছেন। যাকে কেবল একটি বোকা কিংবা মূর্খ অমান্য করার সাহস দেখায়।

তবে মনে হল শেষ পর্যন্ত তিনি সেই সন্তুষ্টি পাবেন না। দুই সপ্তাহ পর আওরঙ্গজেব আবার বেলকনিতে বসে জল্লাদের কাজ লক্ষ করলেন, জল্লাদ সম্ভাজি আর কবি-কুলেশের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কাটছে। মাংসপিণ্ড আর হাড় দেখে তাদেরকে আর মানুষ হিসেবে চেনা যাচ্ছে না। এখন শেষ অপমানজনক কাজটি বাকি রয়েছে, কাটা মুণ্ডুটা নিয়ে দাক্ষিণাত্যের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়ে দেখান। যে কোনোভাবেই হোক এতদিন অত্যাচার করার পরও সম্ভাজি আর কবি-কুলেশ তার বিরোধিতা করার শক্তি আর সাহস খুঁজে পেয়েছিল।

যখন সম্ভাজির ধরা পড়ার খবর তাঁর কাছে পৌছেছিল তখন আওরঙ্গজেব হাঁটুগেড়ে বসে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছিলেন যে, তাঁর সাম্রাজ্য এখন নিরাপদ হয়েছে এবং তার বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে এখন মনে হচ্ছে পূর্ণ বিজয় অর্জিত হয় নি আর হয়তো তিনি শিবাজির মতো আরেকটি মারাঠি বীর সৃষ্টি করেছেন।

অধ্যায় ২০

রাজদূত

মহামান্য, আমি, স্যর উইলিয়াম নরিস সিপিও জাহাজ থেকে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। মরিশাস থেকে পাড়ি দিয়ে দুই সপ্তাহ পার করে আমার প্রিয়মাতৃভূমি ইংল্যান্ডের পথে রয়েছি। ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হওয়ার কারণে আমার শরীর এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, মনে হচ্ছে আমার বয়স কেবল বেয়াল্লিশ বছর হলেও, শেষপর্যন্ত হয়তো আমি আর সেই তীরভূমি দেখা পর্যন্ত বেঁচে থাকবো না। আর তাই আশা করছি মহান মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে একজন দূত হিসেবে আমার প্রতিবেদন একটি চিঠি আকারে পেশ করায় আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের শরৎকালে আমি এই দায়িত্ব নিয়ে ব্রিটেন থেকে রওয়ানা দিয়েছিলাম।

আপনি যেসব উপদেষ্টার সাথে এবিষয়ে আলোচনা করতে চান আর যারা ডাকযোগ পাঠানো আমার তথ্য সম্পর্কে অবহিত নন তাদের জ্ঞাতার্থে আমি জানাচ্ছি, আমার দূতিয়ালির উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দেশের বণিকদের বিশেষ সুবিধা দেবার জন্য সম্রাটকে রাজি করানো। এছাড়া আপনার তরফ থেকে আমি তাঁর কাছ থেকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির নিশ্চয়তা চেয়েছিলাম যে, অসাধু কর্মকর্তা আর বিদ্রোহীর ছদ্মবেশে দস্যুদের লুণ্ঠন থেকে তিনি আমাদের বণিকদের নিরাপত্তা দেবেন।

দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর আমি ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর হিন্দুস্তানের পূর্ব উপকূলে মসুলিপত্তনে অবতরণ করি। সেখানে অমাদের দূত পিট আমাকে উষ্ণ সম্বর্ধনা দেন। দীর্ঘ এই সমুদ্রযাত্রার কষ্ট আর একঘেয়েমি অভিজ্ঞতার বিবরণ আমি তুলতে চাই না। তবে রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমার কাজ শুরু করার ব্যবস্থা করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়া, যেমন উপযুক্ত দোভাষী আর মোগল এলাকায় ঢোকার অনুমতি ইত্যাদি পেতে বেশ সময় লাগলো। পরিশেষে এই সব প্রক্রিয়ার পর ক্লান্ত হয়ে আমি আবার জাহাজে চড়ে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে

হিন্দুস্তানের পশ্চিম উপকূলে সুরাট বন্দরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলাম। চারমাস পর সেখানে পৌঁছলাম। সেখানে অবস্থানরত ইংরেজ বণিকদের সহায়তায় বেশ শীঘ্রই সম্রাটের কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে পারলাম। ওরা আমাকে জানাল, তিনি বর্তমানে দাক্ষিণাত্যের তপতি নদীর তীরে দুর্গনগর বোরহানপুর থেকে একটি অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল এলাকার মধ্য দিয়ে পথ চলে আমি বোরহানপুর পৌঁছে দেখলাম, তিনি আরো দক্ষিণে শিবির স্থাপন করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মাঝে মাঝে আমাকে প্রকৃতপক্ষে মারাঠিদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা পার হতে হয়েছিল। তবে ওদের প্রশংসা করতে হয় এজন্য যে, ওরা আমার সাথে যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেছিল। দুর্বল শরীর নিয়ে আমি সাথে সাথে আবার রওয়ানা দিয়ে ১৭০১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল সম্রাটের শিবিরে পৌঁছলাম। পানহালা দুর্গের বাইরে তিনি শিবির স্থাপন করেছিলেন। কেননা দশ বছর মারাঠি কব্জায় থাকার পর তিনি আবার এই দুর্গটি অবরোধ করে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছিলেন।

তার অধীনে প্রায় ১৫০, ০০০ সৈন্য এবং প্রায় সমসংখ্যক শিবির শ্রমিক থাকা সত্ত্বেও অবরোধ খুব ধীর গতিতে চলছিল। ইতোমধ্যে কয়েক মাস পার হয়ে গেছে এবং গুজব রটেছিল যা পরবর্তীতে আমি সত্য জেনেছিলাম যে, সম্রাট সামরিক বিজয় সম্পর্কে হতাশ হয়ে দুর্গের সামরিক নেতাদেরকে ঘুষ দিয়ে দুর্গ তার হাতে তুলে দেবার পরিকল্পনা করছিলেন। বিশাল মোগল শিবির প্রায় ত্রিশ মাইল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ছিল। জানতে পারলাম ওদের কাছে ৫০,০০০ উট, ৩০,০০০ হাতি আর সেই সাথে ২৫০টি ভ্রাম্যমাণ বাজারও রয়েছে। সে যাইহোক জায়গাটির কোনো কোনো স্থানে হাঁটু পর্যন্ত কাদা আর বড় বড় সবুজ শ্যাওলাভরা পানির ডোবা ছড়িয়েছিল। এসব জায়গায় প্রচুর মশা ভন ভন করতো। সম্রাটের অনেক সভাসদ আর সেনাপতি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিছুদিন পর আমিও অসুস্থ হয়ে পড়লাম আর চাল ধোয়া পানির মতো আমার পাতলা পায়খানা শুরু হল। সম্রাটের একজন আমিরের আমার মিশন সম্পর্কে যথেষ্ট সমবেদনা ছিল, তিনি আমাকে আফিম মেশানো টক দই খেতে দিলেন, যাকে ওরা লাস্‌সি বলেন। এটা খাওয়ার পর কিছুটা আরাম পেলাম, তবে আবার ভীষণভাবে এবং ঘন ঘন যন্ত্রণাটি শুরু হল। আমার বেঁচে থাকার ব্যাপারে আমি সন্দিহান হয়ে পড়লাম। তবে আমার পীড়ার বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিয়ে মহামান্যকে বিরক্ত করতে চাই না।

কিছুটা আরোগ্য লাভ করার পর শরীর একটু সুস্থ হতেই আমি সম্রাটের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে আর্জি পেশ করা শুরু করলাম। বেশ কয়েকবার কয়েকজন

দুর্নীতিপরায়ণ অমাত্য অর্থের বিনিময়ে সম্রাটের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার কথা বলে ব্যর্থ হল। তাদের এই আচরণের একটা কারণ আমি বলতে পারি যে, বেশিরভাগ মোগল সেনার মতো এরাও দীর্ঘকাল—কয়েক মাস কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েক বছর যাবত তাদের সেবার বিনিময়ে সম্রাটের কাছ থেকে কোনো বেতন কিংবা পুরস্কার পায় নি। বিরাট এলাকাজুড়ে শিবির স্থাপন করায় আশেপাশের এলাকার লোকদেরও যথেষ্ট ভোগান্তি হয় যার কারণে ওরা মোগলদের শত্রুকে সমর্থন করতে উৎসাহিত হয়।

সম্রাটের বয়স প্রায় তিরাশি হওয়ায় তার উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা বহুল প্রচলিত ছিল। শাহজাদা মুয়াজ্জমের সমর্থকরা আমার সহযোগিতা কামনা করে জানাল তিনি ক্ষমতায় এলে আমাদেরকে বিশেষ বাণিজ্য সুবিধা দেয়া হবে। আমার এখানে আসার পাঁচবছর আগে সম্রাট তাকে গোয়ালিয়র কারাগার থেকে মুক্তি দেন। গোলকুণ্ডি শত্রুদের সাথে যোগাযোগ করার অপরাধে তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আমিও যথেষ্ট ভদ্রভাবে তাদেরকে ইংরজেদের বদান্যতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তবে যখন শাহজাদার সাথে দেখা হল তখন দেখলাম তারও যথেষ্ট বয়স হয়েছে এবং তার মনোবল কিছুটা ভেঙ্গে গেছে মনে হল। তবে তার বাবার রাগ এড়াতে এটাও এক ধরনের ভান হতে পারে, তবে এতে আমার সন্দেহ হল। সম্রাট লৌহকঠিন হস্তে তাঁর ছেলে এমনকি মেয়েদেরকেও শাসন করেন। এমনকি তিনি তার একান্ত প্রিয় পুত্র কমবখস্‌কেও অসদাচরণের জন্য একবার সংক্ষিপ্ত কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। পরে জানতে পেরেছিলাম এই অসদাচরণ ছিল মাতাল হওয়া। লোকে বলাবলি করে তার মা, সম্রাটের প্রিয়তমা স্ত্রী উদিপুরী মহল তার হাঁটুর উপর মাথা রেখে ছেলের মুক্তির জন্য কাকুতিমিনতি করে বলেছিলেন যে, তার নিজের কারণেই তার ছেলে এটা করেছে, দোষ তারই। সে কেবল তার মায়ের বদভ্যাস অনুসরণ করছিল।

আমি প্রথম সম্রাটকে দেখতে পেলাম যখন তিনি একটি শিবিরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, অবরোধ পরিদর্শনের জন্য তাকে পালকিতে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তার পুরো অবয়ব ছিল সাদা ধবধবে, পোশাকে, পাগড়ি, চুলে এমনকি দাড়িও সাদা ছিল। তিনি ছিলেন একজন মর্যাদাজ্ঞাপক ব্যক্তিত্ব, কারও দিকে তাকাচ্ছিলেন না, সারাক্ষণ পবিত্র কুরআনের উপর চোখ রেখে পড়ে যাচ্ছিলেন, একবারও এদিক ওদিক তাকান নি। অনেকেই তার ধার্মিকতার প্রশংসা করে, তবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন চাপিয়ে দেওয়ার কারণে তিনি অনেকের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন।

২৮এপ্রিল তার সাথে আমি দেখা করার অনুমতি পাই। তিনি অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে আপনার উপহারের জন্য ধন্যবাদ জানান আর আপনার দীর্ঘ শাসন কামনা করেন। এধরনের ভূমিকার পর তিনি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে আমাকে জানান তাঁর কাছ থেকে আমি সেরকম বন্ধুত্ব কিংবা স্বাধীনতা আশা করতে পারি না যা, তাঁর পিতামহ সম্রাট জাহাঙ্গীর আমার পূর্বসূরি স্যর টমাস রো'এর সাথে করেছিলেন। আরো বললেন তিনি বিদেশি মদ কিংবা গভীর রাতে ভিনদেশী দর্শন নিয়ে আলোচনা করার ব্যাপারেও আগ্রহী নন।

তবে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি আমাদের অনুরোধের প্রতি বিশেষ সুনজর দেবেন, যদি আমরা ভারত মহাসাগর থেকে জলদস্যুদের উচ্ছেদ করি—যার মধ্যে অনেকেই ইংল্যান্ড আর আমাদের উপনিবেশ থেকে আগত। বিশেষত বোম্বে (মুম্বাই) বন্দরের অদূরে হাজিবাহী মোগল জাহাজ গনজ-এ-সাওয়াই থেকে হেনরি এভারি তাঁর হিসেবে প্রায় ২০০,০০০ পাউন্ডের সম্পদ লুট করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার বিষয়ে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখালেন। সম্প্রতি জলদস্যুরা 'কায়েদাহ মার্চেন্ট' জাহাজটি দখল করার বিষয়েও অভিযোগ করলেন। আমি তাকে আশ্বস্ত করে জানালাম যে, তাঁর মতোও আমরাও সাগর থেকে জলদস্যুদের উৎখাত করতে বিশেষ আগ্রহী। আর জানালাম অনেক প্রচেষ্টার পরও এভারিকে ধরতে না পারলেও উইলিয়াম কিডকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যে, 'কায়েদাহ মাচেন্ট' জাহাজের উপর আক্রমণ করেছিল। আমাদের নৌ-বাহিনীর শক্তি আর উভয়ের স্বার্থে এটি ব্যবহার ব্যাপারে তিনি খুব একটা আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। তারপর আমাকে বিদায় জানিয়ে আমার অনুরোধের বিষয় নিয়ে তাঁর রাজকর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করতে বললেন।

এই অর্থলোলুপ লোকগুলোর সাথে বহুবার আলোচনায় বসলাম। প্রায় সকলেই আমার কাছ থেকে বন্ধুত্ব এবং সুভেচ্ছার নিদর্শন কামনা করলো—পরিষ্কারভাবে বলা যায় ঘুষ চাইল। সম্রাটের নিষেধ সত্ত্বেও অনেকেই মদের প্রতি বিশেষত 'উত্তর ব্রিটিশ মদ'এর প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখাল। তারপর অনেক সময় আর অর্থব্যয়ের পর আমি তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু সুবিধা আদায় করলাম, যেমন কর এবং শুল্কের পরিমাণ কমান হল এবং আমাদের বণিক এবং মালামালের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আদায় করলাম। তবে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, পরবর্তী প্রতিশ্রুতিটি কার্যক্ষেত্রে ঘুষ ছাড়া বাস্তবায়িত হবে না।

মোটামুটি গত ছয়মাসের আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, মোগল সাম্রাজ্য এর অভ্যন্তরীণ শত্রুর কারণে দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলছে। সবার আগে

শক্তিশালী মারাঠিদের কথা বলতে হয়, তাদের শাসক সম্ভাজির মৃত্যুর পরও তারা টিকে থাকতে পেরেছে। তারপর একসময় যখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল, তখন আবার শিবাজির ছোট ছেলে এবং সম্ভাজির ভাই—রাজারামের নেতৃত্বে সংগঠিত হল। এরা অবিরত সম্রাট এবং তার সেনাবাহিনীর প্রতি একটি ভীতি হয়ে রইল এবং বিশেষত দাক্ষিণাত্যে ওদেরকে আটকে রাখলো। আমি দেশ ছাড়ার আগে জানতে পেরেছি যে রাজারাম মারা গেছে, তবে তার বিধবা স্ত্রী কোনো রক্তপাত ছাড়াই তাদের নাবালক ছেলেকে তার উত্তরাধিকার নিযুক্ত করতে সফল হয়েছেন।

আরো অনেক বিদ্রোহ রয়েছে বিভিন্ন জায়গায়—উত্তরে, উদাহরণস্বরূপ, পাঞ্জাবের শিখ আর জাটরা। আমি শুনেছি শিখদের একটি আলাদা ধর্মবিশ্বাস রয়েছে, তারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। আওরঙ্গজেব তাদের নেতা—যাকে তারা তাদের গুরু বলেন,—সেই তেগ বাহাদুরকে ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে কোতল করার পর, শিখরা তেগ বাহাদুরের ছেলে গুরু গোবিন্দ সিং-এর নেতৃত্বে তাদের নিজেদের বন্ধন সুদৃঢ় করে। গুরু গোবিন্দ ইতোপূর্বে মোগল এবং অন্যান্য প্রতিবেশী শক্তির সাথে বেশ কয়েকবার যুদ্ধ করেছিলেন। আমি যখন হিন্দুস্তান ছিলাম, তখন ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের বাৎসরিক ফসল কাটার দিন, আনাদপুরে শিখদের একটি বিশাল সমাবেশের খবর শুনে মোগল সেনাপতিদের মধ্যে আতঙ্ক জেগে উঠেছিল। তাদের গুরু গোবিন্দ খালসা নামে শিখদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এখন থেকে সকল সদস্য তাদের নামের সাথে 'সিং' অর্থাৎ সিংহ যুক্ত করবেন, আধ্যাত্মিক ঐক্য বজায় রাখবেন এবং তাদের নিজেদেরকে এবং ধর্মকে যারা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করবে তাদেরকে প্রতিরোধ করবে। আমি যখন হিন্দুস্তান ছেড়ে আসি তখন মোগলরা শিখদের বিরুদ্ধে একটি বিশাল যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

জাটরাও সাহসী যোদ্ধা। ওরা অতর্কিত হামলা করে পালিয়ে যেতে পারঙ্গম। সম্প্রতি ওরা আগ্রার কাছে সম্রাট আকবরের জাঁকজমকপূর্ণ বিশাল সমাধিসৌধে হামলা চালিয়ে এর বেশিরভাগ সোনার সাজসজ্জা আর আসবাব লুট করে নিয়ে যায়। সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পারস্যের শাহ সবসময় একটি আতঙ্ক ছিল। নিজের সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়াবার জন্য তিনি সবসময় মোগল সাম্রাজ্যের দিকে হাত বাড়াবার সুযোগ খুঁজতেন।

বিদ্রোহী এবং বহিঃশত্রুর হামলার আশংকা ছাড়াও আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য আরো অন্যদিক থেকে চাপের মুখে ছিল। দূরবর্তী প্রদেশগুলোর দুর্নীতিপরায়ণ রাজকর্মকর্তারা মনে করতো সম্রাট মারাঠিদের নিয়ে ব্যস্ত আছেন, কাজেই সেই

সুযোগে ওরা হিন্দুস্তানের দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে অর্থ আদায় করতো। অবিরত যুদ্ধ চলার কারণে মোগল সাম্রাজ্যের কোষাগারের উপর চাপ পড়ায় সম্রাট কর বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হন, যার ফলে প্রজাদের দুর্দশা আরো বেড়ে যায়।

আমার মতে সম্রাট তার শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব দিয়ে একা তার সাম্রাজ্যকে ধরে রেখেছেন। তাঁকে যেমন সবাই ভয় পায় তেমনি সম্মানও করে। তার বয়স হওয়া সত্ত্বেও কেউ তাঁর বুদ্ধির সূক্ষ্মতা আর অন্যদের মনের ভেতরে ঢুকে গিয়ে তাদের কার্যকলাপ আগে থেকে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করে না। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রয়োজনে তিনি সবচেয়ে কাছের পরিচারক আর দেহরক্ষীদের বিশ্বস্ততা অর্জনের জন্য বিশেষ যত্নবান থাকেন। আর অনেক সময় সাধারণ মানুষদের প্রতিও ছোটখাট দয়া-দাক্ষিণ্য আর তাদের প্রতি মনোযোগ দেখিয়ে তাদের আস্থা অর্জন করেন। আবার তাদের প্রতি তাঁর আগ্রহ আর তাদের জীবন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান দেখিয়ে তিনি তাদেরকে অবাক করে দিতেন।

আমি দেখতে পাচ্ছি, যখন তিনি মারা যাবেন তখন আবার সিংহাসনের দখল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাঝে একটি সংঘর্ষ শুরু হবে। তাঁর জীবিত চার ছেলের মধ্যে কে তাঁর উত্তরাধিকার হতে পারবে তা আমি বলতে পারবো না। এর আগে আমি বর্ণনা করেছি শাহজাদা মুয়াজ্জমকে বাইরে থেকে একজন সাধারণ মানুষ মনে হয়েছে। আকবর এখনও পারস্যে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন এবং আমি জেনেছি তাকে আতিথ্য দেওয়া হয়েছে, তবে তার মায়ের তরফের আত্মীয় কিংবা শাহের তরফ থেকে কোনো ধরনের সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। তাছাড়া তার উপর শাহের তেমন আস্থাও নেই। আকবরের আপন ভাই আজম বর্তমানে গুজরাটের সুবেদার। সাধারণত সবাই জানে তিনি ঝোঁকের বশে চলেন এবং অত্যন্ত অপরিণামদর্শী, তার দ্বারা কোনো সফল অভিযান সম্ভব নয়। সবার ছোট কমবখসের একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে, তাকে তাঁর বাবার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র মনে করা হয় আর সেজন্য তার পথটি হয়তো সহজ। তবে তার সাথে মেশার পর তাকে আমার অর্বাচীন আর অলস মনে হয়েছে, যদিও তার মধ্যে যথেষ্ট রসবোধ আছে। হয়তো এমনও হতে পারে, আওরঙ্গজেবের শক্তিশালী সেনাপতিদের মধ্যে কেউ তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে নিজেই সিংহাসন দখল করতে পারে। তবে যাই হোক, এই অবশ্যসম্ভাবী বিভ্রান্তি আর অন্তঃকলহ আমাদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করবে। সেদেশের সাথে আমাদের বাণিজ্য থেকে বর্ধিতহারে যে লাভ হচ্ছে,

তা কাজে লাগিয়ে সুবিধাজনক এলাকার গভর্নরদের ঘুষ দিয়ে হাত করে এই সম্পদশালী আর বিশাল দেশে ইংল্যান্ডের অবস্থান আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ভাঙ্গনের মুখে রয়েছে।

আমার আশংকা আমার ক্ষয়িষ্ণু স্বাস্থ্য আমাকে আর লিখতে অনুমতি দেবে না। যদি ঈশ্বর আমার আয়ু বাড়িয়ে দেন তবে আবার আমি কাজ শুরু করবো। আর যদি তা না হয়, তবে আমি স্যর উইলিয়াম নরিস, আপনার অনুগত প্রজা এবং হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রদূত, মহামান্যের প্রতি অভিবাদন জানাচ্ছি আর আমার স্ত্রীকে আপনার করুণায় ছেড়ে দিলাম।

অধ্যায় : একুশ

হিন্দুস্তান আমাদের দেশ!

'উমর আলি আমার যুদ্ধের হাতি আনতে বল। আমি যুদ্ধ সীমান্ত অগ্রে গিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করবো। আমাকে দেখে সৈন্যদের মনোবল বেড়ে যাবে। যগিনগঁড়ের মতো এই দুর্গটির এত বড় একটি সেনাবাহিনীকে এতদিন থামিয়ে রাখার কথা নয়। আমি বোরহানপুর থেকে আসার আগেই আমার সেনাপতিদের এটা দখল করা উচিত ছিল।'

উমর আলি উত্তর দিল, 'জাঁহাপনা, আপনার প্রয়োজন পড়লে আমি অবশ্যই আপনার যুদ্ধহস্তী নিয়ে আসার নির্দেশ দেব। তবে আপনি যদি অনুমতি দেন তো বলি, জাঁহাপনা, এখানে আসার মাত্র কিছুদিন হয়েছে, আপনি কী যথেষ্ট শক্তিশালী বোধ করছেন? আর জাঁহাপনা, যদি আপনি সম্মুখ সারি থেকে যুদ্ধ শুরু করার ইঙ্গিত দিতে চান, তা কী হাতির পিঠে বসে করতে হবে? হাওদায় বসলে আপনি মারাঠি গোলন্দাজ সেনা আর বরকন্দাজদের সহজ লক্ষ্যবস্তু হবেন। পালকিতে বসাই বরং অনেক আরামদায়ক আর কম বিপজ্জনক হবে।'

'তুমি আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছ, তা আমি বুঝতে পেরেছি। তবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, আমি এখনও এই কাজ করতে যথেষ্ট শক্তি রাখি। আমি যুদ্ধহস্তী ব্যবহার করবো। যদিও এতে আমি স্বভাবতই একটি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হব, তবে সেই সাথে আমার সৈন্যরা আমাকে দেখতে পাবে আর সেটাই আমার উদ্দেশ্য।'

আধাঘণ্টা পর সবুজ রঙের মোগল যুদ্ধবেশ পরে আওরঙ্গজেব তার সোনা বাঁধান হাতের লাঠিটা তাঁর পাশে দাঁড়ান তরুণ কোরচির হাতে দিয়ে তার সাহায্য নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠতে শুরু করলেন। এই মঞ্চ থেকে তিনি তাঁর যুদ্ধের হাতির পিঠে চড়বেন। বিশাল প্রাণীটির নাম বজ্রদেব। এই পুরুষ হাতিটি তার অত্যন্ত প্রিয়। হাতিটি শান্তভাবে মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়েছিল। দুই মাহুত হাতিটির কানের পেছনে বসেছিল। হাতির দাঁতের হাতলের একটি

ছয়ফুট লম্বা গাদা বন্দুক হাতে নিয়ে উমর আলি সবুজ মখমলের গদিওয়ালা রাজকীয় আসনের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার দাড়ি এখন সাদা হয়ে এসেছে। অনেক সৈন্য যেন তাঁকে দেখতে পারে এজন্য আওরঙ্গজেব হাওদার ছাদ সরিয়ে দিতে বলেছেন। হাতির ঠিক পেছন পেছন যে দেহরক্ষী ঘোড়ায় চড়ে আসবে সে একটি বড় ছাতা বহন করবে। ফেরার সময় প্রয়োজন বোধে রোদের তাপ থেকে সম্রাটকে রক্ষা করার জন্য সে ছাতাটি উমর আলির হাতে দেবে।
আওরঙ্গজেব ধীরে ধীরে মঞ্চের উপর চড়লেন, তারপর উমর আলির সাহায্য নিয়ে হাতির পিঠে চড়ে হাওদায় বসলেন। মাহুতের নির্দেশে বজ্রদেব ধীরে সুস্থে গজেন্দ্রগমনে চলতে শুরু করলো, তার হাঁটার এই ভঙ্গির সাথে আওরঙ্গজেব বেশ পরিচিত ছিলেন। একটু পরই তিনি কামানের পেছনের সারির কাছে এসে থামলেন, তারপর গোলন্দাজ সেনাদেরকে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করলেন। তারপর তিনি অশ্বারোহী, বরকন্দাজ আর পদাতিক সৈন্য সারির কাছে পৌঁছলেন, সকলেই তখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল। মাহুত তার ইস্পাতের আংকা দিয়ে খোঁচা দিয়ে ব্রজদেবকে সারিবদ্ধভবে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যদের মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে চললো। আওরঙ্গজেব হাত তুলে সৈন্যদের সম্ভাষণ জানাতেই সৈন্যরা 'আওরঙ্গজেব জিন্দাবাদ! আওরঙ্গজেব দীর্ঘজীবী হোন!' বলে চিৎকার করে উঠলো।
কয়েকমিনিট পর তিনি একদল জ্যেষ্ঠ সেনানায়কের সামনে এলেন, তাঁর অনুরোধে তারা এখানে তাঁকে স্বাগত জানাতে সমবেত হয়েছিল। বজ্রদেব তাদের সামনে এসে থামলো, তারপর উমর আলির সাহায্য নিয়ে আওরঙ্গজেব আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে প্রধান দেহরক্ষীর হাত ছেড়ে দিয়ে সেনানায়কদের মুখোমুখি হলেন। কয়েকজন তাঁর চোখের দিকে তাকাতে পারলো না। অন্যরা এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে ওরা অস্বস্তিতে রয়েছে। তিনি ভাবলেন, হওয়ারই কথা, অবরোধ করতে গিয়ে ইতোপূর্বে তারা যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে, তাতে এরকমই হওয়ার কথা। তিনি পরিষ্কার জোরালো কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন, 'আমি আজ আশা করবো তোমরা পূর্ণ শক্তি ও মনে সাহস, আমাদের উদ্দেশ্য আর আমাদের অস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ আস্থা নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করবে। এযাবৎ এই মারাঠিদের তোমরা হেলাফেলা করেছ। এখন ওদের দেখিয়ে দাও কে শ্রেষ্ঠ আর আমার কাছে তোমাদের সত্যিকার যোগ্যতা প্রমাণ কর। আজই এই দুর্গ দখল কর!'
একে একে তারপর একযোগে সেনানায়করা চিৎকার করে তার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করলো। আওরঙ্গজেব এক হাত তুলে তাদেরকে চুপ করার নির্দেশ

দিলেন। তারপর বললেন, 'এখন তোমাদের কাজ হল যার যার পল্টনের কাছে গিয়ে তোমাদের সৈন্যদেরকে নতুন উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে উৎসাহিত করা, যেরকম এখন চিৎকার করে আমাকে সমর্থন করে দেখিয়েছ। আধাঘণ্টার মধ্যে সৈন্যদের সামনে আমি আমার গাদা বন্দুক থেকে একবার গুলি ছুড়ে আক্রমণ শুরু করার ইঙ্গিত দেব।'

ত্রিশ মিনিট পর বজ্রদেব ধীরে ধীরে একটি ছোট টিলার উপর চড়লো। তাকে এখন আওরঙ্গজেবের সৈন্যদের অনেকেই দেখতে পাচ্ছে, শুধু তাই নয় যগিনগাঁড় দুর্গ থেকেও তাকে দেখা যাচ্ছিল। দুর্গটি আরো বড় একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল, এর দুই পাশে পাহাড় চূড়া দিয়ে বেষ্টিত এবং পাশেই একটি চওড়া খর-স্রোতা নদী বয়ে যাচ্ছে। দুর্গটি বড় না হলেও, পাথরের চওড়া দেয়ালটি অত্যন্ত শক্ত প্রমাণিত হয়েছিল। বজ্রদেব টিলার সমতল চূড়ায় উঠে দাঁড়াল। দুজন অশ্বারোহী পতাকাবাহক সোনালি ঘেরের দুটি সবুজ বিশাল পতাকা হাতিটির পেছনে মেলে ধরলো। আওরঙ্গজেব আদেশ করলেন, 'উমর আলি আমাকে আবার দাঁড়াতে সাহায্য কর।'

প্রধান দেহরক্ষী তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করে তাঁর হাতে গাদা বন্দুকটা তুলে দিল। এর হাতির দাঁতের বাটে লড়াইয়ের দৃশ্য খোদাই করা ছিল। উমর আলি বললো, 'আপনি কি আমার কাঁধে রেখে বন্দুকটা নিশানা করবেন, জাঁহাপনা?'

আওরঙ্গজেব বললেন, 'না, আমি এটা ধরে নিশানা করতে পারবো।' ঠিকই তিনি তার কথামতোই কাজ করলেন। সমস্ত শক্তি দিয়ে গাদা বন্দুকটা সোজা করে দুর্গের দিকে একটি গুলি করলেন।

সাথে সাথে তার সম্মুখ সারি থেকে গুলির আওয়াজ শোনা গেল। কামানগুলো গোলা ছুড়তেই অশ্বারোহী সেনারা প্রবল উৎসাহে সামনে এগোল। তাদের ঘোড়াগুলো ছোটা শুরু করতেই পতাকাগুলো বাতাসে পত পত করে ভাসতে লাগলো। তাদেরকে অনুসরণ করলো পদাতিক বাহিনী, তাদের মধ্যে কিছু সৈন্য লম্বা মই বহন করছিল।

উমর আলি আবার আওরঙ্গজেবকে তাঁর গদিওয়ালা আসনে বসাতেই কাছেই পাহাড়ের মাটিতে একটি কামানের গোলা এসে পড়লো। আওঙ্গজেব আর তাঁর হাতির গায়ে মাটি ছড়িয়ে পড়লো। প্রশিক্ষিত বজ্রদেবের কিছুই হল না, তবে পতকাবাহকদের একটি ঘোড়া আতঙ্কিত হয়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেই এর আরোহীকে পিঠ থেকে প্রায় ফেলে দিচ্ছিল। ঘন ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে আওরঙ্গজেব দেখলেন দুর্গের দিকে অর্ধেক পথ যাওয়ার আগেই মারাঠিদের কামান আর গাদা বন্দুকের গোলার আঘাতে দুজন পতাকাবাহকসহ

কয়েকজন অশ্বারোহীসেনা হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে। আরো কয়েকজন আহত অশ্বারোহীসেনা পিছু হটছে। যদিও অন্যরা ইতোমধ্যেই দুর্গের দেয়ালের নিচে পৌঁছে গেছে, কয়েকজন ঘোড়ার পাদানিতে দাঁড়িয়ে একহাতে ঘোড়ার রাশ ধরে অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে দুর্গের ছাদের উপর শত্রুপক্ষের সেনাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে। এদের পেছনে যে বরকন্দাজ সেপাইরা ছিল, তারা মাটিতে শুয়ে গাদা বন্দুক নিশানা করছিল।

একটি আতঙ্কিত ঘোড়া হঠাৎ আরোহীসহ দুর্গের পেছনের পাহাড় চূড়ার উপর দিয়ে ছুটলো। পদাতিক সেনারা উপরে উঠার আগেই বারোজনেরও বেশি মোগল বরকন্দাজ হতাহত হল। ওদের মধ্যেও অনেকে হতাহত হয়েছিল। কয়েকজন স্থির হয়ে পাহাড়ের খাড়া ঢালে পড়েছিল আর অন্যরা হাঁমাগুড়ি দিয়ে কিংবা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মোগল শিবিরের দিকে ফিরে আসছিল। তবে যারা দেয়ালের কাছে পৌঁছেছিল, তারা দ্রুত মই খাড়া করে দেয়ালে উঠতে শুরু করলো। দুর্গের ছাদে থাকা মারাঠিরা কয়েকটি মই ঠেলে ফেলে দিল। মইয়ের সাথে লেগে থাকা মোগল সেনারা পেছনে তাদের সহযোদ্ধাদের গায়ের উপর পড়লো। এদের সাথে সাথে দুই-তিনজন মারাঠি সেনাও মোগল গাদা বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে ছাদ থেকে নিচে পড়ে গেল।

তবে তিনি যেরকম আশা করেছিলেন, মোগল সেনারা যথেষ্ট মনোবল দেখাতে লাগলো। দ্রুত প্রচুর সেনা দেয়ালের কাছে পৌঁছতেই আরো অনেক মই লাগান হল। মই থেকে ওরা অনেকে ছাদে উঠতে সফল হল। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে ছাদের উপর উভয়পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই চলছে। ধীরে ধীরে মারাঠিরা দেয়াল ধরে পিছু হটছে। প্রচুর হতাহত করা ছাড়াও মোগলরা ওদেরকে ছোট ছোট দলে একে অপরের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলছিল। ইতোমধ্যে ওরা মারাঠিদের বড় একটি কামান দখল করে কামানের মুখ পিছন দিকে ঘুরিয়ে দুর্গের দিকে গোলা ছোঁড়ার চেষ্টা করছিল। এর কাছেই একজন মোগল সেনা ছাদের একটি ছিদ্রের সাথে বিশাল একটি সোনালি-সবুজ মোগল পতাকার দণ্ড বেঁধে দিতেই পতাকাটি হাওয়ায় পতপত করে উড়তে লাগলো।

আওরঙ্গজেব বললেন, 'আল্লাহর রহমতে যুদ্ধের গতি আমাদের অনুকূলে যাচ্ছে। গরমে আমার মাথা দপদপ করছে উমর আলি। চল আমরা বড় তাবুতে ফিরে যাই। ঐ ছাতাটা নাও। রোদ সহ্য হচ্ছে না।'

সেদিন সন্ধ্যায় হেরেম তাঁবুতে আওরঙ্গজেব একটি রেশমি বালিশে মাথা রেখে একটি ডিভানের উপর শুয়ে চোখ বুজে ছিলেন। উদিপুরী মহল তার দিকে

তাকিয়ে শান্তভাবে বললেন, 'আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। অবশ্য আজ আপনি যা করেছেন, তাতে ক্লান্ত হবারই কথা।'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ আমি ক্লান্ত। তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। আমার উপস্থিতিতে আমার লোকেরা উজ্জীবিত হয়েছে। দুইঘণ্টারও কম সময়ে আমরা পুরো দুর্গ দখল করতে পেরেছি। যদিও কিছু সৈন্যসহ এর অধিনায়ক মাটির নিচের একটি গোপন পথ দিয়ে পালিয়ে গেছে। এবার আমি যগিনগঁড় দুর্গ সঠিকভাবে সুরক্ষিত করবো। মারাঠিরা আর এটা পুনর্দখল করতে পারবে না, আর নয়তো আমার সেনাপতিদের এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

'আপনার সফলতায় আমি খুশি হয়েছি, তবে নিজের শরীরের উপর বেশি চাপ নেবেন না।'

'সেটা হয়তো পুরোপুরি সম্ভব নয়। আমি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেটা সেনাপতিদের সামনে ঘোষণা করার আগে তোমাকে বলতে চাই। কিছু সৈন্য নিয়ে আমি উত্তরে আগ্রা আর দিল্লির দিকে ফিরে যাব। তেইশ বছর যাবৎ দক্ষিণে থেকে আমাদের সাম্রাজ্যের পরিধি এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাড়িয়েছি। এখানে যে বিরাট সেনাবাহিনী থাকবে তার নেতৃত্ব দেবার জন্য মুয়াজ্জমকে ডেকে আনবো। সে একজন কুশলী সেনাপতি আর একটি ভুলের পর নির্দেশের প্রতি সে আরো অনুগত হয়েছে। তার কাজ হবে আমাদের এখানকার অবস্থান ধরে রাখা। আর কোনো এলাকা দখল করার দরকার নেই। আজম গুজরাটেই থাকবে।'

'এসব সিদ্ধান্ত এখন কেন নিচ্ছেন?'

'অনেক কারণে। উত্তরে অশান্তি চলছে। রাজপুতরা উদ্ধত হয়ে উঠেছে আর শিখরাও আরো বেশি স্পর্ধা দেখাচ্ছে। এমনকি জাটরাও আগ্রায় আমার মায়ের সমাধিসৌধে লুটপাট চালিয়েছে। তার উপর আমার নিজের যে কর্মকর্তাদের চোখের আড়ালে রেখে আমি বিশ্বাস করেছিলাম, ওরাও দুর্নীতিপরায়ণ আর অর্থলোলুপ হয়ে উঠেছে। আমি এদের কয়েকজনকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব, যাতে অন্যরা সাবধান হয়ে যায়। আর খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলবো, যা আমার সেনাবাহিনীকে টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।' আওরঙ্গজেব এতক্ষণ সোজা হয়ে বসে কথা বলছিলেন, এবার একটু থামলেন, তারপর আবার বলে চললেন, 'আর সত্যি বলতে কি, উত্তরে আবার পরিচিত লোকালয় আর দালানকোঠাগুলো আমার খুব দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। ইচ্ছা হচ্ছে দিল্লিতে আমার বোন জাহানারার মাজারে দোয়া করার, আর আগ্রায় তাজমহলে মায়ের মাজারে আর হয়তো সেখানে বাবার কবরেও দোয়া করবো।' আবার একটু

থামলেন। আওরঙ্গজেবের এরকম বিষাদময় চেহারা উদিপুরী মহল আর কখনও দেখেন নি। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন তার লাল হয়ে আসা চোখে দু-একফোটা পানি দেখা যাচ্ছে, ধীরে ধীরে গাল বেয়ে নেমে চোখের পানি সাদা দাড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছে। তিনি তাড়াতাড়ি চোখের পানি মুছে আবার বললেন, 'যতই বয়স হচ্ছে ততই তাঁর কথা আমার বেশি মনে পড়ছে। গত বছর পারস্যে আকবর মারা যাবার পর আর তার আগে কারাগারে জেবুন্নিসার মৃত্যুর খবরের পর আমার মনে যে শোক জেগেছিল, তা আমাকে অবাক করেছে। বয়স আমাকে বুঝতে শিখিয়েছে পিতামাতার সাথে তাদের সন্তানেন বন্ধন কত অসমান। বড় হলেই সন্তান তার বাবা-মার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়, নিজের পরিকল্পনা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অথচ বাবা-মা তখনও সেই বন্ধন অনুভব করে আর ওদেরকে ছোট ছেলেমেয়ে হিসেবে দেখে। বুঝতে ব্যর্থ হয় কেন সন্তান তার কথামতো চলে না। যদিও আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে,...মোটেই নেই...যে আমি সবসময় সঠিক কাজই করেছি ...যখন বাবার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছিলাম, আর এখন একটু একটু বুঝতে শুরু করেছি তিনি তখন কেমন অনুভব করেছিলেন।'

কথা বলা শেষ করতেই একটি কষ্টের হাসি আওরঙ্গজেবের মুখে দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল। উদিপুরী তার কাছে গিয়ে দুই হাতে তাঁর কাঁধ ধরলেন। কয়েকমিনিট নীরবতার পর তিনি বললেন, 'কমবখ্স কি আমাদের সাথে উত্তরে যেতে পারবে?'

'হ্যাঁ, যদি তুমি চাও।'

'আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। সে আমার বড় আদরের আর আমার মনে হয় আপনারও একজন প্রিয়পাত্র। সেজন্য অনেক সময় আমার দুশ্চিন্তা হয় হয়তো তার ভাইয়েরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে, বিশেষত যখন সে আপনার নিরাপদ আশ্রয় থেকে দূরে থাকে...'

'আমি যতদিন বেঁচে আছি— আর আমি এত তাড়াতাড়ি মরতেও চাই না, এ ধরনের ষড়যন্ত্র হতে দেব না।'

উদিপুরী মহলের মাংসল মুখে একটি মৃদু হাসি খেলে গেল। আর তা আওরঙ্গজেবকে মনে করিয়ে দিল যৌবনে তিনি দেখতে কেমন ছিলেন। তার বুকে মাথা রেখে ধীরে ধীরে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। উদিপুরী মহল তাঁর পাতলা হয়ে যাওয়া চুলে হাত বুলাতে বুলাতে তার মাতৃভূমি জর্জিয়ার একটি নৈশকালের ঘুমপাড়ানি গান গুন গুন করে গাইতে শুরু করলেন। আগামীকাল

তিনি চাকরদের বলবেন তার সিন্দুকে মালপত্র ভরতে, কেবল সফরের উপযোগী কিছু পোশাক আর অলঙ্কার, যা তার স্বামীকে খুশি করবে সেগুলো আলাদা করে রাখবেন। তবে পোশাকগুলোতে কিছু পরিবর্তন করতে হবে, কেননা তিনি আগের চেয়ে বেশ মোটা হয়েছেন। আর সামান্য যে মদ লুকিয়ে রেখেছিলেন তা ফেলে দিতে হবে, কেননা তার স্বামী এটা খুবই অপছন্দ করেন। উত্তরে পৌঁছান পর্যন্ত তাকে ধীর-স্থির থাকতে হবে। আওরঙ্গজেবের বয়স এখন সাতাশি, কষ্টকর সফরকালে তার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উদিপুরীর সাহায্য প্রয়োজন হবে। কমবখস্ও তার কর্মতৎপরতা আর সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার হিসেবে তার যোগ্যতা প্রমাণ করার একটি সুযোগ পাবে। তবে তিনি নিশ্চিত অবশ্যই সে সময় আসবে...।

অশ্বারোহীদলের সবার আগে অগভীর নদীর পানি ছিটিয়ে কমবখস্ বীরের মতো আক্রমণে ছুটে চললো। শেষ বিকেলের আলোয় নদীর পানির রঙ সোনালি হয়ে চিক চিক করছিল। এক হাতে রোদ আড়াল করে আওরঙ্গজেব লক্ষ করলেন তার ছেলের পেছনের একজন অশ্বারোহী তার সাদা ঘোড়ার পিঠ থেকে দুই হাত ছুড়ে পানিতে পড়ে গেল। তবে কম বখস্ ইতোমধ্যে নদী পার হয়ে পাহাড়ের পেছনের পরিত্যক্ত দুর্গটি পর্যন্ত অর্ধেক পথ পার হয়েছে। এর নিচু মাটির দেয়ালটি বৃষ্টি পড়ে জায়গায় জায়গায় ভেঙ্গে পড়েছে, সহজেই ঘোড়াগুলো টপকে যেতে পারবে। শীঘ্রই দুর্গে যে মারাঠি সৈন্যগুলো লুকিয়েছে তারা ধরা পড়বে এবং মারা পড়বে। ওরা ধীর গতিতে চলা মোগল সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দলের উপর অতর্কিতে হামলা করে এখানে লুকিয়েছিল। মারাঠিদের হাতে তার যে লোকেরা মারা গিয়েছিল, তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। দুই মাইল দীর্ঘ মোগল কাফেলার উপর এটা সর্বশেষ অতর্কিত হামলা ছিল, এমনিতেই ধীরে চলা কাফেলাটির অগ্রগতি আরো ধীর হয়ে পড়লো, কেননা এখন তাদেরকে প্রতিটি লোকের উপর কড়া নজর রাখতে হচ্ছে। তবে এখন পাহাড়ের ঢাল আরো খাড়া হয়ে চলেছে, কমবখস তার বাদামি ঘোড়ায় চড়ে দেহরক্ষীদের আগে আগে ছুটে প্রায় দুর্গের দেয়ালের কাছে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ তার ঘোড়াটি পা ভাঁজ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই সেও জিন থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে রইল।

চার-পাঁচজন দেহরক্ষী ঘোড়ার রাশ টেনে তাদের ঘোড়া থামাল। তারপর দ্রুত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে শাহজাদার উপরে ঝুঁকলো। বাকি মোগল সৈন্যরা

ঢাল বেয়ে দুর্গের দিকে ছুটে চললো। মাটির দেয়াল টপকাতে গিয়ে দুটি ঘোড়া পড়ে গেল, অন্যরা দেয়াল টপকে দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

আওরঙ্গজেব চিৎকার করে বললেন, 'হেকিমকে পাঠিয়ে আমার ছেলেকে পেছনের সারিতে নিয়ে আসতে বল। আর দেখো তার পড়ে যাওয়ার খবরটা যেন মেয়েদের কানে না যায়। ওরা কাফেলার পেছনে পর্দাঘেরা হয়ে আসছিল আর যখন মারাঠিরা অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল তখন প্রহরীরাও ওদেরকে ঘিরে ছিল, কাজেই উদিপুরী মহল দেখতে পারেন নি কি ঘটেছে। আমি আমার ছেলের কতটুকু জখম হয়েছে দেখার পর নিজে তাকে খবরটা জানাব।'

হুমায়ুনের আমল থেকে কোনো মোগল শাহজাদা যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান নি। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, তিনি যেন কমবখস্‌ের প্রাণ রক্ষা করেন। তাঁর মনে পড়লো ছোট ছেলের জন্মের সময় তিনি ভেবেছিলেন একজন সম্রাটের বেশ কয়েকটি ছেলের প্রয়োজন, কারণ কেউ হয়তো মারাও যেতে পারে কিংবা কেউ বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারে। সেই তখন থেকেই তিনি আকবরের বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করে এসেছেন। এখন কি তাকে আরেকটি মৃত্যু সহ্য করতে হবে? অবশ্য সেটা এখনই জানা যাবে। কমবখস্‌ের চারদিকে যে দেহরক্ষীরা ভিড় করেছিল, তাদের মধ্যে একজন ঘোড়ায় চড়ে শিবিরের দিকে ফিরে আসছিল। শীঘ্রই সে আওরঙ্গজেবের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামলো। তার মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না।

'আমার ছেলে—সে কেমন আছে?'

'আমরা নিশ্চিত কিছু বলতে পারছি না জাহাপনা। একটি মারাঠি গোলা তার ঘোড়াকে আঘাত করেছিল, তাকে নয়। তবে মাটিতে পড়ে যাওয়ার সময় তার শিরস্ত্রাণটি খুলে পড়ে এবং শক্ত পাথুরে জমিনে তার মাথা ঠুকে যায়। তার নাক, মুখ আর এক কান দিয়ে রক্ত পড়ছে। জ্ঞান হারালেও তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকই বইছে। আর আমাদের একজন সাথি বলেছে তিনি নাকি একবার চোখের পাতা ফেলেছিলেন। হেকিম বলেছেন তাকে এখন যেখানে আছেন সেখানে রাখাই ভাল। ওরা বরফ আর কম্বল আনতে বলেছে।

'কিন্তু ওকে ওখানে রাখলে মারাঠিরা কিছু করবে না?'

'দুর্গ থেকে যারা পালাতে পারে নি তাদের সকলকে বন্দী করা হয়েছে। সবকিছু এখন শান্ত।'

'কয়জনকে ধরেছ?'

'প্রায় পঁচিশজন হবে, জাহাপনা।'

'ওদেরকে কড়া পাহারায় রাখো। পরে আমি ওদের সাথে কথা বলবো। এখন আমাকে আমার ছেলের কাছে যেতে হবে। উমর আলি, একটা পালকি আনতে বল।'

দশ মিনিট পর ছয়জন বেহারা পর্দাঘেরা পালকিটি কমবখস্‌কে ঘিরে থাকা সেনাদলটির কাছে এসে নামাল। ভিড়ের ফাঁক দিয়ে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। ষাট বছরের উমর আলি পালকির সাথে সাথে ছুটে এসেছে। সে আওরঙ্গজেবকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো।
'আমাকে দেখতে দাও আমার ছেলেকে।' যারা কমবখস্‌কে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তারা সরে দাঁড়াল। আওরঙ্গজেব নিচে তাকিয়ে দেখলেন কমবখস্ এখন মনে হল অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন। নাক মুখ থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে, তবে অন্তত তিনটি দাঁত ভেঙ্গে গেছে আর তার বাম হাতের কব্জির একটি রক্ত মাখা হাড় বেরিয়ে রয়েছে। কালো পোশাকপরা একজন হেকিম কাপড়ে মোড়ান একটি বরফের টুকরা নিয়ে তার ছড়ে যাওয়া কপাল, আর ফুলে বেগুনি হয়ে যাওয়া বাম চোখে ধরে রেখেছিলেন। তবে সকল প্রশংসাই আল্লাহর, তার ছেলের বুক উঠানামা করছিল। সে ঠিকমতোই নিশ্বাস নিচ্ছিল।
আওরঙ্গজেব হেকিমকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কি একবারও নড়েছে?'
'দুই তিন মিনিট আগে তিনি একবার চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন, এমনকি মনে হলো মৃদু হেসেছিলেন। তবে এর পর আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।' হেকিম কথা বলতে বলতেই কমবখস্‌র মাথাটা সামান্য নড়ে উঠলো। তিনি আবার চোখ খুললেন আর মনে হল তার বাবার দিকে তাকালেন।
আওরঙ্গজেব জিজ্ঞেস করলেন, 'কমবখস্, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'
তার ছেলে কোনো উত্তর দিল না, তবে তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কয়েক ফোটা রক্ত বের হয়ে তার কালো দাড়ির উপর গড়িয়ে বের হল—সম্ভবত মাথা নাড়াচাড়ার কারণে কোনো একটি জখম খুলে গেছে। আবার চোখ বন্ধ করলেন।
আরো পাঁচ মিনিট কেটে গেল, তারপর আবার কমবখস্‌ের চোখের পাতা কেঁপে উঠলো, তিনি আবার চোখ খুললেন। এবার আওরঙ্গজেব নিশ্চিত হলেন তিনি তাঁর দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। তিনি ডেকে উঠলেন, 'কমবখস্. . .?'
তিনি আর কিছু বলার আগেই কমবখস্‌ের রক্তমাখা ঠোঁট নড়ে উঠলো। মৃদুস্বরে তবে পরিষ্কারভাবে তিনি বলে উঠলেন, 'বাবা?'
হাঁটুর ব্যথা নিয়ে আওরঙ্গজেব সাথে সাথে সেখানেই হাঁটুগেড়ে বসে পড়লেন, 'সকল প্রশংসাই আল্লাহর!'
দুই ঘণ্টা পর কমবখস্‌ের ভাঙ্গা কব্জিতে পট্টি লাগাবার পর তাকে একটি নতুন তাঁবুতে বসিয়ে পাশে উদিপুরী মহলকে রেখে আওরঙ্গজেব আবার পালকিতে চড়ে নদীর তীরে ফিরে এলেন। সেখানে চব্বিশ জন মারাঠি বন্দী হাত-পা পিছমোরা বাঁধা অবস্থায় একই দেহরক্ষীদলের পাহারায় অপেক্ষা করছিল।

পালকিতে নেমে তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে বন্দীদের কাছে হেঁটে গেলেন। প্রায় সবাই তার দিকে অম্লানবদনে তাকিয়ে রইল।

'তোমরা সবাই তোমাদের সম্রাট—আমার কাছে বিশ্বাসঘাতক। তোমাদের মতো লোকেরা আমার শাসনে বার বার উপদ্রব সৃষ্টি করেছ। কেউ তোমাদের মৃত্যু ঠেকাতে পারবে না, তবে তোমরা যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, তবে ঘাতকের তরোয়ালের এক কোপে তোমাদের মৃত্যু দ্রুত, যন্ত্রণাহীন এবং যতদূরসম্ভব মর্যাদাপূর্ণ হবে। এটা জানার পর তোমাদের মধ্যে কেউ কী সত্যি ধর্মে দীক্ষিত হতে রাজি আছ?'

কোনো উত্তর নেই।

'ঠিক আছে, তোমাদেরকে একজন একজন করে ঐ কামানের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর কামানের মুখে তোমাদেরকে বেঁধে গোলা ছোঁড়া হবে, তোমাদের দেহ টুকরা টুকরা হয়ে উড়ে যাবে। তারপর একটি মুণ্ড ঐ দুর্গের কোনো একটি চূড়ায় সিমেন্ট করে রাখা হবে, যাতে এটা দেখার পর অন্যরা সাবধান হয় আর আমার কর্তৃত্বকে মানতে বাধ্য হয়। প্রহরী, গোলন্দাজ সেপাই, কাজ শুরু করে দাও!'

নদীর ওপারে সূর্য অস্ত যেতেই দুইজন দীর্ঘদেহী প্রহরী লম্বাচুলের একজন মারাঠিকে ধরে তাকে টেনে-হিঁচড়ে কামানের দিকে নিয়ে চললো। লোকটি কোনো বাধা দিল না, তবে মাথা সোজা করে রইল আর আওরঙ্গজেবের কাছে আসতেই চিৎকার করে উঠলো, 'হিন্দুস্তান আমাদের দেশ। এক দিন আমরা আপনার এবং সকল বিদেশি হামলাকারীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হব। এখন আমি যত যন্ত্রণা আর অপমান বোধ করবো, হে বৃদ্ধ, আপনার বংশধরেরা তার চেয়ে দশগুণ বেশি যন্ত্রণা ভোগ করবে।' একজন প্রহরী তার তলপেটে প্রচণ্ড আঘাত করতেই সে উল্টে পড়লো, তবে একটুও শব্দ করলো না। কামানের কাছে পৌঁছে প্রহরীরা কামানের মুখের উপর তার শরীর বাঁকা করে ধরলো আর হাত-পা রশি দিয়ে কামানের নলের সাথে বাঁধলো। কামানের পাশে দাঁড়ান তিনজন গোলন্দাজ সেনা ইতোমধ্যে কামানে গোলা ভরে রেখেছিল। লোকটি তারপরও কোনো ধরনের নড়াচড়া করলো না কিংবা চিৎকার করলো না। প্রধান গোলন্দাজ সেনা বারুদে আগুন ধরাতেই কামানের গোলাটি মারাঠি লোকটির দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিল। অনেক দূরে চতর্দিকে রক্ত, মাংস আর হাড় ছড়িয়ে পড়লো। আর মাথাটি গড়াতে গড়াতে নদীর তীরের দিকে গিয়ে পৌঁছল।

আওরঙ্গজেব উমর আলিকে বললেন, 'বেহারাদের ডাক। আমার এসব দেখার দরকার নেই।' এই লোকগুলোর মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য তিনি আর কি করতে পারেন?

দেবপুর দুর্গ-প্রাসাদের ধূলিধূসরিত উঠানে পালকির পাশে হাঁটুগেড়ে বসা দেহরক্ষী প্রধানকে আওরঙ্গজেব বললেন, 'আমাকে কয়েকটা দিন অবশ্যই বিশ্রাম নিতে হবে। আমার মনে হয় আমি আমার শক্তির শেষ সীমায় এসে গেছি, দিল্লি রওয়ানা দেবার আগে আমাকে সুস্থসবল হয়ে উঠতে আরো কিছু সময় দিতে হবে। তবে দিল্লি যেতেই হবে। উমর আলি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দাও।'

'জ্বী, জাঁহাপনা। আমি সেনাপতিদের বলবো ওরা যেন সৈন্যদের বেশ কিছু দিন থাকার মতো রসদের মজুদ এবং মোটামুটি স্থায়িভাবে থাকার বন্দোবস্ত নিশ্চিত করে।'

'আর বিভিন্ন প্রদেশের সুবেদার আর সেনাপতিরা যেন জানে...' হঠাৎ কাশির দমকে আওরঙ্গজেব থেমে গেলেন। এক টুকরা মসলিন কাপড় দিয়ে ঢাকা পাশে রাখা চিনামাটির একটি পেয়ালায় এক দলা কফ থুক করে ফেলে তিনি আবার কর্কশ স্বরে বলতে লাগলেন, 'ওদেরকে জানাও আমি এখানে আছি, কোনো ধরনের সমস্যা হলে যেন দ্রুত আমাকে খবর দেয়।'

'আমি বলবো জাঁহাপনা। আমি কি আপনাকে পালকি থেকে উঠতে সাহায্য করবো, যাতে আপনি হেটে আপনার থাকার কামরায় যেতে পারেন? আমার মনে হয় পরিচারকরা কামরাগুলো সাজিয়ে রেখেছে।'

'না, এখন আমি হাঁটতে পারবো না, এবার খুব ক্লান্ত হয়েছি। বেহারাদের বল পালকিটা ভেতরে বয়ে নিয়ে যেতে আর চাকরদের বল কিছু বরফ পানি প্রস্তুত করতে। যদিও ঘাম নেই, তারপরও আমার শরীরের ভেতরে আগুনের মতো গরম মনে হচ্ছে।'

'অবশ্যই জাঁহাপনা। আমি নিশ্চিত বরফঘরটিতে প্রচুর বরফ রয়েছে। উদিপুরী মহল খবর পাঠিয়েছেন, তিনি আপনার জন্য আপনার কামরায় অপেক্ষা করছেন। আমি পরিচারকদের বলবো জানালায় লেইসের সুতার পর্দা লাগিয়ে পানি দিয়ে যেন ভিজিয়ে রাখে।'

'ঠিক আছে। এখন বেহারাদের বল পালকিটা ঘরের ঠাণ্ডায় আমাকে নিয়ে যেতে।' কথাগুলো বলতেই আবার কাশির দমকে তাঁর শীর্ণ দেহটি কেঁপে উঠলো।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে দিতে উমর আলি ভাবলো তিনি নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়েছেন। আওরঙ্গজেবকে তিনি কখনও এরকম তাঁর কর্মচারীদের সামনে নিজের শারীরিক দুর্বলতা প্রকাশ করতে দেখেন নি।

সেদিন সন্ধ্যায় উদিপুরী মহল আওরঙ্গজেবের উপর ঝুঁকে তাঁর দিকে তাকালেন। দেবপুরের সন্ধ্যার বাতাসে ঘরে ফেরা ময়ূরের কর্কশ কেকা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। দুর্গের সাদা মার্বেল পাথরের যে প্রাসাদে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেখানে পৌছার কিছুক্ষণ পরই আওরঙ্গজেব ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমের মাঝে বার বার মাথা উঁচু করে এদিক ওদিক পাশ ফিরছিলেন। পাশে রাখা রূপার বাটি থেকে পানি নিয়ে উদিপুরী তার শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনিও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন আর ঘুমে তার চোখ বুজে আসছিল এমন সময় হঠাৎ আওরঙ্গজেবকে কথা বলতে শুনে তিনি চমকে জেগে উঠলেন। 'মা, আমাকে বাঁচাও। আমার যন্ত্রণা হচ্ছে। চারপাশে শুধু সাপ...সাপ আমার মাথায়...সাপ আমার পরিবারে...বিষ ঝরে পড়ছে তাদের বিষদাঁত থেকে। আমাকে ছেড়ে চলে যেও না, সাপ আমাকে কামড়াবে। বাঁচাও! বাঁচাও আমাকে!' তিনি চারপাশে হাত তুলে ছুড়ছিলেন। দুচোখ খোলা আর চোখের মণি উন্মাদের মতো ঘুরছিল। তিনি প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন। তিনি কী মারা যাচ্ছেন?

পাশে দাঁড়ান একজন তরুণ কোরচিকে উদপুরি মহল বললেন, 'হেকিমকে ডেকে আন আর কাউকে পাঠিয়ে দোয়া পড়ার জন্য ইমামকে খবর দাও।' তারপর তিনি পাশে রাখা বড় একটি বোল থেকে বড় এক টুকরা বরফ নিয়ে আওরঙ্গজেবের কপালের উপর ধরলেন। বরফগলা পানি ফোঁটায় ফোঁটায় তাঁর মুখ বেয়ে সাদা দাড়িতে পড়তেই তিনি আবার এক মুহর্তের জন্য প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠলেন। তারপর আবার বিছানায় শুয়ে স্থির হয়ে রইলেন। কপালে হঠাৎ ঠাণ্ডা বরফ রেখে কি তিনি তাঁকে প্রচণ্ডভাবে একটা ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলেছেন? না, তার বুক তো ঠিকই উঠানামা করছে।

হঠাৎ আওরঙ্গজেব তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'কে, উদিপুরী মহল?'

তিনি বললেন, 'জ্বী, আমি এখানে আছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।' কথাটা বলা শেষ করার আগেই আওরঙ্গজেবের সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল, পোশাকে গাঢ় দাগ দেখা দিল। আল্লাহকে শুকরিয়া যে জ্বর চলে গেছে। তিনি হয়তো বেঁচে যাবেন। উদিপুরী মহল তাঁর ভেজা গালে চুমু খেলেন। এখন আর কালো পোশাকপরা ইমামের দোয়া পড়ার প্রয়োজন নেই।

দুদিন পর সকালবেলা উদিপুরী মহল আবার আওরঙ্গজেবের বিছানার পাশে বসেছিলেন। তিনি সবে মাত্র জেগে উঠেছিলেন আর উদিপুরী পাশে রাখা রুপার বোল থেকে একটি চামচে করে হেকিমের তৈরি করা পানি, মধু আর

ভেষজের মিশ্রণ তুলতে যাচ্ছিলেন। তাঁর কাশি কমাবার জন্য হেকিম এটা দিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব বললেন, 'চামচের দরকার নেই। তুমি বোলটা দাও, আমি ওটা থেকে চুমুক দিয়ে খাব।'

মৃদু হেসে তিনি বোলটা আওরঙ্গজেবের হাতে তুলে দিলেন। কাঁপা কাঁপা হাতে তিনি বোলটা ধরলেন। তারপর ভেষজের মিশ্রণটা খাওয়ার পর বললেন, 'আমাকে ধরে বালিশে হেলান দিয়ে বসাও।' সামান্য চেষ্টাতেই উদিপুরী তাকে টেনে তুলে বালিশে হেলান দিয়ে প্রায় খাড়া করে বসালেন। পেছনে কয়েকটা মোটা রেশমি বালিশ রাখতেই তিনি বললেন, 'জলদি কাশ্মিরি শালটা দাও আমার হাতে! বেশ শীত করছে সকালের বাতাসে।'

তিনি তাঁর পুরনো কর্তৃত্বব্যঞ্জক আচরণ কিছুটা ফিরে পেয়েছেন দেখে উদিপুরী মহল খুশি হয়ে বললেন, 'আপনি আবার শক্তি ফিরে পাচ্ছেন দেখে আমার ভাল লাগছে।'

'হ্যাঁ। আজ সকালে আবার নামাজ পড়তে পারবো। বিকেলে পোশাক পরে পালকিতে চড়ে দিওয়ান-এ-খাসে গিয়ে সভাসদদের সাথে একটি সভায় মিলিত হব।'

'সভায় অংশগ্রহণ করে শরীরের উপর চাপ দেবার দরকার নেই।'

'অবশ্যই প্রয়োজন আছে। এখন থেকে প্রতিদিন আমি সভাসদদের সাথে অলোচনায় যোগ দিতে চাই। এতে আমার অমাত্য, উপদেষ্টারা জানবে আমি শুধু বেঁচে নেই পুরাপুরি মন দিয়ে কার্যকরভাবে শাসনকাজ চালাতে সক্ষম। গত রাতে যখন আমি জেগে ছিলাম তখন আমার মনে পড়েছিল, পঞ্চাশ বছর আগে যখন খবর এল আমার মধ্য ষাটের বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়েছেন, তখন আমিসহ আমার ভাইয়েরা সবাই মনে করলাম তিনি আর শাসন করার উপযুক্ত নন। আর সিংহাসনের জন্য নিজেদের দাবি নিয়ে এগোবার সময় এসেছে। পুরোনো কথা আর বলবো না। এখন মুয়াজ্জম আর আজমকে চিঠি লিখে জানাব আমি সুস্থ হয়েছি।'

উদিপুরী মহল মাথা নাড়লেন। তাকে সুস্থ হতে দেখে আর তাঁর মনোবল ফিরে এসেছে দেখে তিনি খুশি হলেন। শুধু তাই নয়, এ খবরটি পেয়েও খুশি হলেন যে, তিনি উত্তরাধিকারীর বিষয়টি নিয়ে এখন অগ্রসর হতে পারেন। চাকর-বাকর আর হেরেমের অন্যান্যের কাছ থেকে কানাঘুষা শুনেও তিনি এ বিষয়ে আরো নিশ্চিত হয়েছিলেন। এখন তাকে সুযোগ বুঝে উত্তরাধিকার হিসেবে কমবখস্‌ের যোগ্যতার কথাটা তুলে ধরে তাঁকে রাজি করাতে হবে। তাকে এখন তার স্বামীর সেবাযত্ন করে তাকে সুস্থ করে তুলতে হবে।

বার বার বৃষ্টি হওয়ায় দেবপুর আর এর আশেপাশের এলাকা আরো গাঢ় সবুজ হয়ে উঠেছে। বাইরে দুর্গে বাগানে সবুজ ফলের গাছের মাঝে ফোয়ারায় পানির বুদবুদ উঠছে আর প্রথম গোলাপ ফুটেছে। সেদিকে তাকিয়ে উদিপুরী মহল ভাবলেন, এখনও রাজদরবার এখানেই রয়েছে। যখনই আওরঙ্গজেব হাজার মাইল দূরত্বে দিল্লি যাওয়ার দীর্ঘ সফরের কথা তুলেন, তখনই তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে প্রথম বারের জ্বরের পর ছাড়া প্রতিদিন তিনি দরবারের সভায় যোগ দিয়েছেন, তবে মাঝে মাঝে এমন শক্তি ক্ষয় হয় যে, এরপরে সারাদিন বিছানায় শুয়ে কাটান। এই ধরনের মনোবল দেখাবার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেও, এতে একটি উদ্দেশ্য সাধন হয়েছিল। উত্তরাধিকারত্ব নিয়ে বেশিরভাগ গোপন ষড়যন্ত্র দমন করা গেছে। এমনকি যখন একজন সেনাপতি বোকার মতো মন্তব্য করেছিল যে, সে আর তার সৈন্যরা সিদ্ধান্ত নেবে কে সিংহাসনে বসবে, তখন তিনি একথা শোনার পর তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।

এই মুহূর্তে তিনি কিছু সময়ের জন্য ভালো বোধ করছিলেন। কাশি কমে গিয়েছে আর ক্ষুধাও বেড়েছে। আবার সফর শুরু করার কথা তুললেন। এবার উদিপুরী মহল আগের চেয়ে আরো উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বছরের এই সময় সফরের জন্য খুবই উপযুক্ত, দিনের বেলা বেশ ঠাণ্ডা থাকে, বৃষ্টি আর গুমোট আবহাওয়ার আশঙ্কাও তেমন নেই।

দীর্ঘদেহী একজন তরুণী পরিচারিকা তার চিন্তার সূত্র ভেঙ্গে দিয়ে বললো, 'বেগম সাহেবা, সম্রাট আপনাকে তাঁর কাছে যেতে বলেছেন।'

'তিনি কী আবার অসুস্থ হয়েছেন?'

'আমার মনে হয় না বেগম সাহেবা। আমি শুনলাম, আপনাকে ডেকে পাঠাবার ঠিক আগে একজন কাসিদ এসেছে—সম্ভবত এমন কোনো খবর এসেছে যা তিনি আপনাকে জানাতে চান।'

হাতের কাছে সবসময় যে ছোট রূপার আয়নাটি তিনি রাখেন, তাতে একবার চেহারা দেখে ঠিক করে নিলেন, যাতে স্বামীর কাছে তাকে সুন্দর দেখায়। তারপর তিনি তার ঘর থেকে বেরিয়ে পর্দাঘেরা করিডোর দিয়ে আওরঙ্গজেবের কামরার দিকে চললেন। একজন প্রহরী পর্দা সরিয়ে দিতেই তিনি ভেতরে ঢুকলেন। আওরঙ্গজেব একটি চেয়ারে সোজা হয়ে বসে রয়েছেন, বাম হাতে একটা কাগজ ধরে রয়েছেন, চোখে পানি।

'কি হয়েছে জান?'

'আমার বোন গওহারা মার গেছেন। একজন কাসিদ খবরটি এনেছে।'
'শুনে খুব খারাপ লাগছে। আল্লাহ তার বেহশত নসিব করুন।' উদিপুরী সামনে এগিয়ে তার স্বামীর কাঁধ এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। আওরঙ্গজেবকে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠতে দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর সবচেয়ে ছোট বোনকে তিনি অনেক বছর দেখেন নি আর তারা তেমন ঘনিষ্ঠও ছিলেন না। সম্ভবত তাকে জন্ম দিতে গিয়ে তার মা মারা গিয়েছিলেন এই কারণে। তিনি বললেন, 'কাঁদবেন না। আল্লাহ সিদ্ধান্ত নেন কে কখন এই পৃথিবী ছেড়ে যাবে। তিনি একজন ভালো মানুষ ছিলেন—ধার্মিক এবং অনেক দাতব্য কার্যকলাপে জড়িত ছিলেন। তার অবশ্যই বেহেশতে স্থান হবে, আমি নিশ্চিত।'
'আমিও তাই মনে করি। তবে শোকটা শুধু বোন হারাবার জন্য নয়, যদিও এই শোকও গভীর। আমরা দুজন ছিলাম, আমার বাবা আর মায়ের ভালোবাসা থেকে জন্ম নেওয়া চৌদ্দজন সন্তানের মধ্যে সর্বশেষ জীবিত সন্তান। আমার মনে হয় আমার দুঃখ হচ্ছে তাঁদেরকে আর তাদের কিছু সন্তানদের হারিয়ে, যারা অল্পবয়সে মারা গিয়েছিল আর বাদ বাকিদের ভাগ্যে কি হয়েছিল তুমি জান...'
'আপনার একথা ভেবে খুশি হওয়া উচিত যে আপনার বাবা আর মায়ের মাঝে এমন চমৎকার বন্ধন ছিল আর তাঁদের মৃত্যুর পর যা হয়েছিল তা আপনি বদলাতে পারেন না।'
'আমার এই বয়সে আমার মনে মৃতদের কথাই কেবল ভিড় করছে। সেটা সবসময় মন্দ নয়। তবে এই মাসগুলোতে যখন অসুস্থ হয়ে জেগে থাকতাম, তখন অনেক সময় ভাবতাম, পরিবারের মাঝে আমার অনেক কিছু বলার ইচ্ছা ছিল কিংবা করার ইচ্ছা ছিল—কিংবা যা বলা হয়নি কিংবা করা হয়নি—সেসব ভেবে এখন মনে দুঃখ হচ্ছে। অনেক সময় আমি ভাবতাম, গওহারাকে জন্ম দেবার সময় আমার মা যদি মারা না যেতেন, তবে হয়তো তিনি তাঁর ছেলেদের মাঝে এই বিবাদ হতে দিতেন না। তবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বাঘের বাচ্চারা যেমন নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই করে সেরকম এটিও কি অবশ্যসম্ভাবী ছিল?'
'আপনার পরিবারে ভাইয়ে ভাইয়ে প্রায়ই লড়াই করে থাকেন। তৃণভূমিতে আপনার পূর্বপুরুষরা প্রায়ই উচ্চারণ করতেন, "সিংহাসন কিংবা কফিন" একথাটা আপনি প্রায়ই আমাকে বলতেন, মনে আছে?'
'তবে তা দিয়ে এই ধরনের লড়াইয়ে আমার অংশগ্রহণকে সঠিক কিংবা ন্যায্য প্রতিপন্ন করা যায় না। আমি বার বার দুঃস্বপ্ন দেখেছি যে, আমার মা দারা

শিকোর খণ্ডিত মাথা কোলে নিয়ে কাঁদছেন আর আমার বাবা, জাহানারাকে পাশে নিয়ে কারাগারের শিকের ফাঁক দিয়ে দুহাত বাড়িয়ে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছেন। সমস্ত মন আর শরীর কাঁপতে কাঁপতে আমি জেগে উঠি আমার সত্তার একেবারে অন্তঃস্থলে এক বিশাল শূন্যতা নিয়ে...'
'হেকিম আপনাকে যে ওষুধ দিয়েছে সে কারণে এটা হচ্ছে। আমি জানি ওরা আপনাকে ঘুম পাড়াতে অনেক সময় আফিম মিশিয়ে দেয় আর এতে আপনি এ ধরনের অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছেন।'
'হয়তো তাই। তবে একজন মানুষের স্বপ্ন তার চিন্তার ফসল। এই মাসগুলোতে আমি কয়েকবার জীবন ফিরে পেয়েছি। সাম্রাজ্য যেভাবে শাসন করেছি, তাতে আমি মোটেই অনুতপ্ত নই, যদিও মাঝে মাঝে বেশ কঠোর হতে হয়েছিল। আমার প্রিয় বোন জাহানারা বলতেন বিশেষত বিধর্মীদের প্রতি আমার আচরণ কঠোর ছিল। তবে সাম্রাজ্য আর আমার ধর্মবিশ্বাসের জন্য যা সঠিক মনে করেছি তাই করেছি। একমাত্র আল্লাহই এর বিচার করবেন। তবে আমার পরিবারের প্রতি আমার আচরণের ব্যাপারে একই কথা বলতে পারবো না...হ্যাঁ, দারাকে আমি খারেজি বা নব্যতান্ত্রিক সন্দেহ করেছিলাম আর আমার বাবা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্নেহে অন্ধ হয়ে তার কোনো ত্রুটি খুঁজে পান নি। তবে আমি যা করেছিলাম তা কি করা উচিত ছিল? তাদেরকে কি বুঝাতে পারতাম না? মুরাদ আর শাহ সুজা নির্বোধ ছিলেন, তবে তাদের মেরে ফেলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমি কি ভাল কিংবা নৈতিকতার কারণে কাজগুলো করার ভান করছিলাম না? প্রকৃতপক্ষে আমি কি একজন মোনাফেকের মতো আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর ক্ষমতার লোভকে ঢেকে রাখছিলাম না? যা আমাকে ঠেলে নিয়ে চলছিল সুনিপুণ ভাবাবেগ নিয়ে...আমি কি আমার বাবার সিংহাসন দখল করতে উদগ্রীব ছিলাম না?
'কেবল আল্লাহই আপনার মনের ভাবনা পড়তে পারেন।'
'আমার ভয় হয় যখন তিনি আমার মনের কথা পড়বেন। তিনি দেখবেন একের পর এক আমি শুধু চেয়েছি। পরকাল আমার কঠিন শাস্তির আর যন্ত্রণাময় হবে।'
'আপনার ভালোকাজগুলো নিশ্চয়ই আপনার পাপকে ঢেকে দেবে।'
'এটা কেবল আশাই করতে পারি। আর যে কদিন বেঁচে থাকবো তাঁর অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকবো। আমার পরিবারের মৃত সদস্যদের আত্মার শান্তির জন্য তাদের কবরে প্রার্থনা করে যাব। এমনকি দিল্লিতে সম্রাট হুমায়ুনের বিশাল মাজারের চত্বরে দারা শিকোর কবরও জেয়ারত করবো। তবে ঘাড়ের

উপর মৃত্যুর কংকালসার হাতের স্পর্শ অনুভব করে মনে হয়, তা হয়তো যথেষ্ট নয়...সেজন্য আমার দীনতা দেখাবার জন্য ইসলামি টুপি সেলাই করে বিক্রি করবো। আর এই টুপিগুলো বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যাবে তার বেশি যেন আমার মৃত্যুর পর দাফন-কাফনে খরচ করা না হয়। আমি চাই না আমার কবরের উপর বিশাল কোনো সমাধিসৌধ নির্মাণ করা হোক, ঠিক প্রথম সম্রাট বাবরের যেমন কাবুলে খোলা আকাশের নিচে কবর হয়েছে, সেরকম একটি অতিসাধারণ কবর আমার জন্য হবে। এছাড়া আল্লাহর আর তাঁর নির্দেশের প্রতি আমার ভালোবাসা দেখাতে আমি নিজ হাতে পবিত্র কুরআনের নকল লিখতে শুরু করেছি। তারপরও আমার মনে স্বস্তি নেই।'

স্বামীকে সান্ত্বনা দেওয়া কিংবা তার মনে যে অশান্তি চলছে তা থেকে তার মন অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার মতো কোনো কিছু খুঁজে না পেয়ে এবার উদিপুরী মহল নিজেই কাঁদতে শুরু করলেন। তারপর তার একটি কথা মনে পড়তেই তিনি বললেন, 'আপনি পারিবারিক কবরগুলো জেয়ারত করতে চেয়েছিলেন। আর গতকাল বলেছিলেন সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা আরো জোরদার করার জন্য উত্তরে যেতে হবে। তাহলে ফিরতি সফরের প্রস্তুতি নেবার দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন না কেন? এতে যেমন আপনার সাম্রাজ্যের ভালোর জন্য কিছু করতে গিয়ে জাগতিক উদ্দেশ্য সাধন হবে আবার যে জায়গায় আপনি অনেক আগে ছোটবেলায় সবার সাথে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতেন, সেখানে গিয়ে আত্মার শান্তিও পাবেন।'

আওরঙ্গজেব একটি নিষ্প্রাণ হাসি দিলেন আর তাঁর চোখের পানিও থেমে এল। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। একজন মানুষ যতই বৃদ্ধ আর অনাচারী পাপী হোক না কেন, তার কিছু করার থাকে, বিশেষত যদি সে একজন শাসক হয়। আমি নিরাশ হব না—নিরাশ হওয়াটা পাপ। আজই রাজদরবারে ঘোষণা দেব এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা উত্তরের দিকে যাত্রা শুরু করবো।'

অধ্যায় : বাইশ

জেড পাথরের তসবিহ্

মার্চের শেষদিকের বিকেলে আহমেদনগরে প্রচণ্ড গরম পড়েছে। আওরঙ্গজেব কারও সাহায্য না নিয়ে হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা দুটি বেতের লাঠির উপর ভর দিয়ে নগরদুর্গে তাঁর কামরার বেলকনিতে এলেন। গদিওয়ালা চেয়ারে বসতেই রোদ ঠেকাবার জন্য একজন পরিচারক তাঁর মাথার উপর একটি সবুজ রোদনিবারক ছাতা মেলে ধরলো। আরেকজন পরিচারক এক গ্লাস বরফ দেওয়া শরবত পাশে রাখলো আর তৃতীয়জন মসলিন কাপড়ে ঢাকা পিকদানিটি হাতের কাছেই রাখলো। তিন মাস আগে তাঁর বুকের অসুখটি আবার এমন গুরুতর আকার ধারণ করেছিল যে, জ্বরে তিনি কাবু হয়ে পড়েন। তখন তিনি উদিপুরী মহলের অনুরোধে উত্তরের দিকে যাত্রা স্থগিত করতে রাজি হলেন। আবার পরিপূর্ণ সুস্থ হলে রওয়ানা দেওয়া যাবে। তারপর বেশ কিছু দিন বিশ্রাম নিয়ে স্বাস্থ্য কিছুটা ভাল হলেও এখনও তেমন শক্তি পান নি যে, সফরের ধকল পোহাতে পারবেন। ইতোপূর্বে ধূলিধূসরিত পথে পালকি দিয়ে এক মাইল চলার পর তিনি যেরকম কাহিল হয়ে পড়েছিলেন, সেরকম কাহিল যৌবনে ঘোড়ায় চড়ে অন্তত একশো মাইল গেলে হতেন। প্রতিটি ধাক্কা তার দেহমনের উপর এমন প্রভাব ফেলেছিল যে এর ফলে মাথায় যন্ত্রণা হত আর প্রতিটি হাড়ের ব্যথায় নির্ঘুম কাটতো। বৃদ্ধ বয়সের এই হচ্ছে পরিণতি।

দিল্লি এখনও প্রায় আটশো মাইল দূরে রয়েছে আর তার আশঙ্কা হচ্ছিল, তিনি বোধ হয় আর কখনও তার লাল বেলেপাথরের রাজধানী দেখতে পাবেন না। অন্যরাও তাই ভাবছিল। তিন সপ্তাহ আগে একজন কাসিদ খবর নিয়ে এসেছিল যে, বাবার গুরুতর অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁর পাশে থাকার জন্য ছেলে আজম গুজরাট থেকে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা দিয়েছে। আজ বিকেলেই তার পৌঁছার কথা আর সেজন্যই আওরঙ্গজেব তার আগমন দেখার জন্য বেলকনিতে এসেছেন। আবার গতকাল দাক্ষিণাত্য থেকে খবর এসেছে যে, মুয়াজ্জমও তার

অসুস্থ বাবাকে দেখতে আসার পরিকল্পনা করছে। স্বভাবসুলভভাবে সাবধানী মুয়াজ্জম বলেছে সে ধীরে সুস্থে সাথে তার অনেক লোক নিয়ে আসবে। পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, তার দুই ছেলেরই মনে উত্তরাধিকারের ভাবনা চলছে।

একই ভাবনাও কমবখস্ আর তার মা উদিপুরী মহলের মনেও চলছিল। মাত্র গতকালই তিনি ছেলেকে তার সামনে হাজির করে বলেছিলেন যে, বাংলার যে অশান্তি চলছে, তা দমন করার জন্য তিনি বিদেশি বণিকদের কাছে সামরিক সহায়তার বিনিময়ে পূর্ব উপকূলে আরো বন্দর খুলে দেবেন। অতিরিক্ত বাণিজ্যের ফলে রাজস্ব বেড়ে যাবে আর এতে স্থানীয় জনসাধারণের করের বোঝা কিছু লাঘব হবে। কমবখস্ তার প্রস্তাবটি তুলে ধরার পর, তার বাবার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বার বার হোঁচট খেতে লাগলেন। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে সামনে খাড়া করা হয়েছে। তিনি বার বার সমর্থনের জন্য তার মায়ের দিকে তাকাচ্ছিলেন। উদিপুরী মহলের প্রতি আওরঙ্গজেবের আকর্ষণের একটি প্রধান কারণ ছিল তার সরলতা আর রাজনৈতিক ব্যাপারে তার অনাগ্রহ। তার সুন্দর বাহুতে তিনি জাগতিক সমস্যা ভুলে যেতে পারতেন। তিনি জানেন এখনও তিনি তার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেও, কমবখসের বার বার হোঁচট খাওয়া সত্ত্বেও তাকে সেরকম সমর্থন যোগাতে পারেন নি।

আওরঙ্গজেব তাদেরকে জানালেন না যে, পাঁচবছর পূর্বে ইংরেজ রাষ্ট্রদূত নরিস যখন তাকে একই ধরনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন তিনি তার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন। কেননা বণিকরা ইতোমধ্যেই উদ্ধত হয়ে উঠেছিল আর মোগল শাসনকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেছিল, কাজেই তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য আর উৎসাহিত করার প্রয়োজন নেই। এরপর কমবখস্ আর তার মা কিছু উদ্ভট আর অবিশ্বাস্য পরিকল্পনার কথা বলতে শুরু করলেন। কমবখস্ নিজে অবশ্য তার মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে যুদ্ধক্ষেত্রে যে বেশ সফলতা অর্জন করেছে তা জানিয়ে নিজের অবস্থান আরো সুবিধাজনক করতে পারত। সম্প্রতি তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ছোট ছোট কয়েকটি লড়াইয়ে জয় পেয়েছিলেন।

অবশ্য কমবখস্ আর উদিপুরী মহল কেবল কমবখসে্র প্রতি তাঁর আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন, ওরা সিংহাসন জবরদখল করার চেষ্টা করছিলেন না। তবে আজমের বিষয়ে তিনি একই কথা বলতে পারছেন না। তার স্ত্রী জানির মৃত্যুর পর তিনি আবার তার পুরোনো স্বভাবে ফিরে গেছেন। একবার তিনি আর তার অশ্বারোহীসেনারা গুজরাটি বিদ্রোহীদের তাড়া করতে

গিয়ে বিদ্রোহীদের অতর্কিত হামলার মুখে পড়ে যান। কেবল তার ব্যক্তিগত সাহসিকতার কারণে সেবার প্রাণে বেঁচে যান। তারপরও বিনাকারণে তিনি তার ভালো কয়েকজন সেনা হারিয়েছেন। আবার এদিকে মুয়াজ্জম গোয়ালিয়র থেকে মুক্তি পাবার পর বাবার সামনে এলে একেবারে মৌনি হয়ে থাকেন। তার মনোভাব বুঝা কঠিন। মুয়াজ্জম প্রকাশ্যভাবে এমন কোনো কাজ করবেন না যাতে সামান্যতম ভুল হওয়ার আশঙ্কা আছে আর তার বাবা তাকে আবার কারাগারে বন্দী করেন কিংবা এমনকি প্রাণদণ্ড দেবারও আশঙ্কা আছে।

যাই হোক সবার আগে আজমকেই সামলাতে হবে। আর যদি তার ভুল না হয়ে থাকে এখন উত্তর-পশ্চিম দিগন্তে যে ধুলার মেঘ দেখা যাচ্ছে, তা নিশ্চয়ই তার পুত্রের আগমনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাদের সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁর যে সামান্য মানসিক আর শারীরিক শক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে তা তুলে ধরতে হবে।

দুই ঘণ্টা পর আওরঙ্গজেব রাজদরবারের উপযোগী পোশাক আর তৈমুরের বাঘের আংটিটি আঙুলে পরে আহমেদনগর দুর্গের একটি রাজকীয় কামরায় একটি সোনালি গিল্টি করা সিংহাসনে বসলেন। উমর আলি আর পাঁচজন দেহরক্ষী পেছনে নিয়ে ছেলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। শিঙা ফুঁকার সাথে সাথে আজম কামরায় ঢুকে সিংহাসনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাকে বেশ স্বাস্থ্যবান আর তেজোদীপ্ত মনে হচ্ছে। তবে একবছরে তার চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে। চোখের নিচে কালো কালি পড়েছে। তার শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মতো মুখও মাংসল হয়ে উঠেছে আর দাড়িতে সাদা ছিটেফোটা দেখা যাচ্ছে।

'স্বাগতম বেটা। এসো, আমার বুকে এসে আমাকে জড়িয়ে ধর।' প্রাণপণ চেষ্টা করে আওরঙ্গজেব বেতের লাঠি বাদ দিয়ে সিংহাসনের হাতলের উপর ভর দিয়ে কোনোমতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁর ছেলের মোটাসোটা শরীর দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। কয়েক মুহূর্ত পর তাকে ছেড়ে দিয়ে তিনি আবার ধপ করে সিংহাসনে বসে পড়লেন।

'এত দিন পর আপনাকে দেখে আমার খুব ভাল লাগছে বাবা। আর খবরে যা শুনেছি তার চেয়ে আপনাকে অনেক ভালো দেখাচ্ছে।'

'আমি এখনও আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাই। আমার এখনও অনেক পরিকল্পনা পূর্ণ করার আছে।'

আজম বললেন, 'আপনার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য আমাকে সাহায্য করতে দিন। আমি আমার যথাসাধ্য ক্ষমতা দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবো।'

'কয়েকদিন পর সে বিষয়ে কথা বলবো। এত তাড়াহুড়ার কিছু নেই। দীর্ঘ সফরের পর তোমার আর তোমার লোকজনের বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন আছে। তারপর রাজদরবারের পুরোনো বন্ধুদের সাথে মোলাকাত কর।'

সম্রাটের ব্যক্তিগত কামরায় একা বসে উমর আলি আওরঙ্গজেবকে বললো, 'জাঁহাপনা, আপনার কথামতো আমি আপনার ছেলের কয়েকজন সেনা কর্মকর্তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করতে পেরেছি।'

'বল, কি জানতে পারলে?' অনেক বছর আগে উমর আলির বিশ্বস্ততা আর সেইসাথে তার সামরিক কুশলতা আর সাহসীকতার কারণে তিনি তাকে তার প্রধান দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছিলেন। সম্রাটের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রয়োজনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে মনের সূক্ষ্ম বুদ্ধি কিংবা চতুরতার প্রয়োজন নেই কিংবা আকাঙ্ক্ষিতও নয়। যাইহোক এমুহূর্তে আর কেউ নেই যাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন, আর যাকে দিয়ে তিনি জানার চেষ্টা করবেন যে, আজমের আহমেদনগরে আসার পেছনে কারণ কি তার বাবার স্বাস্থ্যের জন্য ব্যাকুলতা না কি আরো কিছু আছে।

'জ্বী, জাহাপনা, আমার প্রথম স্ত্রীর পরিবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত একজন সেনা কর্মকর্তার সাথে আলাপ হয়েছে। সে বললো, আজম খোলাখুলিভাবে উত্তরাধিকার বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। আর আপনার মৃত্যুর পর সিংহাসনে তার অধিকারের দাবি তুলে ধরার কথা বলেছেন। তাছাড়া সে আরো বলেছে, গুজরাট ছেড়ে আসার আগে তিনি যেসব জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাদেরকে সেখানে রেখে এসেছেন, তাদেরকে তৈরি থাকতে বলেছেন, যাতে প্রয়োজন পড়লে তার সমর্থনে তারা যেন অল্পসময়ের ডাকে রওয়ানা দিতে পারে।'

'আচ্ছা তাই নাকি? আর কিছু জানতে পারলে?'

'জ্বী। দাক্ষিণাত্যে আমার সাথে লড়াই করেছিল, তেমন একজন যুদ্ধ ফেরত সেনা-কর্মকর্তা বললো আজম তাকে জানিয়েছেন যে, তার ভাইদের সরিয়ে তাকে ক্ষমতায় বসাবার কাজে সে যদি তাকে সাহায্য করে তবে তিনি তাকে পদোন্নতিসহ জায়গির দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সে বললো শুধু সে একা নয় আরো অনেক কর্মকর্তাকেও এ ধরনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।'

আওরঙ্গজেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুমি খুব ভাল কাজ দেখিয়েছ উমর আলি।'

ছেলের আসার দশদিন পার হওয়ার পর আওরঙ্গজেব পুরো দরবারের সামনে তাকে হাজির হতে বললেন। এই সভায় যোগ দেবার প্রস্তুতি নিতে শক্তির জন্য প্রার্থনা করলেন আর শক্তি সঞ্চয় করতে তিনি যতক্ষণ পারেন ঘুমিয়ে নিলেন, তারপরও প্রচণ্ড কাশি আর সেই সাথে শ্বাসকষ্ট রয়েই গেল।

সকলে তার সিংহাসনের সামনে সমবেত হওয়ার পর তিনি শুরু করলেন, 'আজকের এই সভায় সকলকে আমি ডেকেছি, কারণ আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেব। আমাকে শারীরিক অসুস্থততায় আমাকে দেখার জন্য আমার ছেলে আজম এসে আমার প্রতি যে উদ্বেগ দেখিয়েছে, সে জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।'

তার ঠিক বামপাশে সামনে দাঁড়ান আজম মৃদু হাসলেন।

'আমি যতদূর শুনেছি গুজরাটের সুবেদার হিসেবে সে চমৎকার কাজ দেখিয়েছে, একারণে সে এবং তার অনুগত কর্মকর্তাদের সত্যি গর্বিত হওয়া উচিত। তাদের কর্মকাণ্ড এত চমৎকার হয়েছে যে, আমি আজমকে অন্য এক পদে বদলি করতে চাচ্ছি আর তার বিশ্বস্ত কর্মকর্তারা গুজরাটে থেকেই তাদের কাজ চালিয়ে যাবে।'

'অন্য পদে বাবা? কি পদে?'

'মালওয়ার সুবেদারি। এটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রদেশ আর সেখানে রাজস্ব বাড়ানো, দুর্নীতিরোধ আর ডাকাত দমনের জন্য অনেক কিছু করার আছে।'

'কিন্তু বাবা। আমি তো গুজরাট ফিরে যেতেই পছন্দ করবো...'

'এখানে আসার পর প্রথমে তুমি আমাকে বলেছিলে আমার অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করার জন্য তুমি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবে—আমার মনে হয় তাই বলেছিলে তুমি—এখন সেটা কর।'

'মালওয়ার যদি যেতেই হয়, তবে আমার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন কর্মকর্তাকে সাথে নিতে চাই।'

আওরঙ্গজেব ঘুরে আজমের দিকে তাকলেন। আর তার ছেলে তাঁর বাবার চোখে সেই পুরোনো আগুন দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, 'আমি যতদিন শাসন করছি, ওরা আমার অধীনস্ত কর্মকর্তা, তোমার নয়। আর ওরা কোথায় যাবে না যাবে সে সিদ্ধান্ত আমি নেব তুমি নয়। আমি তোমাকে বলেছি গুজরাটে যে ভালো কাজ হয়েছে তা চালিয়ে যেতে ওরা ওখানেই থাকবে। এখন যাও কয়েকদিনের মধ্যে তোমার নতুন প্রদেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি

নাও।' এমন সময় প্রচণ্ড কাশির দমকে সম্রাটের কথা একটু থেমে গেল, তারপর কাশি সামলে তিনি আবার বললেন, 'আমার কথামতো নতুন জায়গায় দায়িত্ব নেবার জন্য চলে গিয়ে তুমি প্রমাণ করবে যে সব সময়ের মতো তুমি আমার প্রতি বিশ্বস্ত আর অনুগত।'
আজম মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করলেন, কোনো কথা বললেন না। তবে তার মুখের ভাব দেখে আওরঙ্গজেব বুঝতে পারলেন তিনি যে বার্তা তার ছেলেকে দিয়েছেন, তা তিনি বুঝতে পেরেছেন।
নিজের কামরায় ফেরার পর আওরঙ্গজেব উদিপুরী মহলের বাহুতে প্রায় ঢলে পড়লেন। তিনি তাঁকে ধরে বিছানায় নিয়ে গেলেন। আওরঙ্গজেব মন্তব্য করলেন, 'আল্লাহর শুকরিয়া যে, আমি তাদের দেখিয়েছি, বুড়ো বাঘ এখনও গর্জন করতে পারে।'

এক সপ্তাহ আগে রাজদরবারের সভায় আওরঙ্গজেব যে শক্তি দেখিয়েছিলেন, তারপর মাত্র ধীরে ধীরে সেই ধকল কাটিয়ে উঠছিলেন। উদিপুরী মহল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'যদিও আজম চলে গেছে—তারপরও আমি আমাদের ছেলের জন্য দুশ্চিন্তায় আছি। আপনি কি কমবখস্‌এর জন্য আর কিছু করতে পারেন না?'
আওরঙ্গজেব একটু উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আমি আজমের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দমিয়ে দিয়েছি আর মুয়াজ্জমকে কঠোর ভাষায় লিখে বলেছি তার সেনাসামন্ত নিয়ে দাক্ষিণাত্যে থাকতে? আর কী চাও তুমি?' একটু থেমে তারপর আবার বললেন, 'কমবখস্ নিজেকে আমার সামনে তুলে ধরার জন্য তোমার সাহায্য নিয়ে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করছে। যখন আমি থাকবো না তখন তার নিজেকে আরো শক্তিশালী দেখাতে হবে।'
'সে এর কিছুই জানে না, আমি হলফ করে বলছি। তাকে বেশি ক্ষমতা দেওয়ার জন্য নয় আপনাকে আমি অনুরোধ করছি না, আমি শুধু চাই তাকে আপনি তার ভাইদের কাছ থেকে দূর কোনো প্রদেশে আপনার বিশ্বস্ত কিছু কর্মকর্তা সাথে দিয়ে পাঠান, যাতে ওরা তাকে নিরাপত্তা দিতে পারে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজদরবার আর এর চারপাশে যে ষড়যন্ত্র ঘুরপাক খাচ্ছে, তা থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা। আর আপনার যখন মৃত্যু হবে—প্রার্থনা করি তা যেন অনেক দেরিতে হয়, তখন এই ষড়যন্ত্র দ্বিগুণ হবে। আপনাদের দুজনের মৃত্যু আমার সহ্য হবে না। আমি চাই সে যেন এখনি নিরাপদ কোনো

জায়গায় চলে যায়।' কথা শেষ করেই উদিপুরী মহল ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

তিনি যদি সত্যিই তার ছেলেকে দূর কোনো প্রদেশে পাঠাতে চান, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই উচ্চাকাঙ্ক্ষার বদলে তার জীবন নিয়ে উদ্বিগ্ন। তার বড় সৎ-ভাইদের তুলনায় কমবখসের খুব একটা সমর্থক ছিল না। সম্ভবত এটা তার মায়ের সাধারণ বংশ ধারার কারণে আবার সেই সাথে ভাইদের তুলনায় তার বয়সও কম। যদিও এখন তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। এছাড়া তার যুদ্ধাভিযানের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল না। সে প্রায়ই উদিপুরী মহলের ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করে রাজদরবারেই থাকতে রাজি হত।

'ঠিক আছে। আমি তার জন্য একটা প্রদেশ খুঁজে বের করবো আর সাথে বিশ্বস্ত লোক দিয়ে তাকে সেখানে পাঠাব।'

আওরঙ্গজেব যে কথাটি প্রকাশ করেন নি, তা হল উত্তরাধিকারের বিষয়টি নিয়ে তিনি বেশ কয়েক মাস যাবত দুশ্চিন্তায় আছেন। বাবা আর ভাইদের সাথে তাঁর আচরণের কারণে, যে সন্দেহ আর অপরাধবোধ দিন-রাত তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেই ভার মন থেকে নামাতে পারছিলেন না। আর সেই সাথে উদ্বিগ্ন ছিলেন সিংহাসনের জন্য তাঁর ছেলেদের পরস্পরের মাঝে সংঘর্ষ কিভাবে এড়ান যায়, যা তিনি নিজেও তাঁর ভাইদের সাথে করেছিলেন। ...কিভাবে আবার সেই 'সিংহাসন কিংবা কফিন'—এই প্রবাদটি এড়ানো যায়। তিনি দীর্ঘদিন গভীরভাবে চিন্তা করে দুনিয়ার সামনে একজন উত্তরাধিকার ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ছেলেদের উপর তাঁর তেমন আস্থা ছিল না, যে কে এতে সফল হবে। তিনি সবসময় ছেলেদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন, কাউকে বিশেষ প্রিয় হিসেবে মনে করেন নি। মুয়াজ্জম আর কম বখস্, উভয়কেই কারাদণ্ড দিয়েছিলেন—একজনকে রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা অপরজনকে নৈতিক স্খলনের কারণে। ওরা তিনজনই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে তাঁকে হতাশ করেছে। এছাড়া শাহজাহান দারা শিকোকে তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার মনোনীত করলেও ওদের কাউকেই তাদের নিজ উচ্চাকাঙ্ক্ষা রোধ করতে পারে নি।

একমাত্র যে সমাধানটি তাঁর মনে জেগেছিল সেকথাটি ভাবলে মনে হয় এই পরিকল্পনাটি হয়তো তাঁর যৌবনে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। তিনি ঘোষণা করবেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর পুরো সাম্রাজ্য তাঁর ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। এতে হয়তো রক্তপাত বন্ধ হবে আর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মাঝে দৃঢ়ভাবে শাসন নিশ্চিত করার সুবিধা পাওয়া যাবে। তিনি যেভাবে সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়িয়েছিলেন, তাতে পুরো সাম্রাজ্য শাসন করা তাঁর যে

কোনো একজন ছেলের ক্ষমতার বাইরে। তিনি নিজে তাঁর সমস্ত কুশলতা দিয়ে এটি অর্জন করেছিলেন। তবে তাঁর মনে ভয় হচ্ছে, তারপরও তাঁর ছেলেরা একটি অবিভক্ত সিংহাসনের জন্য লড়াই করবে।

যাই হোক, কমবখস্ চলে যাওয়ার পর তিনি ছেলেদেরকে চিঠি লিখে উত্তরাধিকারত্ব তিনভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন। তারপর খবরটি তাদেরকে হজম করার সময় দিয়ে রাজদরবারে আর প্রজাদের সামনে ঘোষণা করবেন।

আওরঙ্গজেব উদিপুরী মহলকে বললেন, 'আহমদনগরে এসে থেমেছি প্রায় একবছর হল। আমি এখন এই সত্যিটা স্বীকার করছি যে, এখানেই আমার মৃত্যু হবে।' উদিপুরী মহল তাঁর কপাল থেকে ঘাম মুছে দিচ্ছিলেন। জ্বরের প্রকোপটা এখন একটু কমে এসেছে, তবে আহমদনগরে আসার পর আরো কয়েকবার জ্বর কমে আবার বেড়েছিল আর মনে হয় এবারও শেষও নয়। সারা বছরই তার স্বাস্থ্যের অবস্থা উঠানামা করেছে। এখন প্রচণ্ড গরমের পর মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হয়ে আবহাওয়াও ঠাণ্ডা হচ্ছে, কিন্তু তিনি জানেন, তিনি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়েছেন আর ঘন ঘন জ্বর হচ্ছে। আর ঘন ঘন কাশিটা থামছেই না। ইসলামিক টুপি সেলাই করা আর পবিত্র কিতাব হাতে লিখে নকল করার কাজে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন।

উদিপুরী উত্তর দিলেন, 'আপনার কথা হয়তো ঠিক। তবে এখানে আপনি আরাম পাচ্ছেন। কাসিদরা দ্রুত পুরো সাম্রাজ্যের খবর এনে দিচ্ছে। খামাকা কেন কষ্টকর সফরের কথা ভেবে মনে কষ্ট পাচ্ছেন?'

'কারণ আমি অনুভব করছি আমার কিছু অসমাপ্ত পারিবারিক কাজ রয়ে গেছে। একটি বিরাট অপরাধের বোঝা কখনও প্রশমিত করতে পারবো না। বরং এই ভারী বোঝা নিয়ে আর দোষী সাব্যস্ত হয়ে আমি এখানেই মরবো।' তারপর তিনি মাথা এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন আর সাথে সাথে আবার ঘামতে শুরু করলেন। কয়েকমিনিট পর আবার বললেন, 'যখনই আমি একটু ভাল বোধ করি তখন আমি ইতোপূর্বেকার পাঁচজন সম্রাটের ইতিহাস পড়ি। ওরা সবাই তাঁদের পরিবারের সাথে লড়াই করেছেন, শেষ তিনজন তাদের ছেলেদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। আমার বাবাসহ শেষ দুইজনও পরিবারের সাথে লড়াই করেছেন। আর আমার রাজত্বে দুই ছেলে আমার সাথে লড়াই করেছে। আমাদের রাজবংশ বিদেশি শত্রুদের পরাজিত করেছে আর সাম্রাজ্যের সীমানা

বাড়িয়েছে কিন্তু কখনও নিজেদের মাঝে শান্তি আসেনি। কেন আমরা আর ...কেন আমি কখনও ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেই নি? আমি বিশ্বাস করেছিলাম, ধর্মীয় সততা না থাকাটাই দোষী হওয়ার জন্য যথেষ্ট আর চেষ্টা করেছি আমার সন্তানদেরকে কঠোর ধর্মীয় বিশ্বাসের সীমার মাঝে আবদ্ধ রাখতে আর চেয়েছিলাম বাবা হিসেবে ওরা আমাকে মান্য করুক যা আমাদের ধর্মমতে বলা হয়েছে, কিন্তু কোনো ফল হল না। এখন মৃত্যু যখন কাছে এগিয়ে এসেছে, তখন আমি আমার ছেলেদেরকে একসাথে আমার পাশে আনতে পারছি না, এই ভয়ে যে ওরা আমার সিংহাসন নিয়ে লড়াই করবে। আর যদি আসেও, সেটা আমাকে ভালোবাসে বলে নয়, আসবে আমার সিংহাসনের লোভে।'

'এটা কমবখস্‌রের বেলায় সত্যি নয়।'

'আমি শুধু আশা করতে পারি যেন, একথাটা সত্যি হয়। তবে সে অন্য দুজনের মতোই তার প্রদেশের সবচেয়ে কাছের সীমান্তে অপেক্ষা করছে, যেন খবর পাওয়ার এক মুহূর্তের মধ্যে রওয়ানা দেবার জন্য তৈরি থাকে।'

'উত্তরাধিকারত্ব তিনজনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ায় সে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, এ ব্যাপারে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি—সে কেবল তার ভাইদের উদ্দেশ্যকে ভয় পায়।'

'এধরনের ভীতির ভান করা অনেক সময় উচ্চাকাঙ্ক্ষার খোলস প্রমাণিত হয়েছে। তবে আমার বংশ রক্ষা করার জন্য আমি আর কী করতে পারি? প্রতিদিন আমার শক্তি কমে যাচ্ছে আর বৃদ্ধ বয়সের ক্লান্তি আমার মন আর দেহকে আরো অবসাদ এনে দিচ্ছে। স্মরণশক্তি মাঝে মাঝে এমনভাবে কমে যায় যে, গতকাল কি হয়েছে তা মনে করতে কষ্ট হচ্ছে। আর যৌবনের ঘটনাগুলো আরো পরিষ্কার মনে পড়ে। তুমি আমার এত যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও আমি একাকীত্ব অনুভব করি...অপরাধ বোধের বোঝা নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে একা হয়ে যাই।' আবার আওরঙ্গজেব মাথা এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন।

'শান্ত হোন, জান। আপনার স্মৃতি হয়তো সামান্য কমেছে, তবে এটা অধিকাংশ মানুষের মতো এখনও তীক্ষ্ণ আছে। অন্তত ছেলেদেরকে উপদেশ দিয়েও তো আপনি চিঠি লিখতে পারেন, তাই না? ওদের সামনে যে বিপদ আপনি দেখতে পাচ্ছেন, তা এড়াতে আপনার অভিজ্ঞতা থেকে ওদেরকে আপনি সাহায্য করতে পারেন। সর্বোচ্চ ক্ষমতার পুরস্কারের সাথে সাথে কি বোঝা আর দায়িত্ব কর্তব্য চলে আসে সে ব্যাপারে ওদেরকে পথ দেখান।'

আওরঙ্গজেব একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তা পারি...তবে ওরা এতে কতটুকু মনোযোগ দেবে? আর ওদের জায়গায় হলে আমিই বা ততে কি মনোযোগ দিতাম?'

উদিপুরী মহলের সাথে আলোচনার পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সেই সন্ধ্যায় চিঠিগুলো লিখলেন। তারপর চিঠিগুলো একবার পড়লেন, তিন ছেলেকে আলাদা আলাদা করে লেখা চিঠি। প্রতিটি চিঠিতে তিনি তাদেরকে জোর দিয়ে বলেছেন যে, সাম্রাজ্য বিভক্ত করার তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা যেন ওরা মেনে নেয়। আর তারা যেন ভালোভাবে এবং বিশ্বস্ততার সাথে শাসন করে এবং নিশ্চিত করে যেন, তাদের প্রজারা তাদের মতো ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলে। চাপা স্বভাবের মুয়াজ্জমকে আর কিছু বললেন না, তবে অন্য দুজনকে লিখার সময় তাঁর ইচ্ছে হল মন খুলে তাদেরকে কিছু বলতে, যা এর আগে জীবনে কখনও করেন নি। আর ওরা সামনে থাকলে তো কখনও না। তাঁর মন থেকে ভয় আর অনুতাপ হুড়মুড় করে বের হয়ে যেতেই তিনি এক ধরনের মুক্তি অনুভব করলেন। তিনি আজমকে সতর্ক করে বললেন, রাষ্ট্রনায়োকচিত আচরণ করতে আর কিছু করার আগে একটু ভেবে নিতে। বিশেষত শত্রুর মন বুঝার চেষ্টা করতে হবে—তাঁর মনে পড়লো কথাটি তিনি অনেক বছর আগে আজমের ভাই আকবরকে বলেছিলেন। তিনি লিখলেন

আমি একা এসেছি আর একজন আগন্তুকের মতো চলে যাচ্ছি। যে মুহূর্তে ক্ষমতা পেয়েছি তখন থেকে দুঃখই পেয়েছি। যে জীবন এত মূল্যবান তা আমি অপব্যয় করেছি। জীবন ক্ষণস্থায়ী। অতীত চলে গেছে আর ভবিষত্যের কোনো আশা নেই। আমি ভয় পাচ্ছি আমার পাপ মোচন হবে কি-না। আমি শাস্তির ভয় পাচ্ছি। আমি আল্লাহর রহমত আর করুণায় বিশ্বাস করি তবে আমার ভয় হয় আমি যা করেছি তার জন্য।

কমবখস্‌কে লিখতে অনেক বেশি সময় লেগেছিল। কাশির কারণে মাঝে মাঝে থামতে হয়েছে, আবার শক্তি সঞ্চয় করার জন্যও থামতে হয়েছে।

সবসময় নিজের মনোভাব গোপন রাখবে। ভালো উপদেষ্টা বেছে নেবে, যে তোমার সক্ষমতায়, যেখানে তুমি দুর্বল সেখানে ঘাটতি পূরণ করবে। তবে

তাদেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করো না। মনে রেখ বিশ্বাসঘাতক সবসময় ছায়ার মধ্যে রয়েছে। কখনও নিজের ছেলেদের বিশ্বাস করো না, কিংবা খুব বেশি ঘনিষ্ঠ হইও না। কেননা আমার বাবা যদি দারা শিকোকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় না দিতেন, তবে তার সমস্ত বিষয় এরকম ভেস্তে যেত না। আমার জানের জান, আমি একা চলে যাচ্ছি। তোমার অসহায়তার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। আমি যত পাপ করেছি, যত ভুল করেছি, তার পরিণতি নিজে বহন করছি। আমি এই পৃথিবীতে কিছুই নিয়ে আসি নি। আর এখন পাপের এই প্রকাণ্ড কাফেলা নিয়ে যাচ্ছি। যেদিকে তাকাই কেবল সেদিকে আল্লাহকে দেখছি। আমি ভয়ঙ্কর পাপ করেছি, জানি না কি শাস্তি আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

সবশেষে আমি তোমার মা উদিপুরী মহলকে তোমার হাওলায় তুলে দিয়ে যাচ্ছি। আমার জীবনের শেষ বছরগুলোতে তিনি আমার জন্য এক বিশাল সান্ত্বনা হয়েছিলেন। তাঁকে ভালোবেসে খুব ভালোভাবে তাঁর যত্ন নিও।

বেহারারা আওরঙ্গজেবকে পালকিতে করে মসজিদ থেকে তাঁকে তাঁর ঘরের দিকে ফিরে নিয়ে চললো। শুষ্ক বাগান থেকে জোর হাওয়ায় ধুলোর ছোট ছোট পেঁচালো আকৃতি উপরের দিকে উড়িয়ে নিল। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের শুক্রবার জুম্মার নামাজ পড়তে পেরে তিনি খুব খুশি হলেন। সবসময় যেরকম হতো আজও সেরকম শান্তি আর নৈতিক অনুপ্রেরণা পেলেন। ঘরের দুই-তিন গজ আগে থাকতেই তিনি বেহারাদের বললেন, 'থাম! বাকি কয়েক পা আমি হেঁটেই যাব।'

দুজন কোরচি তাঁকে দাঁড়াতে সাহায্য করে তাঁর হাতে দুটো বেতের লাঠি দিল। ধীরে ধীরে তবে দৃঢ়তার সাথে হেঁটে তিনি ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। প্রখর সূর্যের আলো থেকে কামরার আধো অন্ধকার আলোয় তার দুর্বল চোখ সয়ে নিতে এক মুহূর্ত থামলেন, তারপর হাতের ইশরায় দুই কোরচি আর অন্যান্য পরিচারককে বিদায় করলেন। 'তোমরা যাও। আমি এখন বিশ্রাম নেব।'

ওরা চলে যাওয়ার পর তিনি বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন। বিছানার কাছে পৌঁছতেই অনুভব করলেন বুকে চাপ চাপ লাগছে আর নিশ্বাস নিতে গিয়ে হাঁপাতে শুরু করলেন। বুঝলেন, তিনি মরতে চলেছেন...লাঠিগুলো ফেলে হাঁটুগেড়ে বিছানার পাশে বসে পড়লেন। সবসময় তার কোমরে গুঁজে রাখা জেড পাথরের তসবিহটা আঁকড়ে ধরলেন। তিনি এক শুক্রবারেই মারা যাচ্ছেন,

যা সব সময় কামনা আর প্রার্থনা করতেন...শীঘ্রই তিনি জানতে পারবেন তাঁর জীবন সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর জন্য কি রায় দিয়েছেন। বেশ কিছুসময় তিনি তাঁর শুকনো ঠোঁটে দোয়া পড়তে থাকলেন আর সেই সাথে লম্বা প্রায় হাড়সর্বস্ব আঙুল দিয়ে তসবিহ গুণে চললেন। একটু পরই তসবিহ থেমে গেল...ষষ্ঠ মোগল সম্রাটের মৃত্যু হল।

উপসংহার

দিল্লির দরবার প্রাঙ্গণের সামনে একটি সুন্দর বাড়ির সমতল ছাদে উমর আলি বসে রয়েছে। একটি বড় ছাতা তাকে মধ্য সেপ্টেম্বরের রোদ থেকে ছায়া দিচ্ছে। আড়াই বছর আগে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সাথে সাথে তার রাজকীয় দেহরক্ষীদলের প্রধানের পদটিরও অবসান হয়েছিল। সাথে সাথে উমর আলি দিল্লি ফিরে এসে এই বাড়িটিতে তার একমাত্র মেয়ে আর মেয়ের জামাই এবং তাদের একমাত্র কন্যাসন্তান রেহানাকে নিয়ে থাকতে শুরু করে। উমর আলির স্ত্রী অনেক দিন হল মারা গেছে। তার মেয়ের জামাই একজন হেকিম। ছোট্ট রেহানা এখন তার হিন্দু প্রতিবেশীর পাঁচবছরের ছেলে রবির সাথে খেলা করছে।

আহমদনগর থেকে ফেরার কিছুদিন পর একের পর এক ঘটনার খবর তার কানে আসতে থাকে—যা মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না আর বেশির ভাগই ছিল দুঃখজনক। সম্রাটের ছেলেরা সাম্রাজ্য বিভক্ত করা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। শাহজাদা আজম আহমদনগরে রাজদরবারে ফিরে এসে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন। এর তিনমাসের মধ্যে শাহজাদা মুয়াজ্জম, আজমকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাকে হত্যা করেন। আর সেই সাথে তিনিও বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন। প্রায় একই সময়ে উদিপুরী মহল মারা যান—কথিত আছে আওরঙ্গজেবকে হারিয়ে তাঁর শোকে তিনি মারা গিয়েছিলেন।

তার ছেলে কমবখস্ অবশ্য নিজেকে একজন শক্তিশালী এবং দৃঢ়চেতা মানুষ হিসেবে প্রমাণিত করেন, যা কেউ ভাবতে পারে নি। একজন কুশলী সেনাপতির মতো তিনি দুইবছর ধরে শাহজাদা মুয়াজ্জম আর তার সেনাবাহিনীর সাথে লড়াই করেন। যখন সৎভাইরা সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন, তখন সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। মারাঠি আর শিখরা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে আর 'ধূর্ত ফেরিওয়ালা' হিসেবে যাদেরকে আওরঙ্গজেব একদিন বাতিল করেছিলেন, সেই ইংরেজরা সাম্রাজ্যের এই দুর্যোগের সময় যতটা পারে সুবিধা আদায় করে নিল।

এখন থেকে ঠিক চার মাস আগে হায়দরাবাদের কাছে শাহজাদা মুয়াজ্জম অথবা সম্রাট বাহাদুর শাহ, যাকে এখন থেকে এ নামে ডাকতে হবে, শেষপর্যন্ত কমবখস্‌কে পরাজিত করলেন। যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়ে পরদিন তিনি মারা যান। 'সিংহাসন কিংবা কফিন'-এর লড়াই, মোগল শাহজাদারা যেভাবে সিংহাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন, যে কথা সম্রাট আওরঙ্গজেব বলতেন। কথাটি আবার সঠিক প্রমাণিত হল।

আর কয়েকমিনিটের মধ্যে নতুন সম্রাট—আওরঙ্গজেবের একমাত্র জীবিত পুত্র—দরবার প্রাঙ্গণে এসে একটি মঞ্চের উপর থেকে প্রজাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। উমর আলি তার বাড়ির ছাদের উপর থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। হ্যাঁ ঐ যে বর্শার ডগায় সবুজ পতাকা পত পত করে উড়িয়ে সম্রাটের কুচকাওয়াজের প্রথম অশ্বারোহী দলটি মাঠে ঢুকছে। এর পেছনে ঘোড়ায় চড়ে আসছে নাকাড়া আর শিঙ্গাবাদক আর তারপর এক রাজকীয় বিশাল হাতির চারপাশ ঘিরে আরো অশ্বারোহী আসছে। হাতির পিঠে একটি রত্নখচিত খোলা হাওদা দেখা যাচ্ছে। হাতিটি দেখে বজ্রদেব মনে হচ্ছে, কিন্তু সে নিশ্চয়ই অনেক বুড়ো হয়ে গেছে? সুন্দর আলখাল্লা আর লম্বা পাখির লেজবিশিষ্ট পাগড়ি পরে মুয়াজ্জম হাওদায় বসে রয়েছেন। তার পেছনে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে নিশ্চয়ই তার প্রধান দেহরক্ষী। এই জায়গায়টি ছিল উমর আলির, যখন সে প্রায়ই আওরঙ্গজেবের সাথে হাতির পিঠে চড়তো।

একটু পরই শিঙ্গা ফুঁকতেই বাহাদুর শাহ একটু আড়ষ্ট হয়ে হাতির পিঠ থেকে নামলেন। পঁয়ষট্টি বছর বয়সী সম্রাট উমর আলির চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের ছোট। এখন তিনি মঞ্চের দিকে যাচ্ছেন। ভাষণে তিনি কী বলবেন? তার শাসনে সাম্রাজ্য কী আবার সমৃদ্ধি লাভ করবে? তবে তার নাতনি রেহানা আর তার ছোট্ট খেলার সাথী রবির কাছে এসবের মূল্য কী?

ঐতিহাসিক টীকা

এম্পায়ার অফ দি মোগল সিরিজের আগের পাঁচটি পুস্তকের মতো এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। অর্থাৎ, কাহিনীটি ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে রচিত হলেও এর চরিত্রগুলোর কথোপকথন, চিন্তাচেতনা এবং প্রত্যক্ষ কার্যকলাপ কল্পনাপ্রসূত। যখন আমি একটি চরিত্রের মুখে কোনো শব্দ বসাই, তখন তা এমনভাবে সাজাই যেন, চরিত্রটি সে সময়ে কি ভাবতে অথবা কি বলতে পারতো, তা এতে প্রতিফলিত হয়। অনেক সময় কথাগুলো আমার কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত হতো, অর্থাৎ আমি যে ইউটোপিয়ান কিংবা স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করতাম, যেখানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করবে এবং একে অপরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সম্মান করবে, তার বিপরীত। বিশেষত আওরঙ্গজেবের মতো একজন বিতর্কিত চরিত্রের ব্যাপারে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা, যথেষ্ট আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে।

আওরঙ্গজেবের জীবন সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্যের উৎস রয়েছে। তার পূর্বপুরুষদের মতো তিনিও তার শাসনামলের প্রতিদিনকার ঘটনাপঞ্জি লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। এর নাম আলমগীর-নামা আর এটি রচনা করেছিলেন মোহাম্মদ কাজিম। তবে দশ বছর শাসন করার পর আওরঙ্গজেব তাকে এটি রচনা করতে নিষেধ করলেন। কেননা তিনি মনে করতেন ঘটনাপঞ্জি রচনা এক ধরনের দাম্ভিকতা। সমসাময়িক অন্যান্য ঘটনাপঞ্জির মধ্যে ছিল মুফাজ্জল খান রচিত তারিখ-ই-মুফাজ্জলি, এটা রচিত হয়েছিল পৃথিবীর সূচনা থেকে আওরঙ্গজেবের শাসনের দশ বছর পর্যন্ত; রাই ভর মলের লুব আল-তাওয়ারিখ-ই-হিন্দ, আরেকটি ছিল দারা শিকোর একজন সভাসদ রচিত হিন্দুস্তানের সকল শাসকের ইতিহাস। মিরাত-ই-আলম রচনা করেছিলেন বখতিয়ার খান নামে আওরঙ্গজেবের অধীনে চাকরিরত একজন খোজা; তবে অনেকে মনে করেন এর রচয়িতা হচ্ছেন তার বন্ধু মোহাম্মদ বাকা। ঈশ্বরদাস নগর নামে আওরঙ্গজেবের একজন সভাসদ রচনা করেছিলেন, ফুতুহাত-ই- আলমগিরি। মুনতাখাব আল-লুবাব নামে তৈমুর আর তার বংশধরদের একটি ইতিহাস

গোপনে রচনা করেছিলেন কাফি খান নামে আওরঙ্গজেবের একজন সভাসদ। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর কিছুকাল পর তিনি এটি সম্পূর্ণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের পর মুয়াজ্জমের নির্দেশে আওরঙ্গজেবের দরবারের একজন লিপিকার মাসিরি-ই-আলমগিরি রচনা করেন। এছাড়া কোনো এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি আখাম-ই-আলমগিরি নামে আওরঙ্গজেবকে নিয়ে কিছু কাল্পনিক কাহিনি রচনা করে।

ফারসি ভাষায় লেখা আওরঙ্গজেবের কিছু চিঠি সংরক্ষিত এবং অনূদিত হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের শাসনামলে কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটক ভারতীয় উপমহাদেশ সফর করেছিলেন। তারা মোগল সাম্রাজ্য সম্পর্কে তাদের ধারণার কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এদের মধ্যে নিকোলো মানুসি স্টোরিয়া দ্য মোগল নামে একটি রঙিন খোশগল্পের মতো কাহিনি রচনা করেছিলেন। মানুসি ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে তার মৃত্যু ১৭১৭ সালে পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। এছাড়া ফ্রান্সিস বারনিয়ার নামে একজন ফরাসিও রচনা করেন, ট্রাভেলস ইন দ্য মোগল এম্পায়ার এবং জিন-ব্যাপিস্ট রচনা করেন ট্রাভেলস ইন ইন্ডিয়া। ১৭ শতকের শেষ দিকে মোগল সাম্রাজ্যে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যর উইলিয়াম নরিস বেশকিছু অপ্রকাশিত দিনলিপি লেখে যান, যার কিছু অংশ নিয়ে এইচ দাস রচনা করেন দি নরিস এম্ব্যাসি টু আওরঙ্গজেব।

আমার নিজের গবেষণা ছাড়াও আমি আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিশিষ্ট ভারতীয় ঐতিহাসিক আব্রাহাম এরালির দি মোগল থ্রোন থেকে প্রচুর বিষয়বস্তু ব্যবহার করেছি আর সেই সাথে ব্যামবার গ্যাসকোইনের দি গ্রেট মোগল, ওয়াল্ডেমার হ্যানসেনের দি পিকক থ্রোন এবং কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ার সাহায্য নিয়েছি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে অধিকাংশ চরিত্র ইতিহাস থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে বেশ কয়েকজন, যেমন—আমবারের জগিন্দর সিং, ওয়াজিম খান, উমর আলি, ইউসুফ খান, কামরান বেগ, রশিদ খান এবং বিবিধ গভর্নর ও অতি সাধারণ কিছু চরিত্র মূলত জনগণের অংশ কিংবা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। একই কথা নিকোলাস ব্যালেনটাইন আর আমবারের অশোক সিং সম্পর্কেও বলা যায়। এদেরও সম্পর্কে এই পুস্তকে খুব সামান্য উল্লেখ করা হলেও এই সিরিজের অন্যান্য পুস্তকে এরা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিলেন।

আওরঙ্গজেব একজন গোঁড়া সুন্নি মুসলমান ছিলেন। অবশ্য তাঁর ধর্মীয় কর্মসূচিগুলো বিশেষভাবে বিতর্কিত ছিল। কোনো কোনো লেখক যুক্তি দেখিয়েছেন যে, হিন্দু ধর্ম এবং মন্দির বিষয়ে আওরঙ্গজেবের কর্মসূচিগুলো

মূলত রাজনৈতিক বাস্তবধর্মিতা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং এগুলো পরিকল্পনা করা হয়েছিল মুখ্যত রাজনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতা জাহির করার উদ্দেশ্যেই। তারা বলেন যে, তাঁর জীবনের অন্য সময়ে তিনি হিন্দু মন্দিরের জন্য জমি প্রদান করেছিলেন। রাজপুতদের বিরুদ্ধে তিনি অনেক পদক্ষেপ নেন নি। তাদের বিরুদ্ধে তিনি যেসব অভিযান করেছিলেন, সেগুলো ধর্মীয় কারণে নয়, সম্ভবত তাদের সময়গত ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছে থেকেই করেছিলেন। এটি অবশ্যই সত্যি যে [দ্রষ্টব্য এরালি, পৃ. ৪০১] বিখ্যাত এবং ধৈর্যশীল সম্রাট আকবরের তুলনায় আওরঙ্গজেব অনেক বেশি হিন্দু কর্মকর্তাকে চাকরি দিয়েছিলেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল কেন তিনি এত শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়কে নিয়োগ দিয়েছেন, এর উত্তরে তিনি যথেষ্ট সহনশীলতা দেখিয়ে বলেছিলেন, 'জাগতিক বিষয়ের সাথে ধর্মের কী সম্পর্ক?...আপনার কাছে আপনার ধর্ম আর আমার কাছে আমার ধর্ম। দপ্তর থেকে দক্ষ কর্মকর্তা সরানো বিজ্ঞজনেরা অনুমোদন করেন না।'

এই যুক্তির বিপরীতে অনেক ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবের অনেক পক্ষপাতমূলক রাজ্যশাসন প্রণালির কথা তুলে ধরেন। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল তিনি বিধর্মীদের উপর জিজিয়া কর পুনরায় চালু করেন যা, সম্রাট আকবর মওকুফ করেছিলেন। তিনি নতুন এবং সম্প্রতি পুনর্নির্মিত হিন্দু মন্দিরগুলো ধ্বংস করার আদেশ দেন। তিনি হোলি এবং দিওয়ালির মতো উৎসব নিষিদ্ধ করেন এবং এরালির বর্ণনা অনুযায়ী—অনুমতি ছাড়া হিন্দুদের পালকি ও আরবি ঘোড়া ব্যবহারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসে একজন খাঁটি মানুষ হিসেবে আমি আওরঙ্গজেবের চরিত্র চিত্রণ করেছি এবং বিশেষত তাঁর ধর্মীয় কর্মসূচির মধ্যে 'প্রকৃত ঘটনা' সম্পর্কে এরালির রচনা অনুসরণ করেছি। প্রকৃত সত্য কি তা ইতিহাসে উপলব্ধি করা অবশ্যই কঠিন, বিশেষত যখন বিতর্কিত চরিত্রের মূল্যায়ন করা হয়—এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় রিচার্ড। আমার মনে হয় এটিও মনে রাখা উচিত যে, যে কালে আওরঙ্গজেব রাজত্ব করেছিলেন—সেই ১৭ শতকের ইউরোপে খ্রিস্ট ধর্মের প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায় পরস্পরের বিরুদ্ধে নৃশংস যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, যাতে ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের নির্বিচারে হত্যা করা হত। ইংল্যান্ডে রাজা প্রথম চার্লসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর ইংল্যান্ডের 'রক্ষক' অলিভার ক্রমওয়েল কিছু ধর্মীয় উৎসব, থিয়েটার এবং মেপোল নৃত্যের মতো আরো অনেক বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেন। তার মূর্তিপূজা-বিরোধী অনুসারীরা ক্যাথলিক প্রতিমূর্তিগুলো বিকৃত করে দেয়।

ক্যাথলিক প্রার্থনা অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয় এবং কোনো ক্যাথলিক কোনো দফতরের পদাধিকারী হতে পারতো না।

অন্যান্য মোগলের মতো আওরঙ্গজেব মুসলিম চান্দ্র বর্ষপঞ্জি ব্যবহার করেছেন, তবে আমি পশ্চিমা জগতের সাধারণ অব্দ অনুসরণ করেছি। আওরঙ্গজেবের শাসনকাল দীর্ঘসময় জুড়ে ছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সময়ের মাপকাঠিকে ব্যবহারোপযোগী এবং সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। আর অবশ্য বর্ণনার সুবিধার উদ্দেশ্যে অনেক ঘটনা বাদ দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক টীকায় প্রকৃত তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে।

অতিরিক্ত টীকা

অধ্যায় : ১

শিবাজির জন্মতারিখ সম্পূর্ণ নিশ্চিত নয়, তবে সাধারণত বিবেচনা করা হয় যে, ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল পশ্চিম ঘাটের শিবনেরি দুর্গে তার জন্ম হয়। শিবাজি এবং আফজাল খানের মধ্যেকার লড়াই সম্পর্কে বেশ কয়েকটি ভাষ্য রয়েছে, তবে সাধারণত বলা হয় ঘটনাটি ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ নভেম্বর ঘটেছিল। শিবাজির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল। আওরঙ্গজেব তাকে দমন করার জন্য তাঁর চাচা এবং মমতাজ মহলের ভাই শায়েস্তা খানকে পাঠান, তখন শিবাজি একটি ছোট দল নিয়ে পুনরায় শায়েস্তা খানের শিবিরে ঢুকে হেরেম পর্যন্ত পৌঁছে শায়েস্তা খানকে আহত করে পালিয়ে যান। এছাড়া ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শিবাজি সুরাট আক্রমণ করেন।

অধ্যায় : ২

আরঙ্গজেবের জন্ম ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। তাঁর পিতা সম্রাট শাহজাহানের জন্ম ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র এবং সম্রাট আকবরের পৌত্র। এই সিরিজের পঞ্চম পুস্তক দি সার্পেন্টস টুথ-এ বর্ণিত হয়েছে, ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যখন শাহজাহান পীড়িত হন, তখন পিতার মৃত্যুতে তাদের বড় ভাই দারা শিকো—জন্ম ১৬১৫, সিংহাসনে আরোহণে বাধা দেবার জন্য শাহজাহানের তিন পুত্র—যথাক্রমে মুরাদ—জন্ম ১৬২৪, শাহ সুজা—জন্ম ১৬১৬ এবং আওরঙ্গজেব বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। দারা শিকো তাঁর পিতার পছন্দের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার ছিলেন। বিশেষত আওরঙ্গজেব দারা শিকোকে একজন নব্যতান্ত্রিক বা খারেজি বিবেচনা করতেন। বিদ্রোহী তিন ভাই একটি পর্যায় পর্যন্ত ঐকমত্য ছিলেন—মুরাদকে লেখা আওরঙ্গজেবের একটি চিঠি সংরক্ষিত হয়েছিল, তাতে তিনি একটি ধারণা তুলে ধরেছিলেন—কিভাবে তাদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করবেন। মে ১৬৫৮ আগ্রা থেকে আট মাইল দক্ষিণপূর্বে সমুগঁড়ে আওরঙ্গজেব এবং মুরাদ দারাকে

পরাজিত করেন। পরিশেষে আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা দারা শিকোকে বন্দী করে এবং ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে দিল্লিতে আওরঙ্গজেব তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তাঁর ছোট কবরটি দিল্লিতে সম্রাট হুমায়ুনের কবর-মঞ্চে রয়েছে।

ইতোমধ্যে আওরঙ্গজেব মুরাদকেও সরিয়ে দেন। কৌশলে তাঁকে তাঁর শিবিরে, তারপর একা তাঁর তাঁবুতে ঢুকিয়ে, সেখান থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে বন্দী করা হয় এবং তাঁর প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। সিংহাসনের জন্য তাঁর দাবি নিয়ে এগোবার সময় প্রথম পর্যায়ে মুরাদ তাঁর অর্থমন্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুদণ্ডকে ন্যায্যতা প্রদানের জন্য এই সত্যটি ব্যবহার করা হয়। আওরঙ্গজেব বিনয়ের সাথে মন্ত্রীর পরিবারকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদেরকে ন্যায় বিচার দাবি করার জন্য আহ্বান জানান। মুসলিম আইন অনুযায়ী তারা আর্থিক ক্ষতিপূরণ কিংবা যদি তারা চায়, তবে প্রাণের বদলে প্রাণ—এই দাবি করতে পারে। মন্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র আর্থিক কিংবা শারীরিক, যে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তবে কেউ কেউ বলেন দ্বিতীয় পুত্র সম্ভবত ঘুষ খেয়ে আর্থিক ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ না করে মুরাদের প্রাণদণ্ড দাবি করে। অবশেষে ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর মুরাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। রক্তের দাবি না করার বিষয়টিকে বিশেষভবে চিহ্নিত করে আওরঙ্গজেব বড় ছেলেটিকে পুরস্কৃত করেন।

উত্তরাধিকার নিয়ে সংঘটিত যুদ্ধে শাহ্ সুজা প্রথম দিকেই পরাজিত হয়েছিলেন, তবে তারপরও মাঝখানে তিনি বেশ কয়েকবার হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেন। বেশ কয়েকবার পরাজিত হওয়ার পর তিনি বাংলার পুবে আরাকানের জলদস্যু রাজার দেশে পালিয়ে যান। সেখানে সম্ভবত তাকে হত্যা করা হয়। আওরঙ্গজেবের সাথে শাহ্ সুজার সংঘর্ষের সময় আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ সুলতান কিছু সময়ের জন্য শাহ্ সুজার সাথে যোগ দিয়েছিলেন। তার শাস্তিস্বরূপ আওরঙ্গজেব তাকে গোয়ালিয়রে দুর্গ-প্রাসাদে বন্দী করে রাখেন। ষোল বছর পর সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। একই সময়ে আওরঙ্গজেব দারা শিকোর জ্যেষ্ঠ পুত্র সোলায়মান শেখের মৃত্যুর জন্যও দায়ী ছিলেন। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন তাঁকে জোর করে বিশেষ পরিমাণে আফিমের একটি দ্রবণ—পোস্তা খাওয়ানো হত। এছাড়া দারা শিকোর দ্বিতীয় পুত্র সিফিরকেও গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়।

সমুগঁড়ের যুদ্ধের সময় থেকেই আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা শাহজাহানকে ঘিরে ফেলে, তারপর তাঁকে আগ্রা দুর্গে বন্দী কনে রাখে। তাঁর সর্বজ্যেষ্ঠ কন্যা জাহানারার জন্ম ১৬১৪—শুরু থেকে শেষ অবধি তাঁর পিতার সাথেই ছিলেন।

তবে অন্য দুই কন্যা—রওশনআরা (জন্ম ১৬১৭) এবং গওহরা (জন্ম ১৬৩১) তাঁকে ছেড়ে চলে যান। রওশনআরা আওরঙ্গজেবের দীর্ঘকালের সমর্থক ছিলেন। এই পুস্তকে উল্লেখ করা শাহজাহানের সকল সন্তানের মাতা—মমতাজ মহল গওহরাকে জন্ম দিতে গিয়ে ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দের জুনে বোরহানপুরে মারা যান। তাঁর মৃত্যু শাহাজাহানের মনে গভীর দাগ কাটে, তিনি তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। আর আমার বিশ্বাস তাঁর সন্তানরাও একইভাবে শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁকে তাজমহলে সমাহিত করা হয়, যা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভালোবাসার স্মৃতিসৌধ।

আওরঙ্গজেব অত্যন্ত সাধারণ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জুলাই ১৬৫৮ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্তীতে দিল্লিতে ১৫ জুন, ১৬৫৯ অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে তাঁর অভিষেক হয়।

শাহজাহানের বন্দী হয়ে কারাগারে থাকার প্রথম বছরে পিতা-পুত্রের মধ্যে পত্র বিনিময় হয়। শাহজাহানের তরফের চিঠিগুলো কেবল ভর্ৎসনায় পরিপূর্ণ ছিল আর আওরঙ্গজেব তাঁর চিঠিতে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর কাজের স্বপক্ষে যুক্তি দেখান। একটি চিঠিতে আওরঙ্গজেব সরাসরি মূলে চলে আসেন। একজন অবহেলিত সন্তানের গভীর দুঃখ নিয়ে তিনি লিখেন, 'জাঁহাপনা, আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম যে, আপনি আমাকে ভালোবাসেন না।' তিনি শাহজাহানকে নিজের ভ্রাতৃহত্যার জন্য বিদ্রূপ করেন। আমার মনে হয় আওরঙ্গজেবের বিশ্বাস যে, তাকে তাঁর পিতা ভালোবসেন না আর মাকে হারাবার শোকই তার চরিত্রের মূল চাবিকাঠি।

জানুয়ারি ১৬৬৬ শাহজাহান শেষবারের মতো আগ্রা দুর্গে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কোনো কোনো বর্ণনা মতে, তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি মারা যাচ্ছেন তখন তিনি তাঁকে কাছের বেলকনিতে নিয়ে যেতে বললেন, যাতে সেখান থেকে সহজে তাজমহল দেখতে পারেন। সেখানেই কাশ্মিরি শাল গায়ে জড়িয়ে, পাশে ক্রন্দনরত জাহানারাকে নিয়ে তিনি ২২ জানুয়ারি ১৬৬৬ ভোরে মারা যান। পরিচারকরা কর্পূরের পানিতে তাঁকে গোসল করাল, তারপর মলিন কাফনে তাঁর দেহ জড়িয়ে একটি চন্দনকাঠের কফিনে শোয়াল। পরদিন সকালে নিচের তলায় একটি নতুন ফটক খুলে প্রথানুযায়ী আগে মাথা দিয়ে তাঁকে নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর গুটিকয়েক শবানুযাত্রীসহ নৌকাবেয়ে যমুনা নদী পার হল।

জাহানারা জাঁকজমক এবং যথাযথ সম্মানের সাথে তাঁর পিতাকে দাফন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি। আওরঙ্গজেব রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁকে দাফনের অনুমতি

দেন নি। দোয়া পড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধ সম্রাটের মৃতদেহ অত্যন্ত দ্রুত এবং নীরবে তাজমহলের ভূগর্ভস্থ মার্বেল পাথরের কক্ষে মমতাজের পাশে সমাহিত করা হয়। আমার বিশ্বাস শাহজাহান তাঁর নিজের জন্য যমুনার অপর পাড়ে মাহতাব বাগ নামে একটি সুন্দর 'চন্দ্রালোকিত বাগানে' আলাদা একটি চমৎকার সমাধিসৌধ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন।

১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি দখলের সময় পারস্যসম্রাট নাদির শাহ ময়ূর সিংহাসন তুলে পারস্যে নিয়ে যান। তারপর এটি অদৃশ্য হয়ে যায়, সম্ভবত সেটা ভেঙ্গে ফেলা হয়। পরবর্তীতে পারস্যসম্রাটরা যে ময়ূর সিংহাসনে বসতেন সেটা ১৯ শতকে নির্মাণ করা হয়। এর সাথে মোগল ময়ূর-সিংহাসনের কোনো সম্পর্ক নেই। এছাড়া নাদির শাহ মোগল কোষাগার থেকে বিখ্যাত কোহিনূর হীরাটিও তার সাথে নিয়ে যান। এই হীরা গোলকুন্ডার হীরার খনি থেকে উত্তোলন করা হয়েছিল। ১৯ শতকের শেষ দিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরা আবিষ্কৃত হওয়ার আগপর্যন্ত গোলকুন্ডাই একমাত্র হীরার খনি ছিল। কথিত আছে, গোয়ালিয়রের রাজপরিবারের সদস্যরা এই হীরাটি ভবিষ্যৎ সম্রাট হুমায়ুনকে দিয়েছিলেন। পানিপথের যুদ্ধে প্রথম মোগল সম্রাট বাবর যখন উত্তর-পশ্চিম ভারত দখল করে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করছিলেন, তখন গোয়ালিয়রের রাজা পরাজিত পক্ষের হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হন। পরবর্তীতে হুমায়ুন রাজপরিবারের সাথে ভালো ব্যবহার করায়, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হীরাটি তাঁর হাতে তুলে দেন। এই সিরিজের দ্বিতীয় পুস্তক—ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরবর্তীতে হুমায়ুন হীরাটি পারস্যের শাহের হাতে তুলে দেন, যাতে সিংহাসন পুনরুদ্ধারের সময় তিনি পারস্যের সমর্থন পান। তারপর অবশ্য রত্নটি আবার হিন্দুস্তানে ফিরে আসে এবং শাহজাহানের রত্ন ভাণ্ডারে স্থান পায়। ফরাসি রত্নকার টেভ্যরনিয়ের এটা সেখানে দেখে এর প্রশংসা করেন। নাদির শাহই এই রত্নটির নাম রাখেন কোহিনূর—'জ্যোতির পর্বত'। নাদির শাহ নিহত হওয়ার পর একজন পারসিক সেনাপতি হীরাটি আফগানিস্তানে নিয়ে যান। সেখানে তিনি নিজেকে একজন শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৯ শতকের প্রথম দিকে তার একজন বংশধর শাহ শুজাহ পলাতক অবস্থায় থাকাকালে হীরাটি পাঞ্জাবের শাসক রণজিত সিংকে দেন। রণজিত সিং তার ব্রেসলেটে হীরাটি পরতেন। ব্রিটিশরা পাঞ্জাব দখল করার পর গভর্নর-জেনারেল হীরাটি রানি ভিক্টোরিয়ার কাছে পাঠিয়ে দেন, তারপর সেটি ব্রিটিশ রাজার মুকুটের একটি অংশে পরিণত হয়।

৪ এপ্রিল ১৬৪৪ এক দুর্ঘটনায় জাহানারার মুখ ভীষণভাবে আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। তার মুখের পোড়া দাগটির কথা আওরঙ্গজেবের তখনও মনে ছিল। শাহজাহানের একটি ঘটনাপঞ্জিতে বিষয়টি এভাবে তুলে ধরা হয়েছে :

...কামরার মাঝখানে মাটিতে রাখা একটি জ্বলন্ত প্রদীপের সাথে তাঁর পোশাকের আঁচল ঘষা লাগলো। রাজপ্রাসাদের মেয়েদের পোশাক অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাপড় দিয়ে তৈরি করা হত আর তাতে সুগন্ধি তেল মাখা হত। কাজেই তাঁর পোশাকে আগুন লাগবার সাথে সাথে পুরো দেহের পোশাকে আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর কাছেই চারজন পরিচারিকা ছিল, তারা সাথে সাথে আগুন নেভাতে চেষ্টা করলো। তবে পুরো পোশাকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকায় ওদের চেষ্টায় কোনো কাজ হল না। পুরো ঘটনাটি এত দ্রুত ঘটেছিল যে, কাউকে জানিয়ে পানি আনার আগেই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়জনের পিঠ হাত আর শরীরের দুইপাশ ভয়ঙ্করভাবে পুড়ে গেল।

অধ্যায় :৩

আওরঙ্গজেব যে তৈমুরের আংটি পরতেন, সেই তৈমুর (১৩৩৬-১৪০৫) পশ্চিমাবিশ্বে টমবুরলেইন নামে পরিচিত। 'তৈমুর দি লেইম' নামটি বিকৃত হয়ে টমবুরলেইন হয়েছে। ক্রিস্টোফার মার্লোর নাটকে তাকে 'ঈশ্বরের গজব' হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। তিনি একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। পশ্চিমা জগতের অধিকাংশ এবং মধ্য এশিয়া তিনি বিজয় করেন। ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লি আক্রমণ করে তছনছ করে দেন। তার রাজধানী সমরকন্দকে সুন্দর করে সাজানোর জন্য তিনি এখান থেকে প্রচুর রত্ন এবং কারিগর সাথে নিয়ে ফিরে যান। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রথম মোগল সম্রাট বাবরের একজন পূর্বপুরুষ ছিলেন। চেঙ্গিস খাঁও তা-ই ছিলেন।

১৬৬৬'র মে মাসে শিবাজি আগ্রা আসেন। আওরঙ্গজেব তাকে বন্দী করে। ওই বছরের আগস্টের শেষে তিনি একটি বেতের ঝুড়িতে লুকিয়ে পালিয়ে যান।

আওরঙ্গজেব তার মতো সাধারণ পোশাক পরার অনুশাসন মেনে চলার বিষয়ে তার সভাসদদের উপর কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। একবার একজন সভাসদ একটি পোশাক পরে তার সামনে হাজির হন, যার ঝুল অনেক লম্বা ছিল এবং সম্রাটের চোখে অতি অলঙ্কৃত ছিল। আওরঙ্গজেব সাথে সাথে তার সামনে পোশাকের ঝুল কাটার নির্দেশ দিলেন।

এই সিরিজের আগের পুস্তকগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে, মোগল সম্রাটরা ঝরোকা বেলকনি থেকে প্রজাদের সামনে দর্শন দিতেন। এই প্রথা আওরঙ্গজেব

বাতিল করলেন। তিনি এ-ধরনের দর্শন দেওয়াকে সম্রাটকে পূজা করার খুব কাছাকাছি একটি প্রথা মনে করতেন।

তাঁর ধর্মে মানুষ এবং প্রাণীর প্রতিকৃতি আঁকার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করা হলেও, আওরঙ্গজেব ছবি আঁকার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং সম্রাটের নিজের আঁকা অপরূপ সুন্দর দু-একটি ক্ষুদ্রাকৃতির চিত্রকর্ম পাওয়া যাওয়ার কথা শোনা গেছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের উপর তাঁর ধূর্ত সম্রাজ্ঞী নূরজাহান কিরকম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং কিভাবে তিনি তাঁকে আফিম সেবন আর সুরা পানে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন, তা বিশদভাবে এই সিরিজের চতুর্থ পুস্তক—দি টেইন্‌টেড থ্রোনে উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে বর্ণিত হয়েছে—কিভাবে ভবিষ্যতে ভালো আচরণ করার নামে তাঁদের পিতা শাহজাহান তাঁদেরকে জিম্মি করে রেখেছিলেন।

অধ্যায় : ৪

আজম এবং জানির বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারি ১৬৬৯। মুয়াজ্জমের জন্ম অক্টোবর ১৬৪৩, আজমের জুন ১৬৫৩ এবং আকবরের সেপ্টেম্বর ১৬৫৭।

আওরঙ্গজেব বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকজন স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। এই কাহিনিতে তিনজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন—দিলরাস বানু, নওয়াব বাঈ এবং উদিপুরী মহল। দিলরাস বানু ছিলেন পারস্যের সাফাভিদ রাজবংশের একজন শাহজাদী। তিনি ছিলেন শাহজাদি জেবুন্নিসা এবং জাবতুন্নিসার মাতা, যাঁদের কথা এই পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া তিনি শাহজাদা আজম ও আকবরেরও মাতা ছিলেন। অক্টোবর ১৬৫৭ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি আকবরকে জন্ম দেবার একমাস পর মৃত্যুবরণ করেন। সম্ভবত প্রসবকালীন কোনো জটিলতা হয়েছিল। একজন কাশ্মিরি রাজকুমারী—নওয়াব বাঈ ছিলেন শাহজাদা মুয়াজ্জম ও মোহাম্মদ সুলতানের মাতা, যাকে তার পিতা কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন। তিনি ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

উদিপুরী মহলের বংশ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে। আমি সেই ভাষ্যটি অনুসরণ করেছি, যাতে বলা হয়েছে—তাঁর জন্ম ককেশাস পর্বত এলাকার প্রাচীন জর্জিয়া রাজ্যে। আরো অনেক বিশিষ্টতার মধ্যে দাবি করা হয়—এরাই প্রথম মদ আবিষ্কার করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০ অব্দে এখানে প্রথম মদ চোলাই করা হয়। উদিপুরী মহল সম্পর্কে অন্যান্য বিবরণে জানা যায়—

তিনি যোধপুর অথবা কাশ্মির থেকে এসেছিলেন। দিলারা বানুর মৃত্যুর পর তিনি আওরঙ্গজেবের প্রিয়তমা স্ত্রীতে পরিণত হন।

আওরঙ্গজেব যেসব উল্লেখযোগ্য ভবন নির্মাণ করেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল—আওরঙ্গাবাদে দিলরাস বানুর জন্য নির্মিত 'বিবি কা মকবরা' নামে একটি সমাধিসৌধ। এর সাথে তাজমহলের কিছুটা মিল রয়েছে। এই ভবনের নকশার পরিকল্পনা অনুমোদন করার সময় আওরঙ্গজেব সম্ভবত তাঁর প্রিয় মাতা মমতাজের সমাধির কথা বিবেচনা করেছিলেন। নকশাটি তৈরি করেছিলেন ওস্তাদ আহমেদ লাহোরীর পুত্র আতাউল্লাহ। ওস্তাদ আহমেদ লাহোরী তাজমহলের প্রধান নকশাকার হিসেবে স্বীকৃত।

সম্ভবত সর্বাধিক সুন্দর যে ভবনটি আওরঙ্গজেব নির্মাণ করেছিলেন, সেটি হল মোতি মসজিদ। নিজের ব্যবহারের জন্য দিল্লির লাল কেল্লার ভেতরে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এটি তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন। আমি প্রথম যখন ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলাম, তখন সহজেই এই মসজিদে যাওয়া যেত। এটি সত্যিই চমৎকার একটি স্থাপনা।

আওরঙ্গজেব যেসব ধর্মীয় বিধান বলবৎ করেছিলেন, তা এরালি রচিত দি মোগল থ্রোন পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। জাহানারা এর প্রতিবাদ করেছিলেন।

গোকলার অভ্যুত্থান হয় ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে এবং তার ভয়াবহ পরিণতি হয়। এই লড়াইয়ে আওরঙ্গজেবের অংশগ্রহণের বিষয়টি কাল্পনিক।

মানুসি এবং বেরনিয়ার উভয়েই রওশনআরার মদ পান এবং প্রণয়ঘটিত ব্যাপারটি বর্ণনা করেছিলেন। তাদের মতে একবার তিনি গোপন প্রেমিকসহ ধরা পড়েছিলেন। এই প্রেমিকদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল।

উদিপুরী মহলের গর্ভে কমবখশের জন্ম হয় মার্চ ১৬৬৭ খ্রি.।

অধ্যায় : ৫

রওশনআরা মারা যান সেপ্টেম্বর ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে। কেউ কেউ অভিযোগ করেছিলেন আওরঙ্গজেব তাকে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন, তবে এই অভিযোগের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

সতনামি বিদ্রোহ ঘটে ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে। সতনামিদের প্রথা এবং তাদের জাদুফুৎকারিণীর বর্ণনা ঐতিহাসিক সূত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের সম্পর্কে আরো পরিষ্কারভাবে ঈশ্বরদাস নগর লিখেছেন, 'এরা অত্যন্ত নোংরা, অশুচি এবং নিম্নশ্রেণির মানুষ ছিল। এরা হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে কোনো ভেদাভেদ করতো না। এরা নোংরা শূকর ও অন্যান্য নিষিদ্ধ খাবার খেত।

তাদের সাথে একই পাত্র থেকে একটি খাবার খেলে তারা কিছু মনে করতো না, ঘৃণা করতো না। লাম্পট্য ও ব্যভিচারকে তারা পাপ মনে করতো না।' আওরঙ্গজেব তাঁর লোকদের মনোবল বাড়াবার জন্য তাঁর নিজের তরফ থেকে তন্ত্রমন্ত্র—দোয়া-কালাম লিখে পতাকায় সেলাই করিয়েছিলেন। তাদের সাথে সরাসরি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া কিংবা নিজ হাতে জাদুকরীকে গুলি করে মারার বিষয়টি কাল্পনিক।

সিফির শিকো এবং জাবতুন্নেসার মধ্যে বিয়ে হয় ১৬৭৩ খ্রি.।

অধ্যায় : ৬

আওরঙ্গজেব ও তাঁর ভাইদের মাঝে গৃহযুদ্ধ চলার সময় মারওয়াড়ের জশবন্ত সিং বেশ কয়েকবার পক্ষ বদল করেন। এজন্য তার প্রতি আওরঙ্গজেবের আস্থা ছিল না। তিনি ডিসেম্বর ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে খাইবার গিরিপথে তার সদর দফতরে মারা যান। উত্তরাধিকার নিয়ে বিভিন্ন ঘটনা এবং রাজপুতদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য আওরঙ্গজেব মারওয়াড়ের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা অনেক বিস্তৃত এবং জটিল ছিল; তবে কেবল প্রয়োজনীয় এবং সঠিক বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

আওরঙ্গজেব জিজিয়া কর পুনরায় আরোপ করার কিছু দিন পর—১২ এপ্রিল ১৬৭৯ খ্রি. দিল্লিতে একটি ভূমিকম্প হয়।

অধ্যায় : ৭

জুন ১৬৭৪ খ্রি., শিবাজির জাঁকজমকপূর্ণ রাজ্যাভিষেক হয়। এর বিবরণ তৎকালীন ঘটনাপঞ্জির বিবরণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় : ১০

এপ্রিল ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে শিবাজি মারা যান। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র সম্ভাজি তার বিষয় সম্পত্তির একটি বর্ণনাপূর্ণ তালিকা তৈরি করেন। এতে রত্ন ছাড়াও প্রায় ১০০,০০০টি সোনালি এমব্রয়ডারি করা কাপড়, ৪০০,০০০টি রেশমি কাপড়, ৬৮০০ কিলোগ্রাম মরিচ, ২,২০০ কিলোগ্রাম তিমি মাছের অন্ত্রজাত মোমজাতীয় তীব্র সুগন্ধি, ৪৫০০ কিলোগ্রাম আবীর—বসন্ত উৎসবে (হোলি) ব্যবহৃতব্য লাল রংজাত গুঁড়ো পদার্থ, ৪৫ কিলোগ্রাম বারুদ, ৩১,০০০টি ঘোড়া, ৩০০০টি উট এবং ৫০০টি হাতি প্রাপ্ত হন।

অধ্যায় ১১

আকবর জানুয়ারি ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী হয়ে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন।

অধ্যায় : ১২

এখানে যেভাবে পিতার বিরুদ্ধে আকবরের যুদ্ধাভিযান তুলে ধরা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তার চেয়েও দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল; তবে আওরঙ্গজেব ঠিকই আকবরের সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য নকল চিঠি ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়া তিনি তাহাব্বুর খানকে ভয় দেখিয়ে বলেছিলেন যে, যদি সে আকবরের সঙ্গ ত্যাগ না করে তবে তার পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। আওরঙ্গজেব তাঁর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'যদি তোমার কোনো শত্রুকে ধ্বংস করতে চাও, তবে ব্যর্থ না হতে চাইলে কোনো কিছুই বাদ দিও না। সরাসরি উন্মুক্ত যুদ্ধে প্রতারণা, অজুহাত, কোনো কিছুর জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি—সবকিছুই চলে। তোমার পরিকল্পনা সফল করতে হলে এই দুনিয়ায় যত ধরনের ছলচাতুরী আছে সব ব্যবহার কর।'

আওরঙ্গজেব ঠিকই তাঁর মেয়ে কবি জেবুন্নিসাকে তার ভাই আকবরকে সমর্থন দেওয়ার কারণে তাকে বাকি জীবন কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। পুস্তক সংগ্রহ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের উৎসাহ দেবার ব্যাপারে তার এত আগ্রহ ছিল যে, তিনি এমন একটি গ্রন্থাগার গড়ে তুলেন যা, 'কোন মানুষ কখনও দেখেনি।'

বিদ্রোহী আকবর ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে সম্ভাজির সাথে যোগ দেন। মারওয়াড়ের দুর্গাদাস তাঁকে দক্ষিণে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন।

একদিকে মারওয়াড় ও মেবার এবং অন্যদিকে মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তি পুনপ্রতিষ্ঠিত হলেও, তাদের সম্পর্ক সবসময় আন্তরিকতাশূন্য ছিল না। আগের মতো ওরা পরস্পরের এত কাছাকাছি আর ছিল না। এরপর খুব কম রাজপুতই মোগল সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়।

অধ্যায় : ১৪

জাহানারা ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে দিল্লির একজন সুফি সাধকের কবরের কাছে একটি অতি সাধারণ কবরে দাফন করা হয়। তাঁর নিজ হস্তে রচিত একটি ফার্সি পঙ্ক্তি তাঁর কবরের ফলকে খোদাই করা আছে :

"শুধু সবুজ ঘাস যেন আমার সমাধি ঢেকে রাখে,
নম্র ও ধৈর্যশীলের সমাধি ঢেকে রাখার জন্য ঘাসই সর্বোত্তম।"

অধ্যায় : ১৬

গোলকুন্ডার আদিল হাসান ও অন্য শাসকদের লুচ্চামি সম্পর্কে বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক বিবরণ রয়েছে।

সেপ্টেম্বর ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দের বিজাপুর আত্মসমর্পণ করে। যারা সাহস করে বিজাপুর দুর্গের পরিখায় যথেষ্ট পরিমাণে বিভিন্ন দ্রব্য, এমনকি মৃতদেহও ছুড়ে ফেলেছিল, তাদেরকে আওরঙ্গজেব পুরস্কৃত করেন।

অধ্যায় : ১৭

গোলকুন্ডা দরবারের সাথে যোগাযোগ করার কারণে আওরঙ্গজেব আসলেই মুয়াজ্জমকে কারাদণ্ড দেন।

সেপ্টেম্বর ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে গোলুন্ডার পতন হয়, যখন একজন আফগান বিশ্বাসঘাতক উৎকোচ গ্রহণ করে একটি ছোট মোগল সেনাদলকে একটি ছোট ফটকের মধ্য দিয়ে দুর্গে ঢোকার সুযোগ করে দেয়। আদিল হাসানকে যখন বন্দী করা হয় তখন তিনি যে নির্লিপ্ততা দেখিয়েছিলেন, তা সত্যি ছিল। গোলকুন্ডা বিজয়ের পর মোগল সাম্রাজ্য সর্বকালের সর্ববৃহৎ বিস্তৃতি লাভ করে। এর এলাকা ছিল ৩২, ০০০০০ বর্গ কিলোমিটার বা ১২৫,০০০০০ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ছিল এক থেকে দেড় কোটি।

অধ্যায় : ১৮/১৯

কবি-কুলেশের সাথে সম্ভাজির গ্রেফতারের ঘটনাটি ঘটে ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে। ঘটনাটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, প্রায় সেরকমই ঘটেছিল। ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চের শেষদিকে তাদেরকে দাক্ষিণাত্যের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়ে দেখান, আওরঙ্গজেবের সামনে হাজির হওয়া, অত্যাচার আর মৃত্যুর ঘটনাগুলো ঐতিহাসিক সূত্র থেকে, বিশেষত কাফি খানের বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়েছে। মানুচি আরো বীভৎস বর্ণনা দিয়েছেন, যা এখানে উল্লেখ করা হয় নি।

অধ্যায় : ২০

স্যর উইলিয়াম নরিস তার রাজার কাছে চিঠির মাধ্যমে তার প্রতিবেদন পাঠান নি। তবে তার কথিত 'চিঠিটি'তে উল্লেখ করা তারিখগুলো সঠিক ছিল। সেই সাথে তার ভ্রমণের বিষয়বস্তু, আওরঙ্গজেবের সাথে যেখানে সাক্ষাৎ করেছিলেন, মারাঠা, জাট আর শিখদের সর্ম্পকে বিবরণ, ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে মুয়াজ্জমের কারামুক্তি এবং কমবখশের অস্থায়িভাবে কারাবরণের ঘটনাগুলো

সঠিক ছিল। ভিড়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আওরঙ্গজেবের ডানে বামে না তাকিয়ে একটি বই পড়ে চলার বিবরণটি নরিসের নিজস্ব বিবরণের খুব কাছাকাছি। হেনরী এভারিকে প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের সবচেয়ে সফল জলদস্যু বলা হয়, সে কখনও ধরা পড়ে নি। উইলিয়াম কিডকে লন্ডনের ওয়াপিং জাহাজঘাটায় মে ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। আর তার আলকাতরা মাখা নাবিকের দেহটি একটি লোহার খাঁচায় ভরে টেমস নদীর তীরে প্রদর্শন করা হয়, যাতে অন্যরা সাবধান হয়।

চিঠি লেখার সময় নরিস হয়তো মনে করেছিলেন তিনি ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামকে উদ্দেশ্য করে লিখছেন। তার জানার কথা নয় যে রাজা মার্চ ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে মারা গিয়েছিলেন আর তার পরিবর্তে রানি এনি সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। নরিসের পূর্ব ধারণা মতে ইংল্যান্ডে পৌছার আগে ১০ অক্টোবর ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

অধ্যায় : ২১

গওহরা মারা যান ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দে। বিদ্রোহী আকবর পারস্যে নির্বাসিত অবস্থায় ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। জেবুন্নিসার কারাগারে মৃত্যু হয় ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে।

অধ্যায় : ২২

আজমকে লেখা চিঠির অনুচ্ছেদটি, প্রকৃতপক্ষে তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা আওরঙ্গজেবের একটি চিঠির অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। একইভাবে কম-বখশকে লেখা চিঠির প্রথম অনুচ্ছেদটি আসলেই সর্বকনিষ্ঠ পুত্রকে উদ্দেশ্য করে লেখা আওরঙ্গজেবের একটি চিঠি থেকে নেওয়া হয়েছে।

আওরঙ্গজেব শুক্রবার ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ফজরের নামাজের পর ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে খুলদাবাদে একটি সাধারণ সমাধিতে দাফন করা হয়। লাল বেলেপাথরের কবরটির উপর কোনো কিছু উৎকীর্ণ করা নেই। যে ধরনের বিশাল সমাধিসৌধে হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানকে সমাহিত করা হয়েছে, তা থেকে এটি অত্যন্ত ভিন্ন ধরনের। তবে আফগানিস্তানের কাবুলে একটি পাহাড়ের পাশে প্রথম সম্রাট বাবর এবং দিল্লিতে তাঁর আদরের বোন জাহানারার অতি সাধারণ কবরের সাথে এর মিল রয়েছে।

উপসংহার

আজম, কমবখস্ এবং উদিপুরী মহলের মৃত্যু এবং বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে মুয়াজ্জমের সিংহাসনে আরোহণের ঘটনাগুলো নির্ভুল। বাহাদুর শাহ পাঁচ বছরেরও কম সময় শাসন করতে পেরেছিলেন।

মূল চরিত্রসমূহ

আওরঙ্গজেবের পরিবার

মা-বাবা :

মমতাজ মহল

সম্রাট শাহজাহান

ভাই :

দারা শিকো

শাহ সুজা

মুরাদ

বোন :

জাহানারা

রওশনআরা

গওহারা

স্ত্রী :

দিলরাস বানু

নওয়াব বাঈ

উদিপুরী মহল

পুত্র :

মোহাম্মদ সুলতান} (নওয়াব বাঈর পুত্র)

মুয়াজ্জম

আজম} (দিলরাস বানুর পুত্র)
আকবর}
কমবক্স (উদিপুরী মহলের পুত্র)

কন্যা :

জেবুন্নিসা} (দিলরাস বানুর কন্যা)
জেবাতুন্নিসা}

ভ্রাতুষ্পুত্র :

সুলায়মান} (দারাশিকোর পুত্র)
সিফির}

ভ্রাতুষ্পুত্রী :

জানি, দারা শিকোর কন্যা
সেনাপতি, সভাসদ এবং রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন কর্মকর্তা :
জসবন্ত সিং, মারওয়াড়ের রাজা এবং মোগল সেনাবাহিনীর সেনাপতি
আবু হাকিম, উলামাদের প্রধান
ওয়াজিম খান, আওরঙ্গজেবের গুপ্তচর প্রধান
উমর আলি, আওরঙ্গজেবের দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান
কামরান বেগ, আওরঙ্গজেবের প্রধান চর
আওরঙ্গজেবের প্রধান প্রতিপক্ষ :
শিবাজি, মারাঠি নেতা
সম্ভাজি, শিবাজির পুত্র
রাজারাম, শিবাজির দ্বিতীয় পুত্র
কবি-কুলেশ, সম্ভাজির একজন সেনাপতি
গোকলা, জাট নেতা
আদিল হাসান, গোলকুন্ডার শাসক
সিকান্দার, বিজাপুরের শাসক

অন্যান্য চরিত্র :

আমবারের রাজা
জগিন্দর সিং, আমবারের রাজার পুত্র
মেওয়াড়ের রানা
তাহাব্বুর খান, আকবরের বন্ধু ও ঘনিষ্ঠজন

দুর্গাদাস, মারওয়াড়ের রাজপ্রতিভূ

সন্তাজি, মারাঠি যুবক

স্যর উইলিয়াম নরিস, মোগল দরবারে ইংল্যান্ড থেকে আগত রাষ্ট্রদূত

তেগ বাহাদুর, শিখ নেতা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সম্পূর্ণ মোগল সিরিজটি রচনার ব্যাপারে যাঁরা আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার নিকট আমি কৃতজ্ঞ—এঁরা হলেন যথাক্রমে, হেডলাইন, ইউকে'র শার্লট ম্যানডেলসন, শেরিজ হবস্, এমিলিকিচিন এবং ইমি পার্কিনসকে এবং হ্যাচেট ইন্ডিয়ার টমাস আব্রাহাম, রিতি জাকুরি, অনুরিমা রায়, সহিনি ভট্টাচার্য এবং সবিতা নারায়ণ। সম্পূর্ণ মোগল সিরিজটি লেখার ব্যাপারে আরো যারা আমাকে সাহায্য সহযোগিতার করেছেন বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এছাড়া আমার এজেন্ট—লন্ডনের এ. এম. হিথের বিল হ্যামিলটন এবং নিউইয়র্কের ইঙ্ক ওয়েল ম্যানেজমেন্টের মাইকেল কার্লাইল এবং সেইসাথে আমেরিকান সংস্করণটির সম্পূর্ণ কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য টমাস ডানের সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অ্যার্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে তাদের, সাহায্য বিভিন্ন পরামর্শ এবং সেইসাথে বোরহানপুর দুর্গটি পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়ার জন্য, ধন্যবাদ জানাবে, বই পুস্তকে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা বোরহানপুরে সংগঠিত হয়েছিল।

সর্বোপরি অক্সফোর্ডের বোদলিয়ান লাইব্রেরি, ব্রিটিশ লাইব্রেরি এবং লন্ডনের লন্ডন লাইব্রেরির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।